কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়, বর্ধমান বিশ্ববিত্তালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিত্তালয় এবং গৌহাটি বিশ্ববিত্তালয়ের
বাণিজ্য-স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের অমূল্য সম্পদ।

অরুণ সান্যাল

অধ্যাপক, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ (মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের
প্রাক্তন সান্ধ্য শাখা), শ্রীপৎ সিং কলেজ, জিয়াগঞ্জ;
বসিরহাট কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, (সান্ধ্য
বিভাগ)-এর ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও কলিকাতা
বিশ্ববিত্তালয়ের পরীক্ষক।

আল্‌ফা পাবলিশিং কনসার্ন
৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীহারাধন বসাক
আলফা পাবলিশিং কনসার্ন
৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ :
২৬শে জানুআরী, ১৯৬০

প্রচ্ছদ :
শ্রীশচীন রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীসুকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

শ্রীজয়ন্ত বাগচি
পি, এম, বাগচি এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ
১৯, গুলু ওস্তাগর লেন
কলিকাতা-৬

পরম পূজনীয়

বাবা ও মা

শ্রীচরণেষু

ভূমিকা ॥

অধ্যাপনা উপলক্ষে আমি সুদূর মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ থেকে শুরু করে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ছাত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছি। প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রদের একই অভাববোধের কথা বার বার শুনতে পেয়েছি—সুলিখিত ও উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব। এই অভিজ্ঞতাই আমার বাণিজ্যিকা রচনার মূল উৎস।

দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফসল—বাণিজ্যিকা।

পঠন-পাঠনে লিপ্ত থাকায় ছাত্রদের সঙ্গে একই ভাবে যে অভাববোধের অংশীদার হয়েছি, সেই অভাবকে সীমিত সামর্থ দিয়ে পূরণ করতে চেষ্টা করেছি। আমার বিশ্বাস, 'বাণিজ্যিকা' ছাত্রদের সেই অভাব অনেকখানি মেটাতে সক্ষম হবে।

গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, অনুবাদ ও পরিভাষা অংশগুলি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সেই বৈশিষ্ট্যের কথা পৃথক ভাবেই বলার চেষ্টা করেছি, তাই পুনরাবৃত্তি করলাম না। ছাত্ররা গ্রন্থটি পাঠ করে আমার বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করলে আমার পরিশ্রম হবে সার্থক।

গ্রন্থ রচনার প্রেরণা এক—আর তাকে বাস্তবায়িত করা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। প্রেরণা থাকা সত্ত্বেও হয়ত কোনদিনই 'বাণিজ্যিকা'র আত্মপ্রকাশ ঘটত না, যদি না আমি অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক শ্রীজিতেন ঘোষ, বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীনরেন দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক শ্রীধীরানন্দ রায়ের সক্রিয় সহযোগিতা পেতাম। এঁদের অবিরত উৎসাহ ও পরামর্শদানই আমাকে এই দীর্ঘ কঠিন পরিশ্রমে প্রয়াসী করে তুলেছে। কৃতজ্ঞচিত্তে এ কথা স্বীকার করছি। এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা স্মরণ করে এঁদের ধন্যবাদ দানে বিরত থাকলাম।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপক শ্রীগোপাল সিংহ, মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র কলেজের অধ্যাপক শ্রীনলিনী রায় ও অধ্যাপক শ্রীমোহনলাল মিত্র, উত্তরপাড়া কলেজের বাংলা বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যাপক শ্রীসত্যরঞ্জন দাস, জয়পুরীয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীজগদীন্দু ভট্টাচার্য, প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুধাংশু তালুকদার, কাটোয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীবিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ও শ্রীপৎ সিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্ত রায় নানা ভাবনা দিয়ে সাহায্য করায়, এই সমস্ত অধ্যাপকদের অমূল্য অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে বইটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

শেষ কথা বাণিজ্য স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখে বিষয় নির্বাচনে, বিন্যাসে, উপস্থাপনায় ও মুদ্রণে গ্রন্থটিকে নিখুঁত ও শোভন-সুন্দর করে তুলতে ত্রুটি রাখিনি, তবুও ত্রুটি যদি থেকে গিয়ে থাকে তবে পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধন করার চেষ্টা করব। এ প্রসঙ্গে যে কোন পরামর্শ বা বক্তব্য সাদরে গ্রহণ করব। নমস্কারান্তে ইতি—

বিনীত

২৬শে জানুআরী। কলকাতা। গ্রন্থকার

॥ বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে ॥

॥ ১ ॥ **প্রবন্ধ সম্পর্কে :**

প্রথমত, বইটিতে এমন কয়েকটি সাম্প্রতিক বিষয়াশ্রিত প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে, যা অন্য কোন বই-এ নেই। এর কয়েকটি উল্লেখ করা হল, যেমন :

(১) অটোমেশন—আশীর্বাদ না অভিশাপ (২) ভারতের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক মন্দা (৩) বেতন, মজুরী ও মুনাফা বন্ধ রাখার প্রস্তাব (৪) ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহের সম্পর্ক (৫) ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (৬) শ্রমিক আন্দোলনের নব পর্যায় : ঘেরাও। (৭) পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস ও ভারত (৮) স্বাধীন ভারতে ইংরাজীর স্থান। এই ধরণের সাম্প্রতিক সমস্যা নিয়ে আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে, প্রশ্নপত্রে যে সব প্রবন্ধের প্রত্যাশা করা খুবই সঙ্গত। বলা বাহুল্য, রচনার ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও লাবণ্যমণ্ডিত ভাষার সার্থক সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের সফল নির্বাচন ও সর্বশেষ তত্ত্ব ও পরিসংখ্যান ব্যবহার করে প্রবন্ধগুলোকে ছাত্রবন্ধুদের কাছে মূল্যবান ও সার্থক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, প্রতিটি প্রবন্ধের শীর্ষে অনুসরণে লেখার যোগ্য প্রবন্ধগুলি চিহ্নিত হওয়ায় তা ছাত্রদের প্রস্তুতির সহায়ক হবে।

বাণিজ্যিক পত্র সম্পর্কে :

৮৪টি আদর্শপত্র (Model letters) রচনা করে বইটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। বাজারের কোন বই-এ এত বেশী সংখ্যক চিঠি নেই।

প্রতিটি বিভাগের পত্র রচনার আগে সেই বিভাগ সম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে, এবং শেষে যে সুচিন্তিত অনুশীলনী অংশ সংযোজিত হয়েছে তাতে ছাত্ররা উপকৃত হবে।

এ ছাড়া বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন পত্রে গত কয়েক বছর সংবাদ পত্রের 'চিঠি-পত্র' স্তম্ভে প্রকাশের জন্য যে চিঠি লিখতে দেওয়া হয়েছে, সেই

জাতীয় চিঠির অনেকগুলোরই 'আদর্শপত্র' অন্য কোন বই-এ নেই এই বইটিতে সেই ধরণের চিঠি সংযোজিত হয়েছে।

॥ ৩ ॥ **অনুবাদ সম্পর্কে :**

অনুবাদ বিভাগে বাজারের সব বইতেই শুধু মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন পত্রে প্রদত্ত অনুচ্ছেদগুলোর হয় পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ, নয় সূত্র-সঙ্কেত দেওয়া হয়। এই বইটিতেও তা দেওয়া আছে। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। আরও আছে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে 'Drilling Method'-এর অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে কি ভাবে কঠিন স্তরের অনুবাদের কাজে প্রবেশ করা যায়, গ্রন্থটিতে সেই পদ্ধতিই ছাত্রদের সামনে তলে ধরা হয়েছে।

॥ ৪ ॥ **পরিভাষা সম্পর্কে :**

পরিভাষার বিস্তৃত তালিকা এই বইটিতে দেওয়া আছে।

যে সমস্ত পরিভাষা বিভিন্ন পরীক্ষায় দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে ** চিহ্ন দিয়ে পৃথক করে দেখান হয়েছে।

॥ ৫ ॥ **শেষ বক্তব্য :**

পরিশিষ্টে—বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত কয়েক বছরের প্রশ্নপত্র সংযোজিত হয়েছে।

কলকাতা, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত।

॥ সূচীপত্র ॥

● প্রবন্ধ ●

বাণিজ্যিক পত্র রচনা

অনুবাদ

● পরিভাষা ●

● পরিশিষ্ট ●

বাণিজ্যিক ত্রৈবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর বাংলাভাষার পাঠ্যক্রম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

1. Translation from English to Vernacular—I Passage 20 marks
2. Translation from Vernacular to English I Passage 20 „
3. Translation of English commercial terms in their Vernacular equivalents 10 „
4. Commercial correspondence 20 „
5. Essay 30 „

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

1. Tutorial (from the college records of the Session) 50 marks
2. Essay 15 „
3. Translation 15 „
4. Commercial correspondence 20 „

Spoken 50 „

(i) The following four poems from 'Manashi' by Tagore 15 „

1. নিষ্ফল কামনা
2. গুরু গোবিন্দ
3. সুরদাসের প্রার্থনা
4. মেঘদূত

(ii) Topics relating to the economic and commercial position of West Bengal 10 marks

(iii) Testing Acquaintance with the following literary figures 25 „

(a) Bankim Chandra
(b) Michael Madhusudan
(c) Dwijendralal Roy
(d) Saratchandra
(e) Rabindranath

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

1. Translation from English to Vernacular—1 Passage 20 marks
2. Translation from Vernacular to English I Passage 20 „
3. Translation of English commercial terms into their Vernacular equivalents 10 „
4. Commercial correspondence 20 „
5. Essay 30 „

পৃথক সাহিত্যাংশ আছে

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

1. Translation from English 30 marks
2. Essay 30 „
3. Translation and explanation of commercial terms 20 „
3. Translation into English 20 „

● সংকেত-পরিচিতি ●

ক. বি.—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ব. বি.—বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

উ. বি.—উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

গৌ. বি.—গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

[কেবলমাত্র বি. কম পরীক্ষাই বুঝতে হবে।]

বাণিজ্যিকা

প্রবন্ধ

আজ যে আমেরিকা জগতের মধ্যে সব চেয়ে ধনী দেশ বলে গণ্য হয়েছে তার মূলে রয়েছে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য। …জগতে অর্থের দিক দিয়ে প্রাধান্য লাভ করতে হলে ঘরের আর বাইরের বাণিজ্যকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে ফেলতে হবে। ঘরের পয়সা ঘরে রাখতে হবে আবার বাইরেরও পয়সা কুড়িয়ে আনতে হবে; দেশের ভিতরকার ব্যবসা-গুলোকে সতেজ রাখতে হবেই, অধিকন্তু বাইরে ব্যবসা করবার মত উপযুক্ত সামর্থ্য ও শিক্ষা সঞ্চয় করতে হবে। বাংলার ব্যবসার ইতিহাস ওল্টালে দেখতে পাই আগে বাংলাদেশে বাঙালীর দুই রকম বাণিজ্যেই হাতযশ ছিল। কিন্তু আজ বাংলার লক্ষ্মীশ্রী বড় বাজারে; অন্তর্বাণিজ্যই বলুন, আর বহির্বাণিজ্যই বলুন, একে একে বাঙালীর হাত থেকে সব চলে গেছে বা যাচ্ছে।"

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ভূমিকা

প্রবন্ধ রচনা—বাণিজ্যিক বাংলা পাঠ্যসূচীর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং বাণিজ্য-স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে প্রবন্ধ রচনার পদ্ধতির সঙ্গে সবিশেষ পরিচয় থাকা একান্ত কাম্য।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের পরিধি যেমন বিস্তৃত, তেমনি অন্তহীন তার বৈচিত্র্য। বিচিত্র রূপ সমন্বিত বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটি মূল্যবান অংশ হল—প্রবন্ধ। হয়তো উপন্যাস, নাটক বা ছোট গল্পের যে আকর্ষণী ক্ষমতা আছে—প্রবন্ধের তা নেই; তবুও প্রবন্ধের নিজস্ব গৌরব অনস্বীকার্য।

প্রবন্ধ রচনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে হলে এবং তার স্বরূপ সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট করতে হলে, পটভূমি হিসেবে গদ্যের স্বরূপ ধর্ম এবং তার প্রকাশ-ভঙ্গির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা অপরিহার্য। বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত জেমস্ সাদারল্যাণ্ড ইংরেজি গদ্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে বসে এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, প্রথমে গদ্য ছিল প্রয়োজনের বাহন, কবিতার তুলনায় অনভিজাত, ব্রাত্য; বৈষয়িক চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বহুদিনের অক্লান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর, শিল্পীদের প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে গদ্যের শুষ্ক, নিষ্প্রাণ দেহে সৃষ্টির প্রাণ-ছন্দ ও লাবণ্য ক্রমশ ফুটে উঠতে থাকে, অবশেষে আধুনিক যুগে তা কবিতার মতই পাঠকের গভীরতম রসচৈতন্যকে স্পর্শ করার মত পূর্ণাঙ্গ শিল্পসৃষ্টির গৌরব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। এই শৈল্পিক গদ্যেরই একটি বিচিত্র রূপাঙ্গিক হল—প্রবন্ধ।

'প্রবন্ধ' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত। ইংরেজী 'Essay' শব্দটির প্রতিশব্দ রূপেই আমরা এই শব্দটিকে গ্রহণ করেছি। প্রবন্ধ শব্দের অর্থ হল প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন। প্রশ্ন উঠতে পারে—এ বন্ধন কিসের? উত্তরে বলা হবে: এ বন্ধন বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রকাশভঙ্গির, ভাবের সঙ্গে রূপের, বক্তব্যের সঙ্গে ভাষার। সংস্কৃত

সাহিত্যের ক্ষেত্রে গদ্যেই রচিত হোক, কিংবা পদ্যেই রচিত হোক, বা গদ্যপদ্য মিশ্রিত হোক, 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' যুক্ত রচনা মাত্রেই প্রবন্ধ। কি ; আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'প্রবন্ধ' শব্দটি সংস্কৃত প্রবন্ধ শব্দের মত ব্যাপক অর্থে গৃহীত হয়নি। একটি. সুনির্দিষ্ট অর্থেই আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে 'প্রবন্ধ' শব্দটি প্রচলিত। বর্তমান কালে প্রবন্ধ বলতে বোঝায় : আখ্যানমুক্ত, গদ্যবাহিত এক শ্রেণীর রচনা যা সাহিত্য গুণান্বিত ও রসোত্তীর্ণ। একজন বিখ্যাত ইংরেজ প্রাবন্ধিক প্রবন্ধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন : The essay is a composition of moderate length on any particular subject or branch of asubject originally implying want of finish, but now said of a composition more or less elaborate in style, though limited in range.

॥ ২ ॥

প্রবন্ধের যেমন একটি সুনির্দিষ্ট রূপ আছে, তেমনি তার স্বরূপটিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই স্বরূপ সন্ধান করতে বসে প্রথমেই মনে পড়ে : প্রবন্ধ এমন এক জাতীয় রচনা বা শিল্প-কর্ম যার সৃষ্টির মূলে আছে অপূর্ব নির্মাণ কৌশল—যা সুমিতিবোধ সংগতি-বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বলা বাহুল্য, মাত্রাতিরেক সমস্ত কর্মকেই ব্যাহত করে—শিল্প সৃষ্টিকে তো বটেই। সুতরাং প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও যে এই সংগতি বা সুমিতি-বোধ একান্ত প্রয়োজন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সাধারণতঃ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কোন তত্ত্ব বা তথ্যকে প্রকাশ করা। এক্ষেত্রে সুবিস্তৃত বর্ণনার অবকাশ নেই, নেই আবেগের অকারণ বিস্তার। প্রবন্ধকার মহাসমুদ্রের অপরিসীম সৌন্দর্যে আত্মহারা হন না, তিনি অতলান্ত গভীরতার পরিমাপে আগ্রহী। প্রকৃতপক্ষে, প্রবন্ধকার যতখানি সৃষ্টি করেন, তার চাইতে বেশী করেন—নির্মাণ। তিনি শুধুমাত্র উপভোক্তাই নন, তিনি নিপুণ ব্যাখ্যাতাও। এবং এর জন্য হৃদয়ানুভূতির চেয়ে বেশী প্রয়োজন প্রজ্ঞার। তবে আবেগ ও প্রজ্ঞার সার্থক সমীকরণেই সৎ সাহিত্যের জন্ম হয়। প্রবন্ধ সম্পর্কেও একথা সত্য। 'প্রবন্ধ'* এমন একজাতীয় রচনা যার মধ্যে লেখকের বিদ্যাবুদ্ধির যেমন পরিচয় প্রকাশিত হয়, তেমনি লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনও ঘটে। মূলতঃ তত্ত্বে বা তথ্যে নয়—প্রবন্ধ রচনার উৎকর্ষগত বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে ব্যক্তিত্বের সুচারু প্রক্ষেপণে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে 'প্রবন্ধ'-কে বলা চলে একাধারে ব্যক্তিনিষ্ঠ 'বা' 'মন্ময়' (Subjective) এবং বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় (Objective) শিল্প-প্রকরণের অদ্বয় সমন্বয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথাও স্মরণে

রাখা দরকার যে প্রাবন্ধিক বস্তুর রসরূপ অপেক্ষা বস্তুর অন্তর স্বরূপের প্রতিই বেশী আগ্রহী।

উৎকৃষ্ট সাহিত্য, শিল্পের অন্তর্ভূত হওয়া সত্ত্বেও, প্রবন্ধ সাধারণত জ্ঞানের সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। এইটিই প্রচলিত বিশ্বাস। কিন্তু প্রবন্ধের ঠিক এই একটি পরিচয়ই নেই; আরও অন্য একটি পরিচয়ও আছে। বিখ্যাত ইংরেজ কবি ম্যাথু আরনল্ড এই দু' ধরণের রচনার উল্লেখ করেছেন: জ্ঞানমূলক সাহিত্য (Literature of Knowledge) এবং ভাবমূলক সাহিত্য (Literature of Power) যদিও একথা সাধারণ সত্য যে জ্ঞানের সাহিত্যকে রস-সাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া যায় না; তবুও এ সত্যও স্বীকার না করে উপায় নেই যে প্রকৃত প্রতিভাধর যিনি তিনি তাঁর প্রতিভার যাদু স্পর্শে জ্ঞানের সাহিত্যকে সহজেই রস-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করে দিতে সক্ষম। তবে সেই জাতের প্রাবন্ধিকের সংখ্যা খুবই অল্প। এই শ্রেণীর প্রবন্ধ সাহিত্যের উল্লেখ করতে গিয়ে ব্রিটিশ প্রাবন্ধিক রবার্ট লিণ্ড লিখেছেন: It is strange that the essay which at first sight looks the easiest and most natural thing in the world to write, has so seldom achieved excellence, yet it is an indisputable fact that the greatest essayist like the greatest letter-writer, is rarer even than the great poet.

স্পষ্টই বোঝা গেল, জ্ঞানমূলক সাহিত্য সৃষ্টির উৎস হল ব্যক্তিগত মনীষার আহৃত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং স্রষ্টার কোন বিশেষ মতবাদ। আর ভাবমূলক সাহিত্য সৃষ্টির উৎস হল ব্যক্তিগত প্রতিভা এবং অলৌকিক প্রেরণা। প্রবন্ধকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হলেও অর্থাৎ প্রবন্ধ মনন-প্রধান সৃষ্টি হলেও কোথাও বাক্‌চাতুর্যে, কোথাও হাস্যরসাশ্রিত প্রকাশ-রীতিতে, কোথাও বা তির্যক ভাষণে রচনা ধর্মী প্রবন্ধ রসসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সমালোচকগণ এই জাতীয় প্রবন্ধকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ (Intimate Essay) আখ্যা দান করেছেন। বলা বাহুল্য, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে প্রজ্ঞার স্থান অপেক্ষা হৃদয়ের স্থান বেশী।

॥ ৩ ॥

পৃথিবীর যে কোন বস্তু নিয়ে প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। তাই সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান যেমন প্রবন্ধের বিষয়বস্তু রূপে নির্বাচিত হতে পারে, তেমনি বাণিজ্যিক বিষয় সার্থক প্রবন্ধের উপাদান রূপে স্বীকৃত হওয়ার দাবী রাখে।

বাণিজ্যিক বিষয় বলতে শুধুমাত্র বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ই বোঝায় না, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বাণিজ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত বলে এই সব বিষয়ও বাণিজ্য-বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর যে পটপরিবর্তন ঘটেছে, তাতে ভারতেরও কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে; এরপর ইতিহাসের ইঙ্গিতে ভারত স্বাধীনতা লাভ করায় ভারতের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিতে দেখা দিয়েছে দ্রুত পরিবর্তন। ভারত তথা বিশ্ব-পরিস্থিতিতে অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসার ফলে নানা প্রশ্ন আজ দেখা দিয়েছে। এই সব প্রশ্ন আজ বাণিজ্যিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বাণিজ্য প্রবন্ধের ক্ষেত্রটি হয়েছে সুদূরপ্রসারী।

বিশেষ কোন ভাবনা বা বিষয়কে আশ্রয় করে, তাকে যুক্তি ও তথ্যাশ্রয়ী করে, সুচারু ভাষা-নৈপুণ্যে প্রকাশ করার নাম যখন প্রবন্ধ রচনা, তখন বাণিজ্য-বিষয় অবলম্বনেও তা সম্ভব।

॥ ৪ ॥

দেখা গেল, প্রবন্ধ রচনা করতে হলে দুটি জিনিষের প্রয়োজন: এক, বলার মত বক্তব্য; দুই, বক্তব্য প্রকাশের মত উপযুক্ত এবং রমনীয় বাগ-ভঙ্গী।

প্রশ্নপত্রে সাধারণত একাধিক বিষয় নির্বাচন করে ছাত্রছাত্রীদের সে বিষয়ে উপযুক্ত প্রবন্ধ রচনার নির্দেশ দেওয়া হয়। যে সমস্ত বিষয় প্রবন্ধের বিষয় রূপে নির্বাচন করা হয়, সেগুলো মূলতঃ ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কিত। আবার ভারতবর্ষের অর্থনীতি, রাজনীতি এমনকি সমাজনীতিও বিশ্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন নয়; সুতরাং কোন কোন বিশ্ব-সমস্যাও এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু রূপে চিহ্নিত হতে পারে। তাই বাণিজ্য বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে এই সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক।

প্রবন্ধ রচনার শুরুতেই ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে যা প্রথম প্রয়োজন তা হল নির্দেশিত প্রবন্ধের বিষয় সম্পর্কে মনে মনে উপাদান সমূহকে সাজিয়ে নেওয়া। বলা বাহুল্য, যে সমস্ত বিষয় দেওয়া হয় তা পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীদের অপরিচিত বা অজ্ঞাত বিষয় নয়। তবে সবগুলি বিষয়ই সব পরীক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থিনীদের জানা থাকবে—এমন না হওয়াই সম্ভব। সেক্ষেত্রে যার যে বিষয়ে বিশেষভাবে জানা আছে সে সেই বিষয়টি নির্বাচন করবে। এটি প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তরে, নির্বাচনের পর বিষয়গত উপাদান সমূহ মনে মনে স্থির করার পালা। তৃতীয় স্তরে গিয়ে মনের মণিকোঠায়

সংগৃহীত সমস্ত উপাদান ও তথ্যের মধ্যে থেকে প্রাসঙ্গিক ও সংগতিপূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ বক্তব্যকে সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া।

প্রথম স্তরে—বিষয় নির্বাচনের পালা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তা-যন্ত্রটি সচল হয়ে ওঠে। মনের পর্দায় একের পর এক নানা প্রশ্ন ভিড় করে আসতে থাকে। এইখানেই দ্বিতীয় স্তরের কাজ শুরু হয়ে যায়। এই সময় পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীদের অত্যন্ত স্থির মাথায় এই প্রশ্নগুলিকে এমন ভাবে সাজিয়ে নিতে হবে, যাতে সমস্ত বিষয়টির সূচনা থেকে সমাপ্তির একটা সুস্পষ্ট চিত্র তৈরী হয়ে ওঠে। অর্থাৎ যে মুহূর্তে বিষয়টি নির্বাচন সম্পন্ন হল, সেই মুহূর্তে নির্বাচিত বিষয়টি কি? বিষয়টির প্রকৃত পটভূমি কি? বর্তমানে বিষয়টির রূপ কি? বিষয়টি সমস্যামূলক হলে তার সমাধানের উপায় কি? উপসংহারই বা কি হওয়া উচিত? এই জাতীয় নানা সঙ্গত প্রশ্ন মনে জমা হল। এইবার তৃতীয় স্তরের প্রক্রিয়ার পালা। অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রীদের মনে ভিড় করে আসা প্রশ্নগুলি সম্পর্কিত উপকরণ সংগ্রহের কাজে মনটিকে নিয়োজিত করতে হবে। সেখানে মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত সমস্ত উপকরণ থেকে প্রাসঙ্গিক, সংগতিপূর্ণ এবং যুক্তিসিদ্ধ উপাদান সমূহকে নির্বাচন করে তৃতীয় স্তরের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, 'প্রবন্ধ' হচ্ছে সেই জাতীয় রচনা যাতে কোন বিশেষ বক্তব্যকে প্রাবন্ধিক আবেগ বা বর্ণনার বিস্তার না ঘটিয়ে যুক্তি ও তর্কের বিন্যাসে বক্তব্য বিষয়কে এক অপূর্ব বিশ্লেষণের রসে মথিত করে পাঠক সমাজের কাছে উপস্থিত করেন। সুতরাং এই পথ অনুসরণ করেই পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীদের প্রবন্ধ রচনার কাজে ব্রতী হতে হবে।

একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি আরও পরিষ্কার হবে। দেখা গেল, প্রশ্নপত্রে একটি প্রবন্ধের শিরোনাম: 'ভারতের পথ, পরিবহন ও পর্যটন।' ছাত্র-ছাত্রীরা নিঃসন্দেহে এই বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত। অত্যন্ত পরিচিত বিষয় বলেই এ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন এসে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে সঞ্চিত হয়ে উঠবে। ফলে কোনটি আগে ও কোনটি পরে গৃহীত হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে দেখা দেবে দ্বিধা অথবা দ্বন্দ্ব। যখন এমনিভাবে নানা প্রশ্ন আসবে তখন যেভাবে প্রশ্নগুলি ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রহণ করবে, তা হল, ভারতে পথ-পরিবহন ও পর্যটনের গুরুত্ব কতখানি?···অতীত ভারতে এর গুরুত্ব কতখানি ছিল?···আধুনিক ভারতে এবং বিশেষভাবে চারটি পরিকল্পনাকালে এর পুনর্গঠনের কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে? · অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পথ ও পরিবহন ব্যবস্থায় ভারতের ভূমিকা কি? ··স্বাধীন ভারতে পর্যটন-শিল্পের স্থান···

এবং উপসংহারে সমস্ত বক্তব্য বিষয়ের সপক্ষে অথবা বিপক্ষে অথবা নিরপেক্ষভাবে নিজের সুচিন্তিত বক্তব্যের উপস্থাপনা কিভাবে হবে ?

উত্তর রচয়িতারা যদি এমনিভাবে সুশৃঙ্খল সামঞ্জস্যের বন্ধনে প্রশ্নগুলিকে একবার বন্দী করে নিতে পারে, তবে একটি সার্থক প্রবন্ধ রচনা খুব দুরূহ কর্ম বলে মনে হবে না। উপমা দিয়ে বলা যায় কুমোর যখন মূর্তি গড়তে বসে, তখন সে যেমন প্রথমে খড় দিয়ে মূর্তিটির একটি কাঠামো তৈরী করে নেয় এবং তারপর মাটি দিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত রং করে সেই মূর্তিটিকে অপূর্ব লাবণ্যে পূর্ণতা দান করে, তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে প্রথমে প্রবন্ধের একটি কাঠামো বা খসড়া তৈরী করে নিতে হবে, পরে সেই খসড়াটিকেই একটি প্রাণবন্ত সার্থক প্রবন্ধে রূপান্তরিত করতে হবে।

॥ ৫ ॥

সার্থক প্রবন্ধ রচনার দুটি দিকের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এই দুটি দিকের দ্বিতীয় দিকটি হল—প্রবন্ধের ভাষা এবং রচনা-বৈশিষ্ট্য বা স্টাইল। ইংরেজীতে একটি কথা আছে : 'Style is the man'। কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্য-পূর্ণ। ইংরেজী স্টাইল শব্দটিকে আমরা রচনা-শৈলী বলে চিহ্নিত করি। এই রচনা-শৈলী—ব্যক্তি-নির্ভর। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব রচনাভঙ্গী থাকে যার মধ্যে সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়। তবে অনুশীলন ও কর্ষনা ব্যতীত রচনা-শৈলীর বিশিষ্টতা অর্জন করা সম্ভব নয় ; সুতরাং পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীগণ যদি বিশিষ্ট রচনা-শৈলী বা স্টাইলের অধিকার লাভ করতে আগ্রহী হয়, তবে তার জন্য প্রয়োজন অনুশীলন ও অধ্যবসায়। তবেই তাদের রচনা আপন নৈপুণ্যে উজ্জল হয়ে উঠবে। কারণ অনেক সময়েই দেখা যায় একটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীরা উপযুক্ত ভাষা ও রচনা-শক্তির অভাবে সেই বিষয়টিকে সার্থকভাবে উপস্থাপিত করতে ব্যর্থ হয়।

কোন একটি বিষয় স্থির করে নেওয়ার পরই ছাত্র-ছাত্রীদের এক দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়—কিভাবে শুরু করব ? বলা বাহুল্য, প্রবন্ধের প্রথম বাক্যটি এমন হবে যাতে একদিকে থাকবে নির্দ্ধারিত বিষয়টির প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, অন্যদিকে থাকবে বিষয়টি সম্পর্কে প্রবন্ধ-রচয়িতার সুশৃঙ্খল চিন্তার ছাপ। অর্থাৎ প্রথম বাক্যটি হবে ইঙ্গিতময় ও তাৎপর্যপূর্ণ। একমাত্র শাণিত, বুদ্ধিদীপ্ত ও সৌন্দর্যময় কিন্তু সংক্ষিপ্ত বাক্যেই তা করা সম্ভব। এমনিভাবে প্রথমেই যদি ছাত্র-ছাত্রীরা হৃদয়গ্রাহী বাক্যের অবতারণা করতে পারে, তবে তা হবে তাদের পরীক্ষায়

সাফল্য লাভের প্রথম সোপান। প্রবন্ধের সমাপ্তি-বাক্য সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

এই প্রসঙ্গেই আরও কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন, যেমন প্রবন্ধ রচনা-কালে মহাজন বাণী উদ্ধৃতি কিংবা পরিসংখ্যান-প্রয়োগ। প্রথমে উদ্ধৃতির প্রসঙ্গে মনে পড়ে ইংরেজী ভাষায় রচিত কোন বক্তব্যের উদ্ধৃতি। আমাদের দেশের অনেক প্রবন্ধেই এর ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু এই রীতি কতখানি অনুমোদন যোগ্য তা বিচার করে দেখা দরকার। আমাদের বিশ্বাস, যতদূর সম্ভব বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে ইংরেজী উদ্ধৃতি এড়িয়ে যাওয়া ভাল। যদি কখনও মনে হয় মূল ইংরেজী রচনাংশ উদ্ধৃত করলে বক্তব্যটি জোরালো হবে, তবে সে ক্ষেত্রে ইংরেজী উদ্ধৃতি দেওয়ার আগে অথবা পরে সেই উদ্ধৃতাংশের মর্মানুবাদ বাংলা ভাষায় সংযোজিত করা একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় বাংলা ভাষায় রচিত অন্যের কোন ব্যক্তব্য উদ্ধৃতির প্রয়োজন দেখা দিতে পারে ; সে ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। অর্থাৎ দেখতে হবে উদ্ধৃত অংশটি যেন বিকৃত না হয় এবং অজস্র ভুলে পুর্ণ না হয়ে ওঠে।

অনেক সময় বাণিজ্যিক বিষয়কে উপযুক্তভাবে উপস্থিত করতে হলে পরিসংখ্যান প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে নির্ভুল পরিসংখ্যান প্রয়োগই কাম্য। মনগড়া বা ভুল পরিসংখ্যান প্রয়োগ করে যেসব ছাত্রছাত্রী মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষে হরিষে বিষাদ ঘটে। পরীক্ষাকেন্দ্রে এমন প্রবন্ধ পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীদের নির্বাচন করা উচিত যাতে পরিসংখ্যান ব্যবহারের প্রয়োজন সীমিত বা একেবারেই অনুপস্থিত।

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি—বহু ছাত্র-ছাত্রীর মনে প্রবন্ধের আয়তন কি হওয়া উচিত, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। কতখানি লিখলে একটি প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হয়, কত পৃষ্ঠা লেখা উচিত—এসব প্রশ্ন অনেক ছাত্র-ছাত্রীকেই বিব্রত করে তোলে। এ সম্পর্কে ওজন বা পরিমাণগত কোন সমাধান নির্দেশ করা অবান্তর। কেননা যদি বলা যায়, বাণিজ্য-বিষয়ের স্নাতক পরীক্ষায় একটি প্রবন্ধে নম্বর থাকে ত্রিশ এবং সময়ও পাওয়া যায় এক ঘণ্টা কিংবা তার চাইতে কিছু বেশী, সুতরাং সাত, আট পৃষ্ঠা লেখা সঙ্গত, তবে বলব এই ধরণের বক্তব্য শুধু অস্পষ্টই নয়—ফলপ্রসূও নয়। কেননা বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীর হস্তাক্ষর সমান নয়, কারুর হস্তাক্ষর ছোট, কারুর মাঝারি, কারুর বা খুবই বড়। সেক্ষেত্রে একজন পরীক্ষার্থী সাত, আট পৃষ্ঠায় যতখানি বক্তব্য পরিবেশন করতে পারে আর একজনের পক্ষে সেই সংখ্যক পৃষ্ঠায়

তার অর্ধেক অংশও উপস্থিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা বলতে চাই ত্রিশ নম্বরের উপযোগী একটি প্রবন্ধ রচনা করতে বসে পৃষ্ঠা সংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করার চাইতে একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়কে উপস্থিত করার দিকেই লক্ষ্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

আর একটি বিষয়েও ছাত্র-ছাত্রীদের মনে আজকাল প্রশ্ন জাগে: কোন ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করব? বাংলা ভাষার দুটো রূপ 'সাধু' এবং 'চলিত'। এই দুটি রীতির কোনটি পাংক্তেয় এবং কোনটি অপাংক্তেয় এমন প্রশ্ন অবান্তর। কেননা দুটি রীতিই সমান যোগ্য। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীরা যে রীতিকে তাদের বক্তব্য প্রকাশের সহজ ও সফল মাধ্যম বলে বিবেচনা করবে, সেই রীতিতেই তারা প্রবন্ধ রচনা করতে পারে। এ ব্যাপারে কোন নীতি নির্দেশ পালন করতে হয় না। তবে একটি অলিখিত নির্দেশ তাদের পালন করতেই হবে; তা হল সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ না ঘটানোর নির্দেশ। ছাত্র-ছাত্রীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলি সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণকে বলে 'গুরুচণ্ডালী' দোষ। এ দোষ পরিহার করতে না পারলে সাফল্য লাভের পথে আসবে চরম বাধা।

সব শেষ কথা হল, প্রবন্ধের বিষয় তথ্য-ধর্মীই হোক আর বিতর্কমূলকই হোক, ছাত্র-ছাত্রীদের আপন বুদ্ধিমত্তা ও মননের আলোকে আহরিত উপযুক্ত তথ্যাদি এবং যুক্তি বা প্রতিযুক্তিগুলিকে এমন ভাবে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে হৃদয়গ্রাহী ও মনস্বিতায় প্রোজ্জ্বল করে তুলতে হবে এবং সর্বোপরি রমণীয় ও লাবণ্যময়ী ভাষার মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করতে হবে—যা সহজেই পরীক্ষক বা পরীক্ষিকার অন্তর জয় করতে হবে সমর্থ। এর জন্য চাই সংবেদনশীল মন—সাফল্য লাভের পথে তাই হল প্রধান পাথেয়।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

বাণিজ্যবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা

- স্বাধীন ভারতে বাণিজ্য বিদ্যার স্থান
- অর্থনৈতিক উন্নতি ও বাণিজ্য বিদ্যার ভূমিকা
- মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী যুবকের বাণিজ্য শিক্ষার সার্থকতা

প্রারম্ভ

কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতারও বিবর্তন ঘটছে। অতীতে মানব জীবন ছিল সরল, সহজ, স্বচ্ছন্দ। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই জীবন জটিল হয়ে উঠছে। একদিন যে মানুষ একক ভাবে আহার্য্য সংগ্রহ করে ক্ষুধা নিবৃত্ত করত, সেই মানুষ বিনিময় প্রথাকে গ্রহণ করল। এই বিনিময় ব্যবস্থা তাদের পরস্পর নির্ভরশীল করে তুলল। এরপর এ-ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটল, কেননা এব্যবস্থাও শেষ পর্যন্ত মানুষের অর্থনৈতিক সংগঠনের দাবী সর্বাংশে পুরণ করতে হল ব্যর্থ। মুদ্রাব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক জীবনের নানা অভাব পুরণের জন্য দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার বিনিময় ব্যবস্থা কার্যকর হয়ে উঠল এবং গ্রাম-ভিত্তিক অর্থনীতি ব্যাপকত্ব লাভ করল। পরবর্তীকালে শিল্পবিপ্লবের ফলে বৃহদাকার উৎপাদন এই অর্থভিত্তিক বাজারকেন্দ্রিক বিনিময় ব্যবস্থার গুণেই সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সমর্থ হল।

শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের ফলে বাণিজ্যবিদ্যার প্রয়োজন

বর্তমান যুগকে 'শিল্প যুগ' বলে চিহ্নিত করলে অত্যুক্তি হয় না। সুপ্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করে সূক্ষ্ম শ্রম বিভাগের মাধ্যমে বর্তমান কালের বিরাট যৌথ কোম্পানীগুলি কেবল মাত্র জাতীয় চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপাদন করে না। আন্তর্জাতিক বাজারেও এই সব দ্রব্যের প্রবেশ ঘটেছে। আবার সমাজে ঋণ ব্যবস্থা বর্তমান কালে এত দূর উন্নত হয়েছে যে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ওর গুরুত্ব অসীম। বর্তমান কালের বৃহৎ মাত্রার উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থার অসংখ্য জটিলতা সমাজ জীবনের সর্বত্রই নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ক্রমাগত এই সমস্যাগুলোর সমাধানই যে দরকার হচ্ছে তা নয়, এই সমস্যাগুলোকে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে পর্যালোচনা করে তাদের বৈজ্ঞানিক সমাধানের প্রচেষ্টাও প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রের এই প্রয়োজন মেটাতেই বাণিজ্য বিদ্যার উদ্ভব।

বাণিজ্যবিদ্যা—মানব শিক্ষার একটি অঙ্গ মাত্র। কলা ও বিজ্ঞান বিদ্যা তার

অন্যতম অংশ। কলাবিদ্যা বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। এরপর দেখা দিয়েছে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে যন্ত্রশিল্প প্রসারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান এবং শিল্প প্রসার যত হচ্ছে ততই যেমন ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে, তেমনি তা জটিলও হয়ে উঠছে। এই জটিলতার জট ছাড়ানোর জন্য চাই বাণিজ্যবিদ্যায় পারদর্শী অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এই ব্যক্তির একই সঙ্গে পুঁথিগত ও ব্যবহারিক উভয় প্রকার জ্ঞানই থাকা একান্ত প্রয়োজন। শিল্প বাণিজ্য কেন সম্প্রসারিত হবে, কোথায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে সুবিধা হবে, কিভাবে সুষ্ঠু ও লাভজনক উপায়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা সম্ভব, কিভাবে সর্বাধিক দক্ষতার সঙ্গে হিসাবপত্র রাখা যায়, শ্রমিক, মূলধন, কাঁচামাল এ সব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিল্প বাণিজ্যের কি রকম সুবিধে অসুবিধে—এ সমস্ত বিষয়ই আধুনিক বাণিজ্যবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। বাণিজ্যবিদ্যা মূলতঃ ব্যবহারিক বিদ্যা।

বিজ্ঞানবিদ্যা ও বাণিজ্যবিদ্যার সম্পর্ক

বাণিজ্যবিদ্যার প্রধান আশ্রয় সমাজের অর্থব্যবস্থা। কাজেই সমাজের অর্থ ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরের সমস্যাবলী তার আলোচ্য বিষয়। বাণিজ্য শিক্ষা, শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে পণ্যক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত হিসেব রক্ষা বা দেনা পাওনার হিসাব নিকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। একথা অবশ্য সত্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্বর্ত পত্র (Balance Sheet) প্রধানতঃ একটা দেনা-পাওনারই হিসেব মাত্র। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে যে উদ্বর্ত পত্রকে সামান্য দেনাপাওনার হিসেব বলে মনে হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তার পেছনে আছে বিশেষজ্ঞের অক্লান্ত পরিশ্রমের অবদান। নানা সূক্ষ্ম ও জটিল হিসেবের স্তর পেরিয়ে তবে এই উদ্বর্তপত্র রচিত হয়। বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে এ কাজ করা অসম্ভব। কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে সুপণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে তাই আদর্শ হিসাবরক্ষক বা পারদর্শী হিসাব পরীক্ষক হওয়া সম্ভব হয়। জটিল জীবনের যে অংশ নিয়ে বাণিজ্য বিদ্যার কারবার তার সমস্যাগুলো সাধারণ জ্ঞান দিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয়। এই বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি ভিন্ন ভিন্ন ও বিচিত্র হওয়ার ফলে কোন সাধারণ সূত্রে এগুলিকে বাঁধা যায় না, ফলে এই বিদ্যা পুরোপুরি তত্ত্বগত হয়ে উঠতে পারেনি।

বাণিজ্যবিদ্যাব বিষয়: সমাজের অর্থ-ব্যবস্থা; বাণিজ্যবিদ্যাব বৈশিষ্ট্য

আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যের কাজকর্মে জটিলতা সৃষ্টি করেছে দেশের নানা

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আইন। কারণ দেশে প্রচলিত আইনের কাঠামোর মধ্যে থেকেই প্রত্যেকটি ব্যবসায়ীকে নিজেদের ব্যবসা চালনা করতে হবে। নানা ধরণের কর বা শুল্ক প্রদানের যেমন নির্দিষ্ট রীতি আছে, তেমনি যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান বা অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে লভ্যাংশ বণ্টনেরও নানা নিয়মকানুন আছে, আছে হিসেবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিলতা। হিসেব রক্ষাকারীকে সেইজন্য তাঁর সব রকম হিসেব নিকেশের আগে আইন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে হবে। ফলে বিশেষজ্ঞের পারদর্শিতা না থাকলে আধুনিক ব্যবসা পরিচালনা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

আইন ও বাণিজ্যে তার প্রভাব

বাণিজ্যবিদ্যার পরিধি ব্যাপক। প্রকৃতপক্ষে, বাণিজ্যিক পত্র বিনিময় থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপনী রচনা, কার্য পরিচালনা সভার আলোচনার বিবরণী রচনা থেকে নানা আইনগত পত্রের মুসাবিদা যেমন একদিকে বাণিজ্য-বিদ্যা শিক্ষা দেয়, তেমনি বর্তমান যুগের বাণিজ্য বিদ্যা পরিসংখ্যানতত্ত্ব ভিত্তিক গুণ-নিয়ন্ত্রণ বিদ্যা (Quality control) থেকে বিবিধ যান্ত্রিক হিসেব পদ্ধতিও শিক্ষা দেয়। উপরন্তু হিসেব তৈরী এবং হিসেব নিরীক্ষা (Audit) সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা একান্তই আবশ্যক।

বাণিজ্য বিদ্যার ব্যাপক পরিধি

যেকোন দেশের পর্যাপ্ত পরিমাণ শিল্পোন্নয়ন ও বৈষয়িক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য শিক্ষারও অগ্রগতি শুরু হয়। এর কারণ এই যে, বাণিজ্য শিক্ষার দাবী অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সমতালে বৃদ্ধি পাবে। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জার্মাণী প্রভৃতি দেশগুলোতে বাণিজ্যবিদ্যার বিশেষ বিকাশ ঘটেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে এই সকল দেশে উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় প্রভৃতি ব্যবস্থায় নিত্য নূতন জটিলতা দেখা দিচ্ছে এবং বাণিজ্যবিদ্যা বিবিধ সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান করতে অগ্রসর হচ্ছে। বাণিজ্যবিদ্যার অগ্রগতির ফলে সমাজ নানা দিক থেকে উপকৃত হচ্ছে। প্রথমতঃ, বাণিজ্যবিদ্যা জটিলতার মধ্যে এনেছে শৃঙ্খলা; দ্বিতীয়তঃ, বাণিজ্যবিদ্যা সুপরিকল্পিত হিসেব রক্ষার মাধ্যমে উৎপাদনের অপচয় নিরোধ করার ফলে ভোগকারী উপকৃত হয়েছে। তৃতীয়তঃ, বাণিজ্যবিদ্যা উৎপাদনের ব্যয় পূর্ব থেকে নির্ধারণ করতে সক্ষম হওয়ায় ভবিষ্যত বাজারের অনিশ্চয়তার মধ্যে কিছুটা নিশ্চয়তা আনতে পেরেছে। চতুর্থতঃ, বাণিজ্যবিদ্যা

অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য বিদ্যার প্রসার

বাজার দামের ভিত্তিতে উৎপাদনের লাভ লোকস্থানের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে বিনিয়োগকারীর স্বার্থ রক্ষা করেছে।

ভারতবর্ষে বাণিজ্যবিস্তার প্রভূত সম্ভাবনা থাকলেও, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার কোন চেষ্টা হয়নি। চতুর ইংরেজ রাজশক্তি এ সত্য উপলব্ধি করেছিল যে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষকে শাসন করার চেয়ে দরিদ্র, অশিক্ষিত, অদৃষ্টবিশ্বাসী ভারতকে শাসন করা অনেক সহজ; তাই তারা ভারতের শিক্ষা বা আর্থিক উন্নতির জন্য কোন প্রকার চেষ্টাই করেনি। ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ বণিকশক্তি ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের সুযোগ লাভ করেছে। এই শিল্পবিপ্লবের সুযোগ নিয়ে ব্রিটেন নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ইংরেজ রাজশক্তি সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে কাঁচামাল ও শিল্পশ্রমের সুলভতার জন্য ব্রিটিশ মূলধন নিয়োগে বাণিজ্য ও শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করে। তবে ইংরেজ আমলে ভারতে শিল্প বাণিজ্যের যতটুকু প্রসার হয়েছে তা পরাধীন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে নয়—ইংরেজ শাসন বজায় রাখার স্বার্থে।

ইংরেজ শাসনে ভারতে শিক্ষা উপেক্ষিত

দীর্ঘ দুশো বছরের পরাধীনতার পর ১৯৪৭ সালের পনেরই আগষ্ট আমরা পরশাসনের অভিশাপ-মুক্ত হয়েছি। এর পর শুরু হয়েছে নবভারত গঠনের পালা। সম্মিলিত শক্তি ও সাধনা দিয়ে নবভারতকে গড়ে তুলতে হবে, গড়ে তুলতে হবে শিক্ষায়, দীক্ষায়, কর্মে, কর্তব্যে, এক উজ্জ্বল ভারত। গড়ে তোলার দায়িত্ব এখন ভারতবাসীদের ওপরই ন্যস্ত হয়েছে। ভারতবাসীকে এখন দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, স্বাস্থ্যহীনতা ও অকাল মৃত্যুর মত নানা শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। এর জন্য চাই আয়োজন, চাই কর্মনিষ্ঠা, চাই প্রকৃত প্রেরণা। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থাই কেবলমাত্র এই কর্মনিষ্ঠা ও প্রেরণার সৃষ্টি করতে পারে।

নব ভারত গঠনে বাণিজ্য বিদ্যার ভূমিকা

নব্যভারতে আমাদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে আজ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। দেশের বহু প্রাচীন রীতি-নীতি ও পদ্ধতির সংস্কার সাধনও যেমন করা হচ্ছে, তেমনি নতুন নতুন ব্যবস্থাও গৃহীত হচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনের চিত্র সুস্পষ্ট। আধুনিক যুগ শিল্প বাণিজ্যের যুগ। এ যুগে কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি বাণিজ্যবিদ্যাও সমুচিত গুরুত্ব লাভ করেছে। ভারতের মত স্বাধীন কিন্তু অনুন্নত দেশে নতুন করে যে গঠনের কাজ শুরু হয়েছে, তাতে শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা

আধুনিক ভারতে বাণিজ্য বিদ্যার অনুন্নতি

তীব্রতর হয়ে উঠছে। এর জন্য দেশে অধিক সংখ্যক ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরের চাহিদার পাশাপাশি বিপুল সংখ্যায় বাণিজ্যবিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিরও প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু অনুন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাণিজ্যবিদ্যা সম্যকরূপে বিকশিত হতে পারে নি। ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নয়। ভারতের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাণিজ্য বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

ভারতে বাণিজ্য বিদ্যা শিক্ষা ও কর্ম সংস্থান

ভারতে বাণিজ্যবিদ্যা শিক্ষার প্রত্যাশিত প্রসার এখনও হয়নি। তবে স্বাধীন ভারতের সমস্ত রাজ্যেই বাণিজ্যিক শিক্ষা সংস্থা বা বিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে। এইসব বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় থেকে যে সমস্ত ছাত্র বাণিজ্যবিদ্যায় সফল হয়ে আসছেন, তাঁরা সকলেই দেশের শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে অপেক্ষাকৃত সহজে চাকুরির সুযোগ সুবিধে লাভ করছেন। এবং এসব পদগুলো অর্থ ও মর্যাদার দিক থেকে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। দেশে যতই শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে ততই বাণিজ্য-বিদ্যায় শিক্ষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজনও বেশী করে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু আধুনিক ভারতে যুগোপযোগী বাণিজ্যবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করেনি।

বাণিজ্য বিদ্যায় বিশেষজ্ঞের শিক্ষাদান প্রয়োজন; ভারতের অবস্থা

বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে বণিক সংঘগুলি এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে উচ্চ মানের পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। বৃত্তিগত জ্ঞানের পরিমাপ হিসেবে এই জাতীয় পরীক্ষার সার্থকতাই অগ্রগণ্য হওয়া প্রত্যাশিত। কিন্তু বিদ্যালয়ে বাণিজ্য-বিদ্যার যে আয়োজন তা প্রকৃতিতে সাধারণ হতে বাধ্য। এর জন্য বিশেষজ্ঞের শিক্ষাদান প্রয়োজন। এবং বিশেষ শিক্ষা পেতে হলে বিশেষীকৃত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আধুনিক ভারতে এই জাতীয় বৃত্তিগত বাণিজ্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠান নেই একথা বলা ভুল, তবে এ বিষয়ে ব্যাপক শিক্ষাদানের সুযোগ যে এখনও সীমিত তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। এই সুযোগ আরও ব্যাপক হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

নব ভারতের সমৃদ্ধির সূচনা পর্বে শিল্প বাণিজ্যের বিকাশের শুভ লগ্ন যখন সমাসন্ন, তখনই ভারতের বাণিজ্য ক্ষেত্রে এসে পড়েছে বেশ কিছু অশিক্ষিত, মুনাফালোভী, মানবতাবোধশূন্য ব্যক্তির অসামান্য প্রভাব। ফলে ভারতের শিল্পবাণিজ্য আজ

রাহুগ্রস্ত। শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে উপস্থিত কতিপয় ব্যক্তি বা পরিবার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য দুর্নীতির পথ বেছে নিতে এতটুকু কুণ্ঠিত নয়। সমষ্টির স্বার্থ বা দেশের কল্যাণচিন্তা তাঁদের কাছে মূল্যহীন। মানবিক স্বার্থ আজ পদদলিত। দেশের সামনে কোন আদর্শবাদ না থাকায় দেশের মানুষ আজ উদভ্রান্ত। এই শূন্যতাবোধ ব্যাপক হওয়ার ফলে কিছু লোক স্বার্থসিদ্ধির সুবর্ণ সুযোগ করে নিয়েছে। ভারত অর্থের দিক দিয়ে দরিদ্র হলেও অতীতে সে ছিল আদর্শের মূলধনে ধনী, এখন সেই মূলধন খুইয়ে সে একেবারে নিঃস্ব, রিক্ত। পুনর্গঠনের লগ্নে তাই আবার সেই আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে সমগ্র জাতিকে তবেই প্রকৃত নবভারতের জন্ম হবে সার্থক। শিক্ষার মাধ্যমেই এই কঠিন দায়িত্বটি পালিত হওয়া প্রয়োজন। বাণিজ্যবিদ্যা শিক্ষা হবে তার যোগ্য অংশীদার। ভারতের আত্মিক দৈন্য ঘোচাতে বাণিজ্যবিদ্যার ভূমিকা তাই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ভারতের শিল্প-বাণিজ্য আজ রাহুগ্রস্ত

সমস্ত বিশ্ব জুড়ে আজ বাণিজ্য সম্প্রসারিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আজ বাণিজ্য সূত্রে আবদ্ধ। ভারতও এই একই সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমান তালে বিশ্বের বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করছে। বিশ্বের বাণিজ্যে ভারতের সফল নেতৃত্বের জন্য চাই সহানুভূতিপ্রবণ, উদারচিত্ত, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং প্রকৃত সুশিক্ষিত যুবকদের। আধুনিক ভারতের সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যবিদ্যা শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদল আবার জগৎ সভায় বাণিজ্য লক্ষ্মীর হাতের গৌরবমাল্যটি গ্রহণ করে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করবেন—এ কামনা আকাশ কুসুম নয়।

উপসংহার

ব্যবসা বাণিজ্য ও বাঙ্গালী

এই প্রবন্ধের অনুসরণে :

- শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী [ক, বি '৬৯]
- পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্যের অন্তরায় ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
- ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালী

বাংলাদেশে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে : বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, অর্থ হল : ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমেই যে কোন দেশ লক্ষ্মী শ্রী লাভ করে। পৃথিবীর সম্পদশালী দেশগুলোর সাফল্যের মূলমন্ত্রই বাণিজ্য। আধুনিক বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ আমেরিকা বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়েই বাইরের সম্পদ ঘরে তুলেছে। চতুর ইংরেজ একদিন বণিক বেশেই বিভিন্ন দেশের বন্দরে গিয়ে জাহাজ ভিড়িয়েছে। তারপর কূটবুদ্ধির সাহায্যে বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করেছে। এদের সাফল্যের গোপন কথাটি হল : সফল বাণিজ্য। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁর একটি স্মরণীয় প্রবন্ধে লিখেছেন : "জগতে অর্থের দিক দিয়ে প্রাধান্য লাভ করতে হলে ঘরের আর বাইরের বাণিজ্যকে সম্পূর্ণ রূপে অধিকার করে ফেলতে হবে। ঘরের পয়সা ঘরে রাখতে হবে আবার বাইরের পয়সা কুড়িয়ে আনতে হবে, দেশের ভিতরকার ব্যবসাগুলোকে সতেজ রাখতে হবেই অধিকন্তু বাইরে ব্যবসা করার মত উপযুক্ত সামর্থ্য ও শিক্ষার সঞ্চয় করতে হবে।" এই পথে চলেই বিশ্বের বহু দেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে।

প্রাবন্ধ

শিক্ষায়, দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে, আচারে, রুচিতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, স্বদেশ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী একদিন সর্বদিক থেকে সমৃদ্ধ ছিল। সেদিনকার সেই বাংলাদেশকে লক্ষ্য করে মহামতি গোখেল বলেছিলেন : "What Bengal thinks today, India thinks tomorrow." কিন্তু আজ তা অতীতের ইতিহাসের পৃষ্ঠার একটি অধ্যায় মাত্র। সুজলা সুফলা বাংলা দেশে একদিন অন্ন-বস্ত্রের অভাব ছিল না। পাশ্চাত্য জাতির আগমনের পর তাদের কাছে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রথম পাঠ বাঙ্গালীই গ্রহণ করেছিল। নব প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় বাঙ্গালী যথার্থ আগ্রহ দেখিয়েছিল। তাই আধুনিক যুগের বিজ্ঞান, সাহিত্য,

বাংলাদেশের অতীত সাফল্য

সংস্কৃতি প্রভৃতিতে ভারতে বাঙ্গালী হয়েছিল অগ্রণী। বাণিজ্যেও বাঙ্গালী হয়েছিল সফল। কিন্তু তারপর নানা ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে এই প্রাধান্য কমতে শুরু করেছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাই বেদনার সঙ্গে লিখেছেন : "বাংলার ব্যবসার ইতিহাস ওল্টালে দেখতে পাই, আগে বাংলা দেশে বাঙ্গালীর দু'রকম বাণিজ্যেই হাত যশ ছিল। কিন্তু আজ বাংলার লক্ষ্মীশ্রী বড় বাজারে, অন্তঃবাণিজ্যই বলুন, আর বহির্বাণিজ্যই বলুন, একে একে বাঙ্গালীর হাত থেকে সব চলে গেছে বা যাচ্ছে।"

আচার্যদেবের এই উক্তি ঐতিহাসিক সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত দেয়। একদিন ছিল যখন কৃষি-শিল্প-সম্পদে বাংলাদেশ ছিল ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ঈর্ষার পাত্র। কিন্তু কালের ধারায় ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই বাংলাকেই জীবন সংগ্রামে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হল। ক্রমে সে হারাতে বসল তার যুগার্জ্জিত প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা ও সম্মান। পরজাতি-শোষনে তার ঐতিহ্যময় কুটির শিল্প ধ্বংস হল, কৃষি-উন্নতির পথ হল রুদ্ধ। বাংলাদেশ থেকে কল্যাণলক্ষ্মী অশ্রুমুখী হয়ে বিদায় নিলেন। নিঃস্ব, রিক্ত, হতশ্রী বাংলা প্রতিযোগিতায় পরাজিত হল। যেদিন ইংরেজ রাজশক্তির অত্যাচারে ও কায়েমী স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বাংলার কৃষি, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বলিদান হল, সেদিন সুযোগ বুঝে অবাঙ্গালী সম্প্রদায় বিশেষতঃ রাজস্থানবাসী মাড়োয়ারী সম্প্রদায় ভাগ্যের সন্ধানে বাংলা দেশে এসে উপস্থিত হল। বাঙ্গালী বাবুরা যখন জমিদারী বিলাসে দিন যাপনে প্রবৃত্ত হলেন, তখন অবাঙ্গালী সম্প্রদায় বাংলার অর্থনীতিকে ক্রমে ক্রমে হস্তগত করলেন। অবাঙ্গালীরাই হলেন বাংলার পাট ও বস্ত্রশিল্প, চা-বাগিচা, কয়লা ও লোহার খনির মালিক। আর এই সব কলকারখানায় শ্রমিক হিসেবে যারা কাজ করতে এল, তারা এল প্রতিবেশী রাজ্য, বিহার, উড়িষ্যা থেকে, এল সাঁওতাল পরগণা থেকে, এল সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে। বাংলার অধিকাংশ দরিদ্র মানুষ অনুন্নত কৃষি-নির্ভর হয়ে দারিদ্রের কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার প্রতীক্ষায় রইল। কর্মবিমুখতা ও নিদারুণ নৈষ্কর্ম্যের ফলে ব্যবসা বাণিজ্য থেকেও সে হল বিতাড়িত। বাঙ্গালী হল নিজভূমে পরবাসী। আজ কলকাতা শহরের অধিকারও আর বাঙ্গালীর হাতে নেই বললে সত্যের অপলাপ হবে না। বড়বাজার, চৌরঙ্গী তার সাক্ষ্য বহন করছে। আজ বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়—বাঙ্গালী চাকুরিজীবি জাতি।

ঐতিহাসিক কারণে অবাঙ্গালীদের বাংলায় আগমন বাঙ্গালীর পরাজয়

বাঙ্গালী বুদ্ধিমান জাত—একথা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি পরিচয়ও বাঙ্গালীর আছে: বাঙ্গালী ব্যবসাবুদ্ধিহীন শ্রমবিমুখ জাত। এর সঙ্গে আছে শিক্ষাগত ত্রুটি। ফলে বাঙ্গালী জাতি বাণিজ্যের মালিকানা বা কর্তৃত্ব হারিয়ে বেতনভোগী চাকুরিজীবী হয়ে পড়েছে। এই তিনটি কারণের জন্যই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মূলধনের অভাব, স্বাস্থ্যহীনতা, বিজ্ঞান চর্চার অভাব, বিপদের ঝুঁকি গ্রহণে কুণ্ঠা, ভাবাবেগের প্রাবল্য প্রভৃতি আরও নানা উপসর্গ। কৃষির অনগ্রসরতা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিপর্যয়ের কথাতো আগেই উল্লিখিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বাঙ্গালী যুব সম্প্রদায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন তাঁরা সব হরিপদ কেরাণীর দলভুক্ত হয়েছেন, হয়ে উঠেছেন শহুরে বাবু। আধুনিক কালে বাণিজ্য-শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট তরুণ সমাজও কিন্তু স্বাধীন ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিশ্রম-সাধ্য প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে অন্যের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সমৃদ্ধ করার কৃতিত্বের প্রতি বেশী আগ্রহী হয়ে উঠছে। ফলে বাঙ্গালী জাতি যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে থাকছে। যতদিন না বাঙ্গালী সরস্বতীর সাধনার সঙ্গে লক্ষ্মীর সাধনাও সমন্বিত করে নেবে, ততদিন বাঙ্গালী তমসাচ্ছন্ন হয়ে শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি বহন করতে বাধ্য হবে।

বাঙ্গালীর পরাজয়ের কারণ: ব্যবসা-বুদ্ধিহীনতা, শ্রমবিমুখতা ও শিক্ষাগত ত্রুটি; এবং

যেদিন বাঙ্গালীর ঐতিহ্য সম্পন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিধ্বস্ত হল, সেদিন বাঙ্গালীরা উদভ্রান্ত হয়ে কৃষিকেই আঁকড়ে ধরতে শুরু করল। কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় লোক হল বেশী। কৃষির পক্ষে এভাব হয়ে পড়ল দুর্বহ। আধুনিক পদ্ধতির প্রবর্তন তো হোলই না, বরং একদিকে অতিরিক্ত জনচাপ অন্যদিকে উর্বরতা হ্রাস, সেচ-ব্যবস্থার অভাব, ভূমিক্ষয় ও আরও নানাবিধ কারণে অধিকাংশ বাঙ্গালীর একমাত্র আশ্রয় কৃষি হয়ে পড়ল নিঃস্ব, সর্বশান্ত, দেউলে। সুজলা সুফলা বলে অভিহিত করে যে বাংলাদেশকে প্রণাম জানিয়েছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, সেই বাংলাদেশ আজ লক্ষ্মীছাড়া: সেই বাংলাদেশ আজ অন্নাভাবে পরমুখাপেক্ষী। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর বাঙ্গালীর বিজ্ঞান চর্চার অভাব, মূলধন গঠনের অভাব, স্বাস্থ্য-হীনতা এসব কারণের সঙ্গে রুচিসম্পন্ন, সংস্কৃতিবান ভাবাবেগ চালিত বাঙ্গালী বাণিজ্য ক্ষেত্রে দুঃসাহসিক অভিযান না

সংস্কৃতির চর্চা করতে বসে বাণিজ্য অবহেলিত, বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক ভবিষ্যত বিপন্ন

চালিয়ে 'ভাবের ললিত ক্রোড়ে' আশ্রয় নিল। ভাবাবেগ ভাল, কিন্তু তা যদি জাতিকে প্রমত্ত করে তুলে আত্মবিস্মৃতির কারণ হয়, তবে তা অবশ্যই বর্জনীয়। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে এককালে সমস্ত দিক থেকে যে গ্রীস, রোম, ব্যাবিলন অনন্য উন্নতি লাভ করেছিল, উৎসব-উচ্ছ্বাসের বাহুল্যে ও প্রমোদ-প্রমত্ততায় সেই সব দেশই গৌরব লক্ষ্মীকে বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছে। এই সম্পর্কে বাঙ্গালী জাতির সচেতন হওয়ার লগ্ন এসেছে। হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে না পারলে বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক ভবিষ্যত হবে আরও বিপন্ন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট যে খণ্ডিত নব ভারত ভূমিষ্ট হল, তার জন্ম যন্ত্রণা বহন করতে হয়েছে বাংলা ও পাঞ্জাবকে। রাজনীতির পাশাখেলায় সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে বাঙ্গালী আর পাঞ্জাবী সম্প্রদায়কে। দেশবিভাগের শাণিত ছুরি বাংলা আর পাঞ্জাবের বুকে বিদ্ধ হয়ে তাদের রক্তাক্ত করে তুলেছে। পূর্ব বাংলার পরিচয় আজ পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাবের পরিচয় হয়েছে—পশ্চিম পাকিস্তান।

দেশ বিভাগের যন্ত্রণা ; সম্ভাবনার অপমৃত্যু

রাতারাতি যখন জন্মভূমি, পরভূমিতে পরিণত হল তখন দলে দলে ছিন্নমূল উদ্বাস্তর দল নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে সীমান্ত পেরিয়ে এসে পৌছাল পশ্চিম বাংলায়। অথচ এই আশ্রয়হীন মানুষগুলির পাটের জমিগুলো থাকল পূর্ব পাকিস্তানে। বাংলাদেশের শস্য-ভাণ্ডার বলতে যে পূর্ববঙ্গকে বোঝাত—তার অধিকার গেল হারিয়ে। আকস্মিক ভাবে এই জনতার চাপ বৃদ্ধি ঘটায় বাংলাদেশের জীর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামো পড়ল ভেঙ্গে। সকল সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙ্গালী বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। আত্মবিস্মৃত কিন্তু আদর্শবাদী বাঙ্গালী মরেনি—সে আবার বাঁচবে। তাকে বাঁচতেই হবে।

দুর্ভিক্ষ, অনাহার, শরণার্থী সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দুর্ভাগা বাঙ্গালীর সঙ্গী ; কিন্তু অন্যদিক থেকে এই অভিশাপ আজ পরোক্ষ আশীর্বাদ রূপেই দেখা দিয়েছে। এই প্রতিকুল শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে আজকের বাঙ্গালী লাভ করেছে দুর্জয় সাহস, দুর্বার শক্তি ও অপরিসীম আত্মবল। এই বলে বলীয়ান হয়ে আজ বাংলা দেশের

প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম ; বাঙ্গালীর নবজন্ম

সন্তানেরা সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে, ভাবাবেগে চালিত না হয়ে ছোট, বড় নানান কাজে, নানান ব্যবসায় লিপ্ত হচ্ছে। প্রমাণ করেছে বাঙ্গালী শ্রম-কুণ্ঠ জাত নয়—সে খেটে খেতে জানে। সে দুঃসাহসিক অভিযানে ভয় করে না, সে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সামান্য মূলধন ও কায়িক পরিশ্রমকে অবলম্বন করে

প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূল অবস্থায় পরিণত করার ক্ষমতা রাখে। আজ আর বাঙ্গালীর কাছে কোন কাজই অসম্মানের নয়। শ্রমের মর্যাদা দেবার মত মানসিকতা তার গড়ে উঠেছে। নবোৎসাহে বাঙ্গালী আজ সব রকম কাজে ও ব্যবসায় অগ্রসর হচ্ছে। মনে হচ্ছে, বাঙ্গালীর নবজন্ম হয়েছে। আশা করা যায়, উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিকীকরণ, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে ও সরকারী মূলধন প্রাপ্তি ও সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত মূলধনের সাহায্যে নতুন যুগের বাঙ্গালী জাতি আবার ভারতের আদর্শ স্থানীয় হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশের সরকারের ও কেন্দ্রীয় সরকারের দেখা উচিত, বাঙ্গালীর নব ব্যবসা-চেতনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস যেন নিরুৎসাহ না হয়ে পড়ে। প্রাদেশিকতা নয়, ভারতের আর্থনৈতিক ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির স্বার্থেই, বাংলাদেশের জীর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠন প্রয়োজন, প্রয়োজন সমস্যাপীড়িত বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠা। বর্তমান ভারতে যে নবজাগৃতি দেখা দিয়েছে, বাঙ্গালী জাতি হবে সেই নবজাগৃতির সমান অংশীদার।

উপসংহার

বাণিজ্যে মানবতা ও নীতিবোধের স্থান

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- নৈতিক বোধ বনাম ব্যবসায় বুদ্ধি [ক. বি. '৬০]
- ব্যবসায়-বাণিজ্যে নীতিবুদ্ধি [ক. বি. '৬৬]
- ব্যবসায় ও জাতীয় স্বার্থ

প্রারম্ভ

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্যতম প্রধান স্তম্ভ—ব্যবসায়-বাণিজ্য। আর্থিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অনেকখানি এই বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই প্রত্যক্ষভাবে কিছু সংখ্যক লোক ব্যবসায়-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত থাকলেও, পরোক্ষ ভাবে সমগ্র জাতির জীবন ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্য যেমন জাতি ও দেশের সমৃদ্ধির সূচনা করে, তেমনি ব্যর্থতা ডেকে আনে দুর্ভাগ্যের অমানিশা। বিশেষতঃ প্রতিকূল বাণিজ্য যে কোন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে করে তোলে দুর্বল। অর্থাৎ ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাফল্য ও ব্যর্থতার সঙ্গে জাতীয় স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং তা অবিচ্ছেদ্য।

ব্যবসায় ও জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি এবং জাতীয় স্বার্থ যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের চরিত্র সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়া স্বাভাবিক। বাণিজ্য জগতে একটি প্রচলিত ধারণা এবং মূলগত বিশ্বাস এই যে ব্যবসায় ক্ষেত্রে মানবতাবোধ বা নীতিবোধের কোন স্থান নেই। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে : মানবতাবোধের দীক্ষায় যে ব্যবসায়-বাণিজ্য দীক্ষিত নয়, নীতিবোধের দ্বারা যে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত নয়—সেই ব্যবসায় বাণিজ্য কি জাতীয় স্বার্থ ও দেশের সমৃদ্ধি সৃষ্টিতে সক্ষম ? তা কি সামগ্রিক কল্যাণ সৃষ্টির অনুকূল ? যাঁরা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির অংশীদার তাঁরা এই প্রশ্নের উত্তরে বলবেন—ব্যবসায় বাণিজ্যে মানবতা বা নীতিবোধের কোন স্থান নেই। কিন্তু মানবতায় বিশ্বাসী অসংখ্য মানুষ এই উত্তরকে গ্রহণ করতে অক্ষম।

মুনাফাশিকারী ব্যবসায়ীরা হত্যার অপরাধে অপরাধী

আজ মুষ্টিমেয় মুনাফাশিকারী, অসাধু ব্যবসায়ী ব্যবসায়-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিজেদের করায়ত্ত করায় ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে মানবতাবোধ ও নীতিবোধ হয়েছে বিসর্জিত। গুটিকয়েক অসৎ ও স্বার্থপর ব্যবসায়ী বর্তমানে কোটি কোটি মানুষের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পদের সঞ্চয়কে করছেন স্ফীত। স্বার্থগৃধ্নু ব্যবসায়ীদের

লোভের যূপকাষ্ঠে আজ কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জীবন হচ্ছে বলিপ্রদত্ত। এই সব লোভী, অন্যায়কারী ও অসাধু ব্যবসায়ীর দল সচেতনভাবেই খাদ্যের নামে অখাদ্য, ওষুধের নামে বিষ বিক্রী করতে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত নয়। ফলে বহু মানুষের ঘটছে অপমৃত্যু। সাম্রাজ্যলোভী সমর নায়কদের আক্রমণের ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে বহু মৃত্যুর খতিয়ান রচিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই সব অসাধু, মুনাফা-শিকারী, স্বার্থপর ব্যবসায়ীদের দ্বারা যে কত সংখ্যক মানুষ নিঃশব্দে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। অসংখ্য হত্যার অপরাধে এরা অপরাধী।

বিশ্ব ইতিহাসে মধ্যযুগ ছিল যুদ্ধ-লাঞ্ছিত যুগ। সেই সময় সংখ্যাতীত ছোট বড় যুদ্ধের রক্ত ভিজিছিল পথে চলেছিল সভ্যতার রথ। নিষ্ঠুর বর্বরতার আঘাতে সেই কালে বহু প্রাণ হয়েছে বিনষ্ট। কিন্তু সে আক্রমণ ছিল প্রত্যক্ষ; কিন্তু বিংশ-শতাব্দীর সভ্যতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে কিছু সংখ্যক অতিলোভী ব্যবসায়ী ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নীতি ও আদর্শবাদ জলাঞ্জলি দিয়ে কোটি কোটি মানুষকে নিঃশব্দে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার যে অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাবে তারা গোপনে নরহত্যা করে চলেছে, যে ভাবে মানবতার অপমান ও লাঞ্ছনা ঘটাচ্ছে তা কি ক্ষমার যোগ্য? এদের ঘৃণ্য ও জঘন্য আচরণে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ আজ কলঙ্কিত। মানব কল্যাণ আজ ভূলুণ্ঠিত। নীচ, ঘৃণ্য মনোবৃত্তি সম্পন্ন জাতির শত্রু এই সব মুষ্টিমেয় শক্তিশালী, অর্থপিশাচ ব্যবসায়ীর কাছে নীতিবোধ, সমাজ-সচেতনতা কিংবা ধর্মবুদ্ধি নিছক শূন্যগর্ভ বুলি ব্যতীত আর কিছুই নয়। লক্ষ কোটি মানুষকে শোষণ করে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী গড়ে তুলছে বিলাসের মনিহর্ম্য। এই সব বিলাসী জীবনে নীতির কোন স্থান নেই। দুর্নীতিই ওদের কাছে নীতির মর্যাদা লাভ করেছে।

এই বিশ্বাসঘাতকেরা ক্ষমার অযোগ্য; দুর্নীতি আজ নীতির স্থান লাভ করেছে;

প্রকৃত পক্ষে, দু' দুটি বিশ্ব যুদ্ধ আমাদের দেশের সততাবোধ ও নীতিবোধের মূলে করেছে প্রচণ্ড আঘাত। সেই আঘাতের ফলে নীতি-নিয়ম, সৎ ও আদর্শ বোধ হয়েছে চূর্ণ-বিচূর্ণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যদিও ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনে পরিণত হয়নি, তা সত্বেও সেই যুদ্ধাগ্নির তাপ ভারতকে দগ্ধ করেছে। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হয়েছে ঊর্ধগতি। মজুতদার ও অসাধু ব্যবসায়ীদের তৎপরতায় কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি হল। দেখা দিল মানুষের সৃষ্ট মন্বন্তর। পঞ্চাশের এই মন্বন্তর শুধু অসংখ্য মানুষকেই হত্যা করেনি, দেশের ন্যায় ও নীতিবোধকেও

দ্বিতীয় যুদ্ধের কাল থেকে দুর্নীতির সূচনা

করেছে সমূলে ধ্বংস। শুরু হয়েছে মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের ভেজাল ও চোরা কারবার এবং অপ্রতিহত গতিতে এই চোরা কারবার দিন দিন বর্ধিত হয়েছে। সমাজদেহে যে ব্যাধি প্রবেশ করল তার আর নিরাময় হল না। সেই অবস্থা আজও অব্যাহত আছে। জাতীয়তাবোধশূন্য এই স্বার্থপর, কুচক্রী ব্যবসায়ীর দল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, জনসংখ্যাবৃদ্ধিও সমস্যা, খাদ্যাভাব, উৎপাদনের শ্লথতা, ধন-বৈষম্যের সুযোগ নিয়ে নিজেদের লাভের অঙ্কই দিন দিন স্ফীত করে তুলেছে। হাজার হাজার মানুষ এদের হাত থেকে খাদ্য ও ওষুধের পরিবর্তে বিষ খেয়ে, নিঃশব্দে মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়েছে।

স্বাধীন ভারতের অসাধু ব্যবসায়ীদের মূল মন্ত্র—দুর্নীতি। ভারতের এ দুর্নীতি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অবদান। তাই আজ খাদ্যে, ওষুধে, প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রীতে চলেছে ভেজালের ফলাও কারবার। পৃথিবীতে সম্ভবত ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে সচেতন ভাবে এবং সজ্ঞানে ব্যবসায়ীর দল নরহত্যার ঘৃণ্য চক্রান্ত করেছে, মানবতার করেছে চরমতম লাঞ্ছনা। মানুষের প্রতি মানুষের এমন হীন বিশ্বাসঘাতকার নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। যে সমস্ত দেশ প্রত্যক্ষ ভাবে সমরাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছিল, সেইসব দেশের মানুষ কিন্তু আজও মানবতার প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল। তারা জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত।

মানবতার অপমান ও মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

নিরুপায় সরকার আইনের সাহায্যে এই সর্বব্যাপক ব্যাধির প্রতিকার করবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সালে রচনা করেছেন খাদ্যে ভেজাল নিবারনী বিধি (Prevention of Food Adulteration Act, 1954) এবং রচিত হওয়ার পর তা সমগ্র ভারতবর্ষে (জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত) বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া সরকার এই বিধি অনুযায়ী খাদ্যের মান নির্ণয়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন ও কেন্দ্রীয় খাদ্য পরীক্ষাগার স্থাপন করেছেন। এ ছাড়া সরকার বিশুদ্ধতার প্রতীক চিহ্ন আগমার্ক দেওয়ার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল শুধুমাত্র আইন রচনা করলেই কি সব সংশোধন সম্ভব? না, এর উপযুক্ত প্রয়োগ প্রয়োজন। এবং প্রয়োগের জন্য চাই সৎ ব্যক্তি। কিন্তু আজকের ভারতবর্ষে তেমন সৎ ও যোগ্যকর্মীর নিতান্তই অভাব।

খাদ্য ও ওষুধে ভেজাল বন্ধের জন্য ভেজাল নিবারনী বিধি, ১৯৫৪; আগমার্ক দানের ব্যবস্থা

সরকার আইন রচনা ও বিধিবদ্ধ করেছেন এবং অসাধু ব্যবসায়ীর দল সেই আইন ফাঁকি দেওয়ার জন্য পাপ পথে অর্জিত অর্থের সাহায্যে আইনজীবীদের

নিয়োগ করেছেন। এবং দীর্ঘসূত্রী বিচার-ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই উপযুক্ত প্রমাণাদির অভাবে পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্রটি-বিচ্যুতির ফলে এই সব ব্যবসায়ীর দল আদালতে সংশয়ের সুযোগ লাভ করে মুক্তি পায়। আবার যে সব ক্ষেত্রে বিচারে শাস্তি হয় সে সব ক্ষেত্রে শাস্তি পাপার্জিত অর্থের তুলনায় এতই নগণ্য যে এই সব নীচ ব্যবসায়ীর দল তা দিয়ে মুক্তি পায়। শুধু তাই নয় পাপ পথে বিপুল অর্থ সঞ্চিত হওয়ার ফলে এই সব অসাধু ব্যবসায়ী সেই অর্থের কিছু কিছু ব্যয় করে বহু অভাবী ও স্বভাবী লোককে বশীভূত করে সমাজের বুকে এমন এক পাপচক্র গড়ে তোলে, যে চক্র প্রকাশ্য দিবালোকেও যে কোন ধরণের অন্যায় সাধন করতে সুপটু। পুলিশ এদের বিরুদ্ধাচরণ করতে অক্ষম। আইন এদের কাছে অসার শব্দের সমাবেশ মাত্র।

বিধি প্রয়োগের বাধা

সরকার ভেজাল নিরোধ আইন প্রণয়ন করে, 'আগমার্ক' চিহ্নিত করণের ব্যবস্থা করে দুর্নীতির প্রবল বন্যার গতিরোধের যে চেষ্টা করছেন নিঃসন্দেহে তা প্রশংসার যোগ্য হলেও—অত্যন্ত দুর্বল। কারণ ভেজাল পরীক্ষা করে, প্রমাণ হলে শাস্তি বিধানের অর্থ হল প্রকারান্তরে এই দুর্নীতিকে শুধুমাত্র স্বীকৃতি দেওয়াই নয়, তার সঙ্গে আপোষ করাও বটে। আমাদের দেশে এই জাতীয় অপরাধের শাস্তি এমনই নগণ্য যে পাপার্জিত অর্থে পুষ্ট ব্যবসায়ীর দল সদাই সেই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়। এবং অসাধু ব্যবসায়কে পুরোদমে চালিয়ে যায়। এতে সরকারী উদ্দেশ্য হয় ব্যর্থ। মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীকে ভোজ্য তৈলে খনিজ তৈল মিশ্রণের অপরাধে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘোষণা করা হয়, সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে যারা অপরাধ করে তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। আমাদের দেশেও যতদিন এই জাতীয় অপরাধের কঠিন ও চরম শাস্তির ব্যবস্থা গৃহীত না হবে, ততদিন সরকারী আইন শুধু কিতাবী আইন হিসেবেই শোভা পাবে। সুতরাং সরকারকে এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করে দেখতে হবে—আইনের ফাঁক ও ফাঁকি কোথায়। এবং অত্যন্ত সততার সঙ্গে এই ফাঁক ও ফাঁকি বন্ধ করতে না পারলে অচিরে সমগ্র দেশ জুড়ে দেখা দেবে বিপর্যয়—এ সত্য অনস্বীকার্য। তবে শুধুমাত্র আইনের সাহায্যেই পৃথিবীর কোন দেশের মানুষের মনোবৃত্তিকে পরিবর্তিত করা যায়নি। এর জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা ও চিত্তের শুদ্ধিকরণের ব্যবস্থাও গৃহীত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এমনিভাবে সার্বিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই দেশকে দুর্নীতি ও অন্যায় মুক্ত করতে হবে।

অসাধু ব্যবসায়ীদের চরম শাস্তি প্রয়োজন

মনের পরিবর্তন ও শুদ্ধতা প্রয়োজন

বর্তমান ভারতের ব্যবসায় বাণিজ্য ভুল পথে চালিত হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে আজ এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে পড়েছে যে, ব্যবসা ও নীতিবোধ পরস্পর বিরোধী। আধুনিক কালের ব্যবসা তাই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। তা কল্যাণচ্যুত হয়েছে, হয়েছে আদর্শভ্রষ্ট। আজ তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন ব্যবসায়ীদের মনে বাণিজ্যের মূল চেতনা জাগ্রত করা। জাতির কল্যাণেই ব্যবসায় হবে

উপসংহার

পরিচালিত। ব্যবসায় শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা সম্পদ সংগ্রহের উপায় মাত্র নয়। তা দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন ও সম্পদ বৃদ্ধিরও উপায়। আজ সেই লগ্ন সমাসন্ন যখন ব্যবসায়ীদের উপলব্ধি করতে হবে যে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যারা অসৎ পথে, অসাধু উপায়ে ব্যবসা পরিচালনা করে, তারা জাতির শত্রু, দেশের শত্রু। মানবতার কাছে তারা অপরাধী এবং সে অপরাধের শাস্তি হবে চরম ও নির্মম। প্রকৃত মহৎ ও সৎ ব্যবসায়ী যাঁরা তাঁদের বাণিজ্যিক মূলধন হল : নীতিবোধ, জাতীয়তাবোধ ও মানবতাবোধ।

বাণিজ্য ও বিজ্ঞাপন

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- ব্যবসায় ক্ষেত্রে শিল্প-কলার স্থান [ক. বি. '৫৮]
- ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা [ক.বি. '৬০]
- বাণিজ্যে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা
- ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের উপযোগিতা [ক.বি. '৬৪]

আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞাপনের রথে চড়েই বাণিজ্যের জয়যাত্রা। আধুনিক কালে বিজ্ঞাপন—একাধারে শিল্প ও বিজ্ঞান। বিজ্ঞাপন বর্তমান কালের ব্যবসা বাণিজ্যের শিল্পশ্রীমণ্ডিত অথচ শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। মানুষের শিল্পরুচির শ্রীময় প্রকাশ তাই আজ বিজ্ঞাপনের অঙ্গে অঙ্গে। সুন্দর বস্তু মাত্রেই মানুষের দৃষ্টিকে শুধু আকর্ষণই করে না, তা দৃষ্টিকে নন্দিতও করে। তাই যদিও মানুষের প্রয়োজনেই বিজ্ঞাপনের সৃষ্টি, কিন্তু এই সৃষ্টিকে সে নিরাভরণ করে রাখেনি, শিল্পকলায় মণ্ডিত করে তুলেছে। যুগ ও জীবনের ক্ষেত্রে শিল্প ও বিজ্ঞাপনের হয়েছে মিতালি। পথে চলমান পথিক, সম্ভাব্য ভোগকারীর দৃষ্টি আজকাল সহজেই আকৃষ্ট হয় আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনগুলোর দিকে। বিভিন্ন বিজ্ঞাপন মন ও মেজাজ বুঝে বিভিন্ন মানুষকে আকৃষ্ট করে। শুধু আকৃষ্টই করে না, বিচিত্র-স্বভাব মানুষের মনের গহন গভীরে প্রবেশের পথটি সহজেই আবিষ্কার করে নেয়। তাই আধুনিক কালে বাণিজ্য-প্রসারে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রারম্ভ

অতীতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জগত ছিল সীমিত, সংকীর্ণ ও জটিলতাবিহীন। সেই সময় সাধারণত বিনিময় প্রথার মাধ্যমে (Barter) ব্যবসা চালিত হত, কিন্তু আধুনিককালে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আমরা যেমন আমাদের সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ জীবনের রুদ্ধ কারা থেকে মুক্তি পেয়েছি, তেমনি ব্যবসাও তার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সুদূরে প্রসারিত হয়েছে। কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে। নানা থিয়োরীর উদ্ভব হয়েছে। শুরু হয়েছে ব্যবসাক্ষেত্রে বহুমুখী প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় জয় লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়—বিজ্ঞাপন। কারণ বিজ্ঞাপন পণ্যের গুণগত উৎকর্ষ প্রচারের ও ক্রেতা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের অনন্ত শিল্প-কৌশল। আধুনিক গণমানসে এই শিল্প-কৌশলের প্রভাব এত দৃঢ়মূল যে তা অস্বীকার করা যায় না।

আধুনিক কালে বাণিজ্য-প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞাপন

পৃথিবীর নানা দেশে একই অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো না থাকায় সর্বত্র বিজ্ঞাপন একই ভূমিকা গ্রহণ করে না। কারণ, মুক্ত অর্থনীতিতে (Free economy) প্রত্যেকটি ক্রেতা বিভিন্ন দ্রব্য যাচাই করে ক্রয় করার অবাধ সুযোগ লাভ করে থাকেন, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে তা সম্ভব নয়। তাই সেক্ষেত্রে উৎপাদক বা বিক্রেতা তাদের পণ্যদ্রব্যের কোন সংবাদ ক্রেতা সাধারণের কাছে পৌছে দিতে পারেন না। সে-ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন কোন বিশেষ ভূমিকা গ্রহণেও অক্ষম। মুক্ত অর্থনীতিতে চিত্রটি ভিন্ন। সেখানে বিজ্ঞাপনই শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম।

বিজ্ঞাপনের ভূমিকার ভিন্নতা

বর্তমান কালের ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে তীব্র প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। যে কোন ব্যবসায়ীকেই আজ কাল প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করে তবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়। এবং প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার একমাত্র হতিয়ার—বিজ্ঞাপন। ব্যবসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন দু'ভাবে কাজ করে থাকে। প্রথমতঃ, বিজ্ঞাপন নানা ভাবে উৎপাদকের উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করে থাকে এবং চাহিদা বৃদ্ধি করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ক্রেতা সাধারণের কাছে কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে মনস্তাত্ত্বিক ও শিল্পসম্মত উপায়ে সেই পণ্যের প্রতি ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। শিল্পমণ্ডিত উপায়ে ক্রেতাদের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করা যায়, কেননা শিল্প-সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সহজাত। বিজ্ঞাপনের শৈল্পিক আবেদনে মুগ্ধ মন তখন এই বিশেষ পণ্য কিনতে আগ্রহী হয়। ফলে উৎপাদকের মুনাফার অঙ্কও স্ফীত হতে থাকে।

বিজ্ঞাপনেব দ্বিমুখী ক্রিয়া

শিল্প ও বিজ্ঞানসম্মত বিজ্ঞাপনের শক্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন : "The rise of advertising has brought a social redefinition of the very notion of truth." 'কারণ বিজ্ঞাপিত মিথ্যাও আজ সত্যের স্থান দখল করতে সক্ষম। বিজ্ঞাপন মানুষের রুচিকে, আকাঙ্খাকে, চাহিদাকে অনেকখানি পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। বর্তমান বাণিজ্য-জগতে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষজ্ঞের অভিমত

আজকাল নানা রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নানা প্রকার নতুন নতুন পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পুরোণো পণ্য নবায়িত হয়ে উঠছে। এই সব নতুন পণ্য ও নবায়িত পণ্যের বৈচিত্র ও গুণগত উৎকর্ষ সম্পর্কে ক্রেতা

সাধারণের কাছে সংবাদ পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে আধুনিক বিজ্ঞাপন। শিল্প-সুষমা মণ্ডিত বিজ্ঞাপনগুলি ক্রেতাসাধারণের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ক্রেতাদের রুচি ও আকাঙ্খাকে প্রভাবিত করে এবং অনেক ক্ষেত্রে মন জয়ও করে। কাছের এবং দূরের মানুষের সঙ্গে ব্যবধান ঘুচিয়ে বিজ্ঞাপন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সেতু-বন্ধ রচনা করে।

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সেতু-বন্ধন হল বিজ্ঞাপন

একদিকে নব নব পণ্যের বিচিত্র বার্তা বহন করে এনে বিজ্ঞাপন যেমন ক্রেতাদের মন জয় করে, তাদের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তিত করে, তেমনি অন্যদিকে সাফল্য লাভ করার ফলে উৎপাদকগণও উৎসাহিত হয়ে ওঠে। এইভাবে তারা আরও বেশি সাহস নিয়ে নব নব পণ্য আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করে। এমনি ভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতার আকাঙ্খা পুরণ করে বিজ্ঞাপন দেশকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে চালিত করে।

অর্থনৈতিক উন্নতি

কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়। তাই প্রাথমিক স্তরের সোচ্চার চীৎকারের যুগ পেরিয়ে বিজ্ঞাপন আজ নবরূপ পেয়েছে। দেখা দিয়েছে প্রকরণের বিচিত্রতা। প্রাথমিক স্তরে সাধারণত প্রচারপত্র, ইস্তাহার, প্রচার পুস্তিকা প্রভৃতিই ছিল প্রচারের মাধ্যম। এর পরবর্তী পর্যায়ে এল প্রাচীরপত্র। কিন্তু শুধু মাত্র জড় বস্তুর সাহায্যে বিজ্ঞাপনের কাজ যেন সম্পূর্ণতা পেল না। প্রচার অভিযানে যোগদান করল পুরুষ ও নারী, বিশেষত সুন্দরী নারীদের পণ্য প্রচারের কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়ীরা তাদের নিত্য নতুন পণ্য প্রচারে এবং পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। এই সফল যাত্রায় বিজ্ঞাপনও সহায়ক। কারণ এখন মানুষের কাছে কোন কিছু প্রচার করতে শুধু মানুষের কণ্ঠই নয় সঙ্গে আছে লাউডস্পীকার এবং মাইক্রোফোন। আছে সিনেমার রূপোলী পর্দা যেখানে স্লাইডের সাহায্যে কখনও কখনও চলমান নাট্য-কাহিনীর সাহায্যে পণ্য প্রচার করা হয়ে থাকে। বড় বড় নগরে ও শহরে রঙিন নিয়ন আলোকবর্তিকার সাহায্যে রাত্রের চলমান পথিকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করা হয়। (এক দিকে যেমন ঐ রঙিন আলোক সজ্জায় নগরী রূপময়ী হয়ে ওঠে অন্যদিকে তেমনি সম্ভাব্য ক্রেতার মনের আকাশও রাঙিয়ে তোলে নানা আকাঙ্খার রঙে) অতি আধুনিক কালে এই বিজ্ঞাপন শুধু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে দেশান্তরে পৌঁছে গেছে, পৌঁছে যাচ্ছে।) আমাদের দেশের জিনিষের সংবাদ সাত সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশী মানুষের মনের দরজায় পৌঁছে যাচ্ছে—পৌঁছে

বিজ্ঞাপনের নব নব রূপান্তর

দিচ্ছে বেতার ও টেলিভিশন।) কখনও কখনও খেলার মাঠে, গানের আসরে, সভাসমিতিতে আকর্ষণীয় উপহার বিলি করে প্রচার চালান হয়।) লটারীর পুরস্কার ঘোষণা, ছাত্রদের বৃত্তিদান প্রভৃতিও আধুনিক বিজ্ঞাপনের প্রচার উদ্দেশ্য সফল করে। সম্প্রতি আর একটি পদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছে—ফ্যাশান প্যারেড বা সৌন্দর্য-শিল্প-প্রদর্শনী। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এমনি ভাবে নব নব কৌশল প্রযুক্ত হচ্ছে। বিজ্ঞাপনের রীতিতে এসেছে যুগান্তকারী বিবর্তন।

বিজ্ঞাপন-বাহুল্য বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে গড়ে তুলেছে প্রতিযোগিতার মনোভাব। শিল্প-সুষমা মণ্ডিত বিজ্ঞাপনের ব্যবহার আজ অনেক প্রতিষ্ঠানেরই লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। নিজের নিজের পণ্যের বিজ্ঞাপনকে আরও আকর্ষণীয়, আরও হৃদয়-গ্রাহী করে তোলার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছে। মনস্তত্ত্ব-সম্মত বর্ণ-নির্বাচন, মার্জিত রুচির ভাষা ব্যবহার, আজকাল প্রায়ই চোখে পড়ে। কিন্তু ভিন্ন চিত্রও চোখে পড়ে। বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রুচিবিগর্হিত চিত্র উপস্থাপন, জাতির বরনীয় মহাপুরুষ, কবি বা সাহিত্যিকের মূল্যবান বাণী বা রচনার অপপ্রয়োগ, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের নামে ব্যবসায়ের নামকরণ এবং তাঁদের প্রতিকৃতির অবাধ ব্যবহার করে, কিংবা চিত্রাভিনেত্রীদের চিত্রের সাহায্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। প্রতিটি মানুষের বা প্রতিষ্ঠানের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী এক হতে পারে না, কিন্তু তাই বলে অশালীনতা ও অশ্লীলতার আশ্রয়ে বিজ্ঞাপন-প্রচার কাম্য নয়। এই জন্যই একটি সাধারণ মানদণ্ডের প্রয়োজন। এবিষয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্ত হওয়া

বিজ্ঞাপনের রুচি বনাম রুচিহীনতা

আধুনিক ব্যবসা জগতে অশালীন রুচি, অশ্লীল চিত্র, রুচিহীন ভাষা প্রয়োগের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে তাতে অনেক সময় জাতির সম্ভ্রমবোধ বিসর্জিত হচ্ছে। এটা দেশের পক্ষে সম্মানজনক নয়। অতি মুনাফার লোভে অনেক সময় ব্যবসায়ীরা আসল বাদ দিয়ে নকলের চাকচিক্যের প্রতি বেশী নজর দিচ্ছেন। বাইরের জৌলুষ দিয়ে ক্রেতার মন ভরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আধুনিক ক্রেতারা যথেষ্ট সচেতন হওয়া সত্ত্বেও বাজারে আসলের চেয়ে নকলের প্রাধান্য ও প্রসার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভেজালে সমস্ত বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। এটা সুস্থ প্রবণতা নয়।

আসলের বদলে নকল

এর কারণ বর্তমান। ব্যবসায়ীরা পণ্যের অঙ্গসজ্জা ও প্রচার কার্যের ব্যয়কে উৎপাদন ব্যয়ের অংশ হিসেবে ধরে নেওয়ার ফলে উৎপাদিত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে,

ফলে তারা আসল পণ্য উৎপাদনের ব্যয় সঙ্কুলান করতে পারে না, ফলে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান নামতে থাকে। উৎপাদকেরা ফাঁকির আশ্রয় গ্রহণ করে। নিকৃষ্ট পণ্য এমনকি ভেজাল পণ্য উৎপাদন করতেও তারা দ্বিধা করে না। সুতরাং উৎকৃষ্ট পণ্য উৎপাদন করে নিকৃষ্ট পণ্যের অঙ্গসজ্জার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করে যে প্রচার তা বাঞ্ছিত হতে পারে না। এটি নিঃসন্দেহে ক্রেতার স্বার্থের প্রতিকূল—দেশেরও।

প্রচার ব্যয় উৎপাদন ব্যয়ের অংশ হওয়ায় পণ্যের মূল্য

বিজ্ঞাপন ব্যয় সম্পর্কে আজকাল তাই দু' ধরণের মতবাদ প্রচলিত দেখা যায়। কেউ কেউ এই ব্যয়কে সম্পূর্ণ অপব্যয় বলে মনে করেন। ক্রেতাদের স্বার্থ বিবেচনা করলে এই ব্যয়কে অপব্যয় বলেই চিহ্নিত করতে হয়, কেননা, পণ্যের অভিহিত মূল্য ও নিহিত মূল্যের ব্যবধান অযথাই বহন করতে হয় ক্রেতাকে—এ কথা সত্য। কিন্তু অন্য আর একটি দিকও বিবেচনা করার প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন শৈল্পিক ও মনস্তাত্বিক আবেদনের মাধ্যমে ক্রেতাদের কাছে পণ্যের সংবাদ বহন করে আনে এবং প্রতিযোগী বিভিন্ন পণ্যের নির্বাচনে ক্রেতাকে সাহায্য করে। সুতরাং বিজ্ঞাপন ব্যয় সম্পূর্ণ ক্রেতা স্বার্থের প্রতিকূল—একথা যুক্তি সিদ্ধ নয়।

বিজ্ঞাপন ব্যয় কি অপব্যয়?

ব্যবসায়ী আপন ব্যবসার স্বার্থেই বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন, কারণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নিজের পণ্যকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করার পক্ষে এর চাইতে শক্তিশালী মাধ্যম আর নেই। তাই ব্যবসায়ীর কাছে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এর আর একটি দিক লক্ষ্য করার মত। বর্তমান কালে বিজ্ঞাপনের সম্প্রসারণের ফলে বহু কারুশিল্পী, দপ্তরী, ছুতার, বোর্ড বিক্রেতা, বিজ্ঞাপন রচয়িতা, শিক্ষিত কর্মচারী, মজুর, মিস্ত্রী প্রভৃতি অনেকেই কাজ পেয়ে জীবিকা অর্জন করতে সমর্থ হচ্ছেন। এমন কি বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে আজকাল চারুশিল্পীদের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞাপন প্রসারের ফলে বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জামের ব্যবসা, সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রগুলি যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছে এবং বিজ্ঞাপনের আয়ের ফলেই সুলভে এই সব পত্র-পত্রিকা বিক্রী করা সম্ভব হচ্ছে। সুতরাং দেশের অর্থনীতিতে বিজ্ঞাপনের স্থান খুব নগণ্য নয়।

বিজ্ঞাপনের পরোক্ষ উপকারিতা: কর্ম সংস্থান

বিজ্ঞাপন আজ শিল্প পর্যায়ে উন্নীত। ব্যবসায়-বাণিজ্যে শিল্প-সুষমামণ্ডিত চারু-শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সমুন্নত নীতিবোধের অভাবে

আধুনিক কালে বহু ব্যবসায়ী এই বিজ্ঞাপনকে দুর্নীতির কাজে প্রয়োগ করছে। নিকৃষ্ট মানের পণ্যকে উৎকৃষ্ট অঙ্গসজ্জায় সজ্জিত করে তারা বাজারে বিক্রী করে ক্রেতা সাধারণকে প্রতারণা করছে। এই ক্রেতা সাধারণকে প্রতারণার কাজে বিজ্ঞাপন তাদের হাতিয়ার। কিন্তু এ বিষয়ে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না; তাই ব্যবসায়ী মহলকে যেমন এই দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে, তেমনি অন্য দিকে সরকার ও জনসাধারণকে এবিষয়ে সতর্ক ও সচেতন হয়ে উঠতে হবে। তবেই অসুন্দর ও অশ্লীল নয়—সুন্দর ও শালীন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশ উপকৃত হবে।

উপসংহার

বাণিজ্যে বিজ্ঞানের প্রভাব

এই প্রবন্ধের অনুসরণে
বাণিজ্য উন্নয়নে বিজ্ঞানের অবদান

(দৈবী-নির্ভর ও প্রকৃতির মুখাপেক্ষী না থেকে যেদিন মানুষ নিজের বিচার-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে শিখল, সেইদিন হল বিজ্ঞানের সূত্রপাত। বলা যায়, বুদ্ধির বিশ্লেষণী শক্তির আর এক নাম—বিজ্ঞান। বিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতার বিস্ময়কর অগ্রগতির মূলে আছে এই বিজ্ঞানের অফুরন্ত অবদান। বিজ্ঞান মানব সভ্যতাকে দুরন্ত গতিদান করেছে।) মানুষ বিজ্ঞানের সারথ্যেই চলেছে ভবিষ্যতের পথে। (বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ করেছে অসাধ্য সাধন। বিজ্ঞানের এই সিদ্ধি একক মানুষের বা একদিনের ফল নয়। বহু সাধকের যুগ যুগ সাধনার, কঠিন তপস্যার সিদ্ধি রূপেই এসেছে বিজ্ঞানের বিস্ময়-জনক সাফল্য।) জীবনের বিভিন্ন দিকের মত, বাণিজ্যও এই দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। অতীতের বাণিজ্য-ক্ষেত্রের নানা প্রতিকূলতা আজ বিজ্ঞানের আশীর্বাদে অপসারিত হচ্ছে। সেই ধীর মন্থর গতির বদলে এসেছে দ্রুততা। গো-যানের গতির পরিবর্তে শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী বিমানের গতি আজ বাণিজ্যের গতিকে করেছে দ্রুততম। (সংকীর্ণ, গণ্ডীবদ্ধ বাণিজ্যকে সমস্ত প্রাচীর ভেঙ্গে বিশ্বময় প্রসারিত করে দেওয়ার কৃতিত্বও আধুনিক বিজ্ঞানের। আধুনিক বাণিজ্যের সমৃদ্ধির উৎস—বিজ্ঞান।)

বিচিত্রমুখী বিজ্ঞানের বিশ্বজয়ী রূপে আজ আমরা বিমুগ্ধ। অথচ অতীতের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, অতীতে বিজ্ঞান এতখানি ঐশ্বর্যবান ছিল না। দীন হীন ভাবেই তার যাত্রা শুরু হয়েছিল। (যেদিন মানুষ প্রথম ভূমিষ্ট হয়েছিল সেদিনকার পৃথিবী ছিল শ্বাপদ-সংকুল, বিভীষিকার অন্ধকার-পুরী। সেদিন প্রকৃতির রাক্ষসী রূপ দেখে সে হয়েছিল ভীতত্রস্ত। তখন প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর করাল গ্রাস যেন উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু আপন বুদ্ধি বলে মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে করল জয়। প্রকৃতি হল মানুষের বুদ্ধির বশীভূত।

মানুষের সংগ্রামের
হাতিয়ার : বিজ্ঞান

প্রকৃতিকে বশীভূত করার অস্ত্রই হল বিজ্ঞান।) এই বিজ্ঞানের বলেই বলীয়ান মানুষ আজ অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। (সভ্যতার জন্ম-লগ্নে যে মানুষ ছিল অসহায়, বিজ্ঞানের আশীর্বাদ সেই অসহায় মানুষের জন্য এসেছে অভাবনীয় পুরস্কার। মানুষ বিজ্ঞানের সহায়তায়

মাটির তলায় লুকিয়ে থাকা অজস্র সম্পদকে ওপরে তুলে আনছে। প্রমত্ত নদী জলধারাকে বাঁধছে কংক্রীটের কঠিন বাঁধনে। অনুর্বর জমিকে করে তুলছে ফলবতী, ধূসর মরুপ্রান্তরকে শ্যামল করে তুলছে। শিল্পোৎপাদনের নব নব ধারা প্রবর্তনে উৎপাদনকে করছে বিচিত্রমুখী ও অপর্যাপ্ত। সুদূরকে করছে নিকট প্রতিবেশী। এই সঙ্গে বাণিজ্যও পাচ্ছে বিজ্ঞানের অপার দাক্ষিণ্য; হয়ে উঠছে সমৃদ্ধ। প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ থেকে পারমাণবিক যুগ পর্যন্ত, পদচালনার কাল থেকে স্ফুটনিকের যুগ পর্যন্ত বিজ্ঞানের সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ ঘটেছে, তাই বিশ্বের কৃষি, শিল্পকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, পরিবহন ব্যবস্থাকে যেমন দ্রুত গতিশীল করেছে, তেমনি মানুষের জীবনের পরিধিকে করেছে সম্প্রসারিত। আজ আর সব ব্যাধির আক্রমণেই মানুষ মৃত্যুপথ যাত্রী হয় না। (বিজ্ঞানের এই অজস্র দান বাণিজ্যের হাতে এসে পড়েছে।) বিজ্ঞানের দুশ্চর তপস্যার সিদ্ধি স্বরূপ প্রাপ্ত এই ফলকে বাণিজ্য বিশ্বের সকল মানুষের দ্বারে পৌঁছে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। তাকে করে তুলেছে সার্বজনীন। আধুনিক বাণিজ্যের পক্ষে এ হল চরম গৌরবের কথা।

(ইউরোপীয় দেশে যে শিল্প-বিপ্লব ঘটেছিল, তা বিজ্ঞানেরই দান। এই শিল্প বিপ্লবের ফলে বিশ্বের শিল্পোৎপাদনে এলো যুগান্তর—বাণিজ্যের সুদিনের সূত্রপাত সেই মাহেন্দ্রক্ষণে। শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হওয়ার আগে কুটির শিল্পের ধারাটি ছিল বর্তমান। মানুষ অক্লান্ত পরিশ্রমে, স্বল্প উৎপাদনেই ছিল তৃপ্ত। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যও ছিল সীমিত। কিন্তু কালের পরিবর্তনে এই গণ্ডীর সংকীর্ণতা গেল ভেঙে। ধীর মন্থর বাণিজ্যকে সচল সক্রিয় করে তুলল বিজ্ঞান। কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হল, পথ ও পরিবহনের হল অভূতপূর্ব উন্নতি, কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে নতুন নতুন উৎপাদন কৌশল প্রবর্তিত হল; কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে দেখা দিল বিপ্লব। ফলে বাণিজ্য ক্ষেত্রেও দেখা দিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিজ্ঞান-নির্ভর বাণিজ্যের আজ তাই জগতব্যাপী প্রসারণ হয়েছে বাস্তব সত্য।)

ইউরোপের শিল্প-বিপ্লব

মানব জীবনের অন্যতম সুহৃদ বিজ্ঞান কিন্তু মানুষের শত্রুও। এইটাই সবচেয়ে মর্মান্তিক। যে বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে মানুষ অন্ধকারের বুক থেকে সম্পদ সংগ্রহ করছে, দূরকে নিকট করছে, অসম্ভবকে সম্ভব করছে, দুঃসাধ্যকে জয় করেছে, অসাধ্য সাধন করছে—সেই বিজ্ঞানই কখনও কখনও তার চরমতম অশান্তির কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। কারণ উৎপাদক মানুষ আজ নিজে উৎপাদনের সহায়ক মাত্র হয়ে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা হারিয়েছে, কর্মচ্যুত হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের

আত্যন্তিক যন্ত্রনির্ভরতা মানুষকে পঙ্গু করে তুলছে। স্বাধীন চিন্তার ও উৎপাদন ক্ষমতার অধিকার অনেকাংশে অপহরণ করছে। মানুষের জীবনে দেখা দিচ্ছে প্রাণের স্পর্শবিহীন যান্ত্রিকতা। সভ্যতার যন্ত্রসিদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনের যন্ত্রণা রূপেই দেখা দিয়েছে, কারণ এই সিদ্ধি মুষ্টিমেয় স্বার্থপর লোভী মানুষের করায়ত্ত হয়ে বিশ্ব জুড়ে এক অন্তহীন শোষনের রাজ্য বিস্তার করেছে।

সভ্যতার যন্ত্রসিদ্ধি : শোষণের রাজ্য বিস্তার

বিজ্ঞান-নির্ভর যন্ত্র সভ্যতার চরম বিকাশে একদিকে আলোর রাজ্য গড়ে উঠেছে, অন্য দিকে জমেছে নিশ্চিদ্র অন্ধকার। আজ বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি।' দরিদ্রের সম্পদ অপহরণ করে যন্ত্র বিত্তশালীকে করেছে আরও বিত্তবান। কোটি কোটি মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থ সিদ্ধি করছে। জগৎ জুড়ে দেখা দিয়েছে ধনবৈষম্য। বিজ্ঞানের প্রথম প্রতিশ্রুতি: সামগ্রিক মানব কল্যাণ সার্থক হয়নি। প্রতিশ্রুতি হয়েছে ভঙ্গ। একদিকে অন্তবিহীন দারিদ্র অন্যদিকে প্রাচুর্যের পাহাড়। এই দুয়ে মিলে পৃথিবীতে এনেছে অবক্ষয়, এনেছে পচনের সর্বগ্রাসী সর্বনাশ। কিন্তু এরই মধ্যে মানব সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রস্তুতি হচ্ছে সম্পূর্ণ। রক্তাক্ত বিপ্লবের আগমনকে করছে তরান্বিত। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করবে, করবে বিচার।

বিজ্ঞানের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ : জগতে ধনবৈষম্যের সূত্রপাত

তবে কি বিজ্ঞান-নির্ভর যন্ত্রযুগকে, যন্ত্র সভ্যতাকে অস্বীকার করব? কিছুতেই না। যন্ত্র আমাদের সুহৃদ। যন্ত্র প্রাণহীন। সে চলে যন্ত্রীর সাহায্যে। তাই যন্ত্রকে অপরাধী করে লাভ নেই। তবে অপরাধী কে? স্বার্থসিদ্ধি ও লোভ চরিতার্থতার জন্য যে লোলুপ মানুষ এই যন্ত্রের মালিকানার বলে তাকে অপপ্রয়োগ করছে—প্রকৃত অপরাধী সে। দোষ বিজ্ঞানের নয়, দোষ বিজ্ঞান-নির্ভর বাণিজ্যেরও নয়। বাণিজ্যের মূলমন্ত্র ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধি নয়, সমাজের সামগ্রিক সম্পদ বৃদ্ধি। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে মুষ্টিমেয় অতি লোভী, স্বার্থপর ব্যবসায়ী বাণিজ্যের এই সত্যাদর্শকে বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিগত কামনা সিদ্ধির উপায় স্বরূপ ব্যবহার করছে বিজ্ঞানের দান—যন্ত্রকে, ভুল পথে চালিত করছে বিজ্ঞান-নির্ভর বাণিজ্যকে। সুতরাং ভোগবিলাসী, আত্মসর্বস্ব এই মুষ্টিমেয় ধনীই দোষী।

দোষ বিজ্ঞানের দান যন্ত্রের নয় : দোষী মানুষ নিজে

কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধির কাজে প্রযুক্ত হয়ে যে বিজ্ঞান, যন্ত্র ও বাণিজ্য

সাধারণ মানুষের জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যকে যদি সেই সব লোভী ভোগবিলাসী ধনীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সর্বসাধারণের আয়ত্তাধীন করে তোলা যায় তবে অভিশাপই হয়ে উঠবে অফুরন্ত আশীর্বাদ। রাষ্ট্রই পারে এই কর্তব্য সমাপন করতে। রাষ্ট্রায়ত্ত বিজ্ঞান ও বাণিজ্যই কল্যাণ মন্ত্র উচ্চারণ করে অশ্রুমুখী বিজ্ঞান ও বাণিজ্য-লক্ষ্মীর আবাহন করতে পারে। আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণব।

উপসংহার

জীবন বনাম যন্ত্র

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- মানুষ বনাম কল [ক. বি. '৫৮]
- বিজ্ঞানের উন্নতি ও মানব জাতির ভবিষ্যত [ক. বি. '৫৯]
- যন্ত্র সভ্যতার সংকট

আধুনিক সভ্যতার নাম—যন্ত্র সভ্যতা; আধুনিক যুগের নাম যন্ত্রযুগ। যন্ত্র মানুষের আজ্ঞাবহ দাস হিসেবে বিনা প্রতিবাদে কর্তব্য সাধন করে চলেছে। মানুষ হয়েছে যন্ত্রের দেবতা। যন্ত্রের আছে শক্তি আর মানুষের আছে বুদ্ধি। মানুষ বুদ্ধি দিয়ে যন্ত্রের এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে পৃথিবীতে অসাধ্য সাধন করেছে। মানুষের

প্রারম্ভ

পরিশ্রমের ভার লাঘব করতেই একদিন পৃথিবীতে এল যন্ত্র। কিন্তু আজ অনেক ক্ষেত্রেই সেই যন্ত্রদানব তার স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। একদিন যন্ত্রদানবের অপরিসীম শক্তির সাহায্য নিয়ে মানুষ প্রতিকুল দৈবী শক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। শুধু লিপ্তই হয়নি, সেই প্রতিকুল শক্তিকে জয় করে সে পৃথিবীতে আপন শ্রেষ্ঠত্বতারও প্রমাণ করেছে; কিন্তু এই ভাবে যন্ত্রের সহায়তায় যুদ্ধ জয় করতে বসে সে যেন অজ্ঞাতসারেই নিজের সমস্ত শক্তিকে হৃদয়হীন যন্ত্রের হাতে সমর্পণ করে বসেছে। ফলে মানুষ আজ যন্ত্র-নির্ভর। সেই যন্ত্রই আজ তাই যন্ত্রণারও কারণ হয়ে উঠেছে। যন্ত্র আজ জয়ী। এ সম্পর্কে বহুদিন আগে কোন কোন দার্শনিক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন: প্রাণহীন যন্ত্র মানব সভ্যতার প্রাণ-শক্তিকে করবে বিনষ্ট; মানুষের আত্মিক সম্মান অপহরণ করে প্রাণময় ধরিত্রীকে করে তুলবে প্রাণহীন শুষ্ক; সমগ্র পৃথিবী প্রাণবিহীন যান্ত্রিকতায় পরিণত হবে। এই যান্ত্রিকতা মানুষের জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে তাকে করে তুলবে পঙ্গু। একদিন যে যন্ত্র-সভ্যতার রথে চড়ে মানুষ এগিয়ে চলেছে, আজ সেই সভ্যতার রথের চাকা মানুষের বুকের পাঁজর গুঁড়িয়ে দিয়ে সদম্ভে এগিয়ে চলেছে—কোন ভ্রুক্ষেপ নেই; নির্বিকার, নিরাসক্ত। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাগণ বলেছিলেন, এমন দিন আসবে যেদিন মানুষের এই যন্ত্র-নির্ভরতার পরিণাম হবে ভয়াবহ। যন্ত্র যখন তার স্রষ্টাকে আঘাত হানতে উদ্যত হবে, তখন দেখা দেবে মানব-সভ্যতার চরম সঙ্কট। চরম মূল্য দিয়ে তবে মুক্তি পেতে হবে এই মহাসঙ্কটের অগ্নিপরীক্ষায়।

"মানুষ যেদিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল সেদিন তার এক মহাদিন। অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবামাত্র যে বোঝা সম্পূর্ণ মানুষের নিজের কাঁধে ছিল তার অধিকাংশই পড়ল জড়ের কাঁধে।" বুদ্ধিমান মানুষ এমনি করে নিজের কাঁধের ভার যন্ত্রের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিল মানব-সমাজেরই সামগ্রিক কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে। মানুষের ভোগ বাসনার তৃপ্তি ও জীবন ধারণের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি নিয়েই সেদিন মানুষের দরবারে এসে হাজির হয়েছিল যন্ত্র।

যন্ত্রের আগমন ও আশ্বাস

পৃথিবীর লোকসংখ্যা যখন একদিকে ক্রমবর্দ্ধমান, আর অন্যদিকে যখন অজস্র সম্পদ লুকিয়ে আছে মাটির বুকে আত্মগোপন করে ; কৃষিভূমি যখন কর্ষণার অপেক্ষায় প্রতীক্ষাত্র প্রহর গুণছে—মানুষী উৎপাদন শক্তি যখন প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ, তখন মানুষ অনুভব করেছিল এমন একটি শক্তির যে শক্তি বহু উৎপাদনের মাধ্যমে পৃথিবীকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির স্বর্গরাজ্য করে তুলবে। মানুষের এই প্রয়োজন মেটাতেই যন্ত্রের জন্ম। যন্ত্রের জন্মের এই লগ্ন থেকেই যে যুগের শুরু—সেই যুগের নাম যন্ত্রযুগ। আজও পৃথিবী এই যন্ত্রযুগেই বাস করছে।

বিরাট বিশ্বের সমস্ত দেশে একই সময়ে যন্ত্রযুগের সূত্রপাত হয়নি। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইউরোপে এই যন্ত্র যুগের সূচনা হয়েছে। শিল্প-বিপ্লবের মাধ্যমে যন্ত্র যুগ আসার সোপান হিসেবে আমরা আরও কয়েকটি যুগকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিহ্নিত হতে দেখেছি: প্রস্তর যুগ, তাম্র যুগ, লৌহ যুগ।

মানব সেবায় যন্ত্র

এর পর মানুষ আরও অগ্রসর হয়ে আবিষ্কার করেছে বিদ্যুৎ শক্তিকে, আবিষ্কার করেছে আনব-শক্তিকে। এই দানবীয় শক্তি খনির অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা সম্পদকে দুর্জয় শক্তিতে তুলে এনেছে মাটির ওপরে, প্রমত্ত জলধারাকে সেতুবন্ধনে করেছে আবদ্ধ, জয় করেছে আকাশকে, জয় করেছে সমুদ্রকে। দূরকে করে তুলেছে নিকট প্রতিবেশী। এই যন্ত্রশক্তিই অপর্যাপ্ত কৃষি উৎপাদনে মানুষের শস্য-ভাণ্ডারকে করে তুলেছে পূর্ণ, শিল্পোৎপাদনের ঘটিয়েছে সমৃদ্ধি, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাকে করে তুলেছে দ্রুত ও সুখকর। প্রথম থেকেই মানুষ বুদ্ধিবলে এই শক্তির ওপর কর্তৃত্ব করেছে, কিন্তু আজ দিন বদলের পালা এসেছে। মানুষ-নির্ভর যন্ত্র আজ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছে, মানুষ হয়ে পড়েছে যন্ত্র-নির্ভর। ফলে আধুনিক কালে যন্ত্র বিকল হয়ে পড়লে সমগ্র মানব-সভ্যতাই অচল হয়ে পড়ে, মানবজীবন হয়ে পড়ে গতিহীন।

মানুষের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে যেদিন যন্ত্রদানব নিজের প্রাধান্য ঘোষণা করল

সেদিন মানুষের সঙ্গে তার বিরোধ বাধল। প্রাণহীন যন্ত্রের সঙ্গে প্রাণবান মানুষের বিরোধ। যন্ত্র দানবের এই বিদ্রোহ মানুষের সভ্যতার প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। যন্ত্রের নেই প্রাণের স্পন্দন, নেই চলার স্বচ্ছন্দগতি, কিন্তু প্রাণবন্ত মানুষের আছে স্পন্দন, আছে সহজ গতি। যন্ত্রশক্তি মাত্রাতিরিক্ত প্রসার লাভ করলে মানুষের জীবনের এই সহজ স্বচ্ছন্দ্য ও সাবলীল গতি ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য হবে ক্ষুণ্ণ, এমন আশঙ্কা পোষণ করেই মনীষীগণ এই যন্ত্রশক্তিকে 'সর্বগ্রাসী' বলে অভিহিত করেছেন। প্রাণহীণ যন্ত্রের তাড়নায় মানুষের প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথটি যাবে রুদ্ধ হয়ে, যান্ত্রিকতার চাপে পড়ে মানব সভ্যতার নাভিশ্বাস দেখা দেবে এমন কথাও তাঁরা উচ্চারণ করেছেন। আজ যন্ত্র-নির্ভর মানুষ নিজের জীবনের স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য হারিয়ে সর্বনাশা যন্ত্রসভ্যতার 'ছিন্নমস্তা' রূপটি প্রত্যক্ষ করে ভীতত্রস্ত।

যন্ত্র ও জীবনের বিরোধ

যন্ত্রের আবির্ভাবকে মানুষ অভিনন্দিত করেছিল এই আশায় যে এই যন্ত্র মানুষের জীবনে আনবে গতিশীলতা, সমস্ত সংকীর্ণতার অচলায়তন সে ভেঙ্গে ফেলবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যন্ত্র মানুষের জীবনের গতি অপহরণ করে নিজে লাভ করল গতি। মানুষের জীবনকে করে তুলল গতিহীন। মানব-জীবন হয়ে পড়ল যান্ত্রিক। এ হল দানবের কাছে দেবের পরাজয়, সৃষ্টির কাছে স্রষ্টার। এ পরাজয়ে আছে গ্লানি। কারণ যে উদ্দেশ্য নিয়ে একদিন যন্ত্রের জন্ম, আজ সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ। যন্ত্র আজ মানুষের ক্ষমতাকে হরণ করেছে। একদিন যে মানুষ স্বাধীনভাবে উৎপাদন করত, আজ সে যন্ত্রের গোলামী করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে কি বিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতার অগ্রগতির কোন মূল্যই নেই? মানব-সভ্যতার এই অগ্রগতির মূল্য যদি স্বীকার করতে হয়, তবে সেই সঙ্গে যন্ত্রের অবদানকেও স্বীকার করতে হবে।

যন্ত্রের জটিলতায় জীবন গতিহীন

বিংশ শতাব্দীর উন্নতির মূলে যন্ত্রের অবদান

বিশশতকে মানব জীবনের এই চরম উন্নতির মূলে আছে মুষ্টিমেয় মানুষের গবেষণা ও মনীষা ও যন্ত্রের বিস্ময়কর সাফল্য। বর্তমান কালের যন্ত্রের এই ভূমিকাকে অস্বীকার করার অর্থ যুগকেই অস্বীকার করা। কোন বুদ্ধিমান মানুষই তা বলবেন না। আধুনিক পৃথিবীর বৈষয়িক উন্নতির চাবি-কাঠিটি যে আজ যন্ত্রেরই হাতে তা অস্বীকার করা মূর্খতা বৈ আর কিছুই নয়। যন্ত্রই বিভিন্ন জাতিকে আপন আপন দৈশিক গণ্ডীর আবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। যে বিরাট শক্তির পূর্ণ সম্ভবনা এত

বৈষয়িক উন্নতির চাবি-কাঠি যন্ত্রেরই হাতে

দিন প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল উন্মুখ, যন্ত্রই সেই শক্তিকে দিয়েছে মুক্তি। গুহাশ্রিত মানুষ আজ বহির্বিশ্বের সঙ্গে হয়েছে যুক্ত। নিদ্রিত শক্তির জাগরণের ফলে মানব জাতি আজ দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে উঠেছে। তার মন্ত্র আজ চরৈবেতিঃ, চরৈবেতিঃ। কিন্তু এ সত্য স্বীকার করেও মানুষ আজ সেই যন্ত্রশক্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এত ব্যাকুল কেন? সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা দরকার।

প্রশ্ন হল : এর জন্য কি যন্ত্রই দায়ী? না অন্য কেউ? উত্তরে বলা চলে : নিষ্প্রাণ যন্ত্র নয়—কতিপয় যন্ত্র-মালিকদের নিষ্ঠুর লোভ ও স্বার্থপরতা এর জন্য দায়ী। মুষ্টিমেয় মানুষ অন্যকে শোষণ করার উপায় হিসেবেই আজ এই যন্ত্রকে ব্যবহার করছে। মুনাফালোভী মানুষের চক্রান্তে আজ যন্ত্র মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের বিস্ময়কর ভূমিকা গ্রহণে অক্ষম। পুঁজিপতি ও শিল্পপতির দল অসংখ্য শ্রমিককে নিষ্পেষিত করার উপায় হিসেবেই এই যন্ত্রকে প্রয়োগ করছে। ফলে পৃথিবীর কোটি কোটি সাধারণ দরিদ্র শ্রমিক মানুষের জীবনে কল্যাণের স্পর্শ না লেগে, এসেছে চরম লাঞ্ছনা। দেখা দিয়েছে জীবন-সংকট। প্রাণহীন যন্ত্র যতদিন স্বার্থপর, লোভী, স্বৈরাচারী শিল্পপতিদের তাঁবেদার হিসেবে কাজ করবে, ততদিন মানব সমাজের কল্যাণ চিন্তা হবে দিবাস্বপ্ন মাত্র। মুষ্টিমেয় শোষণকারীর বজ্রমুষ্টি থেকে যন্ত্র-কর্তৃত্ব কেড়ে নিতে পারলেই এই অপরিসীম ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রই আবার মানুষের দাস হয়ে যাবে।

যন্ত্র নয়, যন্ত্রের মালিক শোষণের ইতিহাস রচনা করেছে

এ যুগে যন্ত্র অপরিহার্য। যন্ত্রকে দোষারোপ করে কোন লাভ নেই। যন্ত্র হল শক্তির আধার। শক্তির সৎ ব্যবহারও যেমন করা চলে, তেমনি অসৎ ব্যবহারও করা চলে। মানুষের নীতিবোধের ওপরই তা নির্ভরশীল। মানুষের সুনিয়ন্ত্রণেই এ যন্ত্র যেমন আশীর্বাদ হিসেবে দেখা দিতে পারে, তেমনি অপপ্রয়োগের ফলে তা অভিশাপ রূপেও আসতে পারে। মানুষ যন্ত্রের আশীর্বাদই কামনা করে—অভিশাপ নয়। অর্থাৎ যন্ত্র মানুষের কাম্য, কাম্য নয় যান্ত্রিকতা। যন্ত্রের দাসত্ব নয়, মানুষ চায় যন্ত্রের কর্তৃত্ব। ঐ কর্তৃত্ব শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় স্বার্থপর শিল্পপতি ও পুঁজিপতির করায়ত্ত থাকলে চলবে না। যন্ত্রকে করতে হবে রাষ্ট্রায়ত্ত। বৃহৎ পুঁজিপতির সঙ্গে দরিদ্র শ্রমিকের সংঘর্ষের অবসান ঘটিয়ে সমাজে ধনবণ্টনে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শুধুমাত্র বড় বড় শিল্প-কারখানা না গড়ে, তার পাশাপাশি

যন্ত্রের আশীর্বাদ কাম্য, অভিশাপ নয় ; ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের যোগ্য মর্যাদা আবশ্যক

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে যোগ্য আসনে বসাতে হবে, তবেই যন্ত্র বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জীবনে যন্ত্রণার কারণ না হয়ে, হয়ে উঠবে আশীর্বাদ। যন্ত্রযুগ হয়ে উঠবে স্বর্ণযুগ।

উপসংহার

লোভ-কলঙ্কিত, হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর মানুষের শুভবুদ্ধি যদি যন্ত্র-নির্ভরতার পরিণাম সম্পর্কে, মুষ্টিমেয় স্বার্থপর মানুষের হাতে যন্ত্রশক্তি কেন্দ্রিত থাকার পরিণাম সম্পর্কে সচেতন না হতে পারে, তবে মানব সভ্যতার সংকট হবে অনিবার্য। একদিন যে যন্ত্র মানব সভ্যতাকে অগ্রসর করে দিয়েছিল, সেই যন্ত্রই মানুষের সভ্যতার বিপর্যয় ডেকে আনবে। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে বোধ হয় সেই হবে করুণতম ট্রাজেডি।

অনুন্নত দেশে মূলধন গঠনের সমস্যা

এই প্রবন্ধের অনুসরণে
অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধনের ভূমিকা

পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ আজও অনগ্রসরতার অন্ধকারে 'শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি' বহন করে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির নির্লজ্জ নিষ্পেষণে অগণিত মানুষ অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে হয়েছে বাধ্য। পৃথিবীর একদিকে রচিত হয়েছে ঐশ্বর্য ও বিলাসের স্বপ্নপুরী, অন্যদিকে তৈরী হয়েছে সংখ্যাতীত মানুষের মৃত্যুপুরী। একমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও বৈষয়িক সমৃদ্ধির মাধ্যমেই এই লক্ষ কোটি মানুষের অভিশপ্ত জীবনে নেমে আসতে পারে কল্যাণ আশীর্বাদ।

প্রারম্ভ

দীর্ঘদিন ধরে শোষিত হওয়ার ফলে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও অত্যুজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্র আজও অনুন্নত ও অর্দ্ধোন্নত অবস্থার মধ্যে কালযাপন করছে। এই সব অনুন্নত ও অর্দ্ধোন্নত দেশের পশ্চাদ্‌পদ অর্থব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে প্রয়োজন পর্যাপ্ত মূলধনের। পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ যাঁরা আজও সভ্য মানুষের মত বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত, একমাত্র জাতীয় অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমেই এই বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার হাত থেকে তাঁদের মুক্তি দেওয়া সম্ভব। কিন্তু মূলধনের অভাবই সেই পথের প্রকৃত প্রতিবন্ধক।

অর্থব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনে মূলধনের প্রয়োজন

জাতীয় সঞ্চয়ের সাহায্যেই গড়ে ওঠে মূলধন। কোন দেশ মূলধন গঠন করতে আগ্রহী হলে, সেই দেশকে অনুসরণ করতে হবে তিনটি সুনির্দিষ্ট পথ। প্রথমতঃ, ভোগাতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ যত বৃদ্ধি করা যাবে, জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণও যাবে ততই বেড়ে; দ্বিতীয়তঃ, ভোগাতিরিক্ত এই সঞ্চয়কে সংগ্রহ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তৃতীয়তঃ, এই সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যে (Capital goods) রূপান্তরিত করতে হবে। এছাড়া সম্পদের সামাজিক বণ্টনে বৈষম্য অপসারণও অপরিহার্য।

জাতীয় সঞ্চয়ের সহায়তায় গড়ে ওঠে মূলধন

অনগ্রসর দেশগুলির মূলধন সংগ্রহের সমস্যার সুসম্পূর্ণ পর্যালোচনা করতে বসলে উক্ত দেশগুলিতে মূলধনের যোগান ও চাহিদার দিকেই দৃষ্টিপাত করা একান্ত

আবশ্যক। পর্যালোচনার পথে অগ্রসর হলেই কেবলমাত্র মূলধনের অভাব ও অভাবের কারণগুলির চিত্র আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। যে কোন দেশের মূলধনের যোগান নির্ভর করে দেশবাসীর সঞ্চয়েচ্ছা ও সঞ্চয়-ক্ষমতার ওপর।

মূলধন গঠনের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক শান্তি ও উন্নত সঞ্চয় সংগ্রাহক ব্যবস্থা

দেশবাসীর আয় অধিক হলেই কেবলমাত্র ভোগাতিরিক্ত সঞ্চয় সম্ভব। শুধুমাত্র সঞ্চয়ই যখন উদ্দেশ্য নয়, তখন সেই সঞ্চয় নিরাপদে বিনিযুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকাও অপরিহার্য। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতিও সঞ্চয়-সংগ্রাহক প্রতিষ্ঠান যথা: ব্যাঙ্ক, বীমাপ্রতিষ্ঠান, পোস্টাল সেভিংস ব্যবস্থা প্রভৃতি যদি আশানুরূপ হয়, তাহলে উদ্বৃত্ত আয় সঞ্চিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সুদের হার ও জাতীয় কর ব্যবস্থা মানুষের সঞ্চয়েচ্ছাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করে। সুতরাং এদিকেও সদাজাগ্রত দৃষ্টির প্রয়োজন।

অনুন্নত দেশগুলোতে মানুষ স্বল্পায়ে জীবন যাপন করে, কাজেই সামাজিক সঞ্চয়ের যোগানও সীমিত। ফলে মূলধন গঠনও হয় অল্প। সামান্য মূলধন নিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থাকে নবায়িত করে তোলা সম্ভব নয় বলে অনুন্নত দেশে উৎপাদন-

দুষ্ট-চক্র

ব্যবস্থা প্রাচীন-পন্থীই থেকে যায়। এতে আয়ের পরিমাণ হয় নিতান্তই কম। আবার আয় অল্প বলে সঞ্চয়ও হয় কম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অনুন্নত দেশে আয় অল্প বলে সঞ্চয় অল্প; সঞ্চয় অল্প বলে আয় হয় অল্প। অর্থনীতির ভাষায় একেই বলে দুষ্ট-চক্র (vicious circle)। সাম্প্রতিক কালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক র‍্যাগনার নার্কসে দুষ্ট-চক্রের কারণগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নার্কসে মনে করেন, অনুন্নত দেশের কৃষি-ক্ষেত্রে এক বিরাট সঞ্চয়ের সম্ভাবনা রয়েছে নিহিত। অনুন্নত ও দরিদ্র দেশগুলোর কৃষি ক্ষেত্রে গুপ্ত-বেকারীর (disguised unemployment) চাপ যথেষ্ট। কৃষি-ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক মানুষের চাপে কৃষকের প্রান্তিক উৎপাদন শেষ পর্যন্ত শূন্যে নেমে যায়। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে কিছু সংখ্যক শ্রমিককে অন্যত্র সরিয়ে

গুপ্ত-বেকারীর প্রাবল্য ও তার প্রতিকার

নিয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। এব্যবস্থায় কৃষি উৎপাদন হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদি স্থানান্তরিত শূন্য প্রান্তিক উৎপাদনকারী শ্রমিকেরা অন্যত্র সামান্য কিছুও উৎপাদনে সক্ষম হয়, তবে সেই সামান্য উৎপাদনই জাতীয় সম্পদের পরিমাণকে বর্দ্ধিত করবে; করবে সমৃদ্ধ। এই সব অপ্রয়োজনীয় কৃষি-কর্মীকে

যদি সড়ক-নির্মাণ, জলসেচ ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা কর্মে নিযুক্ত করা যায়, তবে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নয়নী প্রচেষ্টার ভিত্তিমূল হবে সুদৃঢ়।

এই জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে স্বভাবতই একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়—মূলধন আসবে কোথা থেকে? কারণ যে সমস্ত কৃষি-কর্মীকে স্থানান্তরিত করা হবে তাদের অন্য কর্মে নিযুক্ত করলেও, নিতান্তপক্ষে আহারের জন্য কিছু ভাতা দেওয়া অপরিহার্য হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তর হল: বিত্তশালীদের সঞ্চয় সংগ্রহে উদ্যোগী হতে হবে। উপরন্তু ভোগ্যপণ্য ব্যবহারকারীদের ভোগের ওপর উচ্চহারে কর আরোপ করতে হবে। এছাড়া বৈদেশিক মূলধন থেকে মূলধন সংগৃহীত হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপায় হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে কর্মহীনদের জন্য অনুৎপাদক ভাবে ব্যয়িত সঞ্চয় সংগ্রহ করা; কিন্তু এই সংগ্রহের কাজ অত্যন্ত দুরূহ, তা সন্দেহাতীত।

বিত্তশালীদের সঞ্চয়-সংগ্রহ আবশ্যক

অধ্যাপক নার্কসে মূলধন গঠনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: দেখা যাচ্ছে যে মূলধনের যোগানের ক্ষেত্রে একটি দেশের দারিদ্র্যের কারণ: 'A Country is poor because it is poor'। বক্তব্যটি আপাতঃ-দৃষ্টিতে 'টুটলজি' বলে মনে হলেও এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রকৃত সত্যটি। কারণ অনুন্নত দরিদ্র দেশের মূলধন নেই বলেই পুনর্বিনিয়োগের উপযুক্ত অতিরিক্ত আয়ও সম্ভব নয়।

মূলধন-গঠনের সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনায় যোগানের দিকটি পর্যালোচনা সমস্ত বিষয়টির একটি দিক মাত্র, অন্য দিক হল চাহিদার দিক। যোগানের পাশাপাশি চাহিদার দিকটি আলোচনা করলে তবেই আলোচনা হবে সম্পূর্ণ। মূলধন-চাহিদার পেছনে আছে মূলধন ব্যবহারের প্রেরণা। এবং এই প্রেরণার সৃষ্টি হয় তখনই, যখন দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদার মাত্রা হয় যথোপযুক্ত। চাহিদার মাত্রা ক্ষীণ বলেই অনুন্নত দেশে প্রভূত পরিমাণে অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনবল থাকা সত্ত্বেও তাদের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা প্রায় অনুপস্থিত। সুতরাং দারিদ্র নিষ্পেষিত দেশে মূলধন গঠনের প্রয়াসের ক্ষেত্রে প্রথমেই দেশের অভ্যন্তরে পণ্য চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এর জন্য দরকার উৎপাদন বৃদ্ধি। উৎপাদনের আয় থেকেই উৎপাদিত দ্রব্য ক্রীত হবে। অনুন্নত দেশের এই কঠিন সমস্যা সমাধানে ফরাসী অর্থনীতিবিদ জাঁ ব্যাপটিস্ট সের

মূলধন-চাহিদার পেছনে আছে মূলধন ব্যবহারের প্রেরণা

নীতিটিকে কার্যকরী করা দরকার। অর্থনীতিবিদ সে বলেন, 'Supply creates its own demand' অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্যের যোগান নিজস্ব চাহিদা সৃষ্টি করে নেয়।

কিন্তু শুধুমাত্র অনুন্নত দেশের অধিবাসীদের আয় বৃদ্ধি হলেই, দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধি ঘটবে এমন কথা অসঙ্গত। বর্দ্ধিত আয় সঞ্চিত না হয়ে ভোগে ব্যয়িত হলে দেশে মূলধন গঠনের সমস্যা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাবে। দরিদ্র দেশে জীবন ধারণের মান নিম্ন-স্তরের হওয়ায় সেখানে অর্জিত আয় অতিরিক্ত ভোগে ব্যয়িত হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক। সুতরাং বিশেষ পদ্ধতিতে দেশের আয়ের কিছুটা অংশ সংগ্রহ করে সঞ্চয়ের ভাণ্ডারটি পূর্ণ করতে পারলে তবেই মূলধন গঠনের সমস্যার অক্টোপাসী আক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, অন্যথায় নয়!

উপসংহার

অনুন্নত ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

এই প্রবন্ধের অনুসরণে:
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বাধীন ভারত

দীর্ঘ দুশো বছর শাসনের পর ইংরেজ ভারত ত্যাগ করে গেছে। পেছনে রেখে গেছে ব্যর্থতার গ্লানি, দীনতার আবর্জনা। স্বাধীন ভারতের জাতীয় জীবনে তাই এখন শুরু হয়েছে সেই দীনতার আবর্জনা ও ব্যর্থতার গ্লানি অপসারণ করে নব সৃষ্টির সাধনা। পর-শাসনে নিঃস্ব, রিক্ত ভারতের বুকে আজ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পালা শুরু হয়েছে। এতদিন ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক, কিন্তু ক্রমে সেই নৈরাশ্যের অন্ধকার কেটে গিয়ে ভারতের আকাশে উদিত হচ্ছে নব সম্ভাবনার উজ্জ্বল সূর্য। এতদিন বিদেশী কায়েমী স্বার্থের হীন-চক্রান্তে ভারতের বৈষয়িক উন্নতির দ্বারগুলি ছিল রুদ্ধ, আজ পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত ভারতের রুদ্ধ দুয়ারগুলিও হচ্ছে অর্গলমুক্ত। শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদ্‌শালিনী ভারতের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিজের দেশকে করেছে সমৃদ্ধ। আর শোষিত ভারত হয়ে পড়েছে দরিদ্র। তাই অতীত ভারতের ইতিহাস হল—কৃষির নিঃস্বতা, শিল্পের অনগ্রসরতা, স্বাস্থ্যহীনতা ও অকালমৃত্যুর ইতিহাস। সব থেকেও তাই বিশ্ববাসীর কাছে ভারতের একমাত্র পরিচয় ভারত অনুন্নত, অনগ্রসর একটি দেশ।

প্রারম্ভ

পৃথিবীর মানচিত্রে 'উন্নত' বলে চিহ্নিত করার মত দেশের সংখ্যা খুব বেশী নয়। বর্তমান বিশ্বে আমেরিকা, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলিকেই উন্নত নামে অভিহিত করা চলে, কেননা এইসব দেশের মানুষের মাথা পিছু গড় বার্ষিক আয় প্রায় হাজার টাকা কিংবা তারও বেশী। এই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ধন-বৈষম্যেরও পরিমাণও অপরিমিত নয়। আবার জাপান, ইটালি, গ্রীস, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, এই সব দেশের মানুষের মাথা পিছু গড় আয় বার্ষিক পাঁচশো টাকা থেকে হাজার টাকা। এই সব দেশকেও উন্নত দেশ বলে অভিহিত করা সঙ্গত। কিন্তু এদের পেছনে পড়ে আছে ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন ও ল্যাটিন আমেরিকার মত দেশগুলি। এই সব দেশ নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত, কেননা এই সব দেশের অধিবাসীদের মাথা পিছু

উন্নত ও অনুন্নত দেশ

গড় বার্ষিক আয় পাঁচশো টাকার অনেক নীচে। ভারতে মাথা পিছু আয় মাত্র তিনশো টাকার মত। এই সব দেশের মানুষের জীবন ধারণের মান অত্যন্ত শোচনীয়। আধুনিক কালের অর্থনীতি বিশারদগণ এই সব দেশগুলির কয়েকটিকে অনুন্নত না বলে অর্ধোন্নত বা স্বল্পোন্নত বলে চিহ্নিত করতে চান। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ লোক অনুন্নত দেশগুলির অধিবাসী।

অনুন্নত বা অর্ধোন্নত দেশগুলির অর্থব্যবস্থার অনগ্রসরতা যে যে ঘটনার ওপর নির্ভরশীল সেগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হল: শিল্পের অনগ্রসরতা ও কৃষির ওপর অধিক নির্ভরশীলতা। দৃষ্টান্ত ভারত। ভারতের অর্থনীতি কৃষি অর্থনীতি অর্থাৎ ভারতের অর্থনৈতিক শক্তি ও বৈষয়িক কল্যাণ প্রধাণতঃ কৃষি-নির্ভর। ভারতের মূল শিল্প বলতে কৃষিকেই বোঝায়। জাতীয় আয়ের অর্ধাংশ আসে কৃষি থেকে এবং ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত এবং প্রায় শতকরা ১০ ভাগ লোক শিল্পে কর্মরত। বহু মানুষের আয়ের উৎস এই কৃষিও কিন্তু অনুন্নত। উৎপাদনের সমস্ত উপাদানগুলোর কার্যকারিতার দিক থেকে দক্ষতার যথেষ্ট অভাব এবং উৎপাদন ক্ষমতার অভাব দেখা যায়। উন্নত দেশের তুলনায় এই অবস্থা নিতান্ত নৈরাশ্যজনক।

কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি

অনুন্নত দেশের শিল্প অনগ্রসর ও কৃষি অতিভারগ্রস্থই শুধু নয়, এই অতিভার গ্রস্থতার ফলে কৃষি-কর্মরত মানুষগুলির এক বৃহৎ অংশ অনাবশ্যক। দীর্ঘ শাসনকালে বিদেশীরা তাদের নিজেদের স্বার্থে শিল্প-সম্প্রসারণ ঘটায়নি। সমস্ত দেশকে কৃষি-নির্ভর করেই রেখেছে। কারণ ভারতে শিল্প-সম্প্রসারিত হলে ভারতের কৃষিজ ও খনিজ উৎপাদন বিদেশের কলকারখানার জন্য প্রেরণ করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়বে। সুতরাং বিদেশীরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই ছিল ভারতে শিল্প-সম্প্রসারণের বিরুদ্ধবাদী। এই স্বার্থপর শাসকের দল এই দেশকে শিল্প-বিপ্লবের আশীর্বাদ থেকেই শুধু বঞ্চিত করেনি, কৃষিকে শোষণের উপযোগী করার জন্য তুলে দিয়েছে মধ্যস্বত্ব ভোগী জমিদারদের হাতে। ফলে ভারতের নিরক্ষর, দরিদ্র স্বাস্থ্যহীন কৃষকেরা শতধাবিভক্ত ভূমি-জোতে রুগ্ন হাল বলদের সাহায্যে যে কৃষি-কাজ চালিয়েছে তাতে উৎপাদিত হয়েছে সামান্য ফসল। এর ওপর আছে স্বত্ব ভোগের অনিশ্চয়তা। এই কৃষি কাজের উন্নতির সহায়ক আধুনিক কৃষি-প্রকরণ, উন্নত ধরণের সেচ ব্যবস্থা, উন্নত ধরণের বীজ এবং রাসায়নিক সার ব্যবহারের

শিল্প-সম্প্রসারণের অভাব ও কৃষি উৎপাদন নিম্নমুখী

সুযোগও কোনদিন এই সব কৃষকের দল পায়নি ফলে পোড়ামাটিতে প্রত্যাশিত ফসল ফলেনি, খাটুনিই হয়েছে সার। অথচ দেশে একদিকে শিল্প সম্প্রসারণের অভাবে ও অন্যদিকে প্রাচীন ঐতিহ্য-সম্পন্ন কুটির শিল্পের ধ্বংসের ফলে কৃষি-ক্ষেতে কর্মরত মানুষগুলির অন্যত্র গমনও ছিল অসম্ভব। ফলতঃ কৃষি-শিল্পে ক্রমবর্দ্ধমান মানুষের চাপে উৎপাদন হল নিম্নমুখী।

সংস্কারের অভাবে সব কিছুই নষ্ট হয়। এদেশের বহুপ্রাচীন কুটির শিল্পও গ্রামীণ শিল্পেরও যখন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, তখনই এল বিদেশী শিল্পের প্রচণ্ড আঘাত। ফলে এ দেশের কুটির শিল্প ও গ্রামীণ শিল্প হল ধ্বংস। বহুলোক বরণ করতে বাধ্য হল সুদুঃসহ বেকারত্ব। এর সঙ্গে কৃষিতে শস্যাবর্তন অনুপস্থিত থাকায় বেকারত্বও তার চিরসঙ্গী। কারণ শিল্প-সম্প্রসারণের অভাবের ফলে এবং গ্রামে ক্ষুদ্র-শিল্পের অভাবের ফলে অপ্রয়োজনীয় কৃষিজীবিরা স্থানান্তরিত হতে পারে না। এই জাতীয় অনাবশ্যক কিন্তু কর্মক্ষম ব্যক্তিদের অর্থশাস্ত্রের ভাষায় 'প্রচ্ছন্ন বেকার' বলা হয়। আবার বুদ্ধিজীবী বলতে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের বোঝায়, ভাবমূলক শিক্ষার মোহে মোহগ্রস্থ সেই বুদ্ধিজীবী শিক্ষিতের দলের কাছেও কর্ম-লাভের পথ থাকল প্রায়ই রুদ্ধ। ফলে বেকারের সংখ্যা হল ক্রমবর্দ্ধমান।

প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ও শিক্ষিত বেকার

অনুন্নত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, উন্নত দেশের তুলনায় অনেক বেশী। ফলে ভারতে লোক-শক্তির প্রাচুর্য। কিন্তু এই লোক-শক্তিকে উৎপাদনমূলক কাজে কর্মক্ষম করে তোলার মত উপযুক্ত অর্থনৈতিক কাঠামোর ছিল অভাব। তাই সম্পদ সৃষ্টির কাজে এই বিপুল মানব-শক্তি ব্যবহৃত হল না; মূলধনও হল না সংগঠিত। দারিদ্র হল সুতীব্র। এই অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হলে এবং নব নব অর্থনৈতিক প্রয়াস সূচিত হলে দেখা দিল কারিগরের অভাব। পর্যাপ্ত মানবশক্তি থাকা সত্ত্বেও কারিগরি-দক্ষতার অভাবে এই বিপুল শক্তি অকর্মন্যই থেকে গেল। এই বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা হল দেশের বোঝা।

অব্যবহৃত মানব-শক্তি; দক্ষতার অভাব

জনসংখ্যা বৃদ্ধি-হার জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধি-হার থেকে যথেষ্ট বেশী হওয়ায় এইসব দেশে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়া তো দূরের কথা, ঐ আয়ের উত্তরোত্তর হ্রাস রোধ করা হয়ে পড়ল এক জটিল সমস্যা। ফলে দারিদ্র্য উঠল চরমে। দারিদ্র-নিপীড়িত মানুষের সঞ্চয়-ক্ষমতা বলতে কিছুই থাকে না

মূলধন গঠনের অভাব; দুষ্ট-চক্র

কারণ সমস্ত দিনের কঠিন পরিশ্রমে যা আয় হয়, তা জীবন যাপনের জন্যই হয় ব্যয়িত। সামান্য আয় শুধু নিঃশেষিতই হয় না, ঋণের বোঝা ক্রমে বাড়তেই থাকে। তাই উন্নতির মূল উপায় যে মূলধন গঠন তা হয়ে পড়ে অসম্ভব। অধ্যাপক নার্কসে বলেন: অনুন্নত দেশে দারিদ্রের একটা দুষ্ট চক্র (vicious circle) আছে। দারিদ্রের ফলে যেমন দেশের মূলধন সৃষ্টির অন্তরায়, তেমনি মূলধনের অভাবের ফলে সৃষ্ট হয় চির-দারিদ্র।

অত্যধিক জনসংখ্যা ও অনুন্নত কৃষি-ব্যবস্থার ফলে খাদ্যাভাব হয়ে ওঠে প্রকট। খাদ্যাভাব থেকে অপুষ্টি ও অপুষ্টি থেকে নানা ধরনের রোগ বিস্তারের জন্য অনুন্নত দেশের মানুষগুলি হল প্রাণ-শক্তি হীন, ম্রিয়মান। অনুন্নত ভারতেও সেই একই চিত্র। এর ওপর চিকিৎসা ও শিক্ষার অভাব চারিদিকে গড়ে তোলে হতাশার দুর্বহ পরিবেশ। স্বল্পায়ু মানুষগুলি অকাল-মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। একদল সমাজ বিরোধী মুনাফাশিকারী এই সুযোগে চোরাকারবার, মজুতদারী, খাদ্যে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল মিশ্রণ, ইত্যাদি দুর্নীতির পথ নেয় বেছে। ফাটকা-বাজার, কালোবাজার, দ্রব্য মজুত প্রভৃতি পন্থা সাধারণত অস্থিতিস্থাপক চাহিদা-সম্পন্ন দ্রব্য-ভিত্তিক, কারণ এতেই মুনাফার মাত্রা হয় অধিক। এই পথেই অধিকাংশ পুঁজি নিযুক্ত হয়। এতে অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের সঞ্চয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। এতে মূলধন গঠনের পথ হয় অবরুদ্ধ।

চোরা-কারবার, মুনাফাবাজী প্রভৃতির মাত্রাবৃদ্ধি

দেশীয় বাণিজ্যে যখন এই নক্কারজনক পরিস্থিতি তখন বহির্বাণিজ্যের হালও তথৈবচ। ভারত থেকে সস্তা দরে শিল্প প্রধান দেশগুলোতে কাঁচামাল রপ্তানি করা হয় এবং বিদেশ থেকে শিল্পজাত ভোগ্যপণ্য উচ্চ মূল্যে আমদানি হয়ে আসে স্বদেশে। কারণ ভোগ্যপণ্য তৈরী করার মত শিল্পায়নের অভাবেই আমাদের পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। এমনি ভাবে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যের ব্যর্থতা দেশের ভবিষ্যতকে করে তোলে সঙ্কটময়, বর্তমানকে করে তোলে ক্লেদাক্ত।

আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের হাল

সঙ্কট তাই অনুন্নত দেশগুলির চিরসঙ্গী, নিত্য-সহচর। এই সঙ্কট ও সর্বনাশের অক্টোপাসী আক্রমণ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে চাই অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের আত্যন্তিক প্রয়াস। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রধান শর্তই হল সুপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা। পরিকল্পিত ও ত্বরান্বিত অর্থনৈতিক উন্নয়নই কেবলমাত্র পারে অনুন্নত দেশের ব্যাধিগ্রস্থ, বেকার, নিরানন্দ মানুষগুলির জন্য কর্ম সংস্থান করতে, তাদের

মনে আনন্দ সঞ্চার করতে। এই পথে অগ্রসর হওয়ার প্রথম ধাপ হল—কৃষি-উন্নয়ন। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জল সেচ ব্যবস্থা, রাসায়নিক ও জৈবিক সার সরবরাহ, উৎকৃষ্ট বীজ ও উন্নত ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং তা করতে হবে। এই সঙ্গে শুরু করতে হবে শিল্প ও শিক্ষার পথের সমস্ত বাধা অপসারণের পালা। এতদিন যে দুয়ার ছিল রুদ্ধ তাকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। মূলধন গঠনের প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করতে হবে। জনসাধারণের ভোগের পরিমাণ যেমন একদিকে কমাতে হবে, তেমনি অন্যদিকে মানব-শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা শ্রমের অপচয় দূর করতে হবে। দেশের যে মূলধন চোরাকারবারি, মনাফাবাজীতে নিয়োজিত, সেই মূলধনকে সরিয়ে এনে প্রকৃত কল্যাণজনক উৎপাদনের কাজে করতে হবে বিনিয়োগ। জনসংখ্যার ক্রমবর্দ্ধমান বৃদ্ধি-হারকে করতে হবে নিয়ন্ত্রিত। এর জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে এবং দেশে এক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ দেশব্যাপী অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের বিরাট কর্মোদ্যম শুরু করতে হবে। দারিদ্র নিপীড়িত দেশে সৃষ্টি করতে হবে অভূতপূর্ব সামাজিক উৎসাহ। উন্নয়ন-প্রয়াসকে করে তুলতে হবে গতিচঞ্চল। সমবায়ের মন্ত্রদীক্ষিত মানুষের দলকে এগিয়ে দিতে হবে সফল জীবনের লক্ষ্যে।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের শর্ত—সুপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা

অনুন্নত ভারতে সেই বিরাট কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। ভারত আজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর। পরিকল্পিত অর্থনীতির পথ অনুসরণে বহুদিনের ধন-বৈষম্য পীড়িত সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলে এক নবীন ভারত গড়ে তোলার মহৎ সঙ্কল্প নিয়ে আজ স্বাধীন ভারত দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। নবীন ভারত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে একান্ত উন্মুখ।

উপসংহার

ভারতের মূলধন গঠন ও বৈদেশিক মূলধন

এই প্রবন্ধের অনুসরণে
- ভারতের মূলধন গঠনের সমস্যা
- জাতীয় অর্থনীতিতে বৈদেশিক মূলধন নিয়োগের প্রভাব [ক.বি. '৫৪]
- ভারতে বিদেশী মূলধন [ক.বি. '৬২]
- ভারতের উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা

ইংরেজ তার শতাব্দীব্যাপী শাসনকালে ভারতবর্ষকে শুধু তার অবাধ শোষণ ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হিসাবেই দেখেছে এবং তার শিল্পোন্নয়নের পথকে অবরুদ্ধ করার চেষ্টাই করেছে। স্বাধীনতা লাভের পর পরাধীনতার অভিশপ্ত যুগের অনুন্নত, স্থবির অর্থনীতির দুঃসহ বোঝা ভারতকে বহন করতে হচ্ছে বলে তার অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠন একটি সমস্যাকীর্ণ দুশ্চর ব্রত হয়ে উঠেছে। যথোপযুক্ত পরিমাণে মূলধনগঠন শিল্পায়নের প্রাথমিক ভিত্তি। তার অভাব ভারতবর্ষের অনুন্নত অর্থনীতির অন্যতম প্রধান লক্ষণ। ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশগুলোর বেসরকারি শিল্পসমূহে মূলধন সরবরাহের প্রধান উৎসগুলো হল শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়, ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান। উন্নত দেশগুলোয় ব্যাঙ্ক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মূলধনগঠনে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। জাপানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর প্রসারে ব্যাঙ্কের অবদান সৃজনশীল, গৌরবময়। সেদিক থেকে আমাদের দেশের ব্যাঙ্কগুলোর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয়।

প্রারম্ভ

স্বাধীনতা লাভের পর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী কর্মযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে, এই যজ্ঞে সরকারি কর্ম-প্রচেষ্টাকে প্রাধান্যদান করা হলেও বেসরকারি সংস্থাকেও উপেক্ষা করা হয়নি। মূলধন সংগ্রহ জাতীয় জীবনের কঠিন গুরুভার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিকল্পনার কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের কর্মসূচীগুলোর জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। বিশেষত পুরাতন শিল্পগুলোর পুনর্বিন্যাস ও নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠা তথা যথাসম্ভব দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের রূপান্তরের জন্য মূলধনগঠনই সর্বাপেক্ষা জরুরী জাতীয় কর্তব্য। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের পুঁজিপতিরা অনুৎপাদক সঞ্চয়ে ও ব্যয়ে, ফাটকাবাজিতে যতটা উৎসাহী, মূলধন

জাতীয় পরিকল্পনার দিক থেকে মূলধনগঠনের গুরুত্ব

গঠনে ততটা নয়। এক্ষেত্রে সরকারকেই প্রধান উদ্যোগীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে।

বৈদেশিক মূলধন কিংবা সাহায্য অপেক্ষা মূলধন গঠনের উৎস হিসাবে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় যে সহস্রগুণ শ্রেয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশের সাধারণ, দরিদ্র, অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে প্রতি-মুহূর্তে বিপর্যস্ত জনসাধারণের মাথা পিছু আয় এত স্বল্প যে তার থেকে সঞ্চয় ও বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত আর অবশিষ্ট থাকে না। প্রথম তিনটি পরিকল্পনার সমীক্ষায় দেখা যায়, ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ভারতের জনসংখ্যা বছরে ২'৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু প্রকৃত মাথাপিছু আয় মাত্র ১'৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগে ও চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম পর্বে অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্য, বিশেষত খাদ্যশস্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির অঙ্ককে নির্মম পরিহাসে পরিণত করেছে। জাতীয় আয়ের বৃহৎ অংশই মুষ্টিমেয় বিত্তবান শ্রেণীর ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছে। এখন অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ভোগব্যয়কে কঠোরভাবে সঙ্কুচিত করে জনসাধারণের কাছ থেকে সঞ্চয় সংগ্রহের সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সরকার প্রাইজবণ্ড, গোল্ডবণ্ড, ন্যাশনাল সেভিংস্ সার্টিফিকেট, প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট প্রভৃতির মাধ্যমে জনসাধারণের সঞ্চয় সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছেন।

জনসাধারণের সঞ্চয় থেকে মূলধন গঠনের সমস্যা

জাতীয় আয় থেকে মূলধন গঠনের অগ্রগতিও আশাপ্রদ নয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ভারতে মূলধন গঠনের হার সমগ্র জাতীয় আয়ের শতকরা ৪'৯৪ থেকে শতকরা ৬ ভাগ মাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালেই স্বয়ংপোষিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের, অর্থাৎ বিদেশের মুখাপেক্ষী না হয়ে আভ্যন্তরীণ সঙ্গতির ওপর নির্ভর করে উন্নয়নের হার বজায় রাখার ক্ষমতা অর্জনের ভিত্তি নির্মাণ করা যাবে বলে আশা করা হয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার ছিল জাতীয় আয়ের ৮'৫ শতাংশ, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষভাগে তার পরিমাণ দাঁড়াবে ১১'৫ শতাংশে, এই ছিল পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার শেষপ্রান্তে উপনীত হবার পর দেখা গেল, জাতীয় আয়ের তুলনায় বিনিয়োগের হার ১৪ শতাংশ হয়েছে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ ১০'৫ শতাংশের অধিক হয়নি। তিনটি পরিকল্পনার বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হিসাবটি গ্রহণ

জাতীয় আয় থেকে মূলধন গঠনের অগ্রগতি

করলে দেখা যায়, প্রথম পরিকল্পনাকালে সমগ্র ব্যয়ের মধ্যে ভোগ ও মূলধন নির্মাণে সরকারের ব্যয় ছিল শতকরা ৪৯ ভাগ, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শতকরা ৪৪ ভাগ এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শতকরা ৪৫ ভাগ। প্রথম পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রীয় সরকারের মূলধন নির্মাণ ছিল ৩৯৭ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে তার পরিমাণ ১,০১০ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ২,০৬৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৩৬, ২১৮ এবং ১,৩৬৫ কোটি টাকা। আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও মূলধন নির্মাণজনিত ব্যয়ের এই বৈষম্যই সাম্প্রতিককালে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছে এবং চতুর্থ পরিকল্পনার মূলধন গঠনের সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে। তাই পরিকল্পনার কর্মসূচীগুলোর বাস্তব রূপায়ণের গুরুতর ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণের জন্য বজ্রকঠিন সঙ্কল্প এখনই গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য মূলধনদ্রব্য উৎপাদন মূলধন গঠনের একটি বিশিষ্ট দিক। ইস্পাতের মত ভারী ও মূল শিল্পে অর্থবিনিয়োগ আমাদের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে কতটা যুক্তিযুক্ত, এ প্রশ্ন বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন

বোকারোয় চতুর্থ ইস্পাত কারখানা স্থাপন সম্পর্কে সরকারকে প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অটল থেকে সঠিক নীতিরই পরিচয় দিয়েছেন। তবে মূল ও ভারী শিল্পপ্রকল্পগুলোয় অপচয় যাতে বন্ধ হয় ও তাদের উৎপাদনীশক্তি যথাযথভাবে কাজে লাগানো যায়, সেদিকে সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

আমাদের দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার দুর্বলতা ও মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অভাবের জন্য, অর্থাৎ সুসংগঠিত মূলধনের বাজারের অভাবে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ম্যানেজিং এজেন্টরা মূলধন সরবরাহ করে প্রথম যুগে ভারতবর্ষে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হয়েছে, দেশের শিল্প প্রসারে তাদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই প্রথার মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রে যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক একচেটিয়া অধিকার তাতে দেশের শিল্পসম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি যথার্থই বলেছেন, এই প্রথার আগাগোড়া পচে গেছে"... the system is ratten, root and branch, leaf and bark and blossom।" কিন্তু মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থগুলো যতক্ষণ না পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠেছে, ততক্ষণ এই প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করা সম্ভবপর নয়। সরকার সেইজন্য ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠনেই সমধিক উদ্যোগী।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের পর রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে এবং গ্রামীণ অঞ্চলে কুটির শিল্পে মূলধন সরবরাহের দিক থেকে সুফলপ্রসূ হয়েছে। এই সংস্থার কর্মপরিধি আরও বিস্তৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো মজুতদারি ফাটকাবাজি প্রভৃতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপে যাতে দাদন না দেয় এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে মূলধন সরবরাহে উৎসাহী হয়, তার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওপর কতকগুলো অধিকার ও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। মূলধন গঠনে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোকে যাতে পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যবহার করা যায়, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি তাদের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। ১৯৬৪ সালের এক আইন অনুযায়ী সম্প্রতি একটি শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (Industrial Bank) গঠিত হয়েছে, নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধন সরবরাহই এই ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য। সম্প্রতি কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কৃষি-উন্নয়নে মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এগ্রিকালচারল ফিন্যান্স কর্পোরেশন গঠনে উদ্যোগী হয়েছে।

মূলধন সরবরাহে ব্যাঙ্কের ভূমিকা

ভারতের বিত্তবান শ্রেণী অনুৎপাদক সঞ্চয়ে যত উৎসাহী, মূলধন বিনিয়োগে তত নয়। ফাটকাবাজি, মজুতদারি প্রভৃতির পংকিল স্রোতে মুদ্রাস্ফীতি ও কর ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি ও শৈথিল্যের সুযোগে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার প্রভৃতি শ্রেণীর হাতে কর ফাঁকি দেওয়া কালো টাকা বিপুল পরিমাণ জমেছে তা উদ্ধার করা প্রয়োজন। এই কালো টাকার সঞ্চয় জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক একটি অশুভ শক্তি। ভারতবর্ষে প্রায় ১,৮৫০ কোটি টাকার মত স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যক্তিগত অনুৎপাদক সঞ্চয়ে আবদ্ধ। এর একটি অংশকে মূলধন গঠনে নিয়োজিত করতে হবে। সরকার যে স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁকে যথাযথ ভাবে কার্যকারী করা যায়নি এবং তাকে শিথিল করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সরকারের একটি দৃঢ় নীতি ও সুষ্ঠু কর্মপদ্ধতিই গ্রহণ করা উচিত ছিল।

মূল্যবান ধাতু ইত্যাদির অনুৎপাদক সঞ্চয় সংগ্রহ

স্বাধীন ভারতে অনেকগুলো মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। ১৯৫৮ সালে ১০ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধন সহ ভারতীয় শিল্প মূলধন সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Industrial Finance Corporation) স্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্য মূলধন সরবরাহ সংস্থা (State Financial Corporation) গঠনও রাজ্যগুলোর শিল্পোন্নয়নের দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৫৪ সালে

জাতীয় শিল্পোন্নয়ন সংস্থা লিমিটেড (National Industrial Development Corporation Ltd.) স্থাপিত হয়েছে, এর অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। যে সব শিল্পে ব্যক্তিগত মূলধন বিশেষ নিয়োজিত হয়নি, অথচ জাতীয় পরিকল্পনার সাফল্যে যাদের গড়ে ওঠা প্রয়োজন, তাদের আর্থিক সাহায্যদানে, নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠায় এবং বস্ত্র ও পাটশিল্পের আধুনিকীকরণে এই প্রতিষ্ঠান একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত মাঝারি শিল্পগুলো ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাবার পর ঋণ-কালের শেষে তাদের পুনরায় ঋণদানের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালে রিফিনান্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়, অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা। যন্ত্রপাতি, ক্রয়, বিক্রয় সংগঠনের উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে ঋণ পেতে পারে তার জন্য সরকার ১৯৫৫ সালে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা (National Small Industries Corporation) স্থাপন করেছেন। বিদেশী সরকারি ও বেসরকারি পুঁজিপতিরা যাতে ভারতীয় শিল্পকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন, তার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী দেশী ও বিদেশী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত অর্থে ভারতীয় শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ সংস্থা (Industrial Credit and Investment Corporation of India) গঠিত হয়েছে, এই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীকে ভারত সরকার ঋণ দিয়ে সাহায্য করেছেন। মূলধন গঠনে ভারত সরকারের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হল ইউনিট ট্রাষ্ট গঠন। এই সংস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয়কে শিল্পপ্রসারে নিয়োজিত করা সম্ভব হবে।

বিভিন্ন পুঁজিবিনিয়োগ কারী প্রতিষ্ঠান.

বৈদেশিক মূলধন অনুন্নত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তির শোষণের মাধ্যমে মুনাফা সংগ্রহে নিয়োজিত হলেও তা শিল্পায়নকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করে থাকে। আমেরিকা উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ থেকে মূলধন সংগ্রহ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বিদেশী, বিশেষত ব্রিটিশ মূলধন ভারতের কৃষি ও কুটির শিল্পকে ধ্বংস করে তার গুরুতর ক্ষতিসাধন করলেও এদেশে শিল্পপ্রসারের প্রাথমিক পটভূমি রচনায় তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে রেলপরিবহন, আধুনিক যন্ত্রশিল্প, ব্যাঙ্কিং, চা, রবার, কফি প্রভৃতি বাগিচাশিল্প, পাটশিল্প, জাহাজ পরিবহন, বীমাব্যবসায়, খনিশিল্প প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগ। ব্রিটিশ মূলধন আধুনিক

ভারতের শিল্পপ্রতিষ্ঠায় বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা

উৎপাদনপদ্ধতি. যান্ত্রিক জ্ঞান ও কুশলতা, ব্যবসায় পরিচালনা ও যান্ত্রিক যুগের উপযোগী ভাবগত আবহ প্রবর্তন করে ভারতের শিল্পোন্নয়নের পথ প্রদর্শন করেছে।

বিদেশী মূলধনকে কয়েকটি প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়, প্রত্যক্ষ অর্থাৎ পরিচালনার কর্তৃত্বভার সংবলিত, পোর্টফলিও অর্থাৎ কর্তৃত্বক্ষমতাবিহীন, ঋণ, বিনিয়োগ (Investments) এবং সাহায্য (Grants বা Aids)। এই সমস্ত শ্রেণীর মূলধনই ভারতবর্ষে নিয়োজিত হয়েছে। ১৯১৪ সালে ভারতবর্ষে নিয়োজিত ব্রিটিশ মূলধনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ কোটি পাউণ্ড, ১৯৩৩ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১০০ কোটি পাউণ্ডে। ১৯৫৮ সালে বিদেশী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৫৭০.৬৪ কোটি টাকায়, তার মধ্যে ব্রিটেনের অংশ ছিল ৩৯৮.০৩ কোটি টাকা, আমেরিকার ৫৯.৮৫ কোটি টাকা। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭৩৫.৫০ কোটি টাকা, তার মধ্যে বেসরকারি লগ্নীর পরিমাণ ছিল ৬২৫.৫০ কোটি টাকা। পেট্রোলিয়াম এবং যন্ত্রশিল্পেই বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক।

বিভিন্ন ধরনের বৈদেশিক মূলধন ও তার পরিমাণ

বৈদেশিক মূলধন জাতির রাজনৈতিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের পক্ষে অনেক সময় অশুভশক্তি হিসাবে দেখা দিলেও ভারতবর্ষের মত দারিদ্র, অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠনে তার উপযোগিতা অবশ্য স্বীকার্য। একেই ত আমাদের দেশের জাতীয় সঞ্চয় বা উদ্বৃত্তের পরিমাণ নিতান্ত স্বল্প, তার ওপর তার সামান্য, অকিঞ্চিৎকর অংশই শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়। ভারতে অনুৎপাদক ব্যয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। তাই এদেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় বৈদেশিক মূলধনের এত গুরুত্ব। শিল্পোন্নয়নের প্রথমপর্বে মূল ও ভারি যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য প্রভূত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যাকে কঠিন করে তুলছে, এই পরিস্থিতিতে বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থানে বৈদেশিক মূলধনের উপকারিতা দিবালোকের মতই স্পষ্ট। বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতিকেও অনেকটা পরিমাণে নিবারণ করা সম্ভব। এই সমস্ত উপযোগিতার ভিত্তিতে ভারত সরকারের ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে বিদেশী মূলধন সম্পর্কে নিম্নলিখিত নীতিগুলো নির্দেশিত হয়: এক, ভারতে বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ জাতীয় স্বার্থের মানদণ্ডেই নিয়ন্ত্রিত হবে এবং কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া বৈদেশিক মূলধনবাহিত শিল্পগুলোর মালিকানা ও পরিচালনাভার ভারতীয়দের হাতেই ন্যস্ত থাকবে এবং বিদেশী

বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি

বিশেষজ্ঞদের স্থান যাতে ভারতীয়রা নিতে পারে তার জন্য তাদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ; দুই, দেশের সাধারণ শিল্পনীতির ক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনও পার্থক্যের সীমারেখা টানা হবে না ; তিন, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গতি অনুযায়ী বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের মূলধন ও মুনাফা বাইরে নিয়ে যাবার ন্যায়সঙ্গত সুযোগ দান করা হবে এবং চার, বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের সময় ন্যায্য হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কিন্তু এ সমস্ত সুবিধা দানের নীতি ও সংকল্প ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও দেশে প্রত্যাশিত হারে বৈদেশিক মূলধন আসেনি।

আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সঙ্গতির মতই পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা মূল্যবান। ১৯৫১ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬৫ সালের মার্চ পর্যন্ত তিনটি পরিকল্পনাকালে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ হল, আমেরিকা থেকে প্রাপ্ত ২১৩৮·৩ কোটি টাকা, বিশ্বব্যাঙ্ক ৩৫৮·৭ কোটি টাকা, পশ্চিম জার্মানী ৩৩৩·৪ কোটি টাকা, ব্রিটেন ২৫০·১ কোটি টাকা, রাশিয়া ২৪৫·৩ কোটি টাকা। ভারতের বৈদেশিক সাহায্যের প্রধান উৎস হল ভারত সাহায্য সংস্থার অন্তর্ভূক্ত পশ্চিমী দেশগুলো (Consortium countries), আমেরিকা যার প্রধান অংশীদার। বৈদেশিক সাহায্যের ফলেই দুর্গাপুর, রাউরকেলা ও ভিলাইয়ে তিনটি ইস্পাত কারখানা, রাঁচীতে হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা স্থাপিত হতে পেরেছে এবং বোকারোয় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন চতুর্থ ইস্পাতকারখানা নির্মাণের উদ্যোগ আয়োজন চলেছে। এই বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে কিছু অংশ সাহায্য (Grants), অবশিষ্ট অংশ ঋণ হিসাবে পাওয়া গিয়েছে।

বৈদেশিক সাহায্য

কিন্তু বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য ব্যবহারের এবং লাভের সাম্প্রতিককালের অভিজ্ঞতা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। বৈদেশিক ঋণ ও অর্থসাহায্যের সমগ্র পরিমাণের মধ্যে ১৯৬৭ সালের ১লা এপ্রিল পর্যন্ত ১,২৬৯·৫৬ কোটি টাকা ব্যবহৃত হয়নি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ভারত আমেরিকার পি. এল ৪৮০ চুক্তি বাবদ সাহায্য বাদ দিয়ে বৈদেশিক সাহায্যের যথাক্রমে শতকরা ৫২ এবং ৬৪ ভাগ ব্যবহারে সক্ষম হয়েছে। একদিকে আমাদের সুদ ও ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব ক্রমবর্ধমান, অন্যদিকে সেই ঋণের একটা অংশ অব্যবহৃত রয়েছে। ১৯৬৭ সালের ৩১শে মার্চ ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৪,৭৯৭ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৩,০৩৩ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ্য। ভারতীয় মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পর

আমদানিকে সুবিধা দানের জন্য ১৯৬৬-৬৭ সালে প্রকল্পবহির্ভূত কাজে ৬৭৫ কোটি টাকা অর্থসাহায্য করা হয়। ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্য খাদ্য সাহায্য ও প্রকল্পবহির্ভূত কাজে ৯৭৫ কোটি টাকার সাহায্য দানের কথা ঘোষিত হয়েছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারত প্রকল্প সাহায্য সমেত মোট ১,২৩৪ কোটি টাকা লাভ করে, এর ভেতর মাত্র ৬০৩ কোটি টাকা এ পর্যন্ত কাজে লাগানো হয়েছে। আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ ও বৈদেশিক সাহায্য লাভের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিক থেকে এই শৈথিল্য সত্যি অত্যন্ত ক্ষতিকর। সম্প্রতি লোকসভার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি সংগৃহীত ঋণ দ্রুত এবং যথাযথভাবে ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার

তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রথম ভাগে এবং চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম পর্বে বৈদেশিক সাহায্য লাভের সম্ভাবনা যে কত অনিশ্চিত এবং তার ওপর মাত্রাধিক নির্ভরতা যে আমাদের জাতীয় স্বার্থ ও আত্মমর্যাদাবোধের পক্ষে বিপজ্জনক, আমাদের সেই নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মুদ্রামূল্য হ্রাসের পূর্ববর্তী হিসাবানুযায়ী ৪ হাজার কোটি টাকার মত বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে, এই হিসাবের ভিত্তিতেই চতুর্থ পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনার এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে কোনও সুনিশ্চিত আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি মেলেনি। প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে রাশিয়ার অংশ হল ১০০ কোটি রুবল, হাঙ্গেরীর ২৫ কোটি টাকা যুগোশ্লাভিয়ার ৬০ কোটি টাকা, সুইজারল্যাণ্ডের ৭ কোটি ফ্রাঁ, ডেনমার্কের ৩ কোটি ক্রোমার ও সুইডেনের ২ কোটি ৪০ লক্ষ সুইডিশ ক্রোমার। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি, ভারত সাহায্য সংস্থার অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমী দেশগুলোই ভারতের বৈদেশিক সাহায্যের প্রধান উৎস, কিন্তু সাম্প্রতিককালে সাহায্যদানে তাদের কঠোর মনোভাবই লক্ষণীয়। বিশ্বব্যাঙ্কের একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা যায়, শিল্পোন্নত দেশগুলোর বৈষয়িক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেলেও তাদের বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ গত পাঁচ বছরে বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি। এদিকে প্রতিটি পরিকল্পনায় আমাদের বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, প্রথম পরিকল্পনায় তার পরিমাণ ছিল ১৯৬ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৯২৭ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় ২,৬৫০ কোটি টাকা।

সাম্প্রতিক কালে বৈদেশিক সাহায্য লাভের পরিমাণ হ্রাস

মূলধন গঠন সমস্যার সমস্ত দিক পর্যালোচনার পর আমাদের একথাই স্বীকার করতে হয় যে দেশের আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি থেকে মূলধন গঠনের প্রচেষ্টাই

সর্বোত্তম। আত্মনির্ভরতার পথ ক্ষুরধার, কিন্তু বৈদেশিক সাহায্যের সহজ পথে চলতে গিয়ে আমরা সর্বনাশকেই বরণ করব, প্রতিপদে বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থের ফাঁস আমাদের জড়িয়ে ধরতে থাকবে।

উপসংহার

যে পরমতসহিষ্ণুতা, ঔদার্য ও অনুন্নত দেশগুলোকে সাহায্য দানের মনোভাব কেনেডি ও ক্রুশ্চেভের আমলে ছিল, বিশ্বরাজনীতি থেকে তা বিদায় নিয়েছে। পরিকল্পনাকে আমাদের সাধ্যের সীমায় আবদ্ধ রাখতে হবে, পরিকল্পনা সংক্রান্ত কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের কর্মসূচীগুলোর সুষ্ঠু রূপায়ণের মাধ্যমে যাতে মূলধন গঠনের উপযোগী সঙ্গতি সৃজিত হতে পারে, তার জন্য দৃঢ় বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে।

ভারতের সম্পদ ও তার ব্যবহার

এই প্রবন্ধের অনুকরণে
- ভারতের প্রকৃতিপ্রদত্ত উপকরণের সদ্ব্যবহার
- ভারতের কৃষি ও খনিজ সম্পদ

আদিমকালের মানুষ প্রকৃতির অপরিমেয় ঐশ্বর্যভাণ্ডারের চাবিকাঠিটির সন্ধান পায়নি, প্রকৃতি তার কাছে ছিল দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় শক্তি, অন্যান্য প্রাণীর মত সেও তার ওপর ছিল একান্তভাবে নির্ভরশীল। তারপর মানুষ যতই বুদ্ধিবলে প্রকৃতিপ্রদত্ত উপকরণকে তার জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পেরেছে, ততই তার জীবনযাত্রা সুগম এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচিত্র বিস্ময়কর বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। আধুনিক কালে বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার শক্তি প্রকৃতিপ্রদত্ত উপকরণগুলোকে যেভাবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছে, আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের সেই দানবের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপও তার কাছে নিতান্ত ম্লান ও তুচ্ছ।

প্রারম্ভ

ভারতবর্ষে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য অপরিসীম। প্রকৃতি অকৃপণ হাতেই কৃষি সম্পদ, বনজ ও খনিজসম্পদ, নদনদীর জলসম্ভার, উর্বর মৃত্তিকা প্রভৃতি অজস্র সম্পদ কুবেরের ঐশ্বর্যভাণ্ডারের মতই এখানে সঞ্চয় করে রেখেছে। যুগে যুগে পররাজ্যলোলুপ দস্যুর দল লক্ষ্মীর প্রসাদধন্য এই দেশের ঐশ্বর্য লুণ্ঠনের জন্য উপস্থিত হয়ে তাদের হিংস্রনখরে তাকে ক্ষতবিক্ষতকরেছে। বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ের-এর সাক্ষ্যে দেখি, ক্রমাগত শোষণে লুণ্ঠনে ধনধান্যেপুষ্পেভরা ভারতের রিক্ত হওয়ার দুর্ভাগ্যের ইতিহাসের সূত্রপাত ঘটে মোগল যুগে। তারপর ব্রিটেন থেকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এদেশে পদার্পণ করল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হল। ইংরেজ যে ভাবে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্যকে শোষণ ও লুণ্ঠন করেছে, তা চিরদিন আমাদের জাতীয়-জীবনের ইতিহাসের একটি বেদনাদায়ক, গ্লানিময় কলঙ্কিত অধ্যায়রূপে গণ্য হবে। শুধু ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবই নয়, ভারতের মত বিরাট উপনিবেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের যথেচ্ছ সুযোগ সুবিধাও এই ক্ষুদ্র দেশটিকে অপরিমিত ঐশ্বর্য ও শক্তি এনে দিয়েছে। সেই উপনিবেশিক স্বার্থশক্তির নির্লজ্জ ও নির্মম শোষণের তথা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের

বিদেশী শোষণের ইতিহাস

অপব্যবহারের অভিশাপের বোঝা স্বাধীনোত্তর যুগেও আমাদের বহন করতে হচ্ছে।

বিগত পনের বছর ধরেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোর মাধ্যমে ভারতবর্ষ জাতীয় উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসমাজের শক্তি নিয়োগে প্রয়াসী। ভারতের সম্পদকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ; মৃত্তিকা ও কৃষিসম্পদ, খনিজসম্পদ, জল ও শক্তিসম্পদ, বনজসম্পদ, প্রাণিসম্পদ ও জনশক্তি। কৃষি উৎপাদনের মৌলিক উপকরণ ভূমির পরিমাণ ও প্রকৃতি প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বৃষ্টিপাতের ও নদনদীর উৎপত্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় পার্বত্যভূমি, কৃষিকার্য, শিল্পপ্রসার ও পরিবহনের উপযোগী সমভূমি, এই দুই দিক দিয়েই ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ ; একদিকে তার উত্তরপ্রান্তের হিমালয় অসংখ্য নদনদীর উৎস ও প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণ, অন্যদিকে দৈর্ঘ্যে ১৫০০ মাইল ও প্রস্থে ১০০ থেকে ২০০ মাইল বিস্তৃত সিন্ধু গাঙ্গেয় সমভূমি কৃষি ও খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ। এই দেশে যেমন স্বাভাবিক ও অধিক পরিমাণে উর্বর, ইক্ষু, ধান, তামাক প্রভৃতি বহুবিধ শস্য উৎপাদনের উপযোগী পলিমৃত্তিকা আছে (Alluvial Soil), তেমনি তুলা, গম, ছোলা উৎপাদনের উপযোগী কৃষ্ণমৃত্তিকারও (Black Soil) অভাব নেই। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মৃত্তিকা-সম্পর্কিত গবেষণাগার ও একটি কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষণ বোর্ড স্থাপিত হয়েছে। বহু ধরনের জলবায়ু ও ভূমির সুবিধার জন্য ভারতবর্ষে প্রায় সকলপ্রকার কৃষিপণ্যই উৎপন্ন হয়ে থাকে, তার জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধাংশের উৎস কৃষি এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ প্রত্যক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। দেশের কর্ষিত ভূমির শতকরা ৮০ ভাগ অংশে ধান্য, গম, ইক্ষু, জোয়ার, বাজরা, যব, ভুট্টা, নানা শাকশব্জী ও ডাল প্রভৃতি খাদ্যশস্য এবং শতকরা ২০ ভাগ জমিতে এবং অবশিষ্ট ২০ শতাংশ ভূমিতে তুলা, পাট, তৈলবীজ, চা, কফি, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। খাদ্যশস্য এবং শিল্পের জন্য কাঁচামাল দুদিক থেকেই কৃষির উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষভাগে এবং চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে খাদ্যশস্যের তীব্র সংকট ও তজ্জনিত পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস, বৈদেশিক বিনিময় ঘাটতি, এক কথায় সমগ্র দেশে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, কৃষি উৎপাদনের শোচনীয় ব্যর্থতা তার অন্যতম কারণ। আমরা আমাদের মৃত্তিকা ও কৃষিসম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারে এখনও অধিক দূর অগ্রসর হতে পারিনি, এই বিষয়ে একটি সর্বাত্মক জাতীয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

মৃত্তিকা ও কৃষিসম্পদ

ভারতের খনিজসম্পদকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : ধাতব খনিজ, অধাতব খনিজ ও জ্বালানি খনিজ। লৌহ, ম্যাঙ্গনীজ, বকসাইট, তাম্র, স্বর্ণ, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ধাতবখনিজ শ্রেণীভুক্ত। শিল্পায়নে লৌহের গুরুত্ব অপরিসীম, বর্তমান যুগের সভ্যতার ভিত্তিই হল লৌহ ও ইস্পাত। সমগ্র পৃথিবীর লৌহ-আকরিক (Iron Ore) উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান নবম। ভারতবর্ষের বেশিরভাগ লৌহ-আকরিক বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র ও মহীশূরে পাওয়া যায়। পৃথিবীর খনিজ লৌহপিণ্ডের মজুতের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভারতে সঞ্চিত রয়েছে। দামোদর উপত্যকা-অঞ্চলে, সালেম, মহীশূর, রত্নগিরি, কুমায়ুন প্রভৃতি স্থানে মাঝারি ও নিম্নশ্রেণীর লৌহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোয় শিল্পপ্রসারের জন্য মূল ও ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, সেইজন্যই ভারত সরকার লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচীকে গ্রহণ করেছেন। ভারতের তিনটি পুরাতন ইস্পাত কারখানা জামসেদপুর, বার্ণপুর ও মহীশূরে অবস্থিত। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দুর্গাপুর, রাউরকেলা ও ভিলাইয়ে তিনটি ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়েছে, চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বোকারোয় চতুর্থ ইস্পাত কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে তিনটি সরকারি কারখানার সম্প্রসারণ ও বোকারোয় চতুর্থ ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ হবে প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় লৌহ-আকরিকের উৎপাদন লক্ষ্য ছিল ৩ কোটি টন। সমগ্র বিশ্বে ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে ভারতের স্থান তৃতীয়, ইস্পাত তৈরি করতে খাদ হিসেবে এই ধাতুর প্রয়োজন হয়। ভারতের মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, উড়িষ্যা ও সিংভূম জেলায় প্রায় দেড়কোটি থেকে দু কোটি টন ম্যাঙ্গানীজ সঞ্চিত আছে। পূর্বে উত্তোলিত ম্যাঙ্গানিজের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হত, বর্তমানে শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তার আভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। অতীতে তামাশিল্পে ভারতের খ্যাতি ছিল। বৈদ্যুতিক তার ও যন্ত্রপাতি, বাসনপত্র, জাহাজের আবরণ, রং প্রভৃতি তৈরি করতে তামার প্রয়োজন হয় এবং তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ, দস্তা মিশিয়ে পেতল ও স্বর্ণের মিশ্রণে গিনিসোনা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। ভারতের সিংভূম, গারওয়াল, আলমোড়া ও মাদ্রাজে তামা পাওয়া যায়, এ দেশের খনিজ তামার উৎপাদন ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার মেট্রিক টন, কিন্তু ধাতব তামা মাত্র ৮,০০০ মেট্রিক টন পাওয়া যায়। তৃতীয় পরিকল্পনায় ধাতব তামার উৎপাদন লক্ষ্য ছিল ২০ লক্ষ

খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ ও ধাতব খনিজ

টন। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষভাগে তামার চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ১৮০,০০০ টনে। তামার জন্য ভারত বিদেশের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বকসাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হয়। আধুনিক যুগে বিমান, মোটরগাড়ী, জাহাজ, রেলগাড়ির কামরা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, গৃহস্থালীর বাসনপত্র প্রভৃতি বহুবিধ বস্তু নির্মাণে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশে বকসাইট পাওয়া যায়। ভারতে সঞ্চিত বকসাইটের পরিমাণ প্রায় ২ কোটি ৫৭ লক্ষ মেট্রিক টন হলেও বর্তমানে প্রতিবৎসর মাত্র ৯১ হাজার মেট্রিক টন সংগৃহীত হয়। জলবিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে বকসাইটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৮০,০০০ মেট্রিক টন, চতুর্থপরিকল্পনায় তার উৎপাদনের লক্ষ্য ৩৩০,০০০ টন। ভারতে স্বর্ণের উৎপাদনের পরিমাণ স্বল্প, এদেশে উৎপন্ন স্বর্ণের শতকরা ৯৫ ভাগই মহীশূরের কোলার খনি থেকে উত্তোলিত হয়, হায়দ্রাবাদের হাণ্টি নামক খনি এবং সুবর্ণরেখা ও অন্যান্য নদীর বালি থেকেও স্বর্ণ সংগৃহীত হয়ে থাকে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোয় অস্ত্র ছাড়াও নানা কাজে পারমানবিক শক্তির প্রয়োগ ক্রমবর্ধমান, তার জন্য ইউরেনিয়ামের প্রয়োজন। ভারতবর্ষেও পারমাণবিক শক্তির গবেষণা চলছে। ত্রিবাংকুর, কোচিন প্রভৃতি অঞ্চলে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়।

অধাতব খনিজ পদার্থের মধ্যে প্রধান হল লবণ, জিপসাম বা গন্ধক, অভ্র, চীনামাটি, চুনাপাথর ইত্যাদি। অধাতব খনিজ উৎপাদনে ভারতের স্থান উন্নত দেশগুলোর সারিতে। লবণ কস্টিক সোডা ইত্যাদি উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপকরণ। পাঞ্জাবের কোহাট খনি থেকে সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায়, রাজপুতানার লবণাক্ত হ্রদের জল থেকে এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ উপকূলে সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়েও লবণ পাওয়া যায়। লবণ উৎপাদনে ভারতবর্ষ বর্তমানে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, এখানে লবণের উৎপাদন ৩০ লক্ষ টনেরও বেশি। জিপসামে গন্ধক পাওয়া যায়। সাল্‌ফিউরিক্ অ্যাসিড প্রস্তুতিতে এবং সিমেণ্ট ও রাসায়নিক সার উৎপাদনে গন্ধক ব্যবহৃত হয়। সিন্ত্রী এবং অন্যান্য স্থানে রাসায়নিক সারের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভারতে জিপসামের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাঞ্জাব ও রাজপুতানায় জিপসাম পাওয়া যায়। চুণ, সিমেণ্ট, সোডা, কস্টিক সোডা প্রভৃতি উৎপাদনের ও বাড়িঘর নির্মাণের উপকরণ চুণাপাথর, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে চুণাপাথরের সঞ্চয় আছে। বাষ্পচালিত ইঞ্জিন, মোটরযান, বৈদ্যুতিক

অধাতব খনিজ

শিল্প, বেতারযন্ত্র প্রভৃতিতে অভ্রের প্রয়োজন হয়। অভ্রের উৎপাদনে ভারত সমগ্র বিশ্বে প্রথম স্থানের অধিকারী, পৃথিবীর মোট অভ্রের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই এখানে পাওয়া যায়। বিহারের হাজারীবাগ, গয়া, মুঙ্গের, গিরিডি প্রভৃতি স্থান অভ্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র, সমগ্র ভারতের উৎপন্ন অভ্রের ৯০ শতাংশই এ সমস্ত অঞ্চলে পাওয়া যায়; মাদ্রাজের নেলোর জেলায় ও রাজপুতানায়ও অভ্র উৎপন্ন হয়।

জ্বালানি খনিজের অন্যতম অংশ কয়লায় ভারতবর্ষ বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ। পৃথিবীর শক্তিসম্পদের অন্যতম প্রধান উৎস হল কয়লা। বাষ্পচালিত বিভিন্ন যন্ত্রে কয়লা ব্যবহৃত হয়, কয়লা থেকে নানা উপজাত দ্রব্য, যেমন রান্না ও রাস্তাঘাট আলোকিত করার গ্যাস, আলকাতরা, পিচ, শতাধিক রাসায়নিক দ্রব্য, নির্মাণের উপকরণ অ্যামোনিয়ক্যাল লিকর, ন্যাপথালিন, ঔষধ প্রস্তুতির পক্ষে প্রয়োজনীয় ক্রিয়োসোট, রং, বিস্ফোরক সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ কয়লা উৎপাদনে পৃথিবীতে সপ্তম স্থানের অধিকারী, পৃথিবীর মোট কয়লা উৎপাদনের শতকরা তিন ভাগই এখানে উৎপন্ন হয়। ভারতে দুশ্রেণীর কয়লা খনি আছে, গণ্ডোয়ানা ও টার্শিয়ারী।

জ্বালানি খনিজ

বিহারের ঝরিয়া, গিরিডি, কারাণপুরা, বোকারো, রামগড় ডাল্টনগঞ্জ, পশ্চিম বাঙলার রাণীগঞ্জ প্রভৃতি গণ্ডোয়ানা কয়লা অঞ্চলভুক্ত স্থানে শতকরা ৯৮ ভাগ কয়লা উত্তোলিত হয়, অবশিষ্ট ২ ভাগ পাওয়া যায় আসামের নাজিরা ও মাকুম, রাজস্থানের পালনা, কাশ্মীরের রিয়াসী প্রভৃতি স্থানের টার্শিয়ারী কয়লা খনিসমূহে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ৬৮ মিলিয়ন টন। মাদ্রাজের দক্ষিণ আর্কটের নেভেলীতে সম্প্রতি নতুন লিগনাইট কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতবর্ষে বিটুমিনাস্ শ্রেণীর কয়লার পরিমাণ স্বল্প বলে তার উত্তোলনকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। ব্যয়ের দিক থেকে সুবিধাজনক পরিবহন ব্যবস্থার অভাব, দক্ষিণ ভারতে কয়লার অভাব, কয়লাখনিগুলোর আধুনিকীকরণের মন্থর গতি প্রভৃতি আমাদের কয়লাশিল্পের প্রতিবন্ধক। অবশ্য সম্প্রতি এদিকে সরকারের দৃষ্টি পড়েছে। আধুনিক যুগে খনিজ তৈল আধুনিক সভ্যতার একটি অপরিহার্য উপাদান। খনি থেকে লব্ধ অপরিশ্রুত তৈল শোধন করে গ্যাসোলিন বা পেট্রোল, গ্যাস, কেরোসিন, ন্যাপথা, এ্যাসফাল্ট বা পিচ, প্যারাফিন বা মোম প্রভৃতি পাওয়া যায়। মোটর গাড়ী, জাহাজ, বিমান ও বিভিন্ন শিল্পে পেট্রোল ব্যবহৃত হয়। অতীতে মানুষ স্বর্গের সন্ধানে ব্যাকুলভাবে দুর্গম গিরি কান্তার মরুতে ছুটে গিয়েছে, আর আধুনিক

যুগে সেই অভিযান চলে পেট্রোলের সন্ধানে। পৃথিবীর মোট খনিজ তৈল উৎপাদনের পরিমাণ ১২১ কোটি টন, আর ভারতের উৎপাদন মাত্র ৪.৪ টন। আসামের ডিগবয়ই ভারতের প্রধান তৈল উৎপাদন কেন্দ্র, সম্প্রতি এই তৈল শহরের নিকটে নাহারকাটিয়া ও শিবসাগর মহকুমায় রুদ্রসাগরে নতুন খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতবর্ষে চাহিদার তুলনায় পেট্রোলের পরিমাণ অত্যন্ত কম। তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের (Oil and Natural Gas Commission) ব্যবস্থাপনায় বিদেশীদের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে তৈলখনি আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে। গুজরাটের ক্যাম্বে অঞ্চলে, অ্যাঙ্কলেশ্বর ও কালোলে তৈলখনি আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারত সরকার খনিজ তৈলের উন্নয়ন ও বণ্টনের জন্য কয়েকটি তৈল শোধনাগার (বারাউনি, নুনমাটি, কয়ালি ও কোচিনে) এবং ইণ্ডিয়ান অয়েল কোম্পানী স্থাপন করেছেন। ভারতের গুড় থেকে সুরাসার (Alcohol) প্রস্তুত হচ্ছে, সুরাসারের সঙ্গে পেট্রোল মিশ্রিত করে মোটর গাড়ীতে ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু ভারতে এখনও সুরাসার শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার এখনও বিশেষ সম্প্রসারিত হয়নি. খনিজ তৈলের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরতা হ্রাসের প্রয়োজনে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

ভারতে জলশক্তির বিকাশের সম্ভাবনা প্রভূত। পৃথিবীর খনিজ তৈল ও কয়লার পরিমাণ সীমিত ও ক্ষয়িষ্ণু, উৎপাদনে তাই বিভিন্ন দেশ আগ্রহী। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় সমস্ত উপযোগী অবস্থাই ভারতবর্ষে বিদ্যমান। দেশের জলশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার হলে শিল্পায়নে ব্যাপক অগ্রগতি নিশ্চিত হবে। ভারতে প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ কিলোওয়াট জলশক্তি লাভের সম্ভাবনা আছে. ১৯৬৫ সালের প্রথম ভাগে তার উৎপাদনের পরিমাণ ৬৩ লক্ষ কিলোওয়াট। মহীশূরের কাবেরী নদীর ওপর শিবসমুদ্রম, কাশ্মীরে ঝিলামের ওপর শ্রীনগর, হায়দ্রাবাদে তুঙ্গভদ্রা, মাদ্রাজের পাইকারা নদীর ওপর ময়ার, মেতু, পাপনাশম, বোম্বাই-এর নিকটবর্তী কল্যাণ, কেরালার পল্লীভাসাল ও সেঙ্গুলাম এবং দামোদর, হীরাকুঁদ, ভাকরা-নাঙ্গাল, কুশী প্রভৃতি বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলো থেকে যে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে, তা শিল্পপ্রসারে সহায়ক হয়েছে। বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে শক্তি সরবরাহ, সেচ, মৃত্তিকাসংরক্ষণ, মৎস্য চাষ প্রভৃতি বহু ক্ষেত্রে জলশক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

জলশক্তি

অরণ্য পৃথিবীর যে কোনও দেশেরই একটি প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষে বনভূমির পরিমাণ হল ২ লক্ষ ৭৪

হাজার বর্গ মাইল, অর্থাৎ সমগ্র ভূমির ২১.৮ শতাংশ। ভারতের বনভূমির সংস্থান শতকরা ২৫ ভাগ মধ্যপ্রদেশে, ১৩ ভাগ আসামে, ১১ ভাল গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে। ভারতের বনভূমি বৃষ্টিপাতের সহায়ক, এ সম্বন্ধে যথার্থই বলা হয়েছে, 'পরোক্ষ ভাবে ইহা ভারতের প্রাকৃতিক সেচ-ব্যবস্থার অঙ্গস্বরূপ'; অরণ্য ভূমিক্ষয় নিরোধ করে তার উর্বরাশক্তিকে রক্ষা করে থাকে। অরণ্য বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামালের উৎস। ভারতের অরণ্যাঞ্চলের কাঠ রেল পথের পাটাতন, দিয়াশালাই, চায়ের বাক্স, জলযান, গৃহ, আসবাবপত্র, খেলার দ্রব্যসামগ্রী, কাগজ শিল্পের প্রয়োজনীয় কাষ্ঠমণ্ড প্রভৃতি নির্মাণ ও উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া অরণ্য থেকে বার্নিশ, মুদ্রণ ও গ্রামোফন রেকর্ড প্রভৃতি প্রস্তুতির উপকরণ লাক্ষা, কাচ ও কাগজশিল্পে, সাবান, ঔষধ ও বার্নিশ প্রস্তুতির উপাদান তার্পিন তৈল, চামড়াশিল্প, ঔষধ ও রঞ্জনদ্রব্য প্রস্তুতিতে প্রয়োজনীয় হরীতকী, কুইনাইনের উপাদান সিঙ্কোনা প্রভৃতি পাওয়া যায়। অরণ্য সম্পদ থেকে ভারতের প্রায় ১০ লক্ষ লোকের জীবিকা নির্বাহ হয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, নগরাঞ্চলের প্রসার ও নগরীকরণ, ব্যবসায়ীদের যথেচ্ছভাবে জঙ্গল কর্তন প্রভৃতির ফলে ভারতবর্ষের অরণ্যাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারতবর্ষ বর্তমানে অরণ্যসম্পদ সংরক্ষণে ও উন্নয়নে উদ্যোগী। অরণ্যসম্পদ ব্যবহারের জন্য দেরাদুনে অরণ্য গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় অরণ্যসম্পদের উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই প্রসঙ্গে বনমহোৎসব কর্মসূচীও উল্লেখ করা যায়। ভারতবর্ষের প্রাণিসম্পদেরও সদ্ব্যবহার এপর্যন্ত হয়নি। গরু, মহিষ, গাধা, ছাগল, উট, ভেড়া প্রভৃতি অজস্র প্রাণী এদেশে আছে, কিন্তু উপযুক্ত পালন ও পরিচর্যার অভাবে তাদের বেশির ভাগই কাজে আসে না। দুগ্ধ, পশম, মাংস প্রভৃতির উৎপাদনে পশুসম্পদকে এতদিন যথাযথ ভাবে কার্জে লাগানো হয়নি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় পশুসম্পদ উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভারতবর্ষ অতি জনবহুল কিনা, এই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করেই আমরা বলতে পারি, এদেশের বিপুল জনশক্তিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে আজ পর্যন্ত সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গভাবে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়নি। সেটা যেদিন সম্ভব হবে, সেদিন এই জনশক্তিকে বোঝা বলে মনে হবে না, তা সম্পদরূপেই গণ্য হবে।

অরণ্য, পশু ও জন সম্পদ

প্রকৃতি সত্যি অকৃপণ হাতেই তার নানা সম্পদ ভারতকে দান করেছে, কিন্তু দীর্ঘকাল পরাধীনতার অভিশাপে আমরা তাদের সাহায্যে জীবনকে সুখী ও সচ্ছল

করে তুলতে পারিনি। প্রকৃতির বক্ষে সঞ্চিত সম্পদের শক্তি সুপ্ত থাকে, মানুষ তার পরিশ্রমে, অধ্যবসায়ে, সুপরিকল্পিত কর্মপ্রচেষ্টায় সেই শক্তিকে জাগ্রত করে, তখন তা মানবজীবনের কল্যাণপ্রদীপ হয়ে ওঠে, জীবনকে আলোকময় করে তোলে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে একদিন প্রকৃতিদত্ত উপকরণসমূহের সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার ঘটবে, মোচন হবে আমাদের জীবনের রিক্ততা ও দৈন্যের অভিশাপ, ভারত সত্যি সোনার দেশ হয়ে উঠবে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে .

ভারতের কৃষি

● ভারতবর্ষের কৃষি সমস্যা [ক. বি. '৬০]

● তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি [ব. বি. '৬২]

ভারতবর্ষের কৃষি উৎপাদনের শোচনীয় হারের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তার মৃত্তিকা সম্বন্ধে শিল্পীর সুজলা সুফলা এই বন্দনাকে যেন পরিহাস বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এদেশের মৃত্তিকা সত্যি স্বর্ণপ্রসূ ; দীর্ঘদিনের অবহেলায় অনাদরে তার উৎপাদিকাশক্তি যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারেনি বলে আমরা তার থেকে নিজেদের ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করতে পাচ্ছি না বিদেশের কাছে ভিক্ষার প্রার্থনায় অঙ্গুলিবদ্ধ হাত নিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে।

প্রারম্ভ

সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক অথচ এখানকার একর-প্রতি ও চাষী-প্রতি উৎপাদন অন্যান্য দেশের তুলনায় নিতান্ত স্বল্প. এটাই হল ভারতীয় কৃষির অনগ্রসরতার সব থেকে জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ. ১৯৪৮-৪৯ সালের ধানের একর প্রতি উৎপাদনের (পাউণ্ড) হিসাবে দেখা যায়, ব্রহ্মদেশের উৎপাদনের পরিমাণ ১২১৬, জাপানের ৩৩২১ এবং ভারতের ৬৯০ ; অষ্ট্রেলিয়ায় গমের উৎপাদনের পরিমাণ ৯০৯, যুক্তরাষ্ট্রের ১০৭৯, ভারতের ৫৮৫। শিল্পক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার জন্য দেশের প্রায় শতকরা সত্তর জন লোকের একমাত্র জীবিকা কৃষি, আমেরিকায় কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার হার হল ১৯%, অস্ট্রেলিয়ায় ১০%, নিউজিল্যাণ্ডে ২০% এবং পশ্চিম জার্মানীতে ২০ ভাগ। ভারতীয় কৃষিতে এই বিপুল জনসংখ্যার চাপও তার উৎপাদন স্বল্পতার কারণ। ভারতীয় কৃষির শোচনীয় অনগ্রসরতার দ্বিতীয় লক্ষণ হল, এটা এখনও নিছক জীবনধারণ মূলক চাষের (Subsistence framing) গণ্ডিতে আবদ্ধ, ভারতীয় চাষীরা নিজেদের খাদ্যসংস্থানের জন্য চাষ করে এবং মিশ্র চাষ, পশুপক্ষীপালন, মৎস্যচাষ প্রভৃতি জীবিকা খুব কম সংখ্যক চাষীরই আছে। তৃতীয়ত, এদেশের ব্যক্তি ও শ্রমকেন্দ্রিক কৃষি-উৎপাদন অত্যন্ত প্রাচীন, যুগজীর্ণ। চতুর্থত, জমিদার জোতদার প্রভৃতি পরশ্রমজীবি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর কৃষকসমাজের শোষণ, জমির মালিকানায় অসাম্য এবং অতীতকাল থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গ্রামীণ ভূমিব্যবস্থার ফলে জমির খণ্ডীকরণ ও বিচ্ছিন্নতা ভারতীয় কৃষির উন্নয়নের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধক। পঞ্চমত, মহাজন, ফড়ে প্রভৃতি মধ্যবর্তীরা চাষীদের অশিক্ষা,

ভারতীয় কৃষির অনগ্রসরতা

চরম দারিদ্র্যজনিত অসহায়তা ও দৈবনির্ভরতার সুযোগ নিয়ে তাদের নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে। ফলে তারা ঋণভার জর্জরিত হয়ে তাদের বুকের রক্তজলকরা পরিশ্রমের ন্যায্য লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে।

ভারতীয় কৃষি ও কৃষকসমাজের এই মর্মান্তিক দুঃস্থতার কারণ, দীর্ঘকালব্যাপী বিদেশী সাম্রাজ্য শক্তির শোষণ। ইংরেজ শাসক নির্লজ্জ দস্যুর মত ভারতবর্ষের মানুষদের যেমন শোষণ করেছে, তেমনি তার মৃত্তিকার সকল সম্পদ লুণ্ঠন করে, তাকে রিক্ত অবস্থায় ফেলে রেখেছে, তার শুশ্রূষার জন্য বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা বোধ করেনি। ইংরেজ তার সাম্রাজ্য-স্বার্থের প্রয়োজনে যে জমিদারদের ওপর জমির সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা অর্পণ করেছিল, তারা কৃষিউন্নয়নের জন্য মূলধন ও যন্ত্রপাতি, সার, বীজ ইত্যাদি প্রকৃত মূলধন প্রয়োগে কোনওদিন উৎসাহী হয় নি। বিদেশী পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় কুটিরশিল্প বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য এই শিল্প থেকে উৎখাত শ্রমিকেরা জীবিকা হিসেবে কৃষিকে গ্রহণ করে দেশের কৃষিভূমিকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। ভারতীয় কৃষির এই দুর্গত অবস্থা নিঃসন্দেহে আমাদের পরাধীনতার অভিশাপের দুর্বিষহতম বোঝা। তাই স্বাধীনতালাভের পর আমরা যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও দেশবিভাগের ফলে জর্জরিত, ক্ষতবিক্ষত দেশের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নয়নের দুরূহ কর্মব্রতকে গ্রহণ করলাম তখন কৃষি-উন্নয়নের কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দান করা হয়। এই পরিকল্পনায় কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ খাতে মোট ১০০১ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৪২·১%বিনিয়োগ করা হয়েছিল। ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান ভিত্তি কৃষিকে সুদৃঢ় করতে না পারলে শিল্পোন্নয়নের আশা সুদূরপরাহত, এদেশের জাতীয় আয়ের অর্ধাংশের উৎস কৃষি এবং তুলা। পাট, চিনি ইত্যাদি প্রধান শিল্পগুলোও তাদের কাঁচা মালের সরবরাহের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। খাদ্যশস্যের ওপর পণ্যদ্রব্যের মূল্যস্তর প্রধানত নির্ভরশীল বলে পরিকল্পনার সাফল্যের পক্ষে তার উৎপাদনবৃদ্ধি আবশ্যক, দেশের সম্প্রসারণশীল শিল্পগুলোর কাঁচা মালের জন্যও কৃষির উন্নয়ন প্রয়োজনীয়—প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির ওপর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করার পশ্চাতে পরিকল্পনা কমিশন এ সমস্ত যুক্তিই প্রদর্শন করেছিলেন। ভূমি-সংস্কার হল কৃষি-উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরিকল্পনা কমিশন ঘোষিত ভূমি-সংস্কার কার্যসূচীর দুটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল : প্রথমত, অতীতকাল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রামীন অবস্থার দায়ভাগ

কৃষির অনগ্রসরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা

হিসেবে যে সমস্ত প্রতিবন্ধক সৃষ্ট হয়েছে সেগুলোর অপসারণ—এর ফলে যথাসম্ভব দ্রুত, উচ্চ পর্যায়ের কর্মক্ষমতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বিশিষ্ট কৃষি-অর্থনীতি গড়ে তোলার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা ; দ্বিতীয়ত, কৃষিব্যবস্থার মধ্য থেকে শোষণ ও সামাজিক অন্যায়ের সকল চিহ্নের অবলোপ, চাষীর নিরাপত্তাবিধান এবং সকল শ্রেণীর পল্লীবাসীকে সমান মর্যাদা ও আশ্বাসদান। লাঙ্গল যার জমি তার (Land to the tiller) এই নীতিকেই ভূমিসংস্কার-কর্মসূচীর প্রধান ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। পরিকল্পনা কমিশনও তাই সুপারিশ করেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন, সমস্ত রাজ্যেই মধ্যস্বত্ব বিলোপের ব্যবস্থা প্রায় শেষ হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় জমির ব্যক্তিগত মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের নীতি উল্লিখিত হয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রে অসাম্য প্রতিরোধের এটা একটা প্রাথমিক পদক্ষেপ। জমির মালিকানা ও কৃষির একটি আদমসুমারীর (Census of landholdings and cultivation) মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার জমির মালিকানার সর্বোচ্চ আয়তন (Fixation of Ceilings on Agricultural Holdings) সম্পর্কিত যে নীতি রচিত হয় তার দুটি দিক আছে : প্রথম, ভবিষ্যতের জোতগুলোর সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ ; দ্বিতীয়, বর্তমান জোতগুলোর সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, পাঁচ সভ্য সংখ্যা বিশিষ্ট পরিবার পারিবারিক ভূমিখণ্ডের তিনগুণ জমি রাখতে পারবে, সভ্য-সংখ্যা এর বেশি হলে এ পরিমাণ ছয়গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ভূমি-সংস্কারের বিভিন্ন পর্যায়

অন্ধ্রের তেলেংগানা অঞ্চলে, আসামে, বোম্বাইয়ে, জম্মু ও কাশ্মীরে, মহীশূরে, পাঞ্জাবে, কেরালায়, হিমাচল প্রদেশে, মণিপুরে, ত্রিপুরায় এবং পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান জোতের ঊর্ধ্বতম সীমা নির্ধারিত হয়েছে। জোতজমির চকবন্দীকরণ বা সংহতিসাধন (consolidation of holdings) ভূমিসংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভারতবর্ষের জোতজমির উপবিভাগ, খণ্ডীকরণ ও ক্রমবিভাজ্যমানতা বিজ্ঞান-সম্মত কৃষিপদ্ধতির মাধ্যমে কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির পথে একটি অচলায়তন বাধা। প্রথম পরিকল্পনায়ই এর গুরুত্ব নির্দেশিত হয়েছিল। ১৯৫৯—৬০ সালের শেষভাগে ২৩০ লক্ষ একর জমিতে সংহতি সাধন হয়েছে, তৃতীয় পরিকল্পনায় এর পরিমাণ ২৮০ লক্ষ একর হবে আশা করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনার প্রথম চার বছরে প্রায় ২৫০·৫ লক্ষ একর জমির চকবন্দীকরণ সমাধা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার ভূমিসংস্কার কর্মসূচীগুলির নানা ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিয়েছে। জমির মালিকেরা আইনের নানা

ছিদ্রপথের সুযোগ নিয়ে সরকারি প্রচেষ্টাকে অনেকাংশেই ব্যর্থ করেছে, বা পুরোপুরি সফল হতে দেয়নি।

বিভিন্ন রাজ্যে ভূমিসংস্কার কার্যসূচীর বাস্তবায়নে যে সকল সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে, তাদের সমাধানই হবে চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য। ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য যথোপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, রাজ্যগুলোর প্রতিটি জেলায় ভূমিসংস্কার নীতির রূপদানের অগ্রগতির প্রতিটি স্তর পর্যবেক্ষণ এবং আইনের শূন্যস্থানগুলো পূর্ণ করে তার দ্রুত প্রয়োগের সময়োচিত ব্যবস্থার জন্য মন্ত্রীবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন, প্রতিটি রাজ্যে রায়তদের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গের বর্গাদার ও ভাগচাষী এবং আসাম, বিহার, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যের এই জাতীয় চাষীরা যাতে জমির স্থায়ী মালিক হতে পারে তারজন্য আইনপ্রণয়ন, তথাকথিত স্বেচ্ছামূলক জমি সমর্পণের আবরণে রায়তদের উচ্ছেদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা, দুরভিসন্ধিমূলক জমি হস্তান্তরের ফলে ভূমি সংস্কারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী জোতের উর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণকে যেভাবে পণ্ড করে তোলা হচ্ছে, তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন, জোতের সংহতি সাধন, ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের কল্যাণ বিধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ,—পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনায় ভূমি সংস্কার সম্পর্কে এই সকল সুপারিশ ও প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছেন। ভূমি-সংস্কারের এই সকল ব্যবস্থায় ভারতীয় কৃষির নতুন দিগন্তই উন্মোচিত হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোয় কৃষি-পদ্ধতির সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন তথা আধুনিকীকরণের ওপরও সমপরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জলসেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ, উৎকৃষ্ট সার ও বীজ সরবরাহ, ব্যাধি, পঙ্গপাল, পোকামাকড় ইত্যাদি থেকে ফসল রক্ষণ, ভূমিক্ষয়নিরোধ, পতিত জমি উদ্ধার ও উন্নয়ন এবং কৃষিপদ্ধতির যন্ত্রীকরণ—এগুলোই হল কৃষিপদ্ধতির উন্নয়নের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ভূমি সংস্কারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের সুপারিশ

দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় কৃষি ছিল মৌসুমী জলবায়ুর অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির খামখেয়ালিপনার অসহায় শিকার, জাতীয় সরকার সেই অসহায়তা থেকে তাকে মুক্তি দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভ থেকেই দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন, ভাকরা, নাঙ্গাল, হীরাকুদ, চম্বল, তুঙ্গভদ্রা ও নাগার্জুন-সাগরের মত নদী-উপত্যকা-পরিকল্পনার বৃহৎ সেচব্যবস্থার মত মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে, বিশেষত ১৯৬৫ সালে খরার নিদারুণ প্রকোপে কৃষির যে গুরুতর ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে

ক্ষুদ্র সেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুরাতন কূপ, পুষ্করিনী, ক্ষুদ্রবাঁধ, খাল, নলকূপ ইত্যাদির সংস্কার এবং নতুন কূপ, জলাশয়, বাঁধখাল, নলকূপ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও ভূগর্ভ থেকে জল তোলার জন্য পাম্প স্থাপন ইত্যাদি কর্ম-সূচীর রূপায়ণে বিভিন্ন রাজ্য সরকার সেচব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হয়েছেন। ১৯৫০-৫১ সালে প্রথম পরিকল্পনার যাত্রারম্ভে প্রায় ৫৬ মিলিয়ন একর জমি বিভিন্ন ধরনের সেচব্যবস্থার সুযোগ লাভ করেছিল, তিনটি পরিকল্পনায় অতিরিক্ত ১৮ মিলিয়ন একর জমির জন্য সেচের সুবিধাসৃষ্টি হয়েছে, আর ভবিষ্যতে প্রায় ৭০ মিলিয়ন একর জমিতে বৃহৎ ও মাঝারি সেচব্যবস্থা সম্প্রসারিত হতে পারবে। ভারতবর্ষের ১০২ মিলিয়ন একর জমিকে সেচব্যবস্থার অধীনে আনতে পারলে আমরা খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে স্বয়ংনির্ভর হতে পারব, কেন্দ্রীয় সেচ ও শক্তি মন্ত্রী ডাঃ কে. এল. রাওয়ের এই উক্তি আতিশয্যরঞ্জিত নয় বলেই মনে হয়।

বিভিন্ন নদী পরিকল্পনা ও সেচ ব্যবস্থা

চতুর্থ পরিকল্পনায় আপাতত সেচখাতে ৮৪৯ কোটি টাকা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে ১১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় সেচসংক্রান্ত এই তিনটি কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে: প্রথম, কৃষকদের জমি অর্থাৎ জমির নালি পর্যন্ত জল পৌঁছিয়ে দিয়ে পূর্ববর্তী পরিকল্পনার চালু স্কীমগুলোর সমাপ্তি; দ্বিতীয়, জলনিকাশ (drainage), জল-অবরোধ (water logging) এবং সমুদ্রের ভূমিক্ষয় নিবারণ স্কীম এবং তৃতীয়, আশু উপকার লাভের জন্য দূরদৃষ্টির সঙ্গে নির্বাচিত স্বল্পসংখ্যক বৃহৎ ও মাঝারি সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ। চতুর্থ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র সেচ সম্প্রসারণের লক্ষ্য হল ১৭ মিলিয়ন একর। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সেচ-প্রকল্পগুলির সম্ভাব্য সকল সুযোগসুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য প্রায় ৫০০ একর-বিশিষ্ট ব্লকভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কর্মসূচী গৃহীত হবে। প্রথমে কুড়িটি ব্লকে কাজ শুরু করা হবে, তার মধ্যে কোল, নাগার্জুন সাগর, চম্বল-উপত্যকা, রাজস্থান খাল, তুঙ্গভদ্রা, শোন উপত্যকা, ভাক্রানাঙ্গাল প্রভৃতি আটটি প্রকল্পকে ব্লক নির্বাচনে অগ্রাধিকার দান করা হবে বলে স্থির হয়েছে। একটি সারাভারত সেচ কমিশন (All-India Irrigation Commission) স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে।

সেচের তিনটি কর্মসূচী

ভূমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিতে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ আধুনিক কৃষি-পদ্ধতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যথোপযুক্ত পরিমাণে সার উৎপাদনে ভারতের অক্ষমতা তার কৃষিকে পঙ্গু করে রেখেছে. তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ দুবছরে এবং চতুর্থ

পরিকল্পনার প্রথম বছরে (১৯৬৬-৬৭) এটা বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। ১৯৬৬-৬৭ সালে ফসফেটিক সারের ক্ষেত্রে শতকরা ৪৬'৩ ভাগ এবং নাইট্রোজেনবহুল সারের ক্ষেত্রে শতকরা ২২'৫ ভাগ কম উৎপাদন হয়েছে। সার উৎপাদন ও বণ্টনে সরকারই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবেন, সম্প্রতি সরকার এই মৌলিক নীতি ঘোষণা করেছেন। গত চার বছরে আটটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, সিন্ধ্রী, নামরূপ, টম্বের মত পুরাতন কারখানাগুলোর যুক্তিসিদ্ধরূপে পুনর্গঠন ও আধুনিকীকরণের পরিকল্পনাও সরকার গ্রহণ করেছেন। এদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা, ব্রিটেন, ইটালী ও জাপান ভারতে সারের কারখানা নির্মাণে উৎসাহী, ভারত সরকারও এই ক্ষেত্রে বৈদেশিক মূলধন আকর্ষণের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধাদানের আশ্বাস দিয়েছেন। ভারতীয় কৃষকেরা যে রাসায়নিক সারের প্রতি বিমুখ নয়, ক্রমবর্ধমান চাহিদাতেই তা পরিস্ফুট। ১৯৫৯-৬০ সালে ২২ লক্ষ টন মিশ্রসার ব্যবহৃত হয়েছিল, ১৯৬০-৬১ সালে তার পরিমাণ হয় ২৭ লক্ষ টন। দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ সার উৎপাদনের জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারখানা স্থাপন চতুর্থ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান কর্মসূচী। চতুর্থ পরিকল্পনায় সবুজ সার, কম্পোস্ট সার ইত্যাদির বহুল প্রয়োগের কর্মসূচীও প্রস্তাবিত হয়েছে। উন্নতধরণের বীজ সরবরাহও কৃষি-উন্নয়নের একটি অপরিহার্য দিক। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রায় ৪,০০০ বীজ খামার (seed multiplication farm) স্থাপিত হয়, প্রতি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকেই ২৫ একরের এক একটি বীজ-খামার স্থাপিত হয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই কর্মসূচীকে প্রসারিত করা হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে জাতীয় বীজ সংস্থা (National Seed Corporation) উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতাবিশিষ্ট, উন্নতধরনের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ করবে, বীজ উৎপাদনের জন্য কেন্দ্রীয় বীজ-খামার প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া পরিকল্পনা কমিশন নতুন, বৃহদায়তন ৫০০ একরবিশিষ্ট বীজ-খামার, বীজ-গ্রাম এবং উন্নত বীজের উৎপাদন, সংরক্ষণ, বণ্টন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বীজ সংস্থা (Seed Corporation) প্রতিষ্ঠা করতে রাজ্যসরকার গুলোকে পরামর্শ দিয়েছেন। ফসলের ব্যাধি প্রতিকারের জন্য ফসল-সংরক্ষণ অধিকার (Directorate of Plant Protection) তার চোদ্দটি ফসল সংরক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, যন্ত্রপতি, ঔষধপত্র, কর্মচারী ইত্যাদি দিয়ে রাজ্যসরকারগুলোকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছে এবং গ্রাম-পঞ্চায়েত-অঞ্চলও তার পরিধিভুক্ত হয়েছে। চতুর্থ

রাসায়নিক সার, উন্নত বীজ সরবরাহ এবং নিবিড় কৃষি

পরিকল্পনায় নিবিড়-কৃষি কর্মসূচীতে (intensive agricultural programme) ফসলরক্ষণকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা-কমিশন এই পরিকল্পনার তিন বৎসরের মধ্যেই ১৩৭ মিলিয়ন একর জমিকে ফসল-সংরক্ষণ কর্মসূচীর অধীনে আনবার কথা ঘোষণা করেছেন। এই ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত-সমিতিগুলোরও বিশেষ দায়িত্ব আছে।

চতুর্থ পরিকল্পনা কালে মৃত্তিকা সংরক্ষণের (Soil Conservation) কর্মসূচীকে ২০ মিলিয়ন একর জমিতে সম্প্রসারিত করা হবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় জমির আল বাঁধা সমেত মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা সহ অন্যান্য মৃত্তিকা সংরক্ষণ কর্মসূচীর লক্ষ্য ছিল ১৫ লক্ষ একর। চতুর্থ পরিকল্পনায় ২'৫ মিলিয়ন একর পতিত জমি উদ্ধার ও উন্নয়নের কর্মসূচী প্রস্তাবিত হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন, গত দশ বছরে রূপায়িত কৃষিকর্মসূচীতে একটি মারাত্মক ছেদ কৃষি যন্ত্রাদির ক্ষেত্রে রয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষির যন্ত্রীকরণের এই কর্মসূচীগুলো প্রস্তাবিত হয়েছে: কৃষিযন্ত্রপাতি মেরামত, সংরক্ষণ ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রতি ব্লকে একটি কারখানা স্থাপিত হবে, ১০টি গবেষণা-কেন্দ্রের মধ্যে যে দুটি কেন্দ্র তৃতীয় পরিকল্পনাকালে স্থাপিত হয়েছে, তাদের আঞ্চলিক নকশা ও গবেষণাকেন্দ্রে সম্প্রসারিত করা হবে, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, সেবা সমবায় সংস্থাগুলো ঋণের ভিত্তিতে কৃষকদের উন্নতধরনের যন্ত্রপাতি সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। কিন্তু ভারতীয় কৃষি-কাঠামোর আমূল পরিবর্তন না ঘটিয়ে কৃষির যন্ত্রীকরণ সম্ভব হবে না বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। ভারতবর্ষে জমির উপবিভাগ ও খণ্ডীকরণ ট্র্যাক্টর জাতীয় ভারী কৃষি-যন্ত্রপাতি প্রয়োগের অনুকূল নয়, জাপানের মত ছোটখাট অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যের যন্ত্রপাতির ব্যবহারই বাঞ্ছনীয়।

মৃত্তিকা সংরক্ষণ, পতিত জমি উদ্ধার ও কৃষির যন্ত্রীকরণ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তির দ্রুত নির্মাণের জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মানুষের শ্রম ও উপকরণ এই উন্নত সম্পদের নিবিড় ব্যবহারের মাধ্যমে জলসেচ ও বৃষ্টিপাতের অনুকূল অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির নিবিড় প্রচেষ্টা হিসাবে নিবিড় কৃষি-জেলা কর্মসূচী (Intensive Agricultural District Programme) ১৯৬০-৬১ সালে গৃহীত হয়। বর্তমানে ৩০৮টি ব্লক এবং দেশের চাষের জমির ৫ শতাংশ আই এ ডি পি (I A D P)-এর পরিধি ভুক্ত। এ ছাড়া তৃতীয় পরিকল্পনা কালে ১৯৬৪ সালে নিবিড় কৃষি-অঞ্চল কর্মসূচীও (Intensive Agricultural Area Programme) প্রবর্তিত হয়। চতুর্থ পরিকল্পনা কালে এই দুটি কর্মসূচী সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা

হয়েছে। খরা, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ফসলের যে ক্ষতি হয়, কৃষকেরা যাতে তার পূরণের সুযোগ পেতে পারে সে উদ্দেশ্যে চতুর্থ পরিকল্পনায় একটি শস্য বীমা পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

মহাজন, দালাল, ফড়ে প্রভৃতি মধ্যবর্তী মুনাফা খোরদের নির্মম ও যথেচ্ছ শোষণ থেকে কৃষক সমাজকে মুক্ত করে কৃষি-সংগঠনকে ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র গঠনের আদর্শের পটভূমিতে দৃঢ় না করে তুললে কৃষি-উন্নয়নের কোনও কর্মসূচীই সফল হতে পারে না। সমবায় চাষ (co-operative farming) ও কৃষি মূলধনের ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের প্রসার, কৃষি-বিপণন, সমষ্টি-উন্নয়ন ও গ্রাম-পঞ্চায়েত—এই হল কৃষি সংগঠনের বিভিন্ন দিক। কৃষির সর্বক্ষেত্রে সমবায় প্রথা প্রসারিত না হওয়া পর্যন্ত তার প্রকৃত উন্নতি যে সম্ভব নয়, সে সম্পর্কে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই একমত। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শুধু ঋণদান সমিতিই নয়, বহুমুখী সমবায় সমিতির গঠনের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘকালীন কাজকর্ম) ভাণ্ডার [The National Agricultural Credit (longterm operations) Board], ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় কৃষিঋণ (স্থায়িত্ব সাধন করা) ভাণ্ডার [The National Agricultural Credit (Stabilisation) Board], কাঁচা মাল শোধন (processing), গুদাম নির্মাণ ও বিপণনের (marketing) জন্য ১৯৫৬ সালে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম নির্মাণ বোর্ড (National Co-operative Development and ware-housing Board) প্রভৃতি সংস্থার প্রতিষ্ঠা সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে অগ্রগতির উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ১৯৫৮ সালে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ সমবায় নীতি সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তা তৃতীয় ও পরবর্তী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সমবায়ের নতুন পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছে বলা যায়: প্রাথমিক ইউনিট স্বরূপ গ্রাম্য সমষ্টির ভিত্তিতে সমবায় সমিতিগুলো সংগঠিত হওয়া উচিত এবং গ্রাম্য সমবায় সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপরই সম্পূর্ণ ভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব ও উদ্যোগ ন্যস্ত করা উচিত; গ্রামের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনাই সমবায় কর্মসূচীর ভিত্তি হবে। বর্তমানে সমষ্টি উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা বিভাগের (Community work and National Extension Service) কার্যের সঙ্গে সমবায় আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় সমবায় খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ২০৬ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় এই

সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন দিক

খাতে প্রায় ৭৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। ভারতীয় চাষীরা খর রৌদ্রে বৃষ্টিতে বুকের রক্ত জলকরে যে ফসল ফলায়, ফড়ে মহাজনদের চক্রান্তে তারা ন্যায্য মূল থেকে বঞ্চিত হয়। সেইজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সমবায় বিপণন (Co-operative marketing) প্রবর্তিত হয়। পরিকল্পনার কর্মসূচী বহির্ভূত ৯০০টি ছাড়া ১৯৬৫ সালের জুন মাসের শেষভাগে প্রাথমিক বিপণন সমিতির সংখ্যা ২২৩১-এ দাঁড়িয়েছিল। চতুর্থ পরিকল্পনা কালে দেশের প্রত্যেকটি গুরুত্ব পূর্ণ বাজারে যাতে একটি করে সমবায় বিপণন সমিতি থাকে সেই উদ্দেশ্যে ৪১০টি নতুন প্রাথমিক সমবায় বিপণন সমিতি গঠনের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। জাতীয় সমবায় উন্নয়ন সংস্থাও (National Development Corporation) সমবায় বিপণন প্রসারের নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। নিয়মিত উচ্চমানের কৃষি-বাজার পদ্ধতির আর একটি অংশ হল কৃষি বিপণন অধিকার (Direcrorate of Agricultural Marketing and Inspection) কর্তৃক কৃষিপণ্যের শ্রেণীবিভাগ ও মান নির্ধারণ, বাজার ও বাজার পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন নিষেধ প্রবর্তন, বাজার সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সমীক্ষা, ফাটকাবাজি জনিত দুর্নীতিগ্রস্ত বাজার পদ্ধতির অপসারণ, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বাজারজাতকরণের ব্যয় হ্রাস ও উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির দায়িত্ব গ্রহণ। চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করেছেন যে একটি কৃষিপণ্যের কার্যকরী, সুনিশ্চিত মূল্য নীতির অভাবও কৃষি উৎপাদনের শ্লথ গতির জন্য দায়ী। ফাটকাবাজির জন্য কৃষিজ পণ্যদ্রব্যের মূল্য স্তরের অনিশ্চয়তা রোধ, একে শিল্পায়নের অনুকূল করে তোলা এবং এই ক্ষেত্রে ক্রেতা ও উৎপাদক উভয়েরই স্বার্থের যথাসম্ভব সামঞ্জস্য সাধন প্রভৃতির জন্য এই মূল্যনীতি প্রয়োজন। কৃষিপণ্যের মূল্যস্তরের অবিরাম পরীক্ষা ও এই মূল্য নীতি সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শদানের জন্য ১৯৬৫ সালে একটি কৃষিমূল্য কমিশন (Agricultural Price Commission) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হয় যে কৃষির উন্নয়নের হার মোটেই আশানুরূপ হয়নি। তৃতীয় পরিকল্পনায় শেষ বছরে (১৯৬৫-৬৬) ও চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বছরে (১৯৬৬-৬৭) কৃষির ক্ষেত্রে যে শোচনীয় বিপর্যয় ঘটেছে তা দেশের সমগ্র অর্থনীতিকেই গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। খাদ্যশস্যের ঘাটতির ফলে তার সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যশস্যের আমদানির জন্য বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলোর ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব, বিশেষত বৈদেশিক বিনিময় সঙ্গতির

ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি, ক্ষেতে ফসল কম হওয়ার জন্য পাট, তুলা, চিনি প্রভৃতির মত কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলির উৎপাদন হ্রাস এই বিপর্যয়ের পরিণাম হিসেব চতুর্থপরিকল্পনা তথা দেশের অর্থনীতির ওপর অশুভ, কৃষ্ণচ্ছায়া বিস্তার করেছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে কৃষি-উৎপাদন শতকরা ১৬·৯ ভাগ কম হয়েছে। খরার জন্য কৃষি উৎপাদন শোচনীয় ভাবে ব্যাহত হয়েছে, এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে তার আঘাত সামলে ওঠার [illegible]

সাম্প্রতিক কালের কৃষি সংকট এবং তার প্রতিকারের উপায়

৯ কোটি ৭০ লক্ষ টন, সেখানে উৎপন্ন হয়েছে মাত্র ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন; সাম্প্রতিককালের শোচনীয় খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিপণ্যপরিস্থিতির জন্য শুধু খরাকে দায়ী করলে চলবে না। ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনার সময় পরিকল্পনা কমিশন বলেছিলেন যে খাদ্যশস্য উৎপাদনবৃদ্ধি ছাড়া পরিকল্পনা-সংক্রান্ত ব্যয়বৃদ্ধি ও তজ্জনিত অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির দুষ্টচক্র থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। তবু কৃষি উন্নয়নের প্রতিটি সরকারি উদ্যোগ বা কর্মসূচীর রূপায়ণ মর্মান্তিক ভাবে দুর্বল রয়ে গেছে। পরিকল্পনা কমিশন নিজেই স্বীকার করেছেন, সেচের সুযোগসুবিধাও কৃষকদের মধ্যে এমন ভাবে ব্যাপ্ত হয়নি যাতে কৃষি উৎপাদনে প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চারিত হতে পারে। সার, জীবাণু-নাশক ঔষধপত্র, উন্নত ধরণের বীজ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক উপকরণের অনটনও কৃষির অগ্রগতিকে মন্থর করে রেখেছে, নিবিড় কৃষিকর্মসূচী থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি, সমবায় আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায় দুর্বল থেকে গেছে, বিশেষত সমবায় চাষের ক্ষেত্রে কোনও উল্লেখযোগ্য কর্মপ্রচেষ্টারই সূত্রপাত হয়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিগুলো পরশ্রমজীবি ধনী চাষীদেরই কুক্ষিগত থেকে গেছে।

কিন্তু ব্যর্থতার তালিকা যতই প্রসারিত করা যাক না কেন, আমরা যেন নৈরাশ্যে ও অবসাদে উদ্যমহীন না হয়ে পড়ি, বর্ষার মেঘ ও বজ্রবিদ্যুতের দুর্যোগভরা মেদুর আকাশের মধ্যেই শরতের প্রসন্ন, স্বর্ণোজ্জ্বল আকাশের প্রতিশ্রুতি লুকিয়ে থাকে। একথা যেন ভুলে না যাই। চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষির ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে: রাষ্ট্রের নেতৃত্বে সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষির সম্পূর্ণ পুনর্গঠন এবং তার আধুনিকীকরণের মাধ্যমে কৃষিবিপ্লব ঘটিয়ে এদেশের কৃষির অনগ্রসরতার সকল অভিশাপ দূর করতে হবে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে :

- ভারতের ভূমিসংস্কার
- ভারতের কৃষি ও ভূমিসংস্কার
- ভারতের ভূমিহীন কৃষকের সমস্যা
- ভারতের ভূমিব্যবস্থার ত্রুটি ও তার প্রতিকার

ভারতের ভূমিনীতি

প্রারম্ভ

ভারতের অর্থনীতি মূলত কৃষিকেন্দ্রিক, তার জনসংখ্যার প্রায় সত্তর শতাংশই কৃষির ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল এবং জাতীয় আয়ের অর্ধাংশেরই উৎস কৃষি, তবু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর বিড়ম্বনায় ভারতীয় কৃষকসমাজ যুগ যুগ ধরে শোষিত ও উৎপীড়িত হয়ে আসছে, আমাদের ক্ষুধার অন্নের পশ্চাতে কৃষকদের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত অনেক অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস, নির্মমতম বঞ্চনা, অনেক রক্তই লুকিয়ে থাকে। ভারতীয় কৃষকদের এই দুর্গতির মূলে আছে শোষণকলংকিত ভূমিব্যবস্থা।

বৃটিশ যুগে ভারতের ভূমিব্যবস্থা

অর্থনীতিবিদেরা ভারতের কৃষিজমির স্বত্বকাঠামোর (tenure structure) বৈশিষ্ট্যনির্দেশ করতে গিয়ে তাকে পিরামিডের গঠনের সংগে তুলনা করেছেন ; এই কাঠামোর শীর্ষদেশে আছে জমির সর্বোচ্চ মালিক রাষ্ট্র, তার নীচে আছে এমন এক জমিদার-শ্রেণী যারা চাষের কোন দায়িত্ব গ্রহণ না করেই খাজনা আদায় ও ভোগ করে, পরবর্তী পংক্তিতে আছে বিত্তবান কৃষক সম্প্রদায়, যারা বিভিন্ন প্রকার স্বত্ব বা দলিলের মাধ্যমে নিজেদের জমি চাষ করে এবং শ্রমিকদের দিয়ে চাষ করিয়ে নেয়, সর্বনিম্নস্থ শ্রেণী হল ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক, তারা ফসলের অংশ বা নগদ টাকার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অপরের জমি চাষ করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যশক্তি তার কায়েমী স্বার্থসাধনের জন্য শোষণভিত্তিক এই ভূমিবিন্যাসকেই লালিত করে এসেছে। ব্রিটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, মালগুজারী বন্দোবস্ত, মহালওয়ারী বন্দোবস্ত প্রভৃতি স্বত্বাধিকার ব্যবস্থাগুলো মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণকেই সুযোগসুবিধা দান করেছে এবং দরিদ্র কৃষকদের সীমাহীন দুর্গতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। ১৯৩৯ সালে

ফ্লাউড কমিশন : ১৯৩৯

ফ্লাউড কমিশনের অধিকাংশ সদস্য সুপারিশ করেছিলেন যে সরকার ও প্রকৃত কৃষকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জমির ওপর সমস্ত উচ্চ পর্যায়ের স্বার্থ রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়া দরকার।

রায়তেরা জমির মালিকানা লাভ করলেই কৃষির উন্নতি ঘটবে। কিন্তু এই পরাধীন দেশের বিদেশী শাসক এই বিষয়ে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক ছিল না। আমাদের বিচিত্র উত্তরাধিকার আইন কৃষি-উন্নয়নের গুরুতর প্রতিবন্ধক ভূমির উপবিভাগ ও ক্রমবিভাজ্যমানতা, খণ্ডীকরণ প্রভৃতিকে সম্প্রসারিত করেছে। বাঙলাদেশে ১৮৫৯ সাল থেকে এবং পরে অন্যান্য অঞ্চলেও ভূমি-সংক্রান্ত অনেক আইন রচিত হলেও মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাবার জন্য তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। বাঙলাদেশের জমিদার, অযোধ্যার তালুকদার, রাজস্থানের জায়গীরদার, পাঞ্জাবের বিশ্বেদার, মধ্যপ্রদেশের মালগুজার, কাশ্মীরের ইলাকদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের সঙ্গে চাষের কোনও সম্পর্ক ছিল না এবং সে সমস্ত আইন তাদের স্বার্থের সঙ্গে আপোষরফাই করেছিল। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ দীর্ঘকাল থেকেই এই ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছিলেন। ১৯৩৬ সালে কংগ্রেসের এক প্রস্তাবে বলা হয়েছিল; কৃষিসমস্যার স্থায়ী সমাধান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের এবং জমির মালিকানা ও ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত প্রাচীন আমলের শোষণধর্মী ব্যবস্থাদির আমূল পরিবর্তনের ওপরই নির্ভরশীল।

ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

স্বাধীনতালাভের পরই জাতীয় সরকার ভারতবর্ষের কৃষিকে শোষণের রাহুমুক্ত করার জন্যে একটি ব্যাপক ভূমিনীতি রচনা করেন। নবগঠিত স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ভারতের সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি ও মৌলিক অধিকারের (Directive Principles and Fundamental Rights) ওপরই এই ভূমিনীতির মূলসূত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর পটভূমি হিসাবে পরিকল্পনা কমিশন নিম্নোদ্ধৃত সুপারিশগুলো উপস্থাপিত করেছিলেন: এক, রাষ্ট্র ও কৃষিজীবিদের মধ্যাস্থিত সকলপ্রকার মধ্যস্বত্বাধিকারের বিলোপসাধন; দুই, কৃষকদের জমিতে চিরস্থায়ী অধিকার দান ও খাজনা হ্রাসের জন্য প্রজাস্বত্ব সংস্কার; তিন, জোতের ঊর্ধ্বতন সীমা নির্ধারণ এবং তার মাধ্যমে জমির পুনর্বণ্টন; চার, জোতের সংহতি সাধনের উদ্দেশ্যে কৃষির পুনর্গঠন এবং জমির উপবিভাজন ও খণ্ডীকরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ; পাঁচ, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন এবং তার জন্য ভূদান আন্দোলন সমর্থন: ছয়, সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকাজ ও সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার প্রসার এবং সাত, এই সকল উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের জন্য ভূমিস্বত্বের আদমসুমারি গ্রহণ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভূমিসম্পর্কে এই নীতিগুলো নির্ধারিত হয়েছিল: এক

স্বাধীন ভারতবর্ষের ভূমিনীতি

প্রজাস্বত্বসংস্কার ; দুই, ভূমিখণ্ডের আয়তন নির্ধারণ ; তিন, কৃষির পুনর্বিন্যাস এবং এবং চার, ভূদান। দুটি মৌলিক নীতিগত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত কর্মসূচীগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় : প্রথম, অতীতকাল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গ্রামীণ অব্যবস্থার ফলে কৃষি উৎপাদনের পথে যে সমস্ত প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়েছে, তাদের অপসারণ। তার ফলে যথাসম্ভব দ্রুত, উচ্চ পর্যায়ের কর্মক্ষমতা ও উৎপাদন শক্তিসংবলিত কৃষি-অর্থনীতি গড়ে তোলার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টিতে সহায়তা হবে। দ্বিতীয়টি প্রথমটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত : কৃষি ব্যবস্থা থেকে শোষণ ও সামাজিক অন্যায়ের সমস্ত চিহ্ন বিলোপ, চাষীর নিরাপত্তাবিধান এবং সকলশ্রেণীর গ্রামবাসীকে সমান মর্যাদা ও সুযোগ দেবার আশ্বাসদান। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভূমিনীতি দ্বিতীয় পরিকল্পনারই অনুরূপ। তৃতীয় পরিকল্পনায় ঘোষণা করা হয়েছিল, এই পরিকল্পনাকালে প্রধান কর্তব্য হবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রচিত এবং রাজ্যগুলোর গৃহিত নীতি অনুসারে প্রণীত আইনসমূহের অন্তর্ভুক্ত নীতিগুলোর রূপায়ণের কাজ যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করে ফেলা। চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন, লাঙ্গল যার জমি তার—এটাই হচ্ছে ভূমিসংস্কারকর্মসূচীর প্রধানতম ভিত্তি, যথাসম্ভব অধিক সংখ্যায় যে চাষী তাদের জমির মালিক করা এবং সমস্ত চাষীকে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আনয়ন—এই উদ্দেশ্যেই ভূমি সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, "Land to the tiller" was adopted as the main plank in the scheme of land reform, which contemplated that owner-cultivation should be established on the widest possible scale and all cultivators should come into direct relation with the State।

'লাঙ্গল যার ভূমি তার' নীতি

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোর এই সমস্ত ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর বাস্তবরূপায়ণের অগ্রগতির পর্যালোচনায় দেখা যায়, সমগ্র ভারতবর্ষে জমিদারী, জায়গীরদারী প্রভৃতি মধ্যবর্তী ভূমিস্বত্বব্যবস্থা দেশের চল্লিশ শতাংশ ভাগে ব্যাপ্ত ছিল, বিভিন্ন রাজ্যের ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়নের ফলে পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিপুরা ও দিল্লীতে তাদের অবলুপ্তি ঘটেছে, অন্যান্য অংশেও আইনগত নানা বাধা অতিক্রম করে ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে। প্রজাদের স্বত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে এগারটি রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোয় আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে; এর ফলে কাউকে অবৈধভাবে

অতীতে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার বিস্তার।

উচ্ছেদ নিষিদ্ধ হয়েছে, জমির মালিক ব্যক্তিগত চাষের জন্য পুনরায় জমির অধিকার ফিরে পেতে পারে, কিন্তু জমির দখল পেলেও একটা ন্যূনতম এলাকা চাষীর হাতে থাকবে। ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রগঠনের নীতিরই অঙ্গ ন্যায়সঙ্গত সমবণ্টননীতি অনুযায়ী জোতের উর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণকে প্রথম পরিকল্পনায়ই স্থান দেওয়া হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য রাজ্যগুলোয় জমির মালিকানা ও কৃষির আদমসুমারী (census of land holdings and cultivation) গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পারিবারিক জোতের তিনগুণ পরিমাণ জোতের উর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করে দেবার কথা বলা হয়। এই বিষয়ে প্রায় সমস্ত রাজ্যেই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ ব্যক্তির অথবা পরিবারের ভিত্তিতে হবে তা স্থির করার অধিকার রাজ্য সরকারগুলোর ওপরই অর্পিত। ভবিষ্যতের জোতগুলোর সর্বোচ্চসীমা নির্ধারণ এবং বর্তমান জোতগুলোর সর্বোচ্চ সীমা নিরূপন—জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের এ দুটো বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে। ভারতীয় কৃষিকে জোতজমির উপবিভাগ ও খণ্ডীকরণের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে তার চকবন্দীকরণ বা সংহতি সাধনে (consolidation of holdings) অগ্রগতিও উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৯-৬০ সালের শেষভাগে প্রায় ২৩ মিলিয়ন একর জমির সংহতি সাধন হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় জমির চকবন্দীকরণের লক্ষ্য ছিল ২৮ মিলিয়ন একর, এই পরিকল্পনার প্রথম চার বৎসরে প্রায় ২৫.৫ মিলিয়ন একর জমির চকবন্দীকরণ সমাধা হয়েছে বলে জানা যায়। জোতজমির উপবিভাগ ও খণ্ডীকরণের মূলে যে বিশৃঙ্খল উত্তরাধিকার আইন, অনিয়মিত ও অনিয়ন্ত্রিত হস্তান্তর ও ইজারা প্রভৃতি রয়েছে, তাদের উচ্ছেদের জন্যও চেষ্টা চলেছে। ১৯৬৭ সালে কয়েকটি রাজ্য-সরকার ভূমিরাজস্ব থেকে কৃষকদের অব্যাহতি দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

কৃষির আদমসুমারী

ভূমিসংস্কারের অগ্রগতি

ভূমি রাজস্ব থেকে কৃষকদের অব্যাহতি

কিন্তু সামগ্রিক বিচারে ভারতবর্ষে ভূমিসংস্কারের অগ্রগতি খুব আশাপ্রদ নয়। বেনামদারি হস্তান্তরের মাধ্যমে জমির মালিকেরা অনেক জমিই নিজেদের হাতে রেখেছে এবং তথাকথিত স্বেচ্ছামূলক সমর্পণ ও অন্যান্য কৌশলের সাহায্যে তারা চাষীদের উচ্ছেদ করেছে। তৃতীয় পরিকল্পনাই বলা হয়েছে, আইনের দ্বারা প্রজাদের স্বত্ব স্থায়ি করা সম্ভব হয়নি, জমিদারেরা তাদের উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়েছে। তারা জমির সংহতিসাধনকেও বহুলাংশে ব্যাহত করেছে। পরিকল্পনা

কমিশনের ভূমি-সংস্কার কমিটি ১৯৬৬ সালের শেষভাগে তাঁদের বিবরনীতে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, ভূমিসংস্কারে উচ্চতম গতি অনুসৃত না হলে চতুর্থ পরিকল্পনার কৃষির লক্ষ্য গুরুতর ভাবে ব্যাহত হবে। এই কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে আমাদের একথাই মনে হয় যে সরকারের ভূমিনীতির রূপায়ণ আরও বলিষ্ঠ হওয়া উচিত ছিল, জমিদার জোতদার শ্রেণী গ্রামীন অর্থনীতির কেন্দ্রীয় শক্তিকে যে কৌশলে করায়ত্ত করে রেখেছে, তার মূলে প্রবল ভাবে আঘাত করা হয় নি। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় পর্যন্ত কয়েকটি রাজ্যে মধ্য স্বত্ব ভোগীদের বিলোপ সাধনে অগ্রগতি ঘটলেও পরিকল্পনা কমিশন জমিতে পরিশ্রমকারী প্রকৃত চাষী ও 'গায়ে না-খাটা' পরশ্রমজীবি চাষীর মাধ্যে কোনও পার্থক্য রাখেননি; জমিতে পরিশ্রম করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন নি। এ ছাড়া পরিকল্পনায় জমির স্বত্বের কোনও সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করে না দেওয়ায় ভাগ চাষীরা স্বত্ব আইনের পরিধির বাইরেই রয়েছে। ভূমি সংস্কার কমিটি বিভিন্ন রাজ্যে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার অগ্রগতির যে সমীক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাতে দেখা যায়, ভূমি সংস্কার আইনে এখনও অনেক দুর্বলতার ছিদ্র রয়ে গেছে। ভাগ চাষ প্রথায় এখনও কোথাও কোথাও বিস্তৃত অঞ্চলে চাষ করা হচ্ছে। তথা-কথিত সমর্পণ ব্যবস্থার নামে চাষীদের উচ্ছেদ এখনও অব্যাহত। কয়েকটি রাজ্যে ভূমির কর ন্যায্য করার নির্দেশ সুষ্ঠু ভাবে কার্যকরী করা হয়নি। হস্তান্তর ও খণ্ডীকরণের মাধ্যমে জোত জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত আইনটি লঙ্ঘন করা হচ্ছে এবং তার ফলে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণের মত বণ্টনযোগ্য জমি বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যক্তিগত চাষের নামে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এখনও কার্ষিত প্রজার দ্বারাই চাষ হচ্ছে।

ভূমিসংস্কারের মন্থর গতি

ভাগচাষীদের অবস্থা

সমর্পণ ব্যবস্থার মাধ্যমে চাষী উচ্ছেদ

ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থার এই সকল ত্রুটি দূর করার জন্য কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো করেছেন: প্রথমত, ব্যক্তিগত চাষের নামে বণ্টিত জমি পুনর্দখলের নীতি বন্ধ করতে হবে; দ্বিতীয় চাষীর স্বত্বের নিরাপত্তা বিধানের জন্য মালিক ও চাষীর মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অবসান ঘটাতে হবে; তৃতীয়ত, জমির ভাড়া নগদ মুদ্রায় পরিণত করা দরকার, সরকার চাষীদের কাছ থেকে ঐ ভাড়া আদায় করার পর আদায়ের খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্টাংশ মালিককে দেবেন। এই সুপারিশগুলোর

ভূমিসংস্কার কমিটির রিপোর্ট

বাস্তব রূপায়ণের তদারক, চাষীদের স্বত্বের সঠিক নিবন্ধ বা রেকর্ড প্রস্তুত করা এবং চাষীদের আর্থিক প্রয়োজনের ওপর দৃষ্টি রাখার জন্য ভূমিসংস্কার কমিটি প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের সুপারিশও করেছেন। ইতোমধ্যেই বিহার, জম্মু ও কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ ও ত্রিপুরায় এই জাতীয় কমিটি গঠিত হয়েছে।

উপসংহার

কিন্তু আমাদের দীর্ঘকালের বেদনাময় অভিজ্ঞতায় একথাই বার বার নির্মম সত্য রূপে প্রমাণিত হয়েছে যে কমিটি, প্রস্তাব, সুপারিশ, কর্মসূচী ইত্যাদি এখানে রচনা করা যত সহজ, তাদের বাস্তব রূপায়ণ ঠিক ততটাই কঠিন। বহু পূর্বেই জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি ভূমিসংস্কারের জন্য কতকগুলো সুদূর-প্রসারী ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছিলেন, যেমন, সমস্ত জমির মালিকানা সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের জনসাধারণের অধিকারে এবং ঐ জমির ব্যবহারজনিত লভ্যাংশ বা উদ্বৃত্তও সমষ্টির অধীনে আনয়ন, উত্তরাধিকার প্রথা রদ, মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপসাধন ইত্যাদি। অর্থনৈতিক কমিটিও এই প্রস্তাব করেছিলেন যে, যে সকল জমিদার চাষ করেন না, তাদের জমি গ্রামসমবায়ের অধীনে আনয়ন করতে হবে, জমির মালিকানার সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়ে, উদ্বৃত্ত জমি গ্রামসমবায়ের হাতে অর্পণ করতে হবে। যে চাষী ক্রমান্বয়ে ছয় বৎসর ধরে চাষরত, জমির মালিকানা তাকেই দিতে হবে, জমির মালিক তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ঐ জমির পুনর্দখল পেতে পারেন, কিন্তু তাঁকে নিজে জমিতে চাষের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, কৃষি-সংস্কার কমিটিও এই সুপারিশ করেছিলেন। এই সমস্ত সুপারিশ সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা হলে আমরা দীর্ঘকাল ধরে যার জন্য চাতক পাখীর মতই তৃষ্ণার্ত হয়ে আছি, সেই কৃষি-বিপ্লব এদেশের মৃত্তিকায় ঘটে যেত, কৃষি-উন্নয়নে আমরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারতাম। লাঙল যার জমি তার, এই মৌলিক ভূমিনীতি বাস্তবে রূপায়িত না হলে চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি-উন্নয়নের কর্মসূচী সফল হবে না, খাদ্যশস্যের অভাবেও তার জন্য বিদেশের করুণার ওপর নির্ভরতায় সাম্প্রতিককালের থেকেও আরও ভয়াবহ ও বিপজ্জনক সংকটের কৃষ্ণচ্ছায়ায় জাতীয়জীবন আচ্ছন্ন হবে, এ কথা যেন আমরা সকল সময়েই স্মরণে রাখি।

ভারতের জলসেচব্যবস্থা

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- ভারতের বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা।
- ভারতের বন্যানিয়ন্ত্রণ
- ভারতের কৃষি উন্নয়নে জলসেচব্যবস্থার ভূমিকা
- দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা

ভারতের মৃত্তিকার ফলনশক্তির খ্যাতি আবহমানকালের। কিন্তু উপযুক্ত সেচব্যবস্থার লালনের অভাবে সেই উর্বরা মৃত্তিকাই বন্ধ্যা হয়ে উঠেছে, ক্ষুধার অন্নের জন্য ভারতবাসী আজ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর কৃপাপ্রার্থী। অথচ এদেশের বহু অঞ্চলেই নদনদীর সংখ্যা প্রচুর, মৌসুমী জলবায়ুর বৃষ্টির প্রসাদও সচরাচর অকৃপণ। কিন্তু সুপরিকল্পিত সেচব্যবস্থার অভাবের জন্য বৃষ্টির অপরিমিত প্রাচুর্যে কখনও নদীগুলোর দুকূলপ্লাবী বন্যায় কৃষির অপরিসীম ক্ষতি করেছে, কখনও বা অনাবৃষ্টিতে ভারতের কৃষিভূমি মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে, তার শুষ্ক অন্তরে জলের কান্না আকুল হয়ে উঠলেও নির্মেঘ অগ্নিবর্ষী আকাশ থেকে একটুও করুণার অশ্রু ঝরে পড়েনি।

প্রারম্ভ

ভারতের কৃষি মৌসুমী জলবায়ুর জুয়োখেলা, বহুদিন ধরে উচ্চারিত এই উক্তিটি যে বর্তমানকালেও কত মর্মান্তিক সত্য, তা আমাদের কঠিন, নির্মম অভিজ্ঞতায় বুঝতে হচ্ছে। ভারতবর্ষে জল জমি অপেক্ষাও মূল্যবান, ট্রেভিলিয়ানের এই উক্তিটি কোনও মতেই অতিরঞ্জিত নয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণের তারতম্য অনুযায়ী ভারতবর্ষকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে: এক, রাজপুতানা, পাঞ্জাবের দক্ষিণপশ্চিম অংশ প্রভৃতি বৃষ্টিপাতহীন অঞ্চল, এখানে সেচব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক; দুই, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি বৃষ্টিপাতের অনিশ্চিত সম্ভাবনা-অঞ্চলেও সেচব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন; তিন, বাঙলা, আসাম প্রভৃতি নিশ্চিত বৃষ্টিপাত অঞ্চলে অনেক সময় বৃষ্টিপাতের যে মাত্রাধিক্য দেখা যায়, তার নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্যও যথোপযুক্ত সেচব্যবস্থার প্রয়োজন। শীতকালের রবিশস্যের বর্ষার জললাভের কোনও সম্ভাবনা থাকে না বলেও তার জন্য জল ধরে রাখার মত সেচব্যবস্থা গড়ে তোলা আবশ্যক। বস্তুত ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের জন্যই সেচব্যবস্থার প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে চার রকম সেচব্যবস্থা প্রচলিত: পুষ্করিণী, কূপ, নলকূপ এবং খাল। প্রাচীনকালে প্রজাহিতৈষী রাজাদের চেষ্টায় কূপ, জলাশয় ও খাল এই তিন ধরণের

সেচব্যবস্থার সুযোগই কৃষকেরা লাভ করত। পলিমুক্ত করে নদীর ধারাকে অব্যাহত রাখার প্রতিও তাঁদের দৃষ্টি ছিল। কিন্তু এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইংরেজ বণিকেরা সীমাহীন নিলজ্জতায় সম্পদ লুণ্ঠনে মত্ত হয়ে সেচের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করেছিল, এতে ভারতের জলাশয়, কূপগুলো ক্রমশ মজে গেছে, অসংখ্য নদীর গতিপথ রুদ্ধ হবার ফলে তারা বদ্ধ শৈবালদাম ও কচুরিপানায় পূর্ণ পঙ্ককুণ্ডে পরিণত হয়েছে, ভারতীয় কৃষকেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে হাহাকার করে উঠেছে। কিছুকাল পরে বিদেশী শাসককে বাধ্য হয়েই কোথায়ও কোথায়ও আধুনিক সেচব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হয়। ১৯০১-'৩ সালের ভারতীয় সেচকমিশনের প্রদত্ত সুপারিশ অনুযায়ী কয়েকটি আধুনিক বৃহৎ সেচপরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়। পাঞ্জাবের তিনটি প্রধান নদীর জল ব্যবহারের জন্য ট্রিপ্‌ল্ ক্যানেল পরিকল্পনা, সিন্ধু প্রদেশের সুক্কুরে পৃথিবী বিখ্যাত লয়েড বাঁধ, পাঞ্জাবের শতদ্রু উপত্যকা পরিকল্পনা, যুক্তপ্রদেশের সারদাখাল পরিকল্পনা, মাদ্রাজের কাবেরী বাঁধ পরিকল্পনা প্রভৃতি ইংরেজ আমলের বিশিষ্ট সেচব্যবস্থা হিসেবে উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অপর্যাপ্ত। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর উপরি উল্লিখিত সেচব্যবস্থার অধিকাংশই পাকিস্তান লাভ করল, ভারতকে একেবারে গোড়া থেকেই কাজ শুরু করতে হল।

প্রাচীন ভারতের সেচব্যবস্থা ও ইংরেজ আমলের সেচব্যবস্থা

কৃষির উন্নয়ন ছাড়া শক্তি উৎপাদন ও পরিবহনের সুযোগসুবিধার সম্প্রসারণের দিক থেকেও সেচব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাগুলোয় জলসেচকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনার পূর্ব থেকে এবং এই পরিকল্পনাকালে ৭২০ কোটি টাকার ব্যয়ে বিভিন্ন জলসেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে মোট কৃষিজমির শতকরা ২৭·৫ ভাগ অংশে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল, প্রথম পরিকল্পনায় নতুন জল-সেচের ব্যবস্থাসংবলিত ভূমির বৃদ্ধির পরিমাণ হয় ১·৫০ কোটি একর। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃহৎ ও মাঝারি সেচ প্রকল্পের জন্য ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৪১৫ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনাকালে সমস্ত রকমের সেচব্যবস্থা দ্বারা সিঞ্চিত জমির বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ২·১০ কোটি একরে দাঁড়ায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার সেচব্যবস্থা

তৃতীয় পরিকল্পনায় সেচব্যবস্থা ও বন্যানিয়ন্ত্রণ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৬৫৭ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনা শেষে প্রায় ১৩·৮ মিলিয়ন একর জমি সেচের সুবিধা

লাভ করেছে। ভারতবর্ষের নদীর ১৩৬০ মিলিয়ন একর ফিট জলসম্পদের মধ্যে মাত্র প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন একর ফিট সেচের কাজে লাগানো যায়। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তার মধ্যে ৭৬ মিলিয়ন একর ফিট সম্পদ ব্যবহৃত হয়েছে, তৃতীয় পরিকল্পনায় তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন একর ফিটে দাঁড়ায়। চতুর্থ পরিকল্পনায় আরও ৫০ মিলিয়ন একর ফিট বৃদ্ধি পেতে পারে। চতুর্থ পরিকল্পনায় বন্যানিয়ন্ত্রণ ও সেচের জন্য ৯৬৪ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাবিত হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে নতুন সেচসিঞ্চিত জমির পরিমাণ হবে ৯ মিলিয়ন একর। এই পরিকল্পনায় কৃষকের জমিতে সেচের জল পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হয়। নির্মীয়মাণ সেচব্যবস্থাগুলোর সম্পূর্ণতাসাধন এবং কয়েকটি নতুন বৃহৎ ও মাঝারি সেচ-প্রকল্প গ্রহণকেও অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় সেচের অগ্রগতি ও চতুর্থ পরিকল্পনার কর্মসূচী

ভারতের সেচব্যবস্থার প্রধানতম ভিত্তি হল বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, মাল ও যাত্রী পরিবহন, মৎস্যচাষ প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্য একই পরিকল্পনার মাধ্যমে সাধন করা যায় বলে তাদের এই নামকরণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে নদীর ওপর কন্‌ক্রিটের বাঁধ দিয়ে জলাশয় বা কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি করা হয়, তার থেকে খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল সন্দেহ নেই, কিন্তু তার থেকে যে সমস্ত সুফল পাওয়া যায়, তা অন্য ধরনের পরিকল্পনা থেকে লাভ করা সম্ভব নয়। আমরা নীচে ভারতের প্রধান বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনাগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি, তাতেই এদেশের বিপুল কর্মযজ্ঞের মোটামুটি উজ্জ্বল রেখাচিত্র পাওয়া যাবে।

বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা

বাঙলার দামোদর নদ গ্রামীণ বাঙলার বহুলোকের জীবনহানি ও সম্পত্তি-নাশের কারণ হয়েছে, তাই সে 'দুঃখের নদী' নামেই পরিচিত ছিল। আমেরিকার বিখ্যাত টেনেসি পরিকল্পনার ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ডব্লিউ. এল. ভুরডুইন ভারত সরকারের অনুরোধ অনুযায়ী দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা রচনা করেন এবং তার রূপায়ণের জন্য ১৯৪৮ সালে দামোদর-উপত্যকা কর্পোরেশন গঠিত হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দামোদরের তিলাইয়া, মাইথন কোনার এবং পাঞ্চেৎ এই চারটি বাঁধ নির্মিত হয়েছে। তিলাইয়া বাঁধ থেকে ৪০,০০০ হেক্টর জমিতে, কোনার

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা

বাঁধ থেকে ৪০,০০০ হেক্টর জমিতে, মাইথন বাঁধ থেকে ১'০৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ সম্ভব হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে দামোদর নদের ওপর একটি সেচ-বাঁধ নির্মিত হয়েছে, এর মাধ্যমে প্রায় ৩'৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে। দামোদর পরিকল্পনার ফলে ৩'৫ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপন্ন হচ্ছে। পাঞ্চেৎ ও বোকারো কেন্দ্রগুলো থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হচ্ছে, বিভিন্ন শিল্পে তার ব্যবহার ভারতের শিল্পায়নের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত পাঞ্জাবের বহুমুখী নদী পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাকরা নামক স্থানে শতদ্রু নদীর ওপর একটি বাঁধ দেওয়া হয়েছে, ভাকরা বাঁধের দৈর্ঘ্য ৫১৮ মিটার, উচ্চতা ২২৬ মিটার, এটাই পৃথিবীর সর্বোচ্চ বাঁধ। শতদ্রু নদীর ওপর নাঙ্গাল নামক স্থানে আর একটি বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, এই নাঙ্গাল বাঁধের উচ্চতা ৯০ ফুট। এই পরিকল্পনায় পাঞ্জাব এবং রাজস্থানের প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছে। ভাকরা নাঙ্গাল পরিকল্পনায় প্রায় ১৭৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এই পরিকল্পনায় মোট ২৬'৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে এবং তার ফলে প্রায় ১৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হচ্ছে। এই পরিকল্পনাধীনে ভাকরা, গাঙ্গুয়াল ও কোটলায় যে তিনটি শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, তাতে প্রায় ৪ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে।

ভাকরা নাঙ্গাল পরিকল্পনা

উড়িষ্যার অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহানদী পরিকল্পনার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বে এই নদীর বন্যায় উড়িষ্যার বহু সর্বনাশ হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্বলপুরের ১৪ কিলোমিটার পশ্চিমে ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ হীরাকুঁদ বাঁধ নির্মিত হয়েছে, এই বাঁধের দৈর্ঘ্য ৪'৮ কিলোমিটার। হীরাকুঁদ বাঁধের পশ্চাতে একটি বৃহৎ জলাশয় সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বাঁধ থেকে প্রায় ২'৬৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ সম্ভব হয়েছে এবং তার ফলে প্রতি বৎসর ৩'৫ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হচ্ছে। এই বাঁধ থেকে ১'১৮ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে, রাউরকেল্লা, হীরাকুঁদ, ব্রজরাজনগর ইত্যাদি শিল্পাঞ্চলগুলোয় তার সরবরাহ উড়িষ্যার শিল্প-সমৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

মহানদী পরিকল্পনা

কুশীনদীও 'বিহারের দুঃখ' বলে অভিহিত হয়ে এসেছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কুশী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এই পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ১৭৭ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিহার-

নেপাল-সীমান্তে হনুমাননগরে একটি সেচবাঁধ দিয়ে প্রায় ৫৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা প্রসারিত করা হবে। শতদ্রু নদীর হারিকে বাঁধ থেকে খাল কেটে, তাকে 'রাজস্থান ফীডার' ও 'রাজস্থান খাল' এই দুভাগে বিভক্ত করে রাজস্থানে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার কর্মসূচী ১৯৭৫-৭৬ সালে সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়।

কুশীনদী পরিকল্পনা ও রাজস্থান খাল পরিকল্পনা

রিহাণ্ড পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশের শোণ নদীর শাখা রিহাণ্ড নদীর ওপর পিপরী নামক স্থানে একটি বাঁধ নির্মিত হয়েছে, এই বাঁধের পশ্চাতে ভারতের যে বৃহত্তম জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে, তার থেকে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে প্রায় ৭.৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচন করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনায় প্রায় ২.৫ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। চম্বল পরিকল্পনা অনুযায়ী যমুনানদীর উপনদী চম্বলের ওপর বাঁধ দিয়ে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের প্রায় ৪.৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ৭৫ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জলচুক্তি অনুযায়ী বিপাশা নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে রাজস্থান ও পাঞ্জাবে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের হাসদেও পরিকল্পনাও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রিহাণ্ড, চম্বল ও বিপাশা পরিকল্পনা

দক্ষিণ ভারতের নদীপরিকল্পনাগুলোর মধ্যে তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষ্ণানদীর প্রধান শাখা তুঙ্গভদ্রা নদীর ওপর মহীশূর রাজ্যের মালাপুরমে একটি বাঁধ নির্মিত হয়েছে, এই বাঁধ থেকে মহীশূর ও অন্ধ্ররাজ্যে ৩.৩৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্ধ্ররাজ্যের নাগার্জ্জুনসাগরে কৃষ্ণানদীতে বাঁধ দিয়ে প্রায় ৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। গুজরাট রাজ্যে সুরাটের নিকটস্থ তাপ্তী নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে ২.৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এই পরিকল্পনার নাম নাকড়াপাড়া পরিকল্পনা। অন্ধ্র ও মাদ্রাজ সরকারের যৌথ উদ্যোগে সঙ্গমেশ্বরম পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর সঙ্গমস্থলের নিকস্থ সঙ্গমেশ্বরমে কৃষ্ণা নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে অন্ধ্র ও মাদ্রাজের প্রায় ১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ সম্ভব হয়েছে। উড়িষ্যা ও মহীশূর সরকারের

তুঙ্গভদ্রা, নাগার্জ্জুনসাগর, তাপ্তী, নাকড়াপাড়া, সঙ্গমেশ্বরম, মচকুন্দ পরিকল্পনা

যুগ্মপ্রচেষ্টায় উভয় রাজ্যের সীমানাস্থিত মচকুন্দ নদীতে বাঁধ নির্মাণে জলসেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহের দিক থেকে উভয় রাজ্য উপকৃত হয়েছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা অনুযায়ী বিহারের ম্যাসানজোরে ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর একটি বাঁধ নির্মিত হয়েছে, এই নির্মাণে কানাডার সহযোগিতা লাভ করা গিয়েছিল বলে এটা কানাডা বাঁধ নামে অভিহিত হয়। এই বাঁধের সাহায্যে ৪,০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। এই নদীতেই পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার তিলপাড়ায় একটি সেচ-বাঁধ নির্মিত হয়েছে, এর দুই দিকে খাল খনন করে এই জেলায় প্রায় ২.৯১ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচন করা হচ্ছে, এর ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ মেট্রিক টন।

ফারাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা

দীর্ঘকাল পূর্বে গঙ্গানদীর প্রধান স্রোত ভাগীরথী থেকে সরে গিয়ে বর্তমানে পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পদ্মানদীকে আশ্রয় করায় ভাগীরথী-হুগলী নদী ক্রমাগত পলিসঞ্চয়ে জাহাজ চলাচলের পক্ষে অনুপযোগী হয়ে উঠেছে এবং কলকাতা বন্দরের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। সেই জন্য গঙ্গাবাঁধ বা ফারাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় ধুলিয়ানের নিকট তিলডাঙ্গা নামক স্থানে গঙ্গার ওপর একটি বাঁধ নির্মিত হচ্ছে, এর নাম দেওয়া হয়েছে ফারাক্কা বাঁধ। এই বাঁধ থেকে একটি খাল খনন করে ভাগীরথীর সঙ্গে যুক্ত করা হবে। তার ফলে গঙ্গা নদীর প্রধান স্রোত ভাগীরথীতে পুনরায় প্রবাহিত হবে, ভাগীরথী হুগলীনদী আবার জলপুষ্ট, প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠবে। তখন অন্যান্য সুবিধার সঙ্গে জলসেচের সুযোগসুবিধাও লাভ করা যাবে। এই পরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিমাণ হবে প্রায় ৬৮.৫৯ কোটি টাকা।

উপসংহার

১৯৬৪-৬৫ ও ১৯৬৫-৬৬ এই পর পর দুই বৎসরে নিদারুণ অনাবৃষ্টি কৃষির গুরুতর ক্ষতিসাধন করেছে; তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ে ও চতুর্থ-পরিকল্পনার প্রথম পর্বে শোচনীয় খাদ্যাভাবের ফলে জাতীয় জীবনে সংকটের কালোছায়া ঘনিয়ে এসেছে। কেন্দ্রীয় সেচ ও শক্তি মন্ত্রী ডাঃ কে. এল: রাও যথার্থই বলেছেন, আমরা যদি ১০২ মিলিয়ন একর জমিকে সেচব্যবস্থার অধীনে আনতে পারি, তাহলেই খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারব। প্রকৃতির খামখেয়াল ও খুশির ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না, ভারতের মৃত্তিকা যাতে সম্পূর্ণরূপেই আমাদের অন্নদাত্রী হতে পারে, সেচব্যবস্থার মাধ্যমে তার অনুকূল পরিবেশ রচনার দায়িত্ব আমাদের স্বহস্তে গ্রহণ করতে হবে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

- ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র গঠনের লক্ষ্য
- ভারতের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনে অগ্রগতি
  ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তিন দশক
  ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর রাষ্ট্রের সার্বিক কর্তৃত্বে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন—অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সার্থকতা সম্বন্ধে প্রচণ্ড বাতপ্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ হায়েকের মতে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা জনসাধারণকে ক্রীতদাস করে তোলার উপায় মাত্র। হায়েক এবং তাঁর মতানুগামী অর্থনীতিবিদেরা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরোধী এবং ব্যক্তিগত উদ্যমের সমর্থক। অন্যদিকে মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদরা ছাড়াও বিখ্যাত জার্মান অর্থনীতিবিদ শুম্পিটার বা সমাজবিজ্ঞানী ম্যানহাইমের মত গণতন্ত্রের মৌল নীতির পূজারী মনীষীরা গণতান্ত্রিক কাঠামোয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষপাতী। যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় লক্ষ্য গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সাম্যের সমন্বয়, বর্তমানে পৃথিবীর অনেক চিন্তাশীল মানুষের কাছে সেটাই সব থেকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। ভারতবর্ষও এই জাতীয় পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডিকিনসন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তা উদ্ধৃতি যোগ্য: Economic Planning is the making of major economic decisions—what and how much is to be produced, and to whom it is to be allocated by the conscious decision of determinate authority, on the basis of a comprehensive survey of the economic system as a whole, অর্থাৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হচ্ছে কয়েকটি বিশেষ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত—কোন্ জিনিস কত পরিমাণ উৎপাদন করতে এবং কি ভাবে তা বণ্টন করতে হবে, সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষার ভিত্তিতেই একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সচেতন সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই এসমস্ত নিরূপিত হয়। এই কর্তৃপক্ষ হল রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রনিযুক্ত পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষ।

ভারতবর্ষের পরাধীনতার সময়েই জাতীয় আন্দোলনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা স্থান পেয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গঠনের লক্ষ্য স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক নেতার কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে জাতীয় কংগ্রেস দলের তৎকালীন সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু শ্রীজহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেছিলেন। কিন্তু এই কমিটি থেকে কোনও পরিকল্পনা পাওয়া যায় নি। ১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ের কয়েকজন পুঁজিপতি সম্মিলিত ভাবে 'বোম্বাই পরিকল্পনা' নামে একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করেন, মূল ও ভারী শিল্পের ওপর গুরুত্ব দিয়ে ১৫ বৎসরের মধ্যে ১০,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করা এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল। অতঃপর ১৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ১০ বৎসরের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্য সংবলিত এম, এন, রায়ের গণপরিকল্পনা প্রকাশিত হল। ওয়ার্ধা থেকে শ্রীযুক্ত এম, এন, আগরওয়ালা 'গান্ধীবাদী পরিকল্পনা' নামে যে পরিকল্পনা প্রকাশ করেন, তাতে যন্ত্রশিল্পকে পরিহার করে মূলত কৃষি ও কুটির শিল্পের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বিকেন্দ্রিক (decentralised) অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য ৩,৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষে বাস্তব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োগের কিংবা তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার কোনও সুযোগ ছিল না।

ভারতবর্ষের পরিকল্পনার পূর্ব ইতিহাস

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর দেখা গেল, ইংরেজের দীর্ঘকালব্যাপী যথেচ্ছ শোষণে এই দেশ দৈন্যের চরম সীমায় উপনীত, তার কৃষি ও খনিজ সম্পদ জনশক্তি সমস্তই বিদেশী শাসক নির্মমভাবে লুণ্ঠন করে তার ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছে, তাদের উন্নয়নের নূতনতম প্রয়োজনও অবহেলিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মত অনুন্নত, পশ্চাদপদ দেশের কৃষি, বিশেষত দ্রুত শিল্পায়নের সামগ্রিকভাবে পরিকল্পিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রই গ্রহণ করতে পারে, দেশের কল্যাণকামী প্রতিটি ব্যক্তিই তা অনুভব করেন। ভারতের এতদিনকার নিশ্চল, বিদেশী শাসকের শোষণভারজর্জরিত, স্থবির অর্থনীতিতে প্রাণশক্তি সঞ্চারে রাষ্ট্রের প্রধান ভূমিকা ও ব্যাপক নেতৃত্ব অপরিহার্য। ব্রিটেন ও আমেরিকায় অর্থনৈতিক শক্তির স্বাভাবিক বিকাশের ধারানুযায়ী

স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

ব্যক্তিগত উদ্যোগে, পুর্ণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে ভাবে শিল্পসমৃদ্ধি ঘটেছে, আমাদের দেশে সেটা আর সম্ভব নয়। ভারত সরকার গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা রচনায় উদ্যোগী হলেন এবং ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন স্থাপন করলেন। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মূলনীতিগুলোর সমন্বয়ে জনগণের কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রগঠনের (Welfare-state) প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখাকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হল।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশেরই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভিন্ন কালানুক্রমিক স্তর বা পর্যায় সংবলিত একটি ধারাবাহিক, অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার পাঁচবৎসর বা এক একটি কালাংশ সেই প্রক্রিয়ারই সোপান শ্রেণীর মত এক একটি ধাপ, স্তর। এই কালাংশগুলোর যেমন দেশের সমকালীন বিশেষ অর্থনৈতিক সমস্যা ও প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার অধীনে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য, তাদের জন্য অর্থ-বরাদ্দ ও তার অর্থ-সংস্থানের উৎস নিরূপণ করে এক একটি স্বতন্ত্র পরিকল্পনা রচনা করতে হয়, তেমনি তাদের একটি বিস্তৃত, দীর্ঘকাল প্রসারিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যেও স্থাপন করতে হয়। পরিকল্পনার এই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত (Perspective of Plannaing) সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন: পরিকল্পিত উন্নয়নের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জীবনধারণের মানোন্নয়ন নয়, পরন্তু যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মধ্যে সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় (Justice) জাতীয় জীবনের সকল সংস্থায় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়বে তার মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক ও অর্থনীতিক বিন্যাস সৃষ্টি করাও তার উদ্দেশ্য। স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রে (Constitution) রাষ্ট্রের নির্দেশক নীতিতে জীবিকাধারণের যথোচিত ব্যবস্থা, কর্ম ও শিক্ষালাভের অধিকার, বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে, অসুস্থতায়, অক্ষমতায় এবং অন্যান্য ধরনের অবাঞ্ছিত অভাবের ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকারকে সামাজিক লক্ষ্যরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, সেই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে, এই সকল আদর্শ রূপায়ণের জন্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে বণ্টন করতে হবে যাতে সর্বসাধারণ উপকৃত হয় এবং অর্থনীতি যেন এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে সম্পদ ও অর্থনৈতিক শক্তি পুঞ্জীভূত না হয়।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত

এই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৫১—'৫৬) সরকারি অংশে ১৯৬০ কোটি টাকা এবং বেসরকারি অংশে ১৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। উৎপাদনী শক্তিবৃদ্ধি, আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস, জাতীয় আয়ের অন্তত শতকরা ১৩ ভাগ বৃদ্ধি, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি ছিল এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। প্রথম পরিকল্পনার কর্মসূচীতে কৃষিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। এই

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি ও মূল্যায়ন

পরিকল্পনাকালে কৃষি উৎপাদন শতকরা ২২ ভাগ, শিল্প-উৎপাদন শতকরা ৩৯ ভাগ এবং জাতীয় আয় শতকরা ১৮°৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনার ঘোষিত সাফল্যের মূল্যায়নে সমালোচকেরা বলেছেন, এই পরিকল্পনা কালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল কৃষির পক্ষে বিশেষ অনুকূল, সেইজন্য এই সময় কৃষিক্ষেত্রে যে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে, তা পুরোপুরিভাবে পরিকল্পনান্তর্গত কর্মসূচী অনুসরণেরই ফসল, এটা ধরে নিলে ভুল করা হবে। এই পরিকল্পনায় বৃহৎ জলসেচ প্রকল্পগুলোর পরিবর্তে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে অধিক সংখ্যায় ছোট ও মাঝারি সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির উপযোগী যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও সার উৎপাদন প্রভৃতির ওপর যে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ছিল, তা পরবর্তী কালে কৃষি উন্নয়নে শোচনীয় ব্যর্থতার অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন, বিশেষত কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসার যথোচিত গুরুত্ব লাভ করেনি; সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার মৌলনীতি হিসেবে যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রসার অধিকতর কাম্য, সেখানে শিল্পোন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব প্রধান বেসরকারি সংস্থার ওপর ন্যস্ত করা অনুচিত হয়েছে। এই পরিকল্পনাকালে বেকার সমস্যা সমাধানের অগ্রগতি মোটেই আশাপ্রদ নয়, প্রকৃত আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি স্বল্প, এক কথায় জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতির হার আশানুরূপ নয়।

উৎপাদন ও কর্মসৃষ্টি এবং আর্থনীতিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে উন্নয়নের পদ্ধতি এবং যে পথে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হবে তাকে প্রথম থেকেই সমাজের মৌলিক আদর্শগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হবে—গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র গঠনের উপযুক্ত আবহ রচনার এই লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৬ এপ্রিল—১৯৬১ মার্চ) রচিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যগুলো ছিল এই: প্রতি বৎসরে ৫ শতাংশ হারে জাতীয় আয়ের মোট ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি, ১ কোটি ২০ লক্ষের

মত ব্যক্তির কর্মসংস্থান করে বেকারি হ্রাস, মূল ও ভারি শিল্পের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে দ্রুত শিল্পায়নের ভিত্তি নির্মাণ, আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস ও অর্থনৈতিক শক্তির অধিকতর সুষম বণ্টনের তথা অর্থনৈতিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথের প্রশস্তীকরণ। এই লক্ষ্যগুলো পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। বাহ্যিক কাঠামো বা রূপরেখার দিক থেকে বিশেষ কোনও পার্থক্য না থাকলেও প্রথম দুটি পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গিগত স্বাতন্ত্র্য লক্ষনীয়: প্রথম পরিকল্পনা সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা হিসেবে রচিত হয়েছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে সরকারি সংস্থার ভূমিকাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দান করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারি অংশে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪,৬০০ কোটি টাকা, বেসরকারি অংশে ব্যয়ের পরিমাণ ৩,৩০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আয়তন ছিল প্রথম পরিকল্পনায় দ্বিগুণ। এই পরিকল্পনাকালে কৃষি উৎপাদন আরও শতকরা ২০ ভাগ, শিল্প-উৎপাদন শতকরা ৪১ ভাগ এবং জাতীয় আয় শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সমস্ত অগ্রগতি সত্ত্বেও বেকার সমস্যার তীব্রতা, অত্যবশ্যক পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, ঘাটতি-ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতির অশুভ কৃষ্ণছায়া, বৈদেশিক বিনিময়ের ঘাটতি, আয় ও সম্পদে বৈষম্য হ্রাসের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় শ্রেণীর হাতে অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীভবন—এই অশুভ লক্ষণগুলো দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আত্মপ্রকাশ করে। বলা বাহুল্য, এদের কোনওটিই শোষণ-মুক্ত সমাজগঠন ত দূরের কথা, স্বয়ংপোষিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের (self-sustained growth) দৃঢ় ভিত্তি গঠনের দিক থেকেও আশ্বাসজনক নয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি ও তার মূল্যায়ন

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল পাঁচটি: প্রতি বৎসর প্রায় শতকরা ৬ ভাগ হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং পরবর্তী পরিকল্পনাগুলোয়ও উন্নয়নের এই হার বজায় রাখার জন্য বিনিয়োগের ধাঁচ রচনা, খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং শিল্প ও রপ্তানির প্রয়োজন পূরণের জন্য কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি; আগামী দশবৎসরের মধ্যেই যাতে শিল্পোন্নয়নের সমস্ত প্রয়োজন মেটে তার জন্য ইস্পাত, রাসায়নিক শিল্প, জ্বালানি, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি মূল শিল্পের প্রসার এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষমতা গঠন; দেশের জনশক্তির যথাসম্ভব পূর্ণ ব্যবহার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগসুবিধার ব্যাপক প্রসার; আয় ও

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য

সম্পদের বৈষম্য হ্রাস এবং সুযোগসুবিধা ও অর্থনৈতিক শক্তির অধিকতর সুষম বণ্টন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, সেই সঙ্গে সরকারি সংস্থার অধীনে শিল্পায়নের ধারা বজায় রাখার কথাও পরিকল্পনা কমিশন উল্লেখ করেছিলেন। পনের বৎসর পরে দেশের অর্থনীতির স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের, অর্থাৎ দেশের আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ নিজস্ব শক্তিতেই উন্নয়নের হার বজায় রাখার স্তরে (take-off to self sustained growth) যাত্রার প্রয়াসও তৃতীয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত হয়েছিল।

তৃতীয় পরিকল্পনার আয়তন ছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনার দ্বিগুণ। এই পরিকল্পনায় সরকারি সংস্থায় বিনিয়োগের পরিমাণ ৭,৫০০ কোটি টাকা, আর বেসরকারি সংস্থায় বিনিয়োগের পরিমাণ ধার্য হয়েছিল ৪,১০০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে আমাদের কয়েকটি কঠিন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল; চীন ও পাকিস্তানের আক্রমণ ও তজ্জনিত প্রতিরক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি এবং পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ে অস্বাভাবিক অনাবৃষ্টি বা খরার প্রকোপ। তৃতীয় পরিকল্পনার সামগ্রিক শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য এই প্রতিকূল অবস্থাগুলো অংশত দায়ী সন্দেহ নেই, কিন্তু ১৯৬৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাৎসরিক রিপোর্টে এ প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে যুক্তিসঙ্গত: অর্থনীতির মধ্যে এমন কিছু উদ্বৃত্ত সহনক্ষমতা সঞ্চিত হওয়া উচিত যাতে এই সমস্ত আকস্মিক অতিরিক্ত চাপ সামলানো যায়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষভাগে ভারতবর্ষে যে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, পরিকল্পনাসংক্রান্ত মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির মৌলিক ত্রুটিবিচ্যুতিই নিঃসন্দেহে তার জন্য বহুলাংশে দায়ী।

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রতিকূল পরিবেশ

পরিকল্পনা কমিশনের নিজের স্বীকৃতি অনুসারে, তৃতীয় পরিকল্পনা সাধারণভাবে নৈরাশ্যজনক। এই পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার মাত্র ২·৫ শতাংশ। কৃষি উৎপাদন বাৎসরিক ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে আশা করা হয়েছিল, কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বৎসরে গড়ে ২·৮ শতাংশের অধিক হারে কৃষির অগ্রগতি সম্ভবপর হয়নি। এই পরিকল্পনার শেষভাগে কৃষি উৎপাদনের শোচনীয় হ্রাসেই একটা গুরুতর রকমের আসন্ন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ইঙ্গিত পরিস্ফুট। তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হার শতকরা ৭০ ভাগ হবে, এই মূল হিসেবের তুলনায় বাস্তব ক্ষেত্রে প্রকৃত বৃদ্ধির হার শতকরা ৩৯ ভাগ। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগে জাতীয় আয়ের তুলনায় বিনিয়োগের হার ছিল ১৪ শতাংশ, কিন্তু

আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ ১০'৫ শতাংশের অধিক ছিল না। এই বৈষম্যের ফলে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অত্যধিক নির্ভরতা, বৈদেশিক মুদ্রাসংকট, করবৃদ্ধির দুর্বিসহ বোঝা, ঘাটতিব্যয় বৃদ্ধি এবং তার আনুষঙ্গিক কুফল মুদ্রাস্ফীতি ও অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্য, বিশেষত খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি গুরুতর অর্থনৈতিক ব্যাধিরূপে দেখা দিয়েছে। বৈদেশিক ঋণের পর্বতপ্রমাণ বোঝাও কম উদ্বেগজনক নয়। ১৯৬৭ সালে ৩১ মার্চে ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৪,৭৯৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যদিকে মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পরও রপ্তানি আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পায়নি। তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে জনসংখ্যা ২'৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় আয় যখন প্রায় নিশ্চলই ছিল, তখন মুদ্রার সরবরাহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই সরবরাহ মোট ৫৭'৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জাতীয় আয়বৃদ্ধির যে হিসেব আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে প্রকৃত আয়ের পরিমাণ যে নিতান্ত স্বল্প, তা জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতিজনিত পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির (তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পণ্যদ্রব্যের মূল্য ৩২'২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে) প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়।

তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতার জন্য অর্থনৈতিক সঙ্কট

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগে ও চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে যে ব্যাপক ও তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা আত্মপ্রকাশ করেছে, তা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই অশুভ। এই মন্দার অন্যতম প্রধান লক্ষণ খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও ঘাটতিতে গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন কৃষক শ্রমিক এবং নগরাঞ্চলের বাঁধা, নিম্ন আয়ের লোকেদের অবস্থাই হয়েছে সব থেকে শোচনীয়, তাদের আয়ের প্রকৃত মূল্যের চূড়ান্ত অবক্ষয় ঘটার জন্য নিছক অস্তিত্বরক্ষাও তাদের পক্ষে এক মর্মান্তিক, শ্বাসরোধকারী সংগ্রাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পগুলো অসংখ্য শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে এবং বহু শ্রমিকের ভাগ্য অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। অন্যদিকে মুষ্টিমেয় শিল্পপতি, ব্যবসায়ীরা মজুতদারি, ফাটকাবাজি, চোরাকারবারে নিজেদের মুনাফার অঙ্ককে স্ফীত করে ও কর ফাঁকি দেওয়া কালোটাকা জমিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ১৯৬৫ সালেই মনোপলি কমিশন মুষ্টিমেয় শ্রেণীর হাতে অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীভবন সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। পর পর তিনটি পরিকল্পনা শেষ হওয়া সত্ত্বেও ভারত টেক-অফ স্টেজ অর্থাৎ স্বয়ংনির্ভর

অর্থনৈতিক মন্দায় সাধারণ মানুষের দুর্গতি

অগ্রগতির ক্ষমতা অর্জনের ভিত্তি নির্মাণে ব্যর্থ হয়েছে এবং দেশে আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে তা ক্রমবর্ধমান। এই পরিবেশ নিশ্চয়ই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের দিক থেকে আশাব্যঞ্জক নয়।

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে অবশ্যই সমাজের ওপর কিছু কিছু প্রতিকূল চাপ এসে পড়ে। কিন্তু তার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে সাধারণ মানুষকেই দুর্গতির সকল বোঝা বহন করতে হবে, আর মুষ্টিমেয় শ্রেণীর হাতে সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির সমস্ত সুফল জমা হতে থাকবে। অবশ্য এই জটিল সমস্যা সম্পর্কে জাতীয় সরকার, পরিকল্পনা কমিশন ও অন্যান্য মহল সচেতন। চতুর্থ পরিকল্পনায় আপাতত ২৩ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তার মধ্যে সরকারি অংশের পরিমাণ ১৬ হাজার কোটি টাকা, বেসরকারি অংশের পরিমাণ ৭ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা আছে কিনা তা নিয়ে বর্তমানে বিতর্ক চলছে এবং এই পরিকল্পনার বিনিয়োগ এখনও চূড়ান্তভাবে স্থির হয় নি। চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এটা সত্যি আশাপ্রদ। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার পদ্ধতিকে অধিকতর সমাজতান্ত্রিক, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে অধিক পরিমাণে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর জাতীয়করণ, খাদ্যশস্যের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিপণন প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বিত না হলে আমাদের পরিকল্পনার মূল ভিত্তিটি দুর্বল থেকে যাবে এবং বেসরকারি ব্যবসায়ীরা তার সুযোগ গ্রহণ করবে।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালের দায়িত্ব

পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা যথেষ্ট পরিমাণে জাগ্রত করতে পারেনি, এটাও তার বেদনাদায়ক একটি মৌলিক ত্রুটি। জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার উৎসাহসঞ্জীবিত চেতনাকে যদি উদ্বুদ্ধ করা যায়, তবে তাই হবে পরিকল্পনার সব থেকে শক্তিশালী আয়ুধ, দধীচীর অস্থিনির্মিত বজ্রের মতই কঠিন ও অমোঘ।

উপসংহার

ভারতবর্ষের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গতি-সংগ্রহের সমস্যা
- চতুর্থ পরিকল্পনা ও দেশের অর্থনৈতিক স্বয়ং নির্ভরতা অর্জন
- ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট ও চতুর্থ পরিকল্পনা
- অর্থনৈতিক স্বয়ংনির্ভরতা অর্জনে ভারতের অগ্রগতি

অনুন্নত, পশ্চাদপদ অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে দেশকে উদ্ধার করে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠনের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে ভারতবর্ষ ব্রতী হয়েছে স্বাধীনতালাভের পরেই। ১৯৫০-৫১, অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনা প্রবর্তনের কাল থেকে ১৯৭৭-৭৮, পঞ্চম পরিকল্পনার সমাপ্তি কাল পর্যন্ত পরিকল্পনার একটি দীর্ঘকালীন পটভূমি স্থিরীকৃত হয়েছে, পাঁচ বৎসরের কালাংশবিধৃত এক একটি পরিকল্পনা সেই পটভূমিতেই বিন্যস্ত হয়েছে এবং হবে। ১৯৭৭-৭৮ সালের মধ্যেই মাথাপিছু আয়কে দ্বিগুণ করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখেই স্ব স্ব ভূমিকাসহ প্রতিটি পরিকল্পনা পরিচালিত হবে—চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায়ও পরিকল্পনা কমিশন সে কথা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনা সমাপ্ত হয়েছে, অর্থাৎ আমরা আমাদের ২৫ বছরের পরিকল্পিত অগ্রগতির বন্ধুর, সমস্যাকণ্টকিত পথ অতিক্রম করে এলাম। তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল, আমরা ১৫ বৎসর পরে অর্থাৎ পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারব এবং এই পরিকল্পনাকালে তার ভিত্তি রচিত হবে। স্বভাবতই চতুর্থ পরিকল্পনার রূপরেখা ও তার সঙ্গতি সংগ্রহের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতির একটি সমীক্ষা এবং তার থেকে চতুর্থ পরিকল্পনার শক্তি ও উপযুক্ত পরিবেশলব্ধ হয়েছে কিনা তার মূল্যায়ন অপরিহার্য।

প্রারম্ভ

অর্থনীতিবিদদের অভিমত অনুসারে কোনও দেশ টেক-অফ পর্যায়ে, অর্থাৎ স্বয়ং-নির্ভর অগ্রগতির শক্তি অর্জনের স্তরে উত্তীর্ণ হতে পেয়েছে কিনা তা তিনটি শর্ত পূরণের মানদণ্ডে বিচার্য: প্রথম, জাতীয় আয়ের শতকরা পাঁচ ভাগ থেকে দশ ভাগ উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ; দ্বিতীয়, বিকাশের উচ্চ ক্ষমতাসংবলিত এক বা

একাধিক বৃহৎ উৎপাদনী ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা; তৃতীয়, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র থেকেই মূলধন সংগ্রহের উপযুক্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক পরিবেশ সৃষ্টি। এই তিনটি শর্ত পুরণের পুর্বে দুইটি শর্ত পালনীয়: কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধি এবং উপযুক্ত সামাজিক মূলধন গঠন। এর মধ্যে কৃষিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ, টেক-অফ পর্যায়ে উপনীত হবার পুর্বে কৃষিকে এমন উন্নত হতে হবে যাতে জনসাধারণের জন্য ক্রমশ অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য লাভ করা যায়, কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রসারের মাধ্যমে আধুনিক শিল্পব্যবস্থার ভিত্তি নির্মিত হবে এবং অধিক পরিমাণে রাজস্ব পাওয়া যাবে। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার সমাপ্তিকালে দেখা গেল, স্বয়ংনির্ভর অর্থনীতির এই শর্তগুলোর ধারে কাছেও আমরা পৌঁছাতে পারিনি। এই পরিকল্পনাকালে শিল্পউৎপাদন লক্ষ্যানুযায়ী হয়নি, কৃষিক্ষেত্রের ব্যর্থতাই সব থেকে শোচনীয়। যেখানে তৃতীয় পরিকল্পনায় বৎসরে গড়ে ৬ শতাংশ হারে জাতীয় আয়বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছিল সেখানে প্রকৃতপক্ষে তার পরিমাণ হয়েছে ২.৫ শতাংশ। পরিকল্পনার পাঁচ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৫ শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনার এই অসাফল্যের জন্য খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের মূল্য ৩২.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যশস্যের অনটন সাধারণ নিম্নবিত্ত জনসাধারণকে তীব্র, দুর্বিসহ দুর্গতির অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ে জাতীয় আয়ের তুলনায় বিনিয়োগের হার ছিল ১৪ শতাংশ, কিন্তু আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ ১০.৫ শতাংশের অধিক ছিল না।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামগ্রিক ব্যর্থতা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষভাগে সমগ্র ভারতবর্ষে যে ব্যাপক ও তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। এই পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে, এবং তার প্রথম বৎসর ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছে। এই পরিকল্পনায় মোট আথিক বরাদ্দের পরিমাণ ২৩ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা, তার মধ্যে সরকারি ক্ষেত্রের পরিমাণ ১৬ হাজার কোটি টাকা, আর বেসরকারি ক্ষেত্রের ৭ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারি অংশে প্রস্তাবিত বিনোয়োগের রেখাচিত্র হল এই:

অর্থনৈতিক মন্দা ও পরিকল্পনা

			কোটি টাকা হিসাবে
কৃষি, সমাজ উন্নয়ন ও সমবায়	...	...	২৪১০
সেচ	...	...	৯৬৪
শক্তি	...	...	২০৩০
ক্ষুদ্র শিল্প	...	...	৩৭০
সংগঠিত শিল্প এবং খনিজশিল্প	...	...	৩৯৩৬
পরিবহন ও যোগাযোগ	...	...	৩০১০
শিক্ষা	...	...	১২১০
বৈজ্ঞানিক গবেষণা	...	...	১৪০
স্বাস্থ্য	...	...	৪৯২
পরিবার পরিকল্পনা	...	...	৯৫
জল সরবরাহ	...	...	৩৭৩
গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ	...	...	২৮০
অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন	...	...	১৮০
সমাজকল্যাণ	...	...	৫০
শ্রমকল্যাণ ও শিল্প প্রশিক্ষণ	...	...	১৪৫
জনসহযোগিতা	..	...	১০
গ্রামীণ কর্ম	...	...	৯৫
পার্বত্য ও অন্যান্য অঞ্চল	...	...	৫০
পুনর্বাসন	...	...	৯০
অন্যান্য	...	...	৭০

সরকারি খাতে ব্যয়ের সঙ্গতি এইভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে :

সূত্র		কেন্দ্র	রাজ্য	মোট
		(কোটি টাকার হিসাবে)		
চলতি রাজস্ব থেকে উদ্বৃত্ত	...	২০৯০	৯২০	৩০১০
রেলওয়ে থেকে আয়	...	২৬০	—	২৬০
সরকারি শিল্পোদ্যোগ	...	৭৬০	৩২৫	১০৮৫
ঋণ	...	৭০০	৮০০	১৫০০
ক্ষুদ্র সঞ্চয়	...	৩৬০	৬৪০	১০০০
অপরিশোধিত ঋণ	...	৪০০	১৬৫	৫৬৫

সূত্র	কেন্দ্র	রাজ্য	মোট
কম্পালসরি ডিপোজিট ও অ্যান্যুয়িটি ডিপোজিট	১৫০	—	১৫০
মূলধনী ব্যয় …	১৩৩০	—৬৬৫	৬৬৫
পি-এল ৪৮০ ব্যতীত অন্য সূত্রে বৈদেশিক ঋণ	৪৩৪০	—	৪৩৪০
পি-এল ৪৮০ তহবিল …	৩৬০	—	৩৬০
পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয়-সঙ্কোচ …	৮৫	২৫০	৩৩৫
অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ …	১৭৪৫	৯৮৮	২৭৩০
মোট	১২৫৮০	৩৪২০	১৬০০০

পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বৎসরে ৫.৫ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক বিকাশের হার নির্ধারণ করেছেন। বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দা এবং তজ্জনিত অনিশ্চয়তার জন্য চতুর্থ পরিকল্পনার রূপরেখা এখনও চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়নি। চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশিত হবার পর জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদ পরিকল্পনাকে 'মূল' ও 'বহিরঙ্গ' এই দুভাগে বিন্যস্ত করার প্রস্তাব উত্থাপিত করেছেন। এই প্রস্তাবানুযায়ী, মূল অংশকেই অগ্রাধিকার দান করা হবে এবং তারপর যে পরিমাণে অর্থ পাওয়া যাবে তার ভিত্তিতেই বহিরঙ্গ অংশের কাজে হাত দেওয়া চলবে।

চতুর্থ পরিকল্পনার বরাদ্দ অর্থ

চতুর্থ পরিকল্পনার ২৩ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে তীব্র বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রস্তাবিত বিনিয়োগ গত তিনটি পরিকল্পনায় সম্মিলিত বরাদ্দ অপেক্ষাও বেশি। তৃতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা যখন বিন্দুমাত্র আশাপ্রদ নয়, তখন অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা না ঘটিয়ে ও জনসাধারণকে অধিকতর দুর্গতির মধ্যে নিক্ষেপ না করে কিভাবে এই পরিকল্পনার বিপুল পরিমাণ অর্থের সংস্থান হবে, এই প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট সকলের মনকেই আলোড়িত করে তুলেছে। সরকারি অংশে ১৬ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের জন্য অর্থনৈতিক সঙ্গতিসংগ্রহের যে সমস্ত সূত্র পরিকল্পনা কমিশন উল্লেখ করেছেন, আমরা তাদের পরীক্ষা করে দেখতে পারি।

সঙ্গতিসংগ্রহ

সঙ্গতিসংগ্রহের অন্যতম প্রধান উৎস চলতি রাজস্ব থেকে উদ্বৃত্ত সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমান, বর্তমানে প্রচলিত করগুলো থেকেই কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোতে ৩০১০ কোটি টাকা সংগৃহীত হবে। কিন্তু এই অনুমানের বাস্তব সাফল্য কর সংগ্রহের ব্যবস্থার উন্নতি, কর ফাঁকি দেওয়া দৃঢ়ভাবে বন্ধ করা এবং জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির

ওপর নির্ভরশীল। আর তৃতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যেখানে চলতি রাজস্ব থেকে ৫৫০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত পাওয়ার আশা করা হয়েছিল, সেখানে ঘাটতি হয়েছে ৪৭০ কোটি টাকা, অর্থাৎ সর্বসমেত এই ঘাটতির পরিমাণ ১০২০ কোটি টাকা।

নতুন কর স্থাপন করে ২৭৩০ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্বসংগ্রহের লক্ষ্য পূরণ করা হবে, এই হচ্ছে পরিকল্পনা কমিশনের প্রস্তাব। প্রধানত কৃষির ক্ষেত্রে, জমির খাজনার হার সংশোধন, সেচের জলের দরুণ করের হার পরিবর্তন, অর্থকরী ফসলের উপর বিশেষ সারচার্জ স্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে নতুন কর ধার্য করা হবে। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষির ব্যর্থতা স্মরণ করলে এ লক্ষ্যপূরণের বাস্তব সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশেষ আশা পোষণ করা যায় না। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারি উদ্যোগ থেকে ৩৯৫ কোটির মত মুনাফা পাওয়া গিয়েছিল, সেক্ষেত্রে চতুর্থ পরিকল্পনায় ১০৮৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ পূর্ববর্তী পাঁচবৎসরের প্রায় তিনগুণ মুনাফা আশা করার যৌক্তিকতা সম্পর্কেও অনেকে সন্দিহান। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ঋণ সংগ্রহের পরিমাণ ৯১৫ কোটি টাকা এবং ক্ষুদ্রসঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৫৮৫ টাকা, সুতরাং গত পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ঋণ ও স্বল্পসঞ্চয় হিসাবে যথাক্রমে ১৫০০ কোটি টাকা এবং ১০০০ কোটি টাকার প্রত্যাশাও যে কতদূর বাস্তবভিত্তিক, সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠেছে।

অতিরিক্ত কর প্রস্তাব

চতুর্থ পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারতের বেসরকারি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, উৎপাদন অপেক্ষা আর্থিক বরাদ্দের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে যদি সাধ্যের বাইরে পরিকল্পনা রচিত হয়, তাহলে দেশের অর্থনীতিতে এমন সংকটময় চাপ সৃষ্ট হতে পারে যার ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য। পরিকল্পানার মাধ্যমে জনসাধারণের আশা আকাঙ্খাকেই শুধু জাগ্রত করা হয়েছে, কিন্তু পরিকল্পনার কার্যক্রমগুলোকে সফল করে তাদের চরিতার্থ করার কোনও ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়নি, বরং পণ্যদ্রব্যের ক্রমাগত মূলবৃদ্ধিতে জনসাধারণকে নিদারুণ দুর্গতি ভোগ করতে হচ্ছে। পণ্যদ্রব্যের মূল্যকে স্থিতিশীল রাখার পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলো নির্দিষ্ট অগ্রাধিকার নিরূপণ করেই চতুর্থ পরিকল্পনা রচনায় অগ্রসর হওয়া উচিত। খাদ্যশস্যের ঘাটতি, পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার অভাবই সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক দুর্গতির মূল কারণ, সেইজন্য অগ্রাধিকারের মানদণ্ডে চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ এইভাবে স্থির করা উচিত; প্রথম, কৃষি; দ্বিতীয়,

ভোগ্যপণ্যশিল্প ; তৃতীয়, বিদ্যুৎশক্তি ; চতুর্থ পরিবহন এবং পঞ্চম, ভারী শিল্প।

বেসরকারী অভিমত

ভারতীয় বণিক সংস্থার মতে সরকারি অংশে ১০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ও বেসরকারি অংশে ৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দসহ চতুর্থ পরিকল্পনার বরাদ্দের মোট পরিমাণ ১৮ হাজার কোটি টাকা হওয়া উচিত বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ শ্রী পি, জে, প্রফ-এর অভিমত এই-যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার দুঃখদায়ক শিক্ষাকে অস্বীকার করে পরিকল্পনা-রচয়িতারা বৎসরে ৫'৫ শতাংশ হার বিকাশের একটা অবাস্তব লক্ষ্যই নির্ধারণ করেছেন। পরিকল্পনা কমিশন স্পষ্টই স্বীকার করেছেন, ১৯৬৫-৬৬ সালের গুরুতর অর্থনৈতিক আঘাত চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বৎসর ১৯৬৬-৬৭ সালে সামলে ওঠা যাবে বলে যে আশা করা হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে ; কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টন, কিন্তু প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন ; শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদনও লক্ষ্যানুযায়ী হয়নি।

পরিকল্পনার সরকারি ও বেসরকারি সমর্থকেরা বলেছেন, বৃহৎ-পরিকল্পনাই এখন প্রয়োজন, কারণ গত তিনটি পরিকল্পনায় যে আশা ও আকাঙ্খাকে জাগ্রত করা হয়েছে তার অনুপাতে ব্যবস্থা করতে না পারলেই বিশৃংখলা ও অশান্তি দেখা দেবে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ক্ষুদ্র পরিকল্পনার অর্থ হল দারিদ্র্যের চিরস্থায়ীত্ব। পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রীঅশোক মেহতার মতে, চতুর্থ পরিকল্পনা একটা চ্যালেঞ্জ এবং তা অবশ্য গ্রহণীয়। পরিকল্পনা

বৃহৎ বা ক্ষুদ্র পরিকল্পনা ?

কমিশনের সদস্য বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও বলেছেন, ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশের অনগ্রসর অর্থনীতিকে গতিশীল করে তুলতে হলে বিকাশের হার বৎসরে অন্তত ছয় শতাংশ হওয়া উচিত এবং তার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থবিনিয়োগই আবশ্যক।

সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমাদের মনে হয়, পরিকল্পনাকে সাধ্যানুযায়ী রচনা করাই প্রয়োজন। পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য এবং তার রূপায়ণের যে অসঙ্গতি আমাদের জাতীয় জীবনের মর্মান্তিক বিড়ম্বনা হয়ে উঠেছে, তার সমাধানের জন্য বলিষ্ঠ জাতীয়

উপসংহার

নেতৃত্ব চাই। চতুর্থ পরিকল্পনায় স্বয়ংনির্ভরতা অর্জনের জন্য কৃষি উন্নয়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু তার জন্য চাই সঙ্কল্পের একাগ্রতা, সর্বাত্মক সুসংগঠিত জাতীয় প্রয়াস, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত জনসাধারণের উৎসাহ উদ্দীপনা ও কর্মপ্রচেষ্টার দুর্বার, বিপুল তরঙ্গ।

ভারতের নবশিল্পায়ন

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- ভারতে মৌলিক শিল্পের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা [ক. বি. '৫৬]
- বৃহৎ শিল্পে সরকারী বেসরকারী ভাগাভাগি [ক. বি. '৬২]
- ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প
- ভারতে শিল্পবিপ্লব
- শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সরকারী নিয়ন্ত্রণ [ক. বি. '৬১]
- অনগ্রসর দেশে শিল্পপ্রসারের প্রয়োজনীয়তা [ব. বি. '৬২]

প্রারম্ভ

অজস্র নদী বিধৌত ভারতের মৃত্তিকা ও জলবায়ু কৃষির বিশেষ অনুকূল হওয়ার জন্য তার অধিবাসীরা অতীতে একান্তভাবেই কৃষির ওপর ছিল নির্ভরশীল। তাদের মধ্যে শিল্পোদ্যোগের মানসিকতা গড়ে উঠতে পারে নি। ভারতের সমাজ-বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ, যথা বর্ণভেদ প্রথা, বংশগত কৌলীন্য, ভূমিনির্ভর যৌথ পরিবারিক প্রথা, মহাজনী ব্যবসায়ের সংকীর্ণ, ঝুঁকি গ্রহণে অনিচ্ছুক মনোভাব ইত্যাদি শিল্পবিপ্লব ঘটাবার মত উদ্যোগ, নেতৃত্ব, মানসিকতা এবং শিল্পশৈলী গড়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এক কথায় বলতে গেলে, শিল্পবিপ্লব ঘটবার মত জঙ্গমতা আমাদের অতীতের অচলায়তন, স্থবির সমাজে ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃষি ও খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ ভারতের বুকে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution) ঘটে গিয়েছিল। ইংরেজ তার শিল্পের স্বার্থে সুপরিকল্পিতভাবে ভারতের কুটিরশিল্পকে ধ্বংস করল, তার শিল্পপ্রসারের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করে তাকে একান্তভাবে কৃষিনির্ভরশীল করে তুলল এবং নিজের দেশের শিল্পের খোরাকের জন্য এই অদৃষ্ট লাঞ্ছিত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে যথেচ্ছভাবে লুণ্ঠন করে তাকে তার শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের বাজারে পরিণত করল। কিন্তু ইংরেজকে তার নিজের স্বার্থেই বাধ্য হয়ে তাদের উপনিবেশ ও অবাধ শোষণের ক্ষেত্র ভারতবর্ষে কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল, পরিকল্পনাবিহীন হলেও এই শিল্পপ্রসারেই যে ভারতের শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক পটভূমি রচিত হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ

নেই। ১৮১৮ সালে কলকাতার নিকটে কাপড়ের কল স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ মধ্যযুগীয় কৃষিনির্ভরতা থেকে আধুনিক শিল্পযুগে পদার্পণ করল। ইংরেজ বণিকের মূলধনে এদেশে চা, কফি প্রভৃতি বাগিচাশিল্প, পাটকল, চামড়ার কারখানা স্থাপিত হল; বিদেশী মূলধনের ব্যবস্থাপনায় ১৮৫৫ সালে কলকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুরে পাটকলের প্রতিষ্ঠা ভারতে শিল্পযুগের আবির্ভাবের অরুণোদয় সূচিত করল। ১৮২৪ সালে কলকাতার বন্দরে বাষ্পীয় পোতের আবির্ভাব এবং ১৮৫৩ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রেলওয়ে পরিবহন ব্যবস্থার প্রবর্তন ভারতের শিল্পায়নের পটভূমি রচনায় উল্লেখযোগ্য দিক। ইংরেজদের এই সমস্ত শিল্পপ্রচেষ্টা ভারতীয়দের উৎসাহিত ও তাদের নিকট শিল্পোদ্যোগের পথ প্রদর্শন করেছিল।

ইংরেজ আমলে ভারতে বিভিন্ন শিল্পের প্রতিষ্ঠা।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের চক্রান্তকে কেন্দ্র করে যে জাতীয় আন্দোলন সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত বিদেশী শাসনের কঠিন তটের ওপর ভেঙ্গে পড়েছিল, স্বদেশী শিল্পস্থাপনের উদ্যোগ তারই অন্যতম ফল। এই সময়ই ব্যাঙ্ক, বস্ত্রশিল্প প্রভৃতি স্থাপনে ভারতীয়েরা উদ্যোগী হল। অতঃপর পরাধীন ভারতবর্ষের জাতায় শিল্প-চেতনার উজ্জ্বলতম শিখা ভারতের প্রথম ইস্পাতশিল্প টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হল ১৯০৭ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে বিদেশ থেকে পণ্যের আমদানি হ্রাস পাওয়ায় ভারতের বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প, চর্মশিল্প প্রভৃতির প্রভূত উন্নতি ঘটে, সেই সঙ্গে কয়লা, লৌহ, অভ্র প্রভৃতি খনিজশিল্প, তেল কল, কাগজের কল, সাবান, প্রসাধন শিল্প সম্প্রসারণের সুযোগ লাভ করে। ভারতের শিল্প-প্রসারের সম্ভাবনাগুলোর সমীক্ষা গ্রহণের জন্য ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার একটি শিল্প কমিশন (Industrial Commission) নিয়োগ করেন, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত রিপোর্টে কমিশান ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়নের জন্য অনেক মূল্যবান সুপারিশ পেশ করেছিলেন, কিন্তু ভারতের বিদেশী শাসক গোষ্ঠী তাতে কর্ণপাত করেনি। অবশ্য ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বৈদেশিক প্রতি-যোগিতার আঘাত থেকে ভারতীয় শিল্পগুলোকে রক্ষা করার জন্য যে বিভেদাত্মক সংরক্ষণনীতি গৃহীত হল, তার আশ্রয়ছায়ায় ১৯২২ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই সতের বৎসরের মধ্যে বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ ও চিনিশিল্প ব্যাপক উন্নতি লাভ করে, সিমেন্টশিল্প, দেশলাই, কাঁচ, সাবান, ফেনাইল, বনস্পতি, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি,

ভারতীয় শিল্পের প্রসারের ইতিহাস

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রভৃতি শিল্পও বিকশিত হবার সুযোগ লাভ করেছিল। এভাবেই ভারতের শিল্পায়নের ভিত্তিটি তখন নির্মিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালেও বিদেশী শিল্পপণ্যের অভাবের সুযোগে ভারতীয় শিল্পের প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করল, তখন দেশের যথাসম্ভব দ্রুত শিল্পায়নের সমস্যার ওপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। আমাদের কাছে দেশের তিনটি মৌল ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা উন্মোচিত হল: এক, মৌলিক ও ভারি শিল্পসমূহের স্বল্পতা; দুই, উৎপাদনের বিশৃঙ্খলা, অ-বৈন্যস্ত প্রকৃতি এবং তিন, কয়েকটি বনিয়াদী, মূল শিল্পে বৈদেশিক মূলধন ও পরিচালনার অবাঞ্ছিত প্রাধান্য। একটি সার্বিক, জাতীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই ভারত সরকার পরিকল্পনা কমিশন গঠন করলেন, এই কমিশনের নেতৃত্বেই ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হল এবং ১৯৫১ সাল থেকে তার বিপুল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। এই পরিকল্পনাই ভারতের শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত ঘটল, তার প্রকৃত শিল্পায়নের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়টি আরম্ভ হল।

স্বাধীনতা লাভের পর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের শিল্প-বিপ্লবের সূত্রপাত

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অবশ্য শিল্পায়ন অপেক্ষা কৃষি ও সেচব্যবস্থার ওপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল, শিল্পোন্নয়নের দায়িত্ব প্রধানত বেসরকারি সংস্থার ওপরই ন্যস্ত হয়। এই পরিকল্পনায় সরকারি ক্ষেত্রে শিল্প ও খনি উন্নয়ন খাতে ৭৪ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। এই পরিকল্পনাকালে বস্ত্র, শর্করা, সেলাই কল, বাইসাইকেল, কাগজ, বনিয়াদী উৎপাদক দ্রব্যের যেমন সিমেণ্ট, ভারি রাসায়নিক দ্রব্য (কষ্টিক সোডা প্রভৃতি), যন্ত্রপাতি— প্রভৃতির উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। খনিজ তৈল সংশোধন, জাহাজ, এরোপ্লেন, রেলওয়ে ওয়াগন, পেনিসিলিন, ডি ডি টি প্রভৃতি নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠার দিক থেকেও এই পরিকল্পনার কাল উল্লেখযোগ্য। সিন্ধ্রির সার কারখানা, চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানা, টেলিফোন শিল্প, রেলকামরা কারখানা প্রভৃতির অগ্রগতিও আশাপ্রদ।

প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পায়নের অগ্রগতি

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ই শিল্পায়নের ভিত্তিনির্মাণের কর্মসূচী গৃহীত হল। এই পরিকল্পনার শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টার ভিত্তি ছিল মূল ও ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার। দ্বিতীয় পরিকল্পনার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য ৫৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, তার মধ্যে ভারী শিল্পের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫৪৭

কোটি টাকা, অর্থাৎ সমগ্র বরাদ্দের ৯৭ শতাংশ। আমরা প্রথমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ইস্পাত ও লৌহশিল্পের অগ্রগতির বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখব, কারণ শিল্পবিপ্লব এই কে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। ১৮৭৫ সালে কুলটিতে ভারতের প্রথম লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কারখানা বরাকর আয়রণ ওয়ার্কস্ স্থাপিত হয়। ১৮৮৯ সালে বেঙ্গল আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী তার পরিচালনাভার গ্রহণ করে। টাটা ইস্পাত কারখানার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ১৯০৮ সালে বাঙলাদেশের হীরাপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কাজ আরম্ভ হয়। ১৯২৩ সালে দক্ষিণ ভারতের ভদ্রাবতীতে মাইশোর স্টেট আয়রণ ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠিত হয়, এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নাম মাইশোর আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস্। এই কারখানা টাটার কারখানা ও পশ্চিম বাঙলার ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীই হল বর্তমান ভারতের বেসরকারি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা।

ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রাথমিক ইতিহাস

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ভারতের লৌহ ও ইস্পাতশিল্পে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এই পরিকল্পনাকালেই জার্মানীর সহযোগিতায় উড়িষ্যার রাউর-কেলায়, রাশিয়ার সহযোগিতায় ভিলাইয়ে এবং ব্রিটেনের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে ইস্পাতকারখানা স্থাপিত হয়। রাউরকেলা ইস্পাতকারখানার প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৭০ কোটি টাকা, ভিলাইয়ের ১৩১ কোটি টাকা এবং দুর্গাপুরের ১৩৮ কোটি টাকা। তৈরী ইস্পাত উৎপাদনের মোট ক্ষমতা প্রথম পরিকল্পনার প্রথমে যেখানে ছিল ১০ লক্ষ টন ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথমে ছিল ১৩ লক্ষ টন, সেখানে সরকারি ক্ষেত্রে তিনটি ইস্পাত কারখানার উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৪৫ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। বেসরকারি ইস্পাত কারখানাগুলোকেও সম্প্রসারিত করা হয় এবং তার জন্যে তাদেরও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাতশিল্প

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারি উদ্যোগে শিল্পায়নের গতিকে দ্রুততর করার যে প্রয়াস চলে, তৃতীয় পরিকল্পনায়ও তার ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য সরকার সচেষ্ট ছিলেন। পরিকল্পনা কমিশন যথার্থই বলেছেন, ইস্পাত, জ্বালানি, শক্তি ও যন্ত্রোৎপাদন, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতির উন্নয়নের ওপরই দেশের স্বয়ংনির্ভর ও স্বয়ংপোষিত অর্থনীতি কি গতিতে গড়ে উঠবে তা নির্ভর করে: These industries largely determine the pace at which the economy can become sefl-reliant and self-generating। তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্প

ও খনিজদ্রব্য সংক্রান্ত কর্মসূচীর জন্য সরকারি ও বেসরকারি অংশ মিলিয়ে মোট ২৫৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ভিলাই, রাউরকেলা, দুর্গাপুর এবং মহীশূর ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণ তৃতীয় পরিকল্পনা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের অগ্রগতি

সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষভাগে ১৯৬৫ সালে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল, বিক্রয়যোগ্য কাঁচা লৌহ ১,১১৩,৮৩৯ টন এবং তৈরী ইস্পাত ৪,৫২৮,৭১৮ টন। তৃতীয় পরিকল্পনাকালের সম্প্রসারণের ফলে ভিলাই ইস্পাত কারখানা ১ মিলিয়ন টন থেকে ২'৫ মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদনক্ষম হয়েছে। দুর্গাপুর ও রাউরকেলা ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণ চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথমভাগে সমাপ্ত হবে।

চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় শিল্পোন্নয়নের জন্য সরকারি অংশে ৬১৯৩ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাবিত হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষভাগে তৈরী ইস্পাত ও লৌহপিণ্ডের চাহিদার পরিমাণ হবে যথাক্রমে ১০'৫ মিলিয়ন টন ও ৩'০ মিলিয়ন টন। আর ইস্পাতপিণ্ডের চাহিদার পরিমাণ ১৪'০ মিলিয়ন টন, চতুর্থ পরিকল্পনা-কালে ইস্পাতপিণ্ডের উৎপাদনের সম্ভাব্য পরিমাণ ১১'৭ মিলিয়ন টন এবং তৈরী ইস্পাতের পরিমাণ ৮'৮ মিলিয়ন টন হবে। এর থেকেই ইস্পাত উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। চতুর্থ পরিকল্পনার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইস্পাতশিল্প-প্রকল্প হল রাশিয়ার সহযোগিতায় বোকারো ইস্পাত কারখানা স্থাপন। এই কারখানা থেকে বার্ষিক ১'৭ মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপন্ন হবে। এই পরিকল্পনাকালে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন ও বেসরকারি ইস্পাতকারখানাগুলোকেও সম্প্রসারিত করা হবে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের কর্মসূচী

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন শিল্পের অগ্রগতি লক্ষনীয়। সিমেন্ট, কয়লা এলুমিনিয়াম প্রভৃতির মত অত্যাবশ্যক শিল্পপণ্য উৎপাদনে যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়েছে। যন্ত্রপাতি নির্মাণের যন্ত্র, কৃষি, সূতীবস্ত্র, পাট, সিমেন্ট, চা, চিনি ও উদ্ভিজ তৈল শিল্পে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতিও উৎপন্ন হচ্ছে। রেলওয়ের বহু উপকরণের চাহিদা দেশীয় উৎপাদন থেকেই মিলেছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম, ভারী রসায়নশিল্প, অটোমোবাইল, ঔষধপত্র, কৃত্রিম সারসহ রাসায়নিক শিল্পেও অগ্রগতি দেখা গিয়াছে। হাতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, সেলাইকল, বৈদ্যুতিক

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পায়নের অগ্রগতি

বাইসাইকেল প্রভৃতি কতকগুলো ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদনেরও প্রভূত বৃদ্ধি ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গের রূপনারায়ণপুরের হিন্দুস্থান কেব্‌ল্‌স্‌ ফ্যাক্টরী, ভূপালের হেভি ইলেকট্রিক্যাল্‌স্‌, কলকাতার ন্যাশনাল ইন্স্‌ট্রুমেণ্টস্‌, হিমাচল প্রদেশের নাহান ফাউণ্ড্রি প্রভৃতি শিল্পসংস্থায় শিল্পায়নের কর্মচঞ্চল নবভারতের হৃৎস্পন্দন ধ্বনিত।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে লক্ষ্যানুযায়ী না হলেও বিভিন্ন শিল্পে অগ্রগতির যে হার অর্জিত হয়েছে, তার মূল্য অবশ্য স্বীকার্য। রাঁচীতে প্রতিষ্ঠিত ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা ভারতের শিল্পায়নের একটি বলিষ্ঠ, উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, বোকারো ইস্পাতকারখানার যন্ত্রপাতি এই কারখানা থেকে পাওয়া যাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। হরিদ্বারে মোটর উৎপাদন আরম্ভ হয়েছে, রামচন্দ্রপুরম হেভী ইলেক্‌ট্রিক্যাল প্ল্যাণ্ট ও তিরুচিরাপল্লী বয়লার কারখানার উৎপাদনও আরম্ভ হয়ে গেছে। হিন্দুস্থান মেশিন টুল্‌স্‌-এর তিনটি ইউনিট ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয়েছে, দেশের উৎপাদিত মেশিন টুল্‌স্‌-এর অর্ধেকই এখানে উৎপন্ন হচ্ছে। হিন্দুস্থান টেলিপ্রিণ্টার্স, হিন্দুস্থান কেব্‌ল্‌স্‌, ভারত ইলেকট্রনিক্‌স প্রভৃতি কারখানার উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার শিল্পায়নে ভারতের অগ্রগতি

তৃতীয় পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন রাসায়নিক সার উৎপাদনের গোরক্ষপুর ও নামরূপ এ দুটি প্রকল্প এবং বেসরকারি অংশে বিশাখপত্তনম ও বরোদা প্রকল্প গৃহীত হলেও তাদের উৎপাদন চতুর্থ পরিকল্পনাকালেই আরম্ভ হবে। সিমেণ্ট ও কাগজ শিল্পে কিছু অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, শর্করাশিল্পে ৩·৫ মিলিয়ন টন উৎপাদনের লক্ষ্য পূর্ণ করা গেছে। সালফ্যারিক অ্যাসিড, সোডা এ্যাস, কষ্টিক সোডা ইত্যাদি ভারী রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন লক্ষ্যানুযায়ী হয়নি। পুনার সন্নিকটস্থ পিম্‌প্রির পেনিসিলিন ও স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন কারখানা সম্প্রসারিত হয়েছে, হৃষিকেশ ও হায়দ্রাবাদে সিন্‌থেটিক ও অ্যাণ্টিবাওটিক ঔষধ উৎপাদনের কারখানার প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পূর্ণ হতে চলেছে। নেইভেলি লিগনাইট প্রোজেক্ট, বিশাখাপত্তমের শিপ ইয়ার্ডের সম্প্রসারণ, আসামের নাহারকাটিয়া অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম উৎপাদন, নুনমাটি ও বারৌনিতে তৈল শোধনাগার স্থাপন—এ সমস্তই ভারতের শিল্পায়নের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ভারতের শিল্পায়নের আলোচনাপ্রসঙ্গে ভারতের শিল্পনীতিও বিশেষভাবে বিবেচ্য। ভারতসরকার মিশ্রঅর্থনীতি অনুযায়ী শিল্পক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতামূলক সহাবস্থানকে স্বীকার করে নিয়েছেন, এই দুটি সংস্থা

পরস্পরের পরিপূরক হবে এবং তার মাধ্যমে অবাধ ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং একছত্রপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়ের ত্রুটিবিচ্যুতি পরিহার করে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ঘটানো যাবে। ভারত সরকারের ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে এই মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনের নীতিকেই স্থান দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রগঠনের নীতিকে রূপায়িত করা হয়। এই শিল্পনীতি অনুযায়ী সমস্ত শিল্পকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। লৌহ ও ইস্পাত, খনিজ তৈল, আণবিক শক্তি প্রভৃতি ১৭টি শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের দায়িত্বরূপে চিহ্নিত করা হয়। মেশিন টুল, এলুমিনিয়াম, সার, পথ ও সামুদ্রিক পরিবহন প্রভৃতি ১২টি শিল্প সম্বন্ধে বলা হয়, এ সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা পাশাপাশি থেকে নিজস্ব ভূমিকা গ্রহণ করবে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানা ক্রমশ সম্প্রসারিত হবে। অবশিষ্ট অন্যান্য সমস্ত শিল্প তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, এদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওপর ন্যস্ত হলেও রাষ্ট্রের নতুন শিল্পস্থাপনের অধিকার থাকবে। সরকার শিল্পায়নকে সাহায্য করার জন্য কতকগুলো প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন, যেমন শিল্প-মূলধন প্রতিষ্ঠান (Industrial Finance Corporation), স্থায়ী শুল্ক কমিশন, জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্পসংস্থা, জাতীয় শিল্পোন্নয়ন সংস্থা (National Development Corporation), ভারতীয় শিল্পপুঁজি ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন, পুনরর্থ সাহায্য কর্পোরেশন (Refinance Corporation), ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ সংস্থা (Heavy Engineering Corporation), শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক ইত্যাদি।

ভারতের শিল্পনীতি ও শিল্পসংক্রান্ত বিভিন্ন সংগঠন

ভারত সরকার শিল্পপ্রসারে সরকারি ও বেসরকারি অংশের দায়িত্ব বণ্টনের নীতিই অনুসরণ করে আসছেন, সঙ্গত কারণেই সরকারকে প্রধান উদ্যোগীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় পরিকল্পনায় কমিশন বলেছিলেন দ্বিতীয় পরিকল্পনার মতই এই পরিকল্পনায়ও সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রগুলো পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক রূপে গণ্য হতে থাকবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, নাইট্রোজেনবিশিষ্ট রাসায়নিক সার উৎপাদনের কার্যে যেখানে সরকারি ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সেখানে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বেসরকারি ক্ষেত্রও পূর্বাপেক্ষা আরও বেশি করে অংশ গ্রহণ করবে এবং সরকারি ক্ষেত্রের প্রচেষ্টার সম্পূরকতা করবে। বেসরকারি ক্ষেত্রে রঞ্জনদ্রব্য, প্লাষ্টিক ও ঔষধ প্রস্তুত-মূলক কার্য্যসূচী মুখ্যত, সরকারি ক্ষেত্র কর্তৃক জৈব মাধ্যমিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতমূলক

শিল্পায়নে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা

যে কর্মসূচী গৃহীত হবে তার পরিপূরক হবে। সেইরূপ একসঙ্গে বেশি পরিমাণে ঔষধপত্র প্রস্তুতের কার্য মুখ্যত সরকারি ক্ষেত্র কর্তৃক সম্পন্ন হবে এবং এই জাতীয় ঔষধ পত্রের অধিকতর প্রক্রিয়াকরণের কার্য বেসরকারি ক্ষেত্র কর্তৃক গৃহীত হবে। চতুর্থ পরিকল্পনায়ও এই যুক্ত কর্মধারা অনুসৃত হবে বলে পরিকল্পনা কমিশন ঘোষণা করেছেন। শিল্পায়নে সরকারি উদ্যোগের প্রাধান্য বিভিন্ন মহলে সমালোচিত হয়েছে। সরকারি মাথাভারী প্রশাসন যন্ত্রের দীর্ঘসূত্রতা, শৈথিল্য, বেসরকারি শিল্পপ্রচেষ্টায় যে উদ্যোগ উৎসাহ দেখা যায় তার অভাব প্রভৃতি অপচয় ঘটায়, অদক্ষতা ও অপচয়কে প্রশ্রয় দেয় এবং বেসরকারি অংশে মূলধনগঠনকে সঙ্কুচিত করে —সরকারি উদ্যোগের এ সমস্ত সমালোচনা যে যুক্তিপূর্ণ, বাস্তবভিত্তিক, তা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা আমাদের স্বীকার করতে হয় যে ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশে মুনাফাজীবি বেসরকারি ক্ষেত্র কখনও শিল্পায়নের প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেনা। সমগ্র জাতীয় স্বার্থের পরিপেক্ষিতে পরিকল্পিত ভিত্তিতে এদেশের শিল্পবিপ্লব ঘটাবার ক্ষমতা একমাত্র সরকারেরই আছে।

কৃষির উন্নয়নের জন্যও শিল্পসম্প্রাসরণ প্রয়োজন, তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শোচনীয় খাদ্যসংকটের পরিপ্রেক্ষিতে তা নতুনভাবে উপলব্ধি করতে হয়েছে। শিল্পায়ন ছাড়া আমাদের দৈন্যদশা থেকে মুক্তির কোনও উপায় নেই।

উপসংহার

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে অর্থনৈতিক মন্দার মেঘ যতই পুঞ্জীভূত হোক, তার মধ্যে সংকটের বিদ্যুৎ ঝলসে উঠুক এবং ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধবাদী সমালোচকদের সংশয় সন্দেহ ও ধিক্কার যতই বিদেশে ধ্বনিত ও স্বদেশে প্রতিধ্বনিত হতে থাক, ভারতের শিল্পায়নে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে আমাদের দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতেই হবে, তবেই তার দারিদ্রের অভিশাপ ঘুচবে। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলন

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- ধনিক-শ্রমিক বিরোধ সমস্যা [ক, বি, '৬৬]
- ভারতের শ্রমিক মালিকের সম্পর্কের সমস্যা
- ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি
- ভারতের সাম্প্রতিক শ্রমিক বিক্ষোভ

বাসুকী তাঁর মাথায় সমগ্র পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন, এই পৌরাণিক বর্ণনার সঙ্গে আমরা আবাল্য পরিচিত। আমাদের আধুনিক সমাজের ভার শ্রমিকেরাই বাসুকীর মত দিবারাত্র বহন করে চলেছে; আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিলাসের সকল উপকরণের মূলে আছে তাদের বুকের রক্ত জল করা শ্রম। কিন্তু ভারতের মত অনুন্নত, পশ্চাদপদ দেশের শ্রমিকেরা পুঁজিপতিদের নির্মম শোষণের শিকার, সমাজের নিম্নতম সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত।

প্রারম্ভ

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত জহওরলাল নেহেরু কানপুরে শ্রমিক বস্তী দেখে ক্ষোভে বেদনায় বিচলিত হয়ে এই নরককুণ্ড থেকে তাদের উদ্ধারের উদাত্ত বাণী ঘোষণা করেছিলেন। তাদের জীবিকার কোনও স্থিরতা নেই, কৃপণ লোভী পুঁজিপতিদের হাত থেকে ন্যায্য পারিশ্রমিকটুকু সংগ্রহ করতে গিয়ে তাদের আঘাতে, অপমানে, লাঞ্ছনায় জর্জরিত হতে হয়। ভারতীয় শ্রমিকদের যান্ত্রিক কুশলতার অভাব এবং উৎপাদন ক্ষমতার স্বল্পতা বিভিন্ন মহলে উল্লিখিত হয়ে থাকে, কিন্তু সহজ সুস্থ জীবনের আলোকবঞ্চিত কি অন্ধকারময় শ্বাসরোধকারী পঙ্কিল পরিবেশে তাদের দিনযাপনের প্রাণধারণের দুর্বিষহ গ্লানি ভোগ করতে হয়, সেটা স্মরণ করতে অনেকেই ভুলে যান। কিন্তু শ্রমিকেরা আজ আর কারুর করুণা প্রার্থী নয়; তারা আজ জাগ্রত, সমষ্টিগত স্বার্থচেতনার সূত্রে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের প্রাণ বাঁধা পড়েছে, সহস্র প্রাণের স্রোত সম্মিলিত হয়ে এক দুর্বার উত্তাল সমুদ্রের রূপ ধারণ করেছে।

এই চেতনা থেকেই অন্যান্য দেশের মত ভারতেও শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের সূত্রপাত। সমষ্টিগত স্বার্থচেতনায় সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার অর্জনের প্রয়াসেই দুঃখদৈন্যের অন্ধকারে শ্রমিকদের নবজীবনের স্বর্ণদিগন্তটি উদ্ভাসিত। এই আন্দোলন পতন-অভ্যুদয়বন্ধুর, সমস্যাকীর্ণ, জটিল পথে প্রাথমিক, দুর্বল, অসংহত অবস্থা থেকে শক্তিশালী, শৃঙ্খলাসংহত ও আত্ম-

সচেতন হয়েছে। সেই ইতিহাসটিই এবার স্মরণীয়। ১৮৯০ সালে বোম্বাইয়ের শিল্পশ্রমিকেরা বোম্বে মিল-হ্যাণ্ডস অ্যাসোসিয়েশন নামে যে সংগঠন স্থাপন করে, সেটাই ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রাথমিক প্রয়াসরূপে চিহ্নিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক সংকটের বোঝায় উৎপীড়িত শ্রমিকদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ সংঘবদ্ধ আন্দোলনের রূপ নিতে আরম্ভ করছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে, বিশেষত ১৯২০-২১ সালে বহু সংখ্যক শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল, তাদের পরিচালনা, শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ ও মালিকপক্ষের সঙ্গে দরকষাকষি (bargaining) করা প্রভৃতি কাজের জন্য শ্রমিকসংঘ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। প্রথমে ১৯১৮ সালে মাদ্রাজে এবং পরে অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ধাঁচের কয়েকটি শ্রমিকসংঘ স্থাপিত হয়। কিন্তু এই শ্রমিক সংঘগুলোর কার্যকলাপ ধর্মঘটসংক্রান্ত দাবীপূরণেই সীমাবদ্ধ ছিল, দাবী পূরণ বা আন্দোলন শেষ হলে তাদের আর কোনও সাড়া পাওয়া যেত না।

শ্রমিকসংঘ আন্দোলনের ইতিহাস

১৯২০ সালে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সূচিত হল বোম্বাইয়ে শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় সংগঠন নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (All India Trade Union Congress) প্রতিষ্ঠায়। খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে শ্রমিক আন্দোলনের সুসংগঠিত কেন্দ্রীয় স্তরে উত্তীর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। অতঃপর ১৯২২ সালে বোম্বাইয়ে কেন্দ্রীয় শ্রমিক বোর্ড এবং বাঙলায় টেড ইউনিয়ন ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হল। এই বৎসরেই সর্ব ভারতীয় রেলকর্মী সঙ্ঘ এবং তার অল্প কিছু কাল পরে ডাক ও তার বিভাগের কর্মীদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সংঘগুলো স্থাপিত হল। তদানীন্তন সরকার ও শিল্পস্বার্থগোষ্ঠী নানাভাবে শ্রমিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেও তাতে সক্ষম হয়নি। প্রায় ১০ বৎসরব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের ফলেই ১৯২৬ সালে ভারতীয় শ্রমিকসংঘ আইন (Indian Trade Union Act) প্রণীত হল, তদনুযায়ী কতকগুলো শর্তাধীনে সরকারের নিকট শ্রমিকসংঘগুলোকে আইনসঙ্গতভাবে রেজিস্ট্রীকৃত করার অধিকার দেওয়া হল। এই আইন প্রবর্তিত হবার পর ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো টেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্ব দিতে অগ্রসর হয়, তার ফলে একদিকে যেমন কয়েকটি বিশেষ শ্রমিকসংঘ শক্তিশালী হবার সুযোগ পায়, তেমনি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দলীয় স্বার্থগত বিরোধে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রমিক আন্দোলনে সামগ্রিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯২৮-২৯ সালে শ্রী এম, এন, যোশীর নেতৃত্বে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-

বিভিন্ন শ্রমিকসংঘের উদ্ভব

যুদ্ধের সময় ভারতের বিদেশী সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টার সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত কিনা তাই নিয়ে শ্রমিক নেতাদের মধ্যে প্রবল মতভেদ দেখা দেয়। এই সময় শ্রী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠিত হয়েছিল।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতবর্ষে ১৯২৬ সালে যে শ্রমিকসংঘ আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল, তার গুরুত্বের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই ব্যবস্থায়ই শ্রমিকসংঘ প্রথম আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে, অবশ্য তদানীন্তন সরকার ও মালিকপক্ষ এই স্বীকৃতি লাভের অধিকারকে কঠোরভাবে সঙ্কুচিত করতেই তৎপর ছিলেন।

ইংরেজ আমলে শ্রমিকসংঘ সংক্রান্ত আইন

১৯২৯ সালে ভারত সরকার শিল্পবিরোধ আইন প্রণয়ন (Trade Disputes Act) করেন। এই আইন অনুযায়ী কোনও শিল্পে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বিরোধ বাঁধলে তাকে একটি তদন্তকারী কোর্ট (Court of Enquiry) অথবা একটি সালিশী বোর্ড (Board of Conciliation)-এর নিকট প্রেরণ করবার ক্ষমতা সরকার লাভ করেন। এই আইন শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগের প্রতিবিধানে বিশেষ কার্যকরী না হলেও তাদের সংঘবদ্ধ ও নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে পরোক্ষ-ভাবে সাহায্য করেছিল। ১৯২৯ সালে জে, এইচ, হুইটলের সভাপতিত্বে যে রাজকীয় শ্রমকমিশন (Royal Commission on Labour) গঠিত হয়েছিল, ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তার সুপারিশের পটভূমিতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের কারখানা আইন গৃহীত হয়। এই আইনে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং নারী ও শিশু শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল। ১৯২৩ ও ৩৩ খ্রীষ্টাব্দের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মজুরী আইন (Payment of Wages Act) প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রমিকদের দুঃস্থতার সমস্যার সমাধানে এই ব্যবস্থাগুলো ছিল গোষ্পদে জলের মতই তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর। তবে এই আইনগুলো পরোক্ষভাবে শ্রমিকদের সংগ্রামী চেতনাকে তীক্ষ্ণ করে তুলেছে, শ্রমিকসংঘ আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত এবং পরবর্তীকালের শ্রমআইনগুলোর পটভূমি রচনা করেছে, তাদের সার্থকতা এটুকুই।

স্বাধীনতা লাভের পর রাজনৈতিক চেতনার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুযায়ী শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের ধারা ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে লাগল। কংগ্রেসের নেতৃত্বে এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালনী, গুলজারীলাল নন্দা প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (Indian National Trade Union Congress) প্রতিষ্ঠিত

হল। এই সংগঠন সারা ভারতবর্ষে প্রসারিত হয়েছে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ সমাজতন্ত্রী দলের নেতারা হিন্দ্ মজদুর সভা নামে একটি শ্রমিক সংঘ-গঠন করেন। অতঃপর কয়েকটি বামপন্থী দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্থাপিত হল সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (United Trade Union Congress)। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, হিন্দু মজদুর সভা ও সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস—বর্তমানে এই চারটি শ্রমিকসংঘই হচ্ছে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের মূল স্তম্ভ।

বিভিন্ন শ্রমিক সংঘ

ইংরেজ আমলের তুলনায় ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলন বর্তমানে অনেক সুসংগঠিত এবং শ্রমিক সংঘের কার্যাবলী বহুধারায় বিস্তৃত, সুসম্বদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকেরা অনেক অধিকার ও সুযোগসুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের এসমস্ত অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তার দৃঢ় ভিত্তিটি নির্মিত হতে পারেনি। যে সমস্ত কারণে ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলন পঙ্গু রয়ে গেছে, তাহল, প্রথমত, সংগঠনিক শক্তির দিক থেকে শ্রমিক সংঘগুলো বেশ দুর্বল। এ সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন যথার্থই বলেছেন : The obstacles to the development of Trade Unions are largely internal, they come from labour itself। দ্বিতীয়ত, শ্রমিক শ্রেণীর ভেতর থেকেই নিজস্ব নেতৃত্ব উদ্ভূত না হওয়ার জন্য বহিরাগত রাজনৈতিক দলের লোকেরা শ্রমিকসংঘ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে থাকে, তার ফলে অনেক সময় শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থ প্রাধান্য পায় এবং তার ফলে এই আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৃতীয়ত, ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর এক বৃহৎ অংশ আধা-কৃষক আধা-শ্রমিক হবার জন্য তাদের গ্রামমুখিনতা রক্তমজ্জাগত, এর ফলে তাদের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত স্বার্থচেতনা গড়ে ওঠেনি। শিক্ষার ও গণতান্ত্রিক চেতনার অভাবেও ভারতের শ্রমিক শ্রেণী বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের স্বার্থকে উপলব্ধি করে সংঘবদ্ধ হতে পারে না। চতুর্থত, বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ভাষাভাষী গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গুলো নিয়ে ভারতের শ্রমিক শ্রেণী গঠিত, এই সমস্ত বিভেদ তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এবং মালিক পক্ষ শ্রমিক সংঘ আন্দোলনকে বিকলাঙ্গ করার জন্য তাদের সুযোগ নিয়েছে। ভারতবর্ষে ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী শ্রমিকসংঘ গড়ে না ওঠার জন্য এই সকল পার্থক্য বহুলাংশে দায়ী। পঞ্চমত, রাজনৈতিক দলাদলি

শ্রমিক সংঘগুলোর নানা দুর্বলতা

শ্রমিক সংঘ আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন, দুর্বল, শতধাখণ্ডিত করে রেখেছে। একই শিল্পসংস্থায় একাধিক শ্রমিক সংঘের অস্তিত্ব ও তাদের অবিরাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ১৯৫৮ সালে চারটি শ্রমিক সংঘের প্রতিনিধিদল শ্রমিক আন্দোলনের সংহতিসাধনের জন্য পারস্পরিক লেখাপড়ার ভিত্তিতে কতকগুলো সিদ্ধান্তে উপনীত হন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তার মর্যাদা বিশেষ রক্ষিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনের মন্তব্য স্মরণীয়: Multiplicity of trade unions, political rivalries, lack of resources and disunity in the ranks of workers are some of the major weaknesses in a number of existing unions.

স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় সরকার শ্রমআন্দোলনের গুরুত্ব স্বীকার করে এ সম্পর্কে কতকগুলো আইন প্রণয়ন করেছেন। ১৯৪৮ সালে ১৯২৬ সালের শ্রমিক সংঘ আইনকে সংশোধিত করে মালিকপক্ষ কর্তৃক শ্রমিক সংঘকে বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি দানের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমিক ও মালিক উভয়ের পক্ষেই মান্য শৃংখলা বিধি (Code of Discipline) গৃহীত হয়েছে, তাতে শ্রমিক সংঘকে স্বীকারের ভিত্তি নির্দেশিত হয়। ১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইনে শতাধিক শ্রমিক বিশিষ্ট প্রতিটি

শ্রমসংক্রান্ত বিভিন্ন আইন

কারখানায় মালিকপক্ষের প্রতিনিধি ও শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি করে ওয়ার্কস কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করা হয়, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে প্রাত্যহিক বিরোধের মীমাংসাই এই কমিটিগুলোর দায়িত্ব। এই আইনের অন্য বিধি হল, সরকারের কনসিলিয়েশন অফিসাররা বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করবেন, তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হলে সরকার বিরোধকে একটি সালিশী বোর্ড (Board of conciliation) অথবা শিল্পট্রাইবুনালের (Industrial tribunal) নিকট প্রেরণ করতে পারেন। ট্রাইবুনালের রায় শ্রমিক ও মালিক উভয়পক্ষের ক্ষেত্রেই অন্তত এক বৎসরের জন্য বাধ্যতামূলক, সালিশী বোর্ড বা ট্রাইবুনালের বিবেচনা ও বিচারাধীন থাকার সময় ধর্মঘট বা তালাবন্ধ (lockout) বেআইনী। ১৯৫০ সালে সংশোধনী আইনে মজুরি বোর্ড (wage boards), শিল্প আদালত ও শিল্প ট্রাইবুনাল প্রভৃতি রায়ের বিরুদ্ধে আপীল বিচারের জন্য আপীল ট্রাইবুনাল (Apellate Tribunal) গঠন করা হয়। ১৯৫৭ সালের নতুন শিল্পবিরোধ আইনে আপীল ট্রাইবুনাল প্রথা তুলে দিয়ে তিন শ্রেণীর ট্রাইবুনাল স্থাপন করা হয়। শ্রমআদালত (Labour Courts), শিল্প ট্রাইবুনাল ও জাতীয় ট্রাইবুনাল। বিভিন্ন ধরনের শিল্পবিরোধ

বিচারের ভার এই সংস্থাগুলোর ওপর অর্পিত। ১৯৬৭ সালে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রচলিত আইন ও অন্যান্য বিধিসমূহের কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ, তাদের দ্বারা সংবিধানে উল্লিখিত শ্রমসংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নির্দেশক নীতি এবং সমাজবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার ও পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য কতখানি রূপায়িত হচ্ছে সে সমস্ত পরীক্ষা করে দেখার জন্য শ্রীগজেন্দ্র গড়করের সভাপতিত্বে যে জাতীয় শ্রমিক মিশন গঠিত হয়েছিল, ত সুপারিশগুলো রূপায়িত করা প্রয়োজন।

১৯৬২ সালের শেষদিগে চীনা আক্রমণের সময় জাতীয় সংকটের জন্য রাষ্ট্রপতির ঘোষণা অনুযায়ী ধর্মঘট, কর্মচ্যুতি ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়। তৎকালীন জরুরী অবস্থার পটভূমিতে মালিক, শ্রমিক ও সরকারের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে শিল্পে শান্তি রক্ষার চুক্তি (Industrial Truce Resolution) স্বাক্ষরিত হয়। শ্রমিক সংঘগুলো জাতির প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে সহায়তা করার জন্য উৎপাদন প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার সঙ্কল্প ঘোষণা করে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানী আক্রমণের সময়ও শ্রমিক সংঘগুলো প্রতিরক্ষার প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার ব্রতকে গ্রহণ করে। কিন্তু তার পরের বৎসরেই সরকারের অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের মূল্যকে ন্যায়সঙ্গত সীমায় আবদ্ধ রাখার সঙ্কটকে নির্মমভাবে উপহাস করে মূল্যস্তর ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতি হতে থাকে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগে এবং চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম পর্বে তৃতীয় পরিকল্পনার কৃষি ও শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টার সামগ্রিক ব্যর্থতা, ঘাটতিব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট প্রভৃতির জন্য তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য শিল্পে অর্থনৈতিক সংকটের অশুভ প্রতিক্রিয়া হিসেবে উৎপাদন গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহে অজস্র শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়, অনেকের বাধ্যতামূলক কর্মবিরতিও (lay-off) ঘটে। তার ফলে এই রাজ্যে প্রবল শ্রমিকবিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে, এবং বহু উত্তপ্ত বিতর্কের কেন্দ্র ঘেরাও আন্দোলনকেও বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা কোথায় কোথায়ও গ্রহণ করে। এই অশান্ত, উত্তেজনাময়, বিস্ফোরক পরিস্থিতি শুধু শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের দিক থেকেই নয়, সমগ্র জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের পক্ষেই বিপজ্জনক।

জাতীয় সংকটকালে শ্রমিক সংঘের ভূমিকা

সাম্প্রতিককালে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের তিক্ততা

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকেরা তাঁদের মুনাফার কোনও অংশ শ্রমিকদের দেবেন না, অথচ অর্থনৈতিক সংকটের সমস্ত দায়ভাগ দুঃস্থ, অর্থনৈতিক শক্তির দিক থেকে

নিতান্ত দুর্বল শ্রমিকদের ওপর চাপিয়ে দেবেন, এই মনোভাব শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক তিক্ত করে তুলতে বাধ্য। মালিকেরা অনেক ক্ষেত্রেই মজুরী বোর্ডের নির্দেশ কিংবা শিল্প আদালতগুলো রায় কার্যকরী করতে অনিচ্ছুক হয়েছেন, নানাভাবে তাদের সুফল থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করার চেষ্টা করেছেন। শ্রমআইনগুলো যাতে ত্রুটিমুক্ত, অধিকতর শক্তিশালী হয়, তার জন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। অন্য দিকে শ্রমিক সংঘগুলোকেও নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে শ্রমআন্দোলন যাতে বিপথগামী না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য। দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে শ্রমিকসংঘগুলো যদি সুশৃংখল ও ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও অর্জনের সংগ্রামে অগ্রসর হয়, তবে দেশবাসীরাও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উপলব্ধি করবেন, শ্রমিকদের কল্যাণ, তাদের স্বার্থ আর তাঁদের স্বার্থ এক, অভিন্ন। সরকারকেও মনে রাখতে হবে, শ্রমিকদের কল্যাণবিধান ও তাদের ন্যায়সংগত স্বার্থরক্ষা সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনারই একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ।

উপসংহার

ভারতের ঘাটতিব্যয়

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- ঘাটতিব্যয়ের সুবিধা ও বিপদ [ক, বি '৫৩]
- মুদ্রাস্ফীতি ও খুচরা ব্যবসা [ক, বি, '৬৩]
- ভারতের বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির সংকট ও তাহার প্রতিকার

দীর্ঘকালব্যাপী ইংরেজ শাসনের শোষণে ভারতবর্ষ রিক্ততার চরম সীমায় পৌঁছেছে, তার অর্থনৈতিক সঙ্গতির ভাণ্ডার শূন্য। স্বাধীনতালাভের পর ভারতকে এই রিক্ততার উত্তরাধিকারের দুর্বিষহ বোঝা বহন করতে হচ্ছে। তাই ভারত যখন তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে ব্রতী হল, তখন মূলধন গঠন বা সঙ্গতি-সংস্থান তার অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সব থেকে কঠিন ও জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকেই কৃষি ও শিল্পোন্নয়ন কর্মসূচী-

প্রারম্ভ

গুলোর জন্য ভারতকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে হচ্ছে, অথচ সেই তুলনায় আভ্যন্তরীণ সঙ্গতির পরিমাণ নিতান্ত স্বল্প এবং প্রয়োজনের তুলনায় ভবিষ্যতে তার বৃদ্ধির সম্ভাবনাও অনিশ্চিত। এই অবস্থায় ভারতসরকারকে বাধ্য হয়েই ঘাটতিব্যয়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। ঘাটতিব্যয়ের যেমন কতগুলো উপযোগিতা আছে, তেমনি একটি সীমা অতিক্রম করলেই তা মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে জাতির অর্থনৈতিক জীবনে একটি অশুভ, অত্যন্ত ক্ষতিকর শক্তি হয়ে উঠতে পারে। তেজস্বী, দুর্দম গতিবেগসম্পন্ন অশ্বের বল্গাকে যেমন মুহূর্তের জন্যও শিথিল করলে চলে না, তেমনি ঘাটতি-ব্যয়কেও সকল সময়েই সতর্ক ও কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে হয়। ভারতের ঘাটতিব্যয় বহু বিতর্কিত, তদুপরি তৃতীয় পরিকল্পনা সমাপ্তির পর ব্যাপক ও তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের পটভূমিতে ভারত সরকারের চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ঘাটতিব্যয় পরিহারের সংকল্প ঘোষণার জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ, জটিল বিষয়টির ওপর বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

সরকারের রাজস্ব ক্ষেত্রে যখন আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হয়, তখনই তা ঘাটতিব্যয় নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এই সংজ্ঞাটিকে প্রসারিত করে বলা যায়, কর, রাজস্ব, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়, বিবিধ আমানত তহবিল বা বৈদেশিক ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত মোট সরকারি আয় থেকে সরকারি ব্যয় বেশি হলে

তাকে ঘাটতিব্যয় আখ্যা দেওয়া হয়। আয় এবং ব্যয়ের এই অসম ব্যবধান পূরণের জন্য সরকার তাঁদের সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ নিতে, অথবা কাগজী মুদ্রা বা নোটও ছাপাতে পারেন। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ক্রমশ ক্ষীয়মান বলে সরকারকে ঘাটতিব্যয়ের শেষোক্ত পন্থাটিই গ্রহণ করতে হচ্ছে। ঘাটতিব্যয়ের সমর্থনে লর্ড কেইন্‌স্ প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ বলেন, ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশের বৈষয়িক উন্নয়নে ঘাটতিব্যয়ের ঝুঁকি অবশ্য গ্রহণ করা দরকার। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদেরা আয়ব্যয়ের সমতাকে আদর্শ বাজেট বলে মনে করতেন, আধুনিক অর্থনীতিবিদেরা এই ধারণার সমর্থক নন। ঘাটতিব্যয়ের ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তা সকল সময় ক্ষতিকর হয় না। মুদ্রাস্ফীতি যদি মূলধন গঠনের সহায়ক হয়, তবে তা সমর্থনযোগ্য। তার ফলে অনুন্নত দেশের অর্থনীতিতে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়, পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ক্রমবর্ধমান হতে থাকে, মূল্যবৃদ্ধির জন্য মুনাফার অঙ্ক স্ফীত হয় এবং এই সমস্ত প্রক্রিয়ার সামগ্রিক ফল হিসাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। অনুন্নত দেশে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ যেমন স্বল্প, তেমনি কর স্থাপনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের সম্ভাবনাও ক্ষীণ ও সীমিত। তাই এই সমস্ত দেশে ঘাটতিব্যয় তথা মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে মূলধন গঠন করা যায়, ঘাটতিব্যয়লব্ধ অর্থ একটি পরিকল্পনায় নিয়োজিত হয়ে উৎপাদনবৃদ্ধির কর্মসূচীগুলোকে সফল করে তোলে, পরবর্তী পরিকল্পনার বিনিয়োগযোগ্য সঙ্গতি সৃজিত হয়, উৎপাদনের বাধাগুলো অপসারিত হয়ে বিনিয়োগের যে নতুন সুযোগসুবিধাসমূহ দেখা দেয় তা আবার অধিকতর সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম পর্বে গতানুগতিক, রক্ষণশীল, আয়ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্যরক্ষাকারী বাজেট-রচনায় সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির সহায়ক এই সমস্ত সুযোগসুবিধা পাওয়া সম্ভব নয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠনে ঘাটতিব্যয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

ঘাটতিব্যয়ের সংজ্ঞা ও তার উপযোগিতা

কিন্তু বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ক্যালডোর ঘাটতিব্যয়ের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। ঘাটতিব্যয়কে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখলে এবং দ্রুত ফল প্রদান-কারী ক্ষেত্রগুলোয় ঘাটতি ব্যয়লব্ধ অর্থ বিনিয়োগ করলে মুদ্রাস্ফীতির সংকট ও তার বিষময় ফল পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নাও ঘটতে পারে।

ঘাটতিব্যয়ের কুফল নিবারণের উপায়

ঘাটতিব্যয় যাতে উৎপাদক ক্ষেত্রসমূহেই প্রযুক্ত হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সরকারকে করের জালের সাহায্যে ঘাটতিব্যয়ের অর্থের কিছুটা অংশকে ছেঁকে তুলে আনতে হবে, তাহলে মুদ্রাস্ফীতির বিপজ্জনক সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। দেশের অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যসমূহের বণ্টন ও মূল্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলো সুষ্ঠু, কার্যকরী হলে ঘাটতিব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতির কুফল বহুলাংশে নিবারিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

ভারতের প্রথম তিনটি পরিকল্পনাকালের ঘাটতিব্যয়ের সমীক্ষায় দেখা যায়, ঘাটতিব্যয় ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির সংকট সৃষ্টি করে চলেছে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগে এবং চতুর্থ পরিকল্পনার প্রারম্ভে তা ব্যাপক অর্থনৈতিক মন্দার (recession) মত সর্বনাশা বিপর্যয়ে পরিণত হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় ঘাটতিব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪২০ কোটি টাকা, আর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৯৪৮ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেই ঘাটতিব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতির সংকট দেখা দেয়, পণ্যদ্রব্যের মূল্য ঊর্ধ্বগতি হতে থাকে। এই পরিকল্পনাকালে পণ্যদ্রব্যের পাইকারি মূল্যস্তর প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ এবং খাদ্যশস্যের মূল্য প্রায় শতকরা ২৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রথম তিনটি পরিকল্পনা-কালের ঘাটতিব্যয়

সেইজন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতিব্যয়কে সংকুচিত করার সংকল্প ঘোষিত হয় এবং তার পরিমাণকে ৫৫০ কোটি টাকায় আবদ্ধ রাখার কথা পরিকল্পনা কমিশন ঘোষণা করেন। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনাকালে চীনা ও পাকিস্তানী আক্রমণের ফলে বিপুল পরিমাণে প্রতিরক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি, পরিকল্পনার শেষ বৎসরে খরার প্রকোপে কৃষির ক্ষতি, বিশেষত পরিকল্পনাসংক্রান্ত কৃষিউন্নয়ন কর্মসূচীর শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য খাদ্যশস্যের ঘাটতিপূরণের জন্য সরকারের ব্যয়বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য ঘাটতিব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে ভারতে ৩০১৭'৭৭ কোটি টাকার কাগজী মুদ্রার প্রচলনের তুলনায় স্বর্ণের পরিমাণ ছিল ১১৫ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার এবং বিদেশী ঋণপত্র ছিল ১৬৫ কোটি টাকার।

বস্তুত তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সমগ্র ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে এবং যার অশুভ কৃষ্ণচ্ছায়া চতুর্থ পরিকল্পনার ভবিষ্যৎকে সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলেছে, তার জন্য মুদ্রাস্ফীতিই দায়ী। অর্থনীতিবিদরা তাই সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটকে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিত মন্দা (Inflationary recession) বলে অভিহিত করেছেন। এই পরিকল্পনাকালে একদিকে ঘাটতিব্যয়জনিত মুদ্রার পরিমাণ ক্রমশ স্ফীত হয়েছে, অন্যদিকে কৃষি ও শিল্পোন্নয়নে

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মুদ্রাস্ফীতিঘটিত অর্থনৈতিক মন্দা (Inflationary recession)

অগ্রগতির হার নৈরাশ্যজনক ভাবে কম হয়েছে। বাৎসরিক ৫ শতাংশ হারে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল, সেখানে এই পরিকল্পনাকালে বৎসরে ২'৮ শতাংশের অধিক হারে কৃষি অগ্রগতি হয়নি। তৃতীয় পরিকল্পনায় বৎসরে গড়ে ৬ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের গড় ২'৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে জনসংখ্যাও পাঁচ বৎসরে ২'৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধির এই পরিমাণটুকুকেও নিষ্ফল করে তুলেছে। সরকারি অংশে মূল প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণের তুলনায় বাস্তবে লগ্নীর পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তা শুধু টাকার অঙ্কেই, পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে মূল্যের দিক দিয়ে লগ্নীর পরিমাণ পরিকল্পনার লক্ষ্য অপেক্ষা হ্রাস পেয়েছে। জাতীয় আয় বা অর্থনৈতিক সঙ্গতি বৃদ্ধি পায়নি, অন্যদিকে মুদ্রার সরবরাহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে, তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে মুদ্রার সরবরাহ মোট ৫৭'৯ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। এই বৈষম্যের ফলে সমগ্র পরিকল্পনাকালে পণ্যদ্রব্যের মূল্য ৩২'২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বভাবতই তৃতীয় পরিকল্পনার শেষভাগে এবং চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম পর্বে খাদ্যশস্যের ঘাটতির সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতিজনিত অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি যুক্ত হয়ে জনসাধারণকে অবর্ণনীয় দুর্গতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। মুদ্রাস্ফীতির জন্য উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি, পণ্যদ্রব্যের যোগানের তুলনায় মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাবে সরকারি ও বেসরকারি নিম্নআয়ের কর্মচারীদের দাবি অনুযায়ী মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি, এই সমস্ত কিছুর অতিরিক্ত ব্যয় সংকুলানের জন্য আবার নতুন করে ঘাটতিব্যয়—এই দুষ্টচক্রের আবর্তে পড়ে দেশের অর্থনীতি ক্ষতবিক্ষত, জর্জরিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই যথার্থই বলেছেন, মুদ্রাস্ফীতিঘটিত অর্থনৈতিক মন্দার ফলে সঞ্চয় সঙ্কুচিত হয়, লোকেরা জমি ও শহরাঞ্চলের সম্পত্তি, স্বর্ণ ও অন্যান্য দ্রব্যে অনুৎপাদক অর্থ বিনিয়োগেই উৎসাহিত হয়। ভারতবর্ষের অসাধু ব্যবসায়ীরা সরকারি করসংগ্রহব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতির সুযোগে কর ফাঁকি দিয়ে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা সঞ্চয় করেছে, এই টাকা অসামাজিক ভোগবিলাসে, মজুতদারি ও ফাটাকাবাজিতে নিয়োজিত হয়ে আমাদের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিমূলেই আঘাত হেনেছে। ঘাটতিব্যয়ের মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ দুর্নীতির পংকস্তরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এই সকল ব্যবসায়ীদের হাতে এসেছে, তা দেশের শিল্পোন্নয়নে নিয়োজিত না হয়ে অনুৎপাদক

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ভারতবর্ষে ঘাটতিব্যয়ের নানা বিপদের অভিজ্ঞতা

ব্যয়ে এবং খাদ্যশস্যের চোরাকারবার, মজুতদারি প্রভৃতিতে নিয়োজিত হয়ে গুরুতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার নির্মম শিক্ষা এই যে, যে সকল শর্তসাপেক্ষে ঘাটতিব্যয়কে সুফলপ্রসূ করে তোলা যায়, ভারতে তা পূরণ করা যায়নি, সরকারের সকল শুভ সংকল্পকে ব্যর্থ করে ঘাটতিব্যয়জনিত অশুভ মুদ্রাস্ফীতি একটি দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহুবার মুদ্রাস্ফীতির বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আসছে। কেন্দ্রীয় সরকার চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ঘাটতিব্যয় পরিহারের যে নীতি এবং মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের যে সংকল্প ঘোষণা করেছেন, তা অভিনন্দনীয়।

ঘাটতিব্যয় পরিহার ও মুদ্রাস্ফীতি দমনের বহুমুখী প্রয়াস

১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তর মুদ্রাস্ফীতি দমন ও অর্থনৈতিক স্থিতিবিধানের জন্য যে বহুমুখী পরিকল্পনা রচনা করেছেন, তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক হল: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার একাংশের পরিশোধ স্থগিত রাখা হবে এবং সরকারি শিল্পোদ্যোগে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ওপর অনুরূপ বিধিনিষেধ আরোপিত হবে, বকেয়া আদায়, কর ফাঁকি বন্ধ ও শহরাঞ্চলে জমির ক্রয়বিক্রয়ে ফাটকাবাজি দমন, অধিকতর পরিমাণে কার্যকরী করে তোলার জন্য অত্যাবশ্যক পণ্য আইন, আয়কর আইন ও কোম্পানি আইনের সংশোধন ইত্যাদি। কালো টাকা খুঁজে বার করার জন্যও কেন্দ্রীয় সরকার তৎপর হয়েছেন। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা পরিশোধ স্থগিত রাখার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়েছে।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সরকারকে যদি ঘাটতিব্যয়ের আশ্রয় গ্রহণ করতেই হয়, তবে তাকে কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে এবং তার কুফল নিবারণের সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। পরিকল্পনাসংক্রান্ত কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের

উপসংহার

কর্মসূচীগুলোর সুষ্ঠু রূপায়ণের সঙ্গে যাতে তাদের ঋণ ও দাদন নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা ফাটকাবাজি ও মজুতদারি করতে না পারে ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্য অধিক পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ বীমার জাতীয়করণ, খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বিপনন এবং দেশের সর্বত্র র‍্যাশনিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সমবায় ভাণ্ডারগুলোর মাধ্যমে অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের বণ্টন প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ঘাটতিব্যয় মুদ্রাস্ফীতির অশুভ শক্তিতে পরিণত হবার পরিবর্তে কল্যাণপ্রদ হয়ে উঠবে। উৎপাদন বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী উপায়।

ভারতের মুদ্রার মূল্যহ্রাস

এই প্রবন্ধের অনুসরণে
- মুদ্রামূল্য হ্রাস ও ভারতীয় অর্থনীতি
- প্রতিকূল রপ্তানি বাণিজ্য ও মুদ্রামূল্য হ্রাসনীতি
- মুদ্রাস্ফীতি ও খুচরা ব্যবসা [ক. বি. '৬৩]

মুদ্রা ও রাজস্বনীতি দেশের অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম প্রধান নিয়ামক শক্তি বলে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে তা রচনা করতে হয়, এক্ষেত্রে একটিমাত্র ভুল পদক্ষেপই গুরুতর বিপর্যয় বহন করে আনতে পারে। এই নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই ভারত সরকার ১৯৬৬ সালের ৬ই জুন শতকরা ৩৬'৫ ভাগ হারে ভারতীয় মুদ্রার যে মূল্যহ্রাস করেছেন, তাকে ঘিরে প্রবল বাদপ্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমতাবিধানের জন্য বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মূল্যহ্রাসের দৃষ্টান্ত নিতান্ত দুর্লভ নয়। ভারতবর্ষেই মুদ্রার মূল্যহ্রাসের দৃষ্টান্ত মিলবে।

প্রারম্ভ

ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসন শৃঙ্খলিত ছিল, তখন ব্রিটেনের পাউণ্ড-স্টার্লিং-এর সঙ্গে তার টাকার মূল্যকে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ৪'৮৬ ডলার থেকে ৪'০৩ ডলারে ১ স্টার্লিং-এর বিনিময় হার হ্রাস করে তার মুদ্রামূল্যের হ্রাস ঘটায়, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় মুদ্রার মূল্যও সেই হারে হ্রাস পেয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুদ্রামূল্য হ্রাস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা (hard currency) আমেরিকান ডলারের তুলনায় আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রিটেনের স্টার্লিং মুদ্রার মর্যাদা হ্রাস পায়, কতকগুলো স্টার্লিং এলাকাভুক্ত দেশ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে ঋণ গ্রহণ করে স্টার্লিং ও ডলারের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য চেষ্টিত হয়। অবশেষে ব্রিটেন ডলারের তুলনায় স্টার্লিং-এর মূল্য শতকরা ৩০'৫ ভাগ হারে হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তার ফলে স্টার্লিং-এর বিনিময়মান ৪'০৩ ডলার থেকে ২'৮০ ডলারে এসে দাঁড়ায়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর ভারতও ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতীয় টাকার মান ডলারের তুলনায় শতকরা ৩০'৫ ভাগ হ্রাস করে। তার ফলে পূর্বে যেখানে ডলারের অনুপাতে ১ টাকার বিনিময়মূল্য ছিল ৩৯'২৫ সেণ্ট, মুদ্রাহ্রাসের পর তা ২১ সেণ্ট হয়। একমাত্র পাকিস্তান ছাড়া কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য দেশ ব্রিটেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

তখনও পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রা স্টার্লিং-এর প্রভাবাধীন ছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে সে সময় স্টার্লিং এলাকার বাইরের কতকগুলো দেশও তাদের মুদ্রার বিনিময়মান হ্রাস করেছিল।

স্বাধীনোত্তর যুগে ১৯৬৬ সালের ৬ই জুন ভারতবর্ষ দ্বিতীয়বার তার মুদ্রার মূল্য হ্রাস করে। বিনিময়মান হ্রাসের পূর্বের ৪'৭৬ টাকার বিনিময়মূল্য ছিল ১ ডলার, এখন ১ ডলারের বিনিময় হার হল ৭'৫০ টাকা; ১ সোভিয়েট রুবলের বিনিময় হার ছিল ৫'২১ টাকা, হ্রাসের পর দাঁড়াল ৮'৩৩ টাকা; পূর্বের ১ স্টার্লি-এর বিনিময়হার ১৩'৩৩ টাকার তুলনায় হ্রাসজনিত বৃদ্ধির পরিমাণ হল ২১ টাকা। পূর্বে যেখানে ভারতীয় ১০০ টাকার বিনিময় মূল্যে ১৮'৬৬ গ্রাম সোনা পাওয়া যেত, এখন সেখানে সমপরিমাণ টাকার ১১'৫৫ গ্রাম সোনা পাওয়া যাবে। বিদেশের লেনদেনের বাজারে এবারে শতকরা ৩৬'৫ হারে ভারতীয় মুদ্রার মূল্যহ্রাস ১৯৪৯ সালের তুলনায় অনেক বেশি। প্রসঙ্গেক্রমে উল্লেখ করা যায়, এ সময় ব্রিটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা সংকটজনক হয়ে ওঠে ও মুদ্রার মূল্যহ্রাসের মত পরিস্থিতি সেখানে দেখা দেয় এবং ব্রিটেন মুদ্রার মূল্যহ্রাস করেছে।

১৯৬৬ সালের ৬ই জুন ভারতবর্ষের মুদ্রার মূল্যহ্রাস

১৯৪৯ সালে ভারতের মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পশ্চাদপটভূমিতে আমরা তদানীন্তন অর্থনৈতিক সংকটের এই চিত্রটি দেখতে পেয়েছিলাম: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি রক্তক্ষরণের পরে মুদ্রাস্ফীতির জন্য বিদেশ থেকে আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং মূল্যপ্রদান ব্যালান্সে ঘাটতি দেখা গিয়েছিল। দেশবিভাগের ফলেও ভারতবর্ষের রপ্তানির বাজার সংকুচিত হয়ে পড়েছিল, ১৯৪৮-৪৯ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার থেকে তাকে ১০০ কোটি টাকা ঋণ করতে হয়েছিল। মুদ্রাস্ফীতির জন্য রপ্তানি ক্রমাগত হ্রাস পেতে লাগল। একই সঙ্গে আমদানি হ্রাস, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধ করবে, এমন এক বহুমুখী সমাধানের পথ অন্বেষণ করতে গিয়েই ভারতবর্ষ মুদ্রার মূল্যহ্রাস করেছিল।

ভারতবর্ষের ১৯৬৬ সালের মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পশ্চাতেও অনুরূপ অর্থনৈতিক সংকট লক্ষণীয়। অধ্যাপক শেনয় প্রমুখ মুদ্রার মূল্যহ্রাসের প্রবক্তারা যে সকল পরিস্থিতির চাপে মুদ্রার মূল্যহ্রাসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে তা এইভাবে বিবৃত করেছেন: প্রথমত, যে সমস্ত দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক লেনদেন অধিক পরিমাণে হয় এবং যে সকল দেশ আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী, তাদের তুলনায় ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির ফলে এদেশের পণ্যদ্রব্যের মূল্য অনেক

মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পশ্চাদপটভূমি

উচ্চহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার অবস্থার তুলনায় ভারতের পণ্যদ্রব্যের বর্তমান মূল্য সাতগুণ বেশি, ব্রিটেনে চারগুণ বেশি, আর আমেরিকার বৃদ্ধির পরিমাণ আড়াই গুণ। ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে শতকরা ৯০'০ ভাগ হারে ভারতবর্ষে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, ব্রিটেন, আমেরিকা, জাপান, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশে বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৮ ভাগ ও ৩৪ ভাগ (এই বৃদ্ধি হয়েছে ব্রিটেনে)। দ্বিতীয়ত, আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরে মুদ্রাস্ফীতির এই উর্ধমুখী চাপের সঙ্গে সমতাবিধানের জন্য মুদ্রার মূল্যাপকর্ষকে (depreciation) মানিয়ে নেবার মত টাকার বিনিময়হারকে নিম্নাভিমুখী করার ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকান ডলারের তুলনায় শতকরা ৩০'৫ ভাগ হারে ভারতীয় টাকার মূল্যহ্রাস তখনও অপর্যাপ্ত ছিল। তারপর থেকে ভারতীয় মুদ্রার প্রকৃত মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। তার ফলে রপ্তানি-ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ শোচনীয় ভাবে হ্রাস পাচ্ছে। অন্য দিকে দেশে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক বাজার অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ বাজারই ব্যবসায়ীদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও মূল্যের উর্ধমুখীন গতির হার তার থেকে অনেক বেশি, এটা মুদ্রাস্ফীতির একটি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা। স্বভাবতই উৎপাদকেরা বৈদেশিক বাজারকে অবহেলা করে আভ্যন্তরীণ বাজারের ওপরই তাদের দৃষ্টি অধিক পরিমাণ নিবদ্ধ করছে। তৃতীয়ত, পরিকল্পনার নীতির অঙ্গ হিসেবে আমরা বৈদেশিক বিনিময় সঞ্চয় রক্ষার জন্য বাধ্যতামূলকভাবেই শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছি, বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ এবং আমদানির উপর বিধিনিষেধ আরোপও এই প্রক্রিয়াকে সহায়তা করেছে। রপ্তানির সঙ্গে জড়িত পুরানো শিল্পগুলোর ক্ষতিসাধন করেই, নতুন শিল্পগুলোয় বিপুল পরিমাণ সঙ্গতি বিনিয়োগ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯৬৪-৬৫ সালে শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধির হারের তুলনায় চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির হার অনেক কম, অথচ আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের চাহিদা হ্রাস পায়নি। মুদ্রাস্ফীত, মুদ্রার অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি এবং রপ্তানিশিল্পকে বঞ্চিত করে শিল্পপ্রসারে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ প্রভৃতির জন্য রপ্তানিশিল্প থেকে বিনিয়োগ অপসারিত হওয়াই এর কারণ। তার ফলে ১৯৬৫ সালে ভারতকে সর্বপ্রথম সিংহলকে তার চায়ের প্রধানতম রপ্তানিকারকের এতদিনের অবিসংবাদিত স্থানটিকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। পাটশিল্পেও আমরা একই অবস্থা দেখি। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতের শতকরা ৬'১ ভাগ রপ্তানির তুলনায় ১৯৬৪-৬৫ সালে রপ্তানি হয়েছে শতকরা ৪'১ ভাগ। চতুর্থত, রপ্তানির হ্রাস ও রপ্তানি শিল্পগুলো অবহেলিত, অর্থাৎ তাদের থেকে বিনিয়োগ-সঙ্গতি অপসৃত

হওয়ার জন্য আমাদের মূল্যপ্রদান ব্যালান্স (balance of payments) প্রতিকূল হয়েছে।

ভারতীয় মুদ্রার মূল্যহ্রাস অনেককে এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা থেকে উদ্ধার করে তার বৃদ্ধি ঘটাবে, ফলে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন বৃদ্ধি পাবে এবং মূল্য-প্রদান ব্যালান্সের সংকট দূরীভূত হবে। মুদ্রার মূল্যহ্রাসের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও তজ্জনিত পণ্যে সরবরাহ বৃদ্ধিতে পণ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা, সম্প্রসারিত শিল্পে বহুসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান ইত্যাদি ঘটবে আশা করা হয়েছে। মুদ্রার মূল্যহ্রাসের ফলে বিদেশী পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির দরুণ দেশে তার চাহিদা হ্রাস পাবে, তার ফলে অর্থের যে সাশ্রয় ঘটবে, তাতে খাদ্যশস্য ও শিল্পপ্রসার ও শিল্পগুলোকে চালু রাখার পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য সরকারকে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের দায়িত্ব খুব বেশি গ্রহণ করতে হবে না।

মূল্যহ্রাসের উদ্দেশ্য : প্রতিকূল বাণিজ্যের পরিবর্তন সাধন

টাকার মূল্যহ্রাসের ফলে চা, তামাক, পাটজাত পণ্যদ্রব্য, তুলা, পশম, অভ্র, চামড়া ইত্যাদি যে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের রপ্তানিবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, সরকার তাদের রপ্তানিশুল্ক বৃদ্ধি করেছেন, তার ফলে সরকারের অর্থাগম হবে, স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে ভারতবর্ষের অগ্রগতি দ্রুততর হতে পারবে। মুদ্রার মূল্যহ্রাস আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরে বিশেষ কোনও অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবেনা, এ কথাও বলা হয়েছিল। সরকার শিল্পের জন্য বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম আমদানির ক্ষেত্রে উদারনীতি অবলম্বনেরও আশ্বাস দিয়েছিলেন, এতে শিল্পপ্রসার ঘটবে এবং সেই সূত্রে পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে এবং মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতাসৃজনে একটি শুভ প্রভাব বিস্তৃত হবে। মুদ্রার মূল্যহ্রাসের কিছুকাল পরে ১৯৬৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাংকের বাৎসরিক বিবরণীতে বলা হয়েছিল : এই বৎসরে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ একটা বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছিল। আভ্যন্তরীণ ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির জন্য আমদানি-পণ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ হয়; তার ফলে একদিকে আমদানি নিয়ন্ত্রণে শিল্পের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অন্যদিকে চোরাচালানের ছিদ্রপথে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দেশ থেকে বেরিয়ে যায়। মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাসের সিদ্ধান্ত এই পটভূমিকাতেই বিবেচ্য। দেশের আভ্যন্তরীণ মূল্য ও বৈদেশিক বাজারের মূল্যের মধ্যে অধিকতর সামঞ্জস্য আনয়ন করে রপ্তানি

মুদ্রার মূল্য হ্রাসের সম্ভাব্য উপকার

বাণিজ্যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠার শক্তি সঞ্চয় করে তার বর্তমান হার বজায় রাখাই মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাসের অন্যতম উদ্দেশ্য।

মুদ্রার মূল্যহ্রাসের বিরোধীদের মতে, আমেরিকা ও বিশ্বব্যাংক যাদের কাছে ভারতের ঋণের পরিমাণ বিপুল, তারা নিজেদের পাওনার অঙ্ক স্ফীত করার জন্যই টাকার বিনিময় হ্রাসের জন্য ভারত সরকারের ওপর প্রবল চাপ দিয়ে এসেছেন এবং অবশেষে সরকার তার কাছে নতি স্বীকার করেছেন। রপ্তানি সম্প্রসারণের যে উদ্দেশ্য নিয়ে টাকার বিনিময়-মূল্য হ্রাস করা হয়েছিল, ১৯৬৬ সালে তা পূর্ণ হয়নি। ১৯৬৫ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বর এই সময়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৬৪ মিলিয়ন ডলার, আর মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পর ১৯৬৬ সালের জুন-সেপ্টেম্বরে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়ে ছিল ৪৬৪ মিলিয়ন ডলার। ভারতের রপ্তানি পূর্ব বৎসরের তুলনায় ১৯৬৬ সালে শতকরা ৬ ভাগ কম হয়েছে। পাটশিল্পজাতদ্রব্য, কার্পাসবস্ত্র, চা, বনজ তৈল, চিনি, কফি প্রভৃতির রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বরের ৪'১৭ কোটি ডলার রপ্তানি হ্রাসের পরিমাণের তুলনায় ১৯৬৭ সালের জানুয়ারি-মার্চে তার পরিমাণ হয় ১'৯৫ ডলার। কিন্তু রপ্তানি মুদ্রামূল্য-হ্রাসের পূর্ববর্তী স্তরকে অতিক্রম করতে পারবে কিনা তা এখনও অনিশ্চিত। দেশের কৃষি অংশের দুর্বলতার মত বহির্বাণিজ্যের ভঙ্গুর অবস্থাও আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার গুরুতর গঠনতান্ত্রিক ত্রুটির পরিচায়ক। ঘাটতিব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতির চাপে পণ্যদ্রব্যের ক্রমাগত উর্ধ্বগতি মুদ্রার মূল্যহ্রাসে যে সুবিধা পাবার সম্ভাবনা ছিল, তাকে বানচাল করে দিয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে আভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, সেইসঙ্গে রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন শিল্পের জন্য আমদানির ওপর নির্ভর করতেই হবে, টাকার বিনিময়হ্রাসের জন্য তার ব্যয় বৃদ্ধির অতিরিক্ত বোঝাও বহন করতে হবে। বেসরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে রপ্তানি-প্রসারের জন্য বহিঃশুল্ক হ্রাস ও সরকারি সাহায্যের (subsidy) দাবী উত্থাপিত হয়েছে। এই সরকারি বৃত্তি বা সাহায্য না পেলে কোনও কোনও পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংক এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে সরকারি সাহায্য বৃদ্ধি পেলে তা আরও মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে পরিণামে ভারতীয় মুদ্রার ক্ষতিই সাধন করবে।

মুদ্রার মূল্যহ্রাসের বিরুদ্ধে যুক্তি

বহিঃশুল্ক হ্রাস ও সরকারী সাহায্যের দাবী

বাজেটের ক্রমিক ঘাটতি, খরাক্লিষ্ট অঞ্চলে ত্রাণকার্যের জন্য সাহায্য, সরকারি

কর্মচারীদের মহার্ঘ-ভাতা বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব ক্রমবর্ধমান। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরকার রাজস্ব ও ব্যয়ের মধ্যেকার ঘাটতি পূরণের জন্য ২০০ কোটি টাকা ঋণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, যখন প্রকৃত সঞ্চয় থেকে সরকারি সাহায্য দেওয়া হয়, তখন মুদ্রার প্রকৃত মূল্যের অবনতি ঘটে না। ১৯৪৮ সালে মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পর সরকারি অর্থসাহায্য পশ্চিম জার্মানীর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তুলতেই সাহায্য করেছিল। কিন্তু আমাদের দুঃস্থ অর্থনৈতিক অবস্থায় তা সম্ভব নয়।

২০০ কোটি টাকা সরকারী ঋণ

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে রপ্তানি থেকে আয় ৮,০০০ কোটি টাকার বেশি হবে না বলেই মনে হয়, এটা কলকারখানাগুলোকে চালু রাখার জন্য যে ৮,১৯০ কোটি টাকার আমদানিব্যয়ের প্রয়োজন হবে তার থেকে কম, অর্থাৎ রপ্তানি থেকে আমাদের চলতি প্রয়োজনও মিটবে না। অন্যদিকে ২,২৮৪ কোটি টাকার মত ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু মুদ্রার মূল্যহ্রাসের ফলে বৈদেশিক ঋণের দায় শতকরা ৫৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, এই বৃদ্ধি আমাদের অর্থনীতিকে আরও দুর্বল করে ফেলবে।

চতুর্থ পরিকল্পনার দায়িত্ব

মুদ্রার মূল্যহ্রাসের বিপক্ষে এই সমস্ত উদাহরণ ও বক্তব্যের যৌক্তিকত্ব স্বীকার করে নিয়েও আমরা বলতে পারি, পৃথিবীর কোনও কিছুই যেমন অবিমিশ্র শুভ অথবা অশুভ নয়, তেমনি এই ব্যবস্থারও উপকারিতা আছে। কৃষিভিত্তিক পণ্যদ্রব্যের রপ্তানিহ্রাসের মূলে আছে ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ এই দুইটি বৎসরে খরার জন্য কাঁচা মালের অভাবে কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহের উৎপাদনের ক্ষতি। মুদ্রামূল্যহ্রাস যন্ত্রপাতি, কাঁচা চামড়া ও চামড়ার দ্রব্য, লোহা ও ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, খনিজ ম্যাঙ্গানিজ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির রপ্তানিবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। ১৯৬৫-৬৬ সালের ১৫.৫ কোটি টাকার ইস্পাত রপ্তানির তুলনায় ১৯৬৬-৬৭ সালের প্রথম ন'মাসে তার রপ্তানির পরিমাণ ১৭.৮০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। অন্যদিকে মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পর আমদানির পরিমাণও হ্রাস পেয়েছে; ১৯৬৫-৬৬ সালের আমদানির পরিমাণ ছিল ২৯৫.৭ কোটি ডলার, ১৯৬৬-৬৭ সালে তার পরিমাণ হয়েছে ২৬১.৯ কোটি ডলার, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ৩৩.৭ কোটি ডলার হ্রাস ঘটেছে। মুদ্রাস্ফীতির চাপ ও তজ্জনিত অভ্যন্তরীণ মূল্য বৃদ্ধি মুদ্রার মূল্যহ্রাসের উদ্দেশ্যকে বহুলাংশে ব্যাহত

মুদ্রার মূল্যহ্রাসকে যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন

করেছে সন্দেহ নেই, তার জন্য এই ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে অস্বীকার করা অযৌক্তিক, এই হচ্ছে তার প্রবক্তাদের অভিমত। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও যথার্থই বলেছেন ; Now that Devaluation is an accomplished fact, we have all to work together and seek the best ways of getting the maximum national dividends from this decesion।

ভারতীয় মুদ্রার মূল্যহ্রাস যখন হয়েই গেছে, তখন তার থেকে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ সুফল লাভের চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত। মুদ্রাস্ফীতিকে যথাসম্ভব প্রতিরোধ ও ঘাটতি-ব্যয়কে পরিহার করে এবং কৃষি ও শিল্পের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে মূল্যানিবৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় আমাদের অগ্রসর হতে হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বুলেটিনে (এপ্রিল, ১৯৬৭) মুদ্রাস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি রুদ্ধ না হলে মুদ্রার মূল্যহ্রাসের মাধ্যমে আমাদের মূল্যপ্রদান ব্যালেন্সের উন্নতি ঘটানো যাবে না, তাই সতর্কবানী উচ্চারণ করা হয়েছে। মুদ্রার মূল্যহ্রাস যাতে সমস্ত দিক দিয়ে সুফলপ্রসূ হতে পারে তার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করা প্রয়োজন।

উপসংহার

ভারতের খাদ্য সংকট

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- খাদ্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা [ক. বি. '৬৬]
- ভারতের বর্তমান খাদ্যসঙ্কট এবং উহার স্থায়ী প্রতিকার [ব. বি. '৬৬]

প্রারম্ভ

'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' বলে ভারত জননীর যে বন্দনাস্তোত্র এ দেশের কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা উচ্চারণ করেছেন, তা বাস্তব অবস্থার সম্পর্কবিহীন ধ্যান কল্পনায় উচ্ছ্বাস মাত্র নয়। অতীত ভারতবর্ষ সত্যি ছিল অন্নপূর্ণার মহিমায় উদ্ভাসিত। ইংরেজ সাম্রাজ্যশাসনই এই দেশে পরাধীনতার অন্যতম অভিশাপ খাদ্যসংকটের দুর্বিষহ বোঝা বহন করে নিয়ে এসেছে।

ভারতবর্ষের খাদ্য সংকটের অতীত ও বর্তমান রূপ

ইংরেজ শাসক ভারতের কৃষিকে নির্মমভাবে অবহেলা করেছে। বিদেশী সাম্রাজ্য স্বার্থশক্তি প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি শৃংখলিত ভারতবর্ষের ওপরই চাপিয়ে দিয়েছিল ; তার অন্যতম পরিণাম খাদ্যসংকট। ১৯৩০ সালের পূর্ব থেকেই ভারতকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হত। ১৯৩৫ সালে চাল উৎপাদনকারী ব্রহ্ম দেশকে ভারতবর্ষের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলে ১৩ লক্ষ টনের মত খাদ্য-ঘাটতি দেখা দেয়। অতঃপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের খাদ্যসংকট এক বিভীষিকার কৃষ্ণমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, খাদ্যশস্যের ঘাটতি ও তার সুযোগে মুনাফাখোরদের যথেচ্ছ চোরাকারবারের ফলে জনসাধারণের দুর্গতি চরমে ওঠে, বাঙলাদেশের লক্ষাধিক নরনারীকে মনুষ্যসৃজিত কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে প্রাণবলি দিতে হয়। পরাধীন ভারতবর্ষের খাদ্যাভাবের সেই দায়ভাগ থেকে আমরা আজও, তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হবার পরও মুক্ত হতে পারিনি।

খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা : সরকারী ঘোষণা

বারবার খাদ্যসংকট তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে দুর্যোগের ঘন মেঘে দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনকে আচ্ছন্ন ও পঙ্গু করে তুলছে। ১৯৫১ সালে খাদ্যের ঘাটতি ছিল ৩০ লক্ষ টন, ভারত সরকার ৪৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে বাধ্য হন। এই সময় ভারত সরকার খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতার যে নীতি ঘোষণা করেন তাতে বলা হয় : ১৯৫২ সালের ৩১ মার্চের পর থেকে সংকটকাল ছাড়া আর খাদ্য-

আমদানি করা হবে না। ১৯৫৩-৫৪ সালে প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ও উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা-অঞ্চলে নিবিড়-চাষ নীতির ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়াতে সরকার ২০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করেন ও ১৯৫৪ সালে খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে দেন। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে ১৯৫৬ অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভ থেকে আবার খাদ্যসংকট আত্মপ্রকাশ করে এবং তা উত্তরোত্তর তীব্র হাতে থাকে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশানুরূপ হয়নি। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে (১৯৬৫-৬৬) খাদ্যশস্যের উৎপাদন গুরুতরভাবে হ্রাস পায়, এই হ্রাসের পরিমাণ শতকরা ১৬.৯ ভাগ। এর কারণ ছিল খরার প্রকোপ। তার ফলে দ্বিতীয়-পরিকল্পনাকালের বাৎসরিক গড়ে ৩.৮ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্যের আমদানির তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনায় এই আমদানির পরিমাণ ৬ মিলিয়ন টনেরও বেশি হয়।

চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেও (১৯৬৬-৬৭) পর্যাপ্ত ও সময়োচিত বৃষ্টির অভাবে খাদ্যোৎপাদন নিদারুণভাবে ব্যাহত হয়েছে, এ বৎসরে যেখানে উৎপাদন লক্ষ্য ছিল ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টন, সেখানে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন। চতুর্থ পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে কৃষির এই ব্যর্থতা ও আন্তর্জাতিক নানা কারণে বিদেশ, বিশেষত আমেরিকা থেকে খাদ্যশস্যের আমদানির অনিশ্চয়তায় খাদ্য সংকটের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে: খরাক্লিষ্ট বিহারে শতাধিক লোকের মৃত্যু ঘটেছে, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় অনাহারজনিত মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গেছে, চাল সরবরাহের অভাবে কেরলের রেশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও অত্যন্ত সংকটজনক, এখানে রেশনব্যবস্থা চালু রাখার জন্য সংগ্রহের লক্ষ্য দু' লক্ষ টনের এক-তৃতীয়াংশও পূরণ হয়নি। আসামেও এই সংকটের হাহাকার পড়ে গেছে।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালের খাদ্য পরিস্থিতি

জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্য উপাদন বৃদ্ধির হার তাল রাখতে পারছে না, এই হচ্ছে ভারতবর্ষের খাদ্য সংকটের স্বরূপ। ১৯৪১-৫১ দশকে ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৩.৪ ভাগ, কিন্তু সে তুলনায় খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র শতকরা ৩.২ ভাগ। পরবর্তী এক হিসেবে দেখা যায়, একদিকে লোকসংখ্যা বৎসরে শতকরা ২.৪ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে গত নয় বৎসরে ১৯৫৭-৫৮ থেকে ১৯৬৬-৬৭ পর্যন্ত খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ১.১৯ ভাগ মাত্র। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ ভারতবর্ষের খাদ্যসমস্যা আরও জটিল করেছে, কারণ সিন্ধু উপত্যকা

ও পূর্ববঙ্গের মত অধিকাংশ উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদনকারী অঞ্চল পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে। একদিকে কৃষিসংক্রান্ত কর্মসূচীর ব্যর্থতা, অন্যদিকে খাদ্যশস্যের বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি শৈথিল্যের সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীদের মজুতদারি, ফাটকাবাজী ও চোরাকারবার ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক খাদ্য পরিস্থিতিকে এক নিদারুণ, উদ্বেগজনক সংকটের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। পরিকল্পনার জন্য ক্রমাগত ঘাটতি ব্যয়ের ফলে জনসাধারণের হাতে যে অতিরিক্ত অর্থ এসেছে, তার ফলেও খাদ্যশস্যের যোগানের তুলনায় চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবার তার মূল্যকে ঊর্ধ্বমুখী করে তুলতে সাহায্য করেছে। খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যর্থতার জন্য কেবল খরাকে দায়ী করলে চলবে না।

ভারতের খাদ্য সংকটের স্বরূপ ও কারণ

অবশ্য ভারত সরকার প্রথমাবধি দেশের খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে সচেতন এবং পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাগুলোর মাধ্যমে তাদের সমাধানেও সচেষ্ট। ১৯৪৩ সালে প্রথম গঠিত খাদ্যশস্য নীতি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলন প্রবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু সে সম্পর্কে তদানীন্তন সরকার জনসাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে উদ্বুদ্ধ করতে অক্ষম হওয়ার জন্য তা শিবহীন যজ্ঞের মতই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় খাদ্যশস্য নীতি কমিটির ও ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত বিশ্ববিখ্যাত বিশেষজ্ঞ লর্ড বয়েড ওরের সুপারিশগুলোর মধ্যে সঙ্গতিবিধান করে সরকার ১৯৫২ সালের খাদ্যশস্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্যের ভিত্তিতে খাদ্যনীতি প্রণয়ন করেন। এটা ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে। এই পরিকল্পনায় কৃষি ও খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দান করা হয়। পরিকল্পনার কর্মসূচীর সঙ্গে ১৯৫২ সালের অধিক খাদ্য ফলাও অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ যোগ করে এই কর্মসূচীগুলো স্থির হয়: এক, ১৯৫১ সালের পর খাদ্য আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ করার নীতি অনুসারে রাজ্য সরকারগুলো খাদ্যোৎপাদন পরিকল্পনা ও খাদ্যশস্য সংগ্রহের নীতি গ্রহণ করবে; দুই, সারা বৎসর ধরে জলের সুবিধাযুক্ত জমিতে নিবিড়-চাষের সাহায্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন; তিন ট্রাক্টরের সহায়তায় ৮ লক্ষ একর পতিত জমি উদ্ধার; চার, নলকূপ স্থাপন; পাঁচ, জলসিঞ্চিত ধান্যোৎপাদন-অঞ্চলের জন্য বিশেষ ধরণের সারের আমদানি

প্রথম খাদ্যশস্য নীতি কমিটি: ১৯৪৩

খাদ্যসংকট দূরীকরণে বিভিন্ন পন্থানির্দেশ

এবং ছয়, উদ্‌বৃত্ত কৃষিপণ্যদ্রব্যের চাষ থেকে কিছু জমি খাদ্যশস্যের উৎপাদনের জন্য গ্রহণ।

প্রথম পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের উল্লেখযোগ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীর সাফল্য অপেক্ষা প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের ভূমিকাই আমাদের স্বীকার করতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আবার খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধিজনিত সংকট দেখা দিলে খাদ্যশস্যের পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও পরীক্ষার জন্য অশোক মেহতার নেতৃত্বে খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি (Foodgrains Enquiry Committee) গঠিত হয়, ১৯৫৭ সালে এ কমিটি তার বিবরণী পেশ করে। যে কোনও উন্নতিশীল দেশে ঘাটতি ব্যয় ও ঋণপ্রসারের মাধ্যমে জনসাধারণের চাহিদা বৃদ্ধি ও ভোগের পরিমাণ ও ধরণ পরিবর্তন ও সরবরাহের মধ্যকার অসামঞ্জস্যজনিত খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য এটা ধরে নিয়েই কমিটি মূল্যের অনিশ্চয়তা হ্রাসের জন্য কয়েকটি সুপারিশ করেছিলেন। কমিটি খাদ্য বিষয়ে পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও অবাধ বাণিজ্যনীতির মধ্যপন্থা সমর্থন করে কেবলমাত্র সংকটকালেই রেশন ব্যবস্থা ও বাধ্যতামূলক সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। খাদ্যসমস্যার মূলোচ্ছেদ নয়, খাদ্যশস্যের মূল্যকে মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখার জন্য এই কমিটি মূল্যস্থিতিবিধান সংস্থা (Price Stabilization Board), খাদ্যস্থিতিবিধান সংস্থা (Foodgrain Stabilization Board) এবং প্রথম সংস্থা ও কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তরকে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্য-উপদেষ্টা কমিটি ও দ্বিতীয় সংস্থাকে সাহায্য করার জন্য মূল্যানুসন্ধানী বিভাগ (Price Intelligence Division) গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালে শ্রী ইউ. এন. ডেবরের সভাপতিত্বে একটি কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে চালকলগুলোকে সরকারি তত্ত্বাবধানে আনয়ন এবং চালপ্রধান রাজ্যগুলোর কলগুলোকে সরকারি পরিচালনাধীন করা, খাদ্যশস্যের সর্বনিম্ন মূল্যনির্ধারণ, খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায়ীদের জন্য যে লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে, তাকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে দু' বছরের মধ্যেই খাদ্যশস্যের মূল্যকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণাধীন করা দরকার।

প্রথম পরিকল্পনায় প্রকৃতির দাক্ষিণ্য ;

খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির বিবরণী

১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনার কালে যেমন, তেমনি তার রূপায়ণের সময়েও আমরা এই সত্য উপলব্ধি করেছিলাম যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ার

জন্ম পরিকল্পনা সংক্রান্ত ব্যয়ভারবৃদ্ধি সমস্যা, তথা মুদ্রাস্ফীতির সংকট, পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যশস্য আমদানির জন্য বৈদেশিক বিনিময় সঙ্গতির অশুভক্ষয় ইত্যাদি সমস্যা ঠিক একটি লৌহ-শৃংখলের মত গ্রন্থিবদ্ধ অবস্থায় দেখা দিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনোন্নয়নের কর্মযজ্ঞকে পণ্ড করে তুলতে উদ্যত হয়েছে। দেশে খাদ্যঘাটতি থাকলে শিল্পপ্রসারের গতিবেগ অব্যাহত থাকতে পারে না। তৃতীয় পরিকল্পনায়ও প্রথম দুটি পরিকল্পনার মত শিল্পপ্রসারের ভিত্তি হিসেবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা উল্লিখিত হয়েছে। ভারতের কৃষি সমস্ত রকম সমস্যার জগদ্দল বোঝায় দীর্ঘকাল ধরেই পঙ্গু নিশ্চল হয়ে ছিল: জোতজমির খণ্ডীকরণ ও ক্রমবিভাজ্যমানতা, চাষের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন মধ্যবর্তী স্বত্বভোগীদের শোষণে প্রকৃত চাষীদের দুর্গতি, যুগজীর্ণ প্রাচীন, অবৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতি, কৃষিঋণ ও সুগঠিত বিপণন ব্যবস্থার অভাবে মহাজন-ফড়ে ইত্যাদির শোষণ, সেচ ও সারের অভাব এ সমস্তের বিরুদ্ধে পরিকল্পনার কর্মসূচীগুলোর মাধ্যমে বিরামবিহীন সংগ্রাম চলেছে। ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থায় মধ্য-স্বত্বের বিলোপ, জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ ও সংহতি সাধন ইত্যাদি সম্পন্ন হয়েছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জলসেচের ব্যবস্থা, কৃষি-ঋণ-সরবরাহ উন্নত শস্যবীজ ও রাসায়নিক সরবরাহ, ফসলের ব্যাধি-প্রতিকার ও পঙ্গপালবিতাড়ন, উন্নত ধরণের কৃষি-যন্ত্রপাতি প্রবর্তন, ইত্যাদি পরিকল্পনাগত কার্যক্রমও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করেছে। অধিক ধান উৎপাদনক্ষম জাপানী কৃষিপ্রথা প্রবর্তিত হয়েছে, প্রচলিত প্রথায় যেখানে ১৭ মণ কি তার কিছু বেশি ধান উৎপন্ন হয়, এই পদ্ধতির সাহায্যে সেখানে সাড়ে সাতাশ মণ ধান উৎপাদন করা যায়। মেক্সিকোর গমের ফলন পাঞ্জাব গম অপেক্ষা শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত বেশী, এর প্রবর্তন ভারতীয় কৃষকসমাজে আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। সাধারণ ধানের বীজের ২৫-৩০ মণ ফলনের তুলনায় তাইচুং ধানের ফলন একর প্রতি প্রায় ৬০ মণ, পশ্চিমবঙ্গের কৃষিবিভাগ এই ধানের চাষে উদ্যোগী হয়েছে। সমবায় সংস্থাগুলোর অনেক সম্প্রসারণ ঘটেছে, খাদ্যশস্যের উৎপাদনকেই অগ্রাধিকার দিয়ে সমষ্টিউন্নয়ণ পরিকল্পনা, গ্রামপঞ্চায়েত ও সমবায় সংস্থাগুলোর কার্যধারাকে ঐক্যবদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৬০-৬১ সালে খরিফ মরসুমে যে নিবিড় খাদ্যোৎপাদন অভিযান পরিচালিত হয়েছিল তাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মূলত

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির নানা প্রয়াস

অধিক ফলনশীল তাইচুং ধান ও মেক্সিকো গমের চাষ

দুটি উদ্দেশ্যে নিবিড় কৃষি জেলা কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে : এক, সাম্প্রতিক খাদ্যঘাটতি দূরীকরণ ও দ্রুত অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণের জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি ; দুই, মানুষ ও প্রকৃতিদত্ত উপাদান উভয় প্রকার সম্পদের নিবিড় বা প্রগাঢ় (intensive) ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় প্রদর্শন এবং জলসেচের অনুকূল অঞ্চলে নিবিড় কৃষিকর্মসূচী সম্প্রসারণের দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা।

নিবিড় কৃষি জেলা কর্মসূচী

অসাধু ব্যবসায়ীদের মজুতদারি ও চোরাকারবার ও ফাটকাবাজীর কবল থেকে খাদ্যশস্যকে মুক্ত করে তার মূল্যের স্থায়িত্ববিধান ও যথোপযুক্ত বণ্টনব্যবস্থা খাদ্যসংকট প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক্। সরকার খাদ্যশস্যের মজুতদারি নিরোধের জন্য ভারত সরকার ১৯৫৭ সালে অত্যাবশ্যক সামগ্রী সংশোধনী আইন (Essential Commodities Amendment Act) প্রণয়ন করেছেন। ভারত সরকার ১৯৫৫ সালের অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্য আইন (Essential Commodities Act) অনুসারে রাজ্য সরকারগুলোকে খাদ্যশস্যের পাইকারি ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সপ্রদান, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্টমূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করবার এবং সর্বশ্রেণীর ব্যবসায়ীকে মজুত খাদ্যসামগ্রীর পরিমাণ জানাতে বাধ্য করা প্রভৃতি ক্ষমতা দান করেছেন। অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে ফাটকাবাজির সুযোগ না পায় সে জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যাংকের ঋণদানকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। খাদ্যশস্যের চলাচলের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা চালু আছে। পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং দিল্লী, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং বোম্বাই শহর ব্যতীত বোম্বাই রাজ্য এই তিনটি গম অঞ্চল, চালের জন্য অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর ও কেরালাকে নিয়ে একটি দক্ষিণাঞ্চল গঠন করা হয়েছে। একটি অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে খাদ্যশস্য প্রেরণে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের অনুমতিপত্রের প্রয়োজন। তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শেষভাগে খাদ্যোৎপাদনের অবনতির জন্য রেশনিং তথা সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন বণ্টনব্যবস্থা সম্প্রসারিত ও কঠোরতর করা হয়েছে। ১৯৬৫ সালে প্রায় ১·১ লক্ষ ন্যায্যমূল্যের দোকানের মারফৎ প্রায় ৮৯ মিলিয়ন ব্যক্তিকে ৮·২ মিলিয়ন টন খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে। ঐ সালেই বৃহত্তর নাগরিক অঞ্চলগুলিকে বিধিবদ্ধ রেশনিং-এর (statutory rationing) আওতায় আনবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৬৬ সালের মে মাসের হিসেবে দেখা যায়, বিধিবদ্ধ রেশনিং-এর মাধ্যমে ২৫·৫ মিলিয়ন এবং ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে ৮৪ মিলিয়ন ব্যক্তি উপকৃত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে গঠিত

খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনব্যবস্থা

ভারতের খাদ্যশস্য কর্পোরেশন (Food Corporation of India) খাদ্য সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। খাদ্যসামগ্রীর মজুত নিয়ামক ব্যবস্থা (Buffer Stocks) রেশনিংকে শক্তিশালী তথা খাদ্যসংকট প্রতিরোধের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষভাগে ৬ মিলিয়ন টনের বাফার স্টক গঠনের লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে। সরকার রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের (State Trading Corporation) মাধ্যমে খাদ্যশস্যের ক্রয় ও বিক্রয় কার্যপরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য কৃষিপণ্যদ্রব্যের সঙ্গে খাদ্যশস্যেরও মূল্যস্তরের নিরবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যনীতি সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য একটি কৃষিমূল্য কমিশন (Agricultural Price Commission) ১৯৬৫ সালে স্থাপন করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের খাদ্যসমস্যার প্রকৃত চিরস্থায়ী সমাধান খাদ্যশস্যের উৎপাদনের সম্যক সম্প্রসারণেই নিহিত এ সম্বন্ধে দ্বিমতের কোনও অবকাশ নেই, অথচ প্রতিটি সরকারি উদ্যোগ শোচনীয়ভাবে দুর্বল রয়ে গেছে। খাদ্যশস্যের জন্য বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলোর ওপর নির্ভরতা অর্থনৈতিক দিক থেকে যে কত বিপজ্জনক এবং রাজনৈতিকক্ষেত্রে জাতীয়সত্তার পক্ষে গ্লানিকর হতে পারে, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের সময় আমাদের সে তিক্ত ও কঠিন সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হয়েছে। তবু আমরা খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারিনি। ভূমিসংস্কার ব্যবস্থায় ভূমিহীন চাষীরা সম্পূর্ণরূপে জমির অধিকার লাভ করেনি, সর্বস্তরে সমবায় প্রথা সম্প্রসারিত করা যায় নি, যেটুকু হয়েছে সেটুকু বিকলাঙ্গ থেকে গেছে, গ্রামপঞ্চায়েতগুলি খাদ্যশস্যের উৎপাদনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেবার পরিবর্তে ক্ষমতালাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে পর্যবসিত হয়েছে। ভারতের কৃষক তার নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও উন্নতধরনের বৈজ্ঞানিক চাষ সম্পর্কে উৎসাহ দেখিয়েছে, কিন্তু জলসেচ, রাসায়নিক সার, জীবাণুনাশক ঔষধপত্র, উন্নতধরণের বীজ, কৃষিঋণ প্রভৃতি খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উপকরণ পর্যাপ্তভাবে সরবরাহ করে তার পরিশ্রমেচ্ছুক হাত দুটিকে শক্ত করে তোলা যায় নি। সম্প্রতি কৃষিমূল্য কমিশন সঙ্গত কারণেই কৃষির প্রয়োজনীয় মূলধন, উপকরণ সংস্থান ও অন্যান্য উদ্যমের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জাপান প্রায় এক শতাব্দী পূর্বেই কৃষির উৎপাদনকে যেভাবে দ্বিগুণ করতে সমর্থ হয়েছে তা আমাদের অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। বিশ্বব্যাপী খাদ্য কর্মসূচীর পটভূমিতে ভারত সরকার সম্প্রতি

খাদ্যসংকটের সমাধান
সরকারি প্রচেষ্টার অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা; কর্মসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণ প্রয়োজন

স্থির করেছেন, ১৯৭০ সালের মধ্যে দেশকে খাদ্যশস্যে স্বয়ংনির্ভর করার জন্য প্রতি বৎসর ছয় শতাংশ হারে খাদ্যশস্যের ফলনবৃদ্ধির লক্ষ্যসংবলিত একটি চারসালা কর্মপন্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু ভারতবর্ষে এখনও পর্যন্ত খাদ্যশস্যের ফলনবৃদ্ধির গড় হার বার্ষিক শতকরা প্রায় ২'৬ এবং এর মধ্যেও আবার ফলনের হার বৃদ্ধির করার জন্য মাত্র শতকরা ১ ভাগ ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে, অবশিষ্টাংশ বৃদ্ধির কারণ নতুন জমিতে চাষ। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে লক্ষ্যের বাস্তাবরূপায়ণ যে কত দুরূহতা সহজেই অনুমেয়। স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের এই কর্মসূচীতে নতুন, অধিক ফলনশীল বীজ ব্যবহারের ওপর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে, ৬০ লক্ষ একর জমিতে উন্নত ধানের বীজ, '৩৫ লক্ষর একর জমিতে উন্নত গমের বীজ ও ৫৫ লক্ষ একর জমিতে উন্নত বাজরার বীজ বপন করা হবে। সেই সঙ্গে সার ও সেচের স্বাভাবিক, অনিবার্য চাহিদাবৃদ্ধির কথা মনে রেখে এই স্বয়ংসম্পূর্ণতার কর্মসূচীতে সার ও সেচের জন্যও গুরুত্বপূর্ণস্থান নির্দিষ্ট করতে হয়েছে। খাদ্যশস্য সংগ্রহে শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য রেশনিং-এর দুর্বলতা, অসাধু ব্যবসায়ীদের মজুতদারি ও ফাটকাবাজি নিরোধ ও খাদ্যশস্যের মূল্যের স্থিরতাবিধানে সরকারি কর্মপ্রচেষ্টার অসাফল্য ও অনুপযুক্ততা সাম্প্রতিককালের খাদ্যসমস্যার তীব্র সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষের খাদ্যসংকট যে আমাদের জাতীয় অস্তিত্বেরই সংকট, এই চেতনা জাতীয়জীবনের প্রতিটি স্তরে সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। খাদ্যোৎপাদনের কর্মসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করে তাকে ইস্পাতের মত কঠিন ও কর্মক্ষম করে তুলতে হবে। ভারতবর্ষের নিরন্ন, দুর্গত কোটি কোটি মানুষদের ক্ষুধার অন্ন নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের লোভের ছিনিমিনি খেলা অচিরেই বন্ধ করা দরকার। এর একমাত্র পথ, খাদ্যশস্যে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিপণন ও দেশের সমস্ত অঞ্চলে রেশনিং-এর প্রবর্তন। অথচ এ সম্বন্ধে সরকার এখনও দ্বিধাগ্রস্ত। জনসাধারণকেও খাদ্যের অপচয় রোধ ও তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন সাধন করে, তরিতরকারির উৎপাদনে উৎসাহী হয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় এই সংকট নিবারণ ও তার মূলোচ্ছেদে অগ্রসর হতে হবে। দৃঢ় বলিষ্ঠ জাতীয় নেতৃত্বে আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির কর্মযজ্ঞের বিপুল উদ্দীপনায়, সাহসবিস্তৃত বক্ষের দুর্জয় সংকল্পে, ঐক্যবদ্ধ, সুশৃংখল প্রচেষ্টার গতিপ্রবাহে এই সংকটের সমাধান ঘটবে। অবাস্তব, ভিত্তিহীন নয় বলেই আমাদের এ আশা দুর্মর।

উপসংহার

ভারতের পণ্যমূল্যবৃদ্ধি ও মধ্যবিত্তের সঙ্কট

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- বর্তমান সময়ে মধ্যবিত্ত সংসারে কৃচ্ছ্রতা [ক. বি. '৬২]
- প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও তাহার প্রতিকার [ক. বি. '৬১]
- মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ [ব. বি. '৬৫]
- পণ্যমূল্যবৃদ্ধি, ইহার কারণ ও প্রতিকার [ব. বি. '৬০]

সাম্প্রতিককালে অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যেদ্রব্যের অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত মূল্যবৃদ্ধি আমাদের জাতীয় জীবনে একটি বিভীষিকাময় বিপর্যয় রূপে দেখা দিয়েছে। বিশেষত খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি নিম্ন আয়বিশিষ্ট জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে দুর্বহ করে তুলেছে। একেই ত ভারতের দারিদ্র্যভারজর্জরিত জনসাধারণের জীবনে দুঃখকষ্ট সমস্যার অন্ত নেই, তার ওপর দিনের পর দিন যদি উপার্জনের তুলনায় পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিজনিত ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তবে সেই দুর্বিবহ বোঝা তাদের পক্ষে আর কতদিন বহন করা সম্ভব! একটা নিষ্ঠুর দৈত্যের মতই এই মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা সাধারণ মানুষের শ্বাসরোধ করতে উদ্যত, বাঁচার তাগিদে মরীয়া হয়ে সে একদিন ক্রোধে ক্ষোভে অসুস্থ উত্তেজনায় সমাজের বুকেই আঘাত হেনে বসতে পারে। বস্তুত ভারতের সাধারণ মানুষের জীবন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণ, দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—সমস্ত দিক থেকেই পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি অত্যন্ত ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক।

প্রারম্ভ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনল প্রজ্বলিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে পণ্যদ্রব্যের মূল্য ঊর্ধ্বগতি হতে থাকে। এই দেশের তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসক যে ভাবে প্রচুর নোট ছাপিয়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করেছিল তাকে নির্লজ্জ লুণ্ঠন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস থেকে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর—এই সময়ের মধ্যে কাগজের নোটের পরিমাণ ১৬৯ কোটি টাকা থেকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ১১৪২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছিল। অথচ উৎপাদনের বৃহৎ অংশকেই যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়োগ, যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি

আমদানির পরিমাণ হ্রাস, অসাধু ব্যবসায়ীদের বেপরোয়া মজুতদারি ও কালোবাজারী প্রভৃতি কারণে অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যদ্রব্য সরবরাহ শোচনীয়ভাবে হ্রাস পায়। মুদ্রার প্রচলন ও পণ্যদ্রব্যের সরবরাহের এই বৈষম্যের ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, মূল্য নিয়ন্ত্রণে ও সময়োপযোগী বণ্টনব্যবস্থায় সরকারী শৈথিল্য তাকে শোচনীয় করে তোলে। সাধারণ মানুষের জীবন এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় তাতে বাঙলার লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণবলি দিতে বাধ্য হয়।

স্বাধীনতালাভের পরও এই মুদ্রাস্ফীতি ও তার আনুষঙ্গিক কুফলসমূহের দুর্বিষহ বোঝা ভারতকে বহন করতে হয়। একদিকে উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়াস ও খাদ্য ও বস্ত্রের সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন বণ্টনব্যবস্থা, অন্যদিকে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করে ঘাটতি-বাজেট পরিহারের চেষ্টা, লভ্যাংশের ঊর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণ ও অন্যান্য উপায়ে ক্রয়শক্তির পরিমাণ হ্রাস—প্রভৃতি ব্যবস্থার সাহায্যে ভারত সরকার পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিকে আয়ত্তাধীন করার জন্য সচেষ্ট হন। ১৯৪৯ সালের মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পর খাদ্যশস্য, বস্ত্র ইত্যাদির মূল্যহ্রাস, কয়েকটি পণ্যদ্রব্যের আগাম কারবার (forward trading) নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্য কিছুটা পরিমাণে স্থিতিশীল থাকে। ১৯৫০ সালে কোরিয়া যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পুনরায় মূল্য ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে।

যুদ্ধোত্তরকালে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও প্রতিরোধের প্রয়াস

অতঃপর এই মূল্যবৃদ্ধির মাঝখানে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হল। কোরিয়া যুদ্ধের অবসান, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণসংকোচন ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি অবলম্বিত হওয়ার ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়। প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে মূল্যস্তরের সাধারণ সূচক ছিল ১২৫.৩, ১৯৫২ সালের মার্চের তা ৯৯.৯-তে এসে দাঁড়ায়। মৌসুমী বৃষ্টির অকৃপণ প্রসাদে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তার ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য নিম্নাভিমুখী হয়, কিছুকাল ধরে অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মূল্যেও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

প্রথম পরিকল্পনাকালে পণ্যদ্রব্যের মূল্য

কিন্তু ১৯৫৫ সাল থেকেই আবার মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বমুখীনতার সূত্রপাত। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রতিটি বৎসরে অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে

এসেছে। এই পরিকল্পনাকালে পাইকারী মূল্যস্তর বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল শতকরা ৩০ ভাগ, খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি পরিমাণ শতকরা ২৭ ভাগ এবং শিল্পগত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৪৫ ও ২৫ ভাগ। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে জীবনযাত্রার ব্যয়স্তরের সাধারণ সূচক ছিল ১০০, পরিকল্পনা শেষে তা ১১৪-তে এসে পৌঁছোয়। সেই থেকেই পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণ তথা সমগ্র অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক থেকে একটি জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি

দ্বিতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা ৩০ শতাংশের অধিক বর্ধিত মূল্যস্তরের বোঝা নিয়ে তৃতীয় পরিকল্পনার যাত্রারম্ভ। তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন যুক্তিসঙ্গত কারণেই মূল্যের স্থিতিবিধানকে (price stabilisation) পরিকল্পনার সাফল্যের অন্যতম অপরিহার্য সর্তরূপে ঘোষণা করেছিলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-বুলেটিনের ১৯৬৭ সালের জুন সংখ্যায় গত পনের বৎসরে মূল্যস্তরের গতিকে চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫-৫৬ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার কাল হল প্রথম পর্যায়: পণ্যদ্রব্যের মূল্যের ১৭·৩ শতাংশ হ্রাস এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য। ১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৬০-৬১, বা দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাল হল দ্বিতীয় পর্যায়, এই সময়ে ৩৫ শতাংশ করে মূল্যবৃদ্ধি পায়। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুটি বৎসরকে তৃতীয় পর্যায় হিসাবে ধরা হয়েছে, এই পর্যায়ে পণ্যদ্রব্যের মূল্য আপেক্ষিক বিচারে স্থিতিশীলই ছিল, এই দুই বৎসরে বাৎসরিক গড়ে সাপ্তাহিক পাইকারী মূল্যস্তরের সূচক মাত্র ২·৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

গত পনের বৎসরে মূল্যস্তরের গতির চারটি পর্যায়

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের মূল্যবৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অর্থনীতিবিদেরা বলেছেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যেই মূল্যস্তর বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিহিত থাকে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ না থাকলেই তা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। আমরা পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিকে সেই সীমায় আবদ্ধ রাখতে পারিনি। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের ক্রমাগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরকারের ক্রমবর্ধমান ঘাটতিব্যয় (deficit financing) ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর ঋণসরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মুদ্রাস্ফীতির চাপ, খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস, বিদেশ থেকে

মূল্যবৃদ্ধির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়

খাদ্যশস্যের আমদানির জন্য ব্যয়বৃদ্ধি, মুদ্রার সরবরাহবৃদ্ধির ফলে ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের চাহিদার বৃদ্ধির তুলনায় তার সরবরাহের স্বল্পতা এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য, বিশেষত খাদ্যশস্যের মজুতদারি ও ফাটকাবাজি এই দুটি পর্যায়ে মূল্যবৃদ্ধির কারণ।

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ তিন বৎসরকে (১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৫-৬৬) মূল্যস্তরের গতির চতুর্থ পর্যায়রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পর্যায়ে প্রায় ৩৬ শতাংশ হারে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, ১৯৬৬-৬৭ সালেও এই উর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকে। মূল্যের এই বৃদ্ধির পরিমাণ গত দশ বৎসরের মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি। এই সময়ে খাদ্যশস্য ও শিল্পগত কাঁচামালের মূল্যই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৫-৬৬ সালে খাদ্যশস্য ও শিল্পগত কাঁচামাল বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪ ও ২৮ শতাংশ। ১৯৬৬-৬৭ সালে খাদ্যশস্যের মূল্য প্রায় শতকরা ৩৭ ভাগ হারে বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিক এই মূল্যবৃদ্ধি সত্যি অস্বাভাবিক ও অত্যন্ত উদ্বেগজনক। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিনের ১৯৬৭ সালে ৬ই জুন সংখ্যায় প্রদত্ত পাইকারি মূল্যস্তরের গতির এই হিসাবটি থেকে সাম্প্রতিক কালের মূল্যবৃদ্ধির তীব্রতা উপলব্ধি করা যায়:

মূল্যবৃদ্ধির চতুর্থ পর্যায়: তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ-ভাগে মূল্যবৃদ্ধি

বিবরণ	প্রথম পরিকল্পনা ১৯৫১-৫৬	দ্বিতীয় পরিকল্পনা ১৯৫৬-৬১	তৃতীয় পরিকল্পনা ১৯৬১-৬৬	চতুর্থ পরিকল্পনা ১৯৬৬-৬৭
সকল পণ্যদ্রব্য	−১৭·৩	+৩৫·০	+৩২·২	+১৫·৭
খাদ্যশস্য	−২৩·০	+৩৮·৬	+৪০·৭	+১৮·৪
শিল্পগত কাঁচামাল	−২৪·৩	+৪৬·৯	+৩০·১	+২০·৯
শিল্পজাত দ্রব্য	− ৩·৪	+২৪·৩	+২০·৩	+ ৯·২

সাম্প্রতিক কালের এই তীব্র, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণ হল, প্রথমত, সামগ্রিক সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ

তিন বৎসরে জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধির গড় বাৎসরিক হার ছিল শতকরা ১১ ভাগ, সেই ক্ষেত্রে জাতীয় উৎপাদনের হার ছিল মাত্র শতকরা তিনভাগ। দ্বিতীয়ত, খাদ্যশস্য ও শিল্পগত কাঁচামালই আমাদের দেশের মূল্যস্তরের প্রধান নিয়ামক, সাধারণ মূল্যসূচকে এদের অংশ হল ৬৬ শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষভাগে অনাবৃষ্টি ও পরিকল্পনার কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীর ব্যর্থতার জন্য কৃষিক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যর্থতাই আমরা দেখি। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যেখানে কৃষি উৎপাদন ২০ শতাংশেরও বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেখানে তৃতীয় পরিকল্পনা কালে ৭৪ শতাংশ হারে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়। তৃতীয়ত, সরকারের উন্নয়ন খাতে ব্যয়বৃদ্ধির সঙ্গে ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণ ও ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানীর আক্রমণের ফলে প্রতিরক্ষাব্যয়ও বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬২-৬৩ সালে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪২৫ কোটি টাকা, ১৯৬৬-৬৭ সালে তার পরিমাণ হয় ৭৯৮ কোটি টাকা। অর্থনৈতিক উন্নয়নও দেশরক্ষা এই যুগ্ম দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সরকারকে নোট ছাপিয়ে ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সমগ্র পরিকল্পনাকালে মুদ্রার সরবরাহ ৫৭.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পণ্য-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এই মুদ্রাস্ফীতিরই কুফল।

সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির কারণ : চাহিদা ও সরবরাহে বৈষম্য, কৃষির ব্যর্থতা, উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষা ব্যয়বৃদ্ধির জন্য ঘাটতিব্যয়

চতুর্থত, জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও নগরীকরণ (Urbanisation) খাদ্যশস্যের চাহিদাকে বাড়িয়ে তুলে সরবরাহে গুরুতর চাপ সৃষ্টি করেছে। পঞ্চমত, বেসরকারি ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারি সংস্থা ক্রমাগত অধিক পরিমাণে ব্যাঙ্কের ঋণের আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং তার ফলে মূল্যস্তরে অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ষষ্ঠত, হিসাব বহির্ভূত কালো টাকাও বর্তমান পণ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য কম দায়ী নয়। সপ্তমত, অসাধু ব্যবসায়ী, জোতদার, বড় চাষী প্রভৃতিদের মজুতদারি ও ফাটকাবাজিও খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৬৭ সালের সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যকার ব্যবধান যেখানে ৬০ লক্ষ টন বা শতকরা ৭ ভাগ, সেখানে শতকরা প্রায় ৩৭ ভাগ মূল্যস্ফীতির জন্য এই অসাধু ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ বহুলাংশে দায়ী। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ভারতীয় মুদ্রার মূল্যহ্রাসের ফলে বিশেষ করে আমদানি-নির্ভর শিল্পসমূহের উৎপাদিত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও নগরীকরণ, সঞ্চয়ের তুলনায় বেসরকারি অংশের ব্যয়বৃদ্ধি, খাদ্যশস্যের মজুতদারি ও ফাটকাবাজি

অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের এই ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির আঘাত বাঁধা স্বল্প আয়ের ওপর নির্ভরশীল শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই সহ্য করতে হচ্ছে। মধ্যবিত্তদের অবস্থাই সব থেকে শোচনীয়। একটি শ্রমিক পরিবারের নারী পুরুষ এবং বালকও উপার্জন করে থাকে, খাদ্যশস্য ছাড়া তাদের জীবন-যাত্রার অন্য কোনও ব্যয় বিশেষ নেই, কোনও কোনও শ্রমিক বিশেষত অবাঙালি শ্রমিকদের চাষের জমি আছে, অথবা চাষের কাজ করে থাকে, ওভারটাইম বা অতিরিক্ত সময়ে কাজ করেও তারা উপার্জনবৃদ্ধির সুযোগ পায়। কিন্তু শিক্ষক, অধ্যাপক, কেরাণী প্রভৃতি বাঁধা আয়ের চাকুরিজীবি মধ্যবিত্তদের দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করতে হয়, পুত্রকন্যাদের উচ্চশিক্ষা দান ও কন্যার বিবাহ, আতিথেয়তা ও লৌকিকতার দায়দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বর্তমান অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য অথৈ জলে নিমজ্জিত তরণীর যাত্রীর মতই খাবি খেতে হচ্ছে। পরিবারের কারোর কঠিন, দুরারোগ্য ব্যাধি হলেও তার দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার ব্যায়ভার বহন করতে গিয়ে একজন মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবিকে আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত হতে হয়, মোটামুটি একটি ভদ্রজীবনের মান বজায় রেখে নিজেদের অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রাখাই এক মর্মান্তিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে মধ্যবিত্ত সমাজের দুর্গতি

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বর্তমান পণ্যদ্রব্যের অগ্নিমূল্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই সব থেকে অধিক পরিমাণে আঘাত করেছে, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন চাকুরিজীবিদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি পেলেও তা পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে নি। অবিরাম রক্তক্ষরণে মধ্যবিত্ত সমাজ আজ মুমূর্ষু, তার অদৃষ্টে শুধু দিন যাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানি। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণী সত্যি আজ দুঃস্থতার চরম সীমায়ই উপনীত। খাদ্য, বস্ত্র, মৎস্য, তৈল, দুগ্ধ, প্রত্যেকটি অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের মূল্য আজ আকাশস্পর্শী। ইংরেজ আমলে ১৯২৯-৩২ সালের অর্থনৈতিক মন্দার সময়ই বাঙলার মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙন শুরু হয়, আর তৃতীয় পরিকল্পনা শেষ হবার পর দেশে যে ব্যাপক ও তীব্র মুদ্রাস্ফীতি-ঘটিত অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, তার আঘাতে এই শ্রেণীর আজ প্রায় বিধ্বস্ত হওয়ার লক্ষণ পরিস্ফুট। মধ্যবিত্তশ্রেণী ধ্বংসের সম্মুখীন কিনা এই প্রশ্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সমাজ কি ধ্বংসের সম্মুখীন ?

অথচ বাঙলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পথিকৃৎ ছিল এই মধ্যবিত্ত

সমাজ। সাহিত্য, শিল্প সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজসংস্কার, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই নেতৃত্ব দিয়েছে, স্বাধীনতা-সংগ্রামেও তারাই ছিল পুরোধা। কালের অমোঘ নির্দেশে, কায়িক শ্রমবিমুখ চাকুরিজীবি এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী একদিন বিলুপ্ত হবে, তার সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সকল ব্যবধান ঘুচে যাবে। কিন্তু যত দিন তা না হচ্ছে, ততদিন মধ্যবিত্ত সমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য। পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির মত অর্থনৈতিক ব্যাধি এই শ্রেণীকে অবসন্ন করে ফেললে সমাজ গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মধ্যবিত্তরাও ক্রমশঃ তাদের পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করছে, শ্রমনির্ভর কাজে তারা আর বিমুখ নয়। সরকারকেও তেমনি তাদের জীবনযাত্রার সমস্যাসমাধানে সচেষ্ট হতে হবে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক

বস্তুত, সমস্ত দিক থেকেই পণ্যদ্রব্যের মূল্যনিয়ন্ত্রণ আমাদের জাতীয় জীবনের একটি জরুরী কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি রোধের বিভিন্ন পন্থাগুলো হল এই : এক, খাদ্যশস্যের ঘাটতিই পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ, সুতরাং তার উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করতে হবে; দুই, মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণসংকোচনের যে নীতি গ্রহণ করে আসছে তাকে আরও কঠোর করে তোলা প্রয়োজন, তিন, খাদ্যশস্যের পূর্ণ রাষ্ট্রীয়-বাণিজ্য ও ক্রেতা সমবায় বিপণীর মাধ্যমে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের সরবরাহের ব্যবস্থা; চার, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর কাছ থেকে দাদন নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা খাদ্যশস্যের মজুতদারি ও ফাটকাবাজি চালিয়ে থাকে, সুতরাং প্রয়োজন মত তাদের জাতীয়করণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে; পাঁচ, সরকারি উদ্যোগে অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের উৎপাদন।

মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায়

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তর একটি বহুমুখী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ও অন্যান্য ভাতা স্থগিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির দিক থেকে এ প্রস্তাব যে গ্রহণীয় নয় সরকার তা উপলব্ধি করেছেন। এই পরিকল্পনার অন্যান্য দিক হল, বকেয়া কর আদায়, কর ফাঁকি দেওয়া বন্ধ করার

কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিরোধের বহুমুখী পরিকল্পনা

জন্য কঠোর শাস্তির বিধান সন্নিবিষ্ট করে আয় কর আইন সংশোধন, অত্যাবশ্যক পণ্য আইনের কঠোর ধারাগুলোর প্রয়োগ, মজুতদারি ও মুনাফাবাজি কঠোরভাবে নিবারণ, কালো টাকা উদ্ধার ইত্যাদি।

চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় পরিকল্পনা কমিশন মূল্যের স্থিতিবিধানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মূল্যবৃদ্ধি রোধের এই উপায়গুলো পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশ করেছেন: এক, খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি; দুই, সরকারি ব্যয়ে কঠোর সংযম ও পর্যাপ্ত পরিমাণে আভ্যন্তরীণ সঞ্চতি-সংগ্রহ; তিন, খাদ্যশস্য, বস্ত্র, তৈল প্রভৃতি অত্যাবশ্যক ভোগ্য-পণ্যদ্রব্যের পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও নিয়ন্ত্রণের প্রসার; চার, ক্রেতা সমবায়, ন্যায্যমূল্যের দোকান প্রভৃতির মাধ্যমে ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের সরবরাহ, শিল্পজাত কাঁচামালের মূল্য ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ; পাঁচ, ঘাটতিব্যয় পরিহার, রাজস্বসংক্রান্ত ব্যবস্থার সাহায্যে অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতার উচ্ছেদসাধন। চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য আপাতত ২৩,৭৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাবিত হয়েছে, মুদ্রাস্ফীতি তথা মূল্যস্ফীতি না ঘটিয়ে এই বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ যে কি করে সম্ভব হবে সে সম্পর্কে ভারতের বিভিন্ন মহল সংশয় প্রকাশ করেছেন।

চতুর্থ পরিকল্পনা ও মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ

চতুর্থ পরিকল্পনায় বিনিয়োগের চূড়ান্ত পরিমাণ যাই হোক না কেন, পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য সর্বাত্মক জাতীয় প্রয়াসের প্রয়োজন। অসাধু ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্রে পণ্যদ্রব্যের মূল্য যেন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি না পায়, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বহ না হয়ে ওঠে, তার জন্য সরকারকে কঠোর হতে হবে। এই সংকটের অন্ধকার যতই ঘনীভূত হোক, সম্মিলিত সংকল্পে ও প্রচেষ্টায় তার অবসান ঘটবেই ঘটবে।

উপসংহার

ভারতের জনসমস্যা

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- ভারতের জনবৃদ্ধি সমস্যা [ক, বি, '৬১]
- লোকবৃদ্ধি সমস্যা [ক, বি, '৬৩]
- ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তিই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দুটি প্রধান ভিত্তি। প্রকৃতি মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তিতে, মৃত্তিকানিহিত খনিজসম্পদে, অরণ্যে, নদীতে নির্ঝরে তার সম্পদকে সঞ্চিত করে রাখে, মানুষের শ্রমশক্তি সে সমস্ত সঞ্চয়কে জাতির ঐশ্বর্য করে তোলে, তার দৌলতে ব্যক্তির জীবনও হয় শ্রীমণ্ডিত, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দময়, আলোকোজ্জ্বল। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা তার শক্তিতে পরিণত হয়নি, অগ্রগতির পথে একটি বিরাট অচলায়তন, দুর্বহ প্রতিবন্ধক, বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজ শাসন দীর্ঘকাল ভারতের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্ত পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। যে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, মধ্যযুগীয় সংস্কারাচ্ছন্নতা ভারতের জনসংখ্যাবৃদ্ধির কারণ, তা ইংরেজের শোষণেরই ফল, তা ভারতের ঐশ্বর্য লুণ্ঠন মত্ততায় এদেশের আর্থিক উন্নয়নকে নির্মমভাবে অবহেলা করারই শোচনীয়, মর্মন্তুদ পরিণাম। ভারতের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কিছুটা পরিমাণে দায়ী সন্দেহ নেই, কিন্তু সব থেকে বেশী দায়ী তার দারিদ্র্য ও অশিক্ষা ও তজ্জনিত উচ্চজীবন যাত্রার আকাঙ্ক্ষার অভাব, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির মত প্রাচীন সামাজিক প্রথা, আর অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা এ সমস্ত কিছুরই পরিপোষক।

প্রারম্ভ

১৯৬১ সালের আদমসুমারী (Census) অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৪৩৯'২ মিলিয়ন, অর্থাৎ ৪৩ কোটি ৬৪ লক্ষ ২০ হাজার; সমগ্র পৃথিবীতে জনসংখ্যার দিক থেকে তার স্থান দ্বিতীয়। ১৯৬৬ সালে এদেশের জনসংখ্যা ৪৯৮'৯ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ও ঔষধপত্র এবং জনস্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থায় উন্নতির জন্য মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে, অথচ প্রজনন কিছুমাত্র নিয়ন্ত্রিত হয় নি। সেইজন্যই ভারতের জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ১৯৪১-৫১ এই সময়ে ভারতের বাৎসরিক জনসংখ্যার বৃদ্ধি শতকরা

১৯৫১ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যার হিসাব

১'২৬ ভাগ থেকে ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে বাৎসরিক ১'৯৭ হারে বৃদ্ধি পায়, ১৯৬১-৬৫ এই সময় সীমার মধ্যে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ২'৪ শতাংশ, ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা ২'৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। ১৯৬১ সালের আদমসুমারির ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশন যে হিসেব করেছেন, তদনুযায়ী ১৯৬৬ সালে ভারতের জনসংখ্যা হবে ৪৯ কোটি ২০ লক্ষ, ১৯৭১ সালে ৫৫ কোটি ৫০ লক্ষ এবং ১৯৭৬ সালে ৬২ কোটি ৫০ লক্ষ হবে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির এই হার সত্ত্বেও ভারতবর্ষ অতি জনাকীর্ণ (over populated) দেশ কিনা সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। মাত্রাধিক জনাকীর্ণতা সম্বন্ধে দুটি তত্ত্বের প্রচলন দেখা যায়, এক ম্যালথাসের তত্ত্ব (Mal thusian theory), দুই, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব (Theory of Optimum Population)। ম্যালথাসের তত্ত্বানুযায়ী, যখন কোনও দেশে খাদ্যের সরবরাহ জনসংখ্যার পক্ষে পর্যাপ্ত না হয়, তখনই তাকে অতি-জনাকীর্ণ বলে চিহ্নিত করা যায়। এই তত্ত্বের মানদণ্ডে ভারতবর্ষকে অতি জনাকীর্ণ বলা হয়েছে। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, পি. কে. ওয়াটাল, অধ্যাপক গিয়ানচাঁদ প্রভৃতি অর্থনীতিবিদেরা বহু পূর্বেই ভারতকে জনবহুলদেশ বলে নির্দেশ করেছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাল থেকেই আমাদের বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করতে হচ্ছে, ১৯৬৪-৬৫ সালে অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে ভারতকে ২০৮ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছিল। যেখানে ভারতের খাদ্যশস্যের মোট প্রয়োজন ৯৫০ লক্ষ টন, সেখানে ১৯৬৫-৬৬ সালে খাদ্য শস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭৬০ লক্ষ টন। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগের মত চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম পর্বেও সমগ্র দেশে নিদারুণ খাদ্যাভাব ও তার অনিবার্য ফল-তীব্র অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য-শস্যের এই ক্রমিক ঘাটতি ভারতের জনবহুলতারই প্রমাণ। ম্যালথাস একথাও বলেছিলেন জনাধিক্য ঘটলে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকৃতি জন-সংখ্যার অতিরিক্ত অংশটুকুর ধ্বংস সাধনে খাদ্যের সংস্থান ও জনসংখ্যার মধ্যে তার সাম্য প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৬৬ সালে বিহারে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও বাঙলার ১৪২ সালের দুর্ভিক্ষের মতই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবাংলায় কয়েকটি জেলায় দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া আমরা দেখেছি। এদিক থেকেও ম্যাল-থাসের তত্ত্ব নির্দিষ্ট জনসংখ্যাধিক্যের লক্ষণ ভারতবর্ষে প্রকট।

ম্যালথ্যাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

দ্বিতীয় তত্ত্বের সমর্থকদের মতে, ভারতে জনবহুলতা ঘটেনি। ভারতের জন-

সংখ্যার ঘনত্ব অনেক ইউরোপীয় দেশ অপেক্ষা কম, এখানে মাথা পিছু আয়ও ক্রমবর্ধমান। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভারতের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এখনও যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়নি। শিল্পক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা, গতানুগতিক উৎপাদন পদ্ধতি ও অসম বণ্টনই ভারতবাসীর সকল দুর্গতির মূল কারণ। সেই জন্যই এই দেশে এক দিকে মুষ্টিমেয় শ্রেণীর প্রাচুর্য, অন্যদিকে সাধারণ মানুষদের সীমাহীন, দুর্বিষহ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করতে দেখা যায়। অধ্যাপক ক্যান্নান প্রমুখ অর্থনীতিবিদেরা যে সর্বাধিক উৎপাদনের অবস্থা (point of maximum return) নির্দেশ করেছেন, ভারত তার শ্রমশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনে নিয়োজিত করে সেই পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, এ কথা কোনও মতেই বলা যায় না। ভারতবর্ষ তার অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যায় ভারাক্রান্ত নয়, তার জনশক্তিকে 'অন্তর্নিহিত সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত' (Potential Surplus) রূপেই গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। অধ্যাপক মেলিগম্যান বলেছেন, ভারতের জনসংখ্যা সমস্যা শুধু সংখ্যার সমস্যা নয়, তা হল সুদক্ষ উৎপাদন ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের সমস্যা।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ এ দুটি তত্ত্বের কোনওটিরই সমর্থক নন, তাঁরা মধ্যপন্থাবলম্বী। তাঁদের মতে, তিনটি পরিকল্পনায় যে মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি ঘটেছে, তার মধ্যে প্রকৃত আয়ের পরিমাণ নিতান্তই স্বল্প। ১৯৫০-৫১ সাল থেকে প্রকৃতপক্ষে ভারতের জনসংখ্যা বৎসরে ২·৫ শতাংশ হারেই বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে। আর তৃতীয় পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বৃদ্ধির বাৎসরিক গড় হয়েছে ২·৫ শতাংশ। তার ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে জাতীয় আয়ের যে পরিমাণ ছিল, সমাপ্তিতেও তার কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। ভারতের উপকরণসমূহে ব্যবহৃত হয়নি বলে তার জনাধিক্য ঘটেনি, এত মত গ্রহণযোগ্য নয়। অন্তত বর্তমানে যে হারে উপকরণ নিয়োজিত হচ্ছে, তার তুলনায় যে জনবহুলতা ঘটেছে তা অবশ্য স্বীকার্য। ভারতবর্ষে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে, আগামী দশ পনের বৎসরের মধ্যে উৎপাদনবৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টাসত্ত্বেও যে তার খাদ্যসংস্থান সম্ভব হবেনা, অর্থাৎ ভারতের খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্য অনায়ত্ত থেকে যাবে, অনেক বিদেশী ও ভারতীয় অর্থনীতিবিদই তা হিসেব কষে দেখিয়ে দিয়েছেন। এই অবস্থা চলতে থাকলে ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশ একদিন ভয়াবহ বিস্ফোরক অবস্থায় উপনীত হবে।

ভারতের জনসংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কে তৃতীয় মত

ভারতের জনসংখ্যাবৃদ্ধি খাদ্য সমস্যাকেই শুধু তীব্র ও জটিল করে তোলেনি, দেশের অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই অশুভ, ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে আমাদের খাদ্যশস্য আমদানির জন্য ২৮০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল, এর ফলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গতি হ্রাস পেয়েছে, মূল পরিকল্পনার ব্যয়বৃদ্ধিতে নানা অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। জনসংখ্যাবৃদ্ধি কর্মসংস্থানের সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে। জনসংখ্যাবৃদ্ধিতে অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দেয় এবং তার অনিবার্য পরিণাম হিসেবে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। দেশের বর্তমান পণ্যদ্রব্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির জন্য জনসংখ্যাবৃদ্ধি যে কিছুটা পরিমাণে দায়ী তা আমাদের স্বীকার করতেই হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহসংস্থান, সমাজে শৃংখলা রক্ষা—প্রভৃতি ক্ষেত্রেও জনসংখ্যাবৃদ্ধি 'গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর সমস্যা, তার যথাযথ নিয়ন্ত্রণের ওপর চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক ও পরবর্তী পরিকল্পনাগুলোর সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির নানা ক্ষতিকর প্রভাব

তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় পরিকল্পনা কমিশন যথার্থই বলেছেন, পরিবার পরিকল্পনা (family planning) কর্মসূচী তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চাবিকাঠিস্বরূপ। 'অদূরদর্শী মাতৃত্ব,' অর্থাৎ তিন ও ততোধিক সন্তানের জননীর পুনর্মাতৃত্ব রোধই পরিবার পরিকল্পনার মৌলিক ভিত্তি। বৃহৎ পরিধিতে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচীর প্রয়োজনীয় সামাজিক পটভূমি সৃষ্টির জন্য ব্যাপক শিক্ষা, স্বাভাবিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যকলাপের সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনাকার্যাদির সংহতিবিধান, চিকিৎসা, ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহ এবং যথোপযুক্ত সংখ্যায় পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র (family planning clinics) স্থাপনের মাধ্যমে জন্মনিরোধের ব্যবস্থা ও পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রচার, মেডিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণ কর্মসূচীর উন্নয়ন এবং পরিবার পরিকল্পনা অভিযানে যত বেশি সম্ভব স্থানীয় স্বেচ্ছা নেতৃত্ব ব্যবহার ইত্যাদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি, বিবাহ ও সন্তান জন্মের উপর কর নির্ধারণ, তিনটির বেশী সন্তান হলে বেতন বা মজুরী হ্রাস প্রভৃতি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বনের মত পরিবেশ ভারতবর্ষে সৃজিত হয়নি।

পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য উপায়

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত জ্ঞান প্রচারের জন্য

মাত্র ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। পরিকল্পনা কমিশন এ সময় দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধি সমস্যার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেননি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেই পরিকল্পনা কমিশন এ সম্পর্কে সচেতন হন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পরিবার পরিকল্পনা খাতে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে ৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়। কর্মসূচী নিরূপণের জন্য কেন্দ্রে ও কয়েকটি রাজ্যে পরিবার পরিকল্পনা পরিষদ (Family Planning Board) ও কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের সংখ্যা ১৭৫০ হয়েছিল ; মূল কর্মসূচীতে শহরাঞ্চলে ৫০০ ও গ্রামাঞ্চলে ২০০০, সমেত ২৫০০ জ্ঞান প্রচার কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব ছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার অগ্রগতি

তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষভাগে পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১,৪৭৪। পরিবার পরিকল্পনা-সংক্রান্ত কর্মসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় রূপে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। ১৯৬৭ সালে প্রখ্যাত জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ ডাঃ চন্দ্রশেখর এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হয়েছেন। জন্ম সংখ্যা হাজার প্রতি ৪০ থেকে ২৫-এ হ্রাস করার মৌলিক লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে চতুর্থ পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনা-খাতে ৯৫ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাবিত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা অভিযানকে সফল করে তোলার জন্য চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মীদের প্রশিক্ষণকে এই পরিকল্পনায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। সমগ্র ৫২০০টি সমাজ উন্নয়ন ব্লক ও ঘন জনবসতিপূর্ণ শহরাঞ্চল পরিবার পরিকল্পনা-সংক্রান্ত কর্ম-সূচীর অধীনে আনয়ন করাই চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য।

তৃতীয় পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি ও চতুর্থ পরিকল্পনার কর্মসূচী

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আমাদের অগ্রগতি বিশেষ আশাপ্রদ নয়। শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীই পরিবার পরিকল্পনায় উৎসাহী। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের কৃষি ও অন্যান্য জীবিকাশ্রয়ী মানুষদের নিয়েই সমস্যা। তারা এখনও নানা সংস্কারে ও অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন। অবশ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দূরীকরণই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘস্থায়ী কার্যকরী উপায়। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অবিরাম সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, তাই হবে দেশের উজ্জ্বল, স্বাস্থ্যময় ভবিষ্যৎ নির্মাণে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

ভারতের জনস্বাস্থ্য

- ভারতের জনস্বাস্থ্য সমস্যা
- ভারতীয় জনজীবন ও জনস্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যবান, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা জনসাধারণই দেশের সকল সম্পদের উৎস, জাতির প্রাণশক্তির আধার। পরাধীন, বিদেশী শাসনশৃংখলিত ভারতবর্ষে জনস্বাস্থ্যরক্ষার নিম্নতম প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলোও নির্মমভাবে অবহেলিত হয়েছে। স্বাস্থ্যহীনতায়, অকালবার্ধক্যের বোঝায় ভারাক্রান্ত, রোগজীর্ণ শরীর নিয়ে ভারতবাসী দিনযাপনের প্রাণধারণের দুর্বিষহ গ্লানি ভোগ করতে করতে নৈরাশ্যের নীরন্ধ্র অন্ধকারে শুধু মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণেছে। কত ফুলের মত সুন্দর, নিষ্পাপ শিশুর, ভবিষ্যতের স্বপ্নে উদ্বেল কত কিশোর ও তরুণের প্রাণ অকালে ঝরে গেছে, একমাত্র উপার্জনকারী গৃহকর্তার প্রাণপ্রদীপ রোগের আকস্মিক আক্রমণে হঠাৎ নির্বাপিত হয়েছে, তার পরিবারে চিরকালের জন্য নেমে এসেছে নিষ্ফলতার ঘন অন্ধকার। এক একটি মহামারীতে অজস্র মানুষের মৃত্যু ঘটেছে, গ্রামের পর গ্রাম শ্মশানে পরিণত হয়েছে। এদেশে মৃত্যুই ছিল যেন স্বাভাবিক ঘটনা, বেঁচে থাকাটাই ছিল আশ্চর্যের। অশিক্ষায় অন্ধসংস্কারে নিমজ্জিত এখানকার সাধারণ মানুষেরা শুধু দৈবশক্তির কৃপার ওপর নির্ভর করে বাঁচার মর্মান্তিক চেষ্টা করে এসেছে।

প্রারম্ভ

দারিদ্র্যই স্বাস্থ্যহীনতার মূল কারণ। দারিদ্র্যের জন্যই মানুষ শরীর রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক পুষ্টিকর আহার্য পায় না, অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পংকিল পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হয়। তার ফলে তার জীবনীশক্তির ক্রমাগত ক্ষয় ঘটতে থাকে, ব্যাধির প্রতিষেধক ক্ষমতা সে ফেলে হারিয়ে, ব্যাধির আক্রমণ তাকে অতি সহজেই পর্যুদস্ত করে। দারিদ্র্যের জন্যই সে সভ্যসমাজের শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ন্যূনতম সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণেও উদাসীন থাকে। ঠিক এই কারণেই ভারতীয়দের স্বাস্থ্য অত্যন্ত শোচনীয়, তাদের ক্ষীণায়ু জীবনে ব্যাধি নিত্যসঙ্গী। মানুষের গড় হিসাবে আয়ু আমেরিকা, ব্রিটেন ও জার্মানীতে ৬২ বৎসর, ইটালীতে ৫৬ বৎসর, নিউজীল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় ৬৭ বৎসর, জাপানে ৪৬ বৎসর, আর ভারতবাসীর আয়ু মাত্র ৪২ বৎসর। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর তুলনায় ভারতে

ভারতবাসীর স্বাস্থ্যহীতার কারণ ও তার স্বরূপ

শিশুমৃত্যুর হার সত্যি শোচনীয়। ১৯৪১-৫১ সাল পর্যন্ত ভারতে শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজার প্রতি ৪৬৫। উন্নত দেশগুলোর হিসাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখি ব্রিটেনে শিশুমৃত্যুর হার হাজার প্রতি ৫২, আমেরিকায় ৪২, কানাডায় ৫৪,— অষ্ট্রেলিয়ায় ৩৬। ভারতে সাধারণ মৃত্যু ও সংক্রামক ব্যাধিতে অকাল মৃত্যুর উচ্চ হারও আমাদের জাতীয় জীবনের অপরিসীম দৈন্যের পরিচায়ক, তার কলঙ্ক, গ্লানি, দারিদ্র্যের মর্মান্তিক অভিশাপ।

আমরা পূর্বেই বলেছি, ভারতবর্ষের বিদেশী শাসক তার প্রজাদের স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে নিম্নতম দায়িত্ব পালন করেনি। ইংরেজ আমলে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের, কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক টীকা ব্যাপক ভাবে দেওয়া, আবর্জনা পরিষ্কার ও বীজাণুনাশক ওষুধপত্রের প্রয়োগ, সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক বিধি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা, এ সমস্ত ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই অবলম্বিত হয়নি। সরকারি স্বাস্থ্যবিভাগ নিতান্ত নিষ্প্রাণ দায়সারা ভাবে তার রুটিন বাঁধা দায়িত্ব পালন করে যেত মাত্র। সমগ্র দেশের জন্য সরকারের কোনও স্বাস্থ্য পরিকল্পনা ছিল না, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠাও দেখা দেয় নি।

ইংরেজ আমলে স্বাস্থ্যরক্ষার শোচনীয় ব্যবস্থা

স্বাধীনতালাভের পর স্বভাবতই জাতীয় সরকারের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব অন্যতম কঠিন ও জটিল সমস্যারূপেই দেখা দিয়েছে। ভারত সরকার দুর্জয় সংকল্প নিয়েই এই দায়িত্বপালনে অগ্রসর হয়েছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার সমূহের স্বাস্থ্যবিভাগ ও সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোকে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে, বস্তুত স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পূর্ণ একটি নতুন, ব্যাপক সংগঠনই স্বাধীন ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে। সরকার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যরক্ষাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে স্থান দিয়েছেন। ভারতের প্রথম পরিকল্পনায় জনস্বাস্থ্যের জন্য ১৪০ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২২৫ কোটি টাকা। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত ব্যবস্থাদির ফলে সাধারণ ভাবে যে জনগণের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে, তা রোগাক্রমণের ঘটনা হ্রাস, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস এবং আয়ুবৃদ্ধির তথ্যাদি থেকেই প্রমাণিত হয়।

স্বাধীন ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যোন্নয়ন

তৃতীয় পরিকল্পনায় জনস্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩৪১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মত তৃতীয় পরিকল্পনার স্বাস্থ্য কর্মসূচীগুলো এই ছয়টি

শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল: এক, পরিবেশমূলক স্বাস্থ্যের, বিশেষ করে পল্লী ও শহরাঞ্চলের জলসরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি; দুই, সংক্রামক রোগের নিয়ন্ত্রণ; তিন, স্বাস্থ্যসম্পর্কিত কার্যকলাপ সংগঠনের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহারোপযোগী পর্যাপ্ত প্রতিষ্ঠানগত সুবিধার ব্যবস্থা; চার, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য কর্মীদের শিক্ষণ সুবিধার ব্যবস্থা; পাঁচ, পরিবার পরিকল্পনা এবং ছয়, প্রসূতি ও শিশুকল্যাণসহ জনস্বাস্থ্য কৃত্যক, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পুষ্টি। তৃতীয় পরিকল্পনায় এ সমস্ত শাখায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনা ও জনস্বাস্থ্য

চতুর্থ পরিকল্পনায় জনস্বাস্থ্য খাতে মোট ৪৯২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাবিত হয়েছে, তার মধ্যে চিকিৎসা সম্পর্কিত শিক্ষা, শিক্ষণ ও গবেষণার জন্য ১৭৮.৩০ কোটি টাকা, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের জন্য ৮৬.৬৮ কোটি, টাকা, হাঁসপাতাল, ডিসপেন্সারি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ চিকিৎসাব্যবস্থার জন্য ১৮১.৩০ কোটি টাকা, অন্যান্য জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা খাতে ১৬.০২ কোটি টাকা এবং দেশীয় ভেষজ পদ্ধতির জন্য ১০.০০ কোটি টাকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার মতই ১৯৬১ সালের স্বাস্থ্য সমীক্ষা ও পরিকল্পনা কমিটি (Health Survey and Planning Committee) যে সমস্ত দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য সুপারিশ করেছিলেন, তার কাঠামোতেই চতুর্থ পরিকল্পনার চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যসম্পর্কিত সুযোগসুবিধা সম্প্রসারণের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

চতুর্থ পরিকল্পনার জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্মসূচী

উদরাময়, আমাশয়, কলেরা প্রভৃতি অধিকাংশ ব্যাধির মূলে আছে দূষিত জল-ব্যবহার। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবের জন্যই জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহের ব্যবস্থা এই চারটি কর্মসূচী অনুসারে সম্প্রসারিত হয়েছে: এক, সমষ্টি উন্নয়ন; দুই, স্থানীয় উন্নয়ন কার্যাদি; তিন, রাজ্যসরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের জলসরবরাহ কর্মসূচী এবং চার, অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ কর্মসূচী। প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় ৪৪.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহের ৬৪৪টি কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। প্রায় ১৭০০০ হাজার গ্রামে পাইপ-বাহিত জলসরবরাহের ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। এখনও শতকরা ৩০ ভাগ গ্রামে জলসরবরাহের ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত এবং শতকরা ২৫ ভাগ গ্রামে তার কোনও সন্তোষ-

পানীয় জল সরবরাহ

জনক ব্যবস্থাই নেই। শহরাঞ্চলে জল সরবরাহও কম জটিল সমস্যা নয়। প্রথম পরিকল্পনায় শহরাঞ্চলে জলসরবরাহ ও ময়লানিকাশের প্রায় ২৭২টি, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২২৭টি এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৪২৯টি পরিকল্পনা ১৮২'৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনা সমাপ্ত হবার পরও শহরবাসীদের প্রায় শতকরা ৫২ ভাগই পর্যাপ্ত জলসরবরাহের ব্যবস্থা পাবে না।

সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ জনস্বাস্থ্যরক্ষার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইংরেজ আমলে ম্যালেরিয়া ভারতবর্ষের অসংখ্য গ্রামের সর্বনাশ সাধন করেছে। স্বাধীনতা লাভের পর ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়, সর্বাত্মক চেষ্টার ফলে এই ব্যাধির বিভীষিকা এখন ক্রমশ অপসৃয়মান। ১৯৫৩-৫৪ সালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা যেখানে ছিল শতকরা ১০'৮ ভাগ, সেখানে ১৯৬৫ সালে তার সংখ্যা ছিল ০'০৫ ভাগ মাত্র, অর্থাৎ এই হ্রাসের হার ৯৯'৫ ভাগ। বর্তমানে ৩৯৩'২৫টি ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র কর্মরত। তিন বৎসর কালের জন্য নিবিড়ভাবে ম্যালেরিয়া নিরোধক ঔষধ ছড়ানো এবং তারপর আরও দুই বৎসরকাল তত্ত্বাবধান ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। পরিকল্পনা কমিশন যথার্থই বলেছেন, অতীতে দেশের বিভিন্ন অংশে বিপুল হারে রুগ্নতা ও মৃত্যুর কারণ এই ম্যালেরিয়া ছিল বলে সাধারণ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণের উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য রয়েছে। ১৯৬৭ সালের জুন জুলাই মাসে কলকাতা শহরে ম্যালেরিয়া আক্রমণের যে সংবাদ পাওয়া যায় তা উদ্বেগজনক। এই ব্যাধির পুনরাবির্ভাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে আরও সতর্ক হতে হবে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯'২১ কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাবিত হয়েছে।

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ

১৯৬২ সালে প্রতিটি রাজ্যে নির্মূলীকরণের বিশেষ ইউনিটসহ জাতীয় জলবসন্ত নির্মূলীকরণ কার্যক্রম প্রবর্তিত হয়। সমগ্র দেশের জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশের জন্যই টিকার মাধ্যমে ব্যাধির প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত এক কমিটি জলবসন্ত রোগ নির্মূলীকরণের যে কর্মসূচী প্রস্তুত করেছেন, তার প্রধান দিক হল, বহু সংখ্যক টিকাদানকারী সংগ্রহ ও তাদের শিক্ষণ, ব্যাপক টিকাদানের ব্যবস্থা এবং টিকা বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি। ফাইলেরিয়ার আক্রমণ বেশ ব্যাপক এবং নতুন অঞ্চলগুলোয় ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৬টি ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায়

জলবসন্ত, ফাইলেরিয়া ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ

ফাইলেরিয়া-অঞ্চলের শিক্ষাদানমূলক হাসপাতালগুলোয় ফাইলেরিয়া ক্লিনিক স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণের সহায়ক বলে ময়লানিকাশের ওপরও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বিশেষ চিকিৎসার সুবিধা ছাড়াও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের শতাধিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়। রোগনির্ণয় এবং তার চিকিৎসাই হবে কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণের ভিত্তি। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ১০০টি কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, ২০০০টি সমীক্ষা, শিক্ষা ও চিকিৎসা কেন্দ্র (Survey, education and treatment centres) ও ৬টি শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যায়, যক্ষ্মা রোগে মৃত্যুর হার হ্রাস পেলেও শহর ও গ্রাম উভয় স্থানেই রোগগ্রস্ততার পরিমাণ প্রায় একই রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন, গৃহ চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালানো সম্ভব। এ ভাবে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তা প্রতিষ্ঠান গত যত্ন অপেক্ষা জনস্বাস্থ্য ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির ওপর গুরুত্ব দানের অধিক অনুকূল। ব্যাপকভাবে বি সি জি টিকা দান, যক্ষা ক্লিনিক, যক্ষ্মা-সংক্রান্ত শিক্ষণ ও প্রদর্শন কেন্দ্র স্থাপন, ক্লিনিকের সন্নিহিত অঞ্চলে গৃহচিকিৎসার সুবিধার সম্প্রসারণ এবং বিশেষ-ধরণের যক্ষ্মা হাসপাতালগুলোয় রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের আলাদা করে রাখা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা—ঐগুলোই হল যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের প্রধান দিক, তৃতীয় পরিকল্পনার মত চতুর্থ পরিকল্পনায়ও এই সমস্ত কার্যক্রমের ভিত্তিতেই যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হবে। বর্তমানে দেশে ৪২৫টি যক্ষ্মা ক্লিনিক এবং ৩৪,৫০০ রোগীর জন্য শয্যা রয়েছে। কলেরা আর একটি মারাত্মক ব্যাধি। ভারতীয় চিকিৎসা-গবেষণা পরিষদের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি সম্প্রতি দেখিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মাদ্রাজের প্রধান নদীগুলোর অববাহিকা অঞ্চলগুলোই কলেরা অধ্যুষিত। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ ও ময়লানিকাশই কলেরা প্রতিরোধের কার্যকরী উপায়। কলেরা নিয়ন্ত্রণে সঙ্গত কারণেই পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্যকর অবস্থার উন্নতি বিধানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। গলগণ্ড, ট্রাকোমা নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক যুগের একটি ভয়াবহ ব্যাধি হল ক্যান্সার, ভারতবর্ষে এই ব্যাধির আক্রমণের হার ক্রমবর্ধমান। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতার জাতীয় ক্যান্সার হাসপাতালে ক্যান্সার চিকিৎসার যে ব্যবস্থা রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে একটি গবেষণাকেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছে।

যক্ষ্মা, কলেরা, গলগণ্ড, ট্রাকোমা ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা

প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে ভারতবর্ষে হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ছিল ৮৬০০ এবং শয্যার সংখ্যা ছিল ১১৩,০০০ ; ১৯৬৫-৬৬ সালে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪,৬০০ এবং ২৪০,১০০ হয়। কিন্তু এখনও প্রয়োজনের তুলনায় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার সুযোগসুবিধা নিতান্ত স্বল্প। বর্তমানে জনসংখ্যা অনুযায়ী শয্যা সংখ্যার আনুপাতিক হার হল প্রতিহাজার ০'৪৯ ভাগ। চতুর্থ পরিকল্পনায় অতিরিক্ত ৬০,০০০টি শয্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হবে, তাতে এই আনুপাতিক হার বজায় থাকবে মাত্র। গ্রামাঞ্চলের জনস্বাস্থ্য রক্ষায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৬ সালের ১লা মার্চে, অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনার শেষভাগে ৪৮০০টি কেন্দ্রকে কর্মরত দেখা দেয়, চতুর্থ পরিকল্পনায় ৪০০টি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে, প্রতি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত শাখা কেন্দ্রগুলোর সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হবে। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যকলাপ, বিশেষত স্বাস্থ্য-শিক্ষা, মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্ন, বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা, পুষ্টি কর্মসূচী, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণাগারের উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে। ভাবী মাতা, প্রসূতি এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিশুদের সম্পর্কে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে দরিদ্র মাতা ও শিশুদের খাদ্যের পরিপূরক হিসাবে গুঁড়ো দুধ ও ভিটামিন দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শিক্ষণ সুবিধাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫০-৫১ সালে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ছিল ৩০, ১৯৬০-৬১ সালে তা ৫৭ হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষভাগে ৮৭টি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে, চতুর্থ পরিকল্পনায় এই সংখ্যাকে ১১২-তে বৃদ্ধি করার কথা হয়েছে। অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের শিক্ষণের ব্যবস্থাকেও সম্প্রসারিত করা হবে।

হাসপাতাল, চিকিৎসালয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং শিক্ষণব্যবস্থা

স্বাধীন ভারতবর্ষে জন স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের অগ্রগতি নিঃসন্দেহে উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু এই বিশাল দেশে জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। ব্রিটেনে ১৯৪৮ সাল থেকে ন্যাশানাল হেলথ ইনসিওরেন্স স্কীম নামে যে সরকারী স্বাস্থ্য পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়েছে, তা জনসাধারণের চিকিৎসার সর্ববিধ প্রয়োজনকেই সন্তোষজনক ভাবে পূরণ করেছে। আমাদের দেশে যতদিন না পর্যন্ত এইজাতীয় পরিকল্পনা প্রবর্তিত হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত দরিদ্র জনসাধারণ চিকিৎসার প্রকৃত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকবে। কর্মচারী রাজ্যবীমা পরিকল্পনা পরিপূর্ণভাবে জনসাধারণকে চিকিৎসার সুযোগসুবিধা

দিতে পারে নি। আমাদের হাঁসপাতালগুলো দুঃস্থ, দরিদ্র রোগী ও তাদের আত্মীয় স্বজনের কাছে বিভীষিকাময় নরক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা দুর্নীতির পংকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এখানে রোগীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে, কর্মচারীদের অমানুষিক, নির্মম ব্যবহারে রোগীরা উৎপীড়িত হয়, রোগীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের জন্য এরা হিংস্রপশুর মত ওঁৎ পেতে থাকে—হাসপাতালের এই সমস্ত মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার অনেক বিবরণ সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। সরকারকে কঠোর হস্তে হাসপাতালগুলো থেকে দুর্নীতির মুলোচ্ছেদ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতবর্ষে ভারতবাসীর জন্য স্বাস্থ্য, বল, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু ব্যাকুলভাবে বাসনা করেছিলেন, সরকারের জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়াসের মাধ্যমে তাঁর সেই কামনা অচিরেই বাস্তবে পরিণত হোক, এই আমাদের প্রার্থনা।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

ভারতের বেকার সমস্যা

- পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বেকার সমস্যা
- পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা ও তার প্রতিকার
- ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বেকার সমস্যা

সাম্প্রতিককালে বেকার সমস্যা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের এক গ্লানিময় দুষ্ট-ক্ষত ভয়াবহ, দুর্বিষহ অভিশাপ হয়ে উঠেছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যশক্তি দুই শতাব্দী-ব্যাপী শোষণ ভারতকে রিক্ত, বিকলাঙ্গ দেশে পরিণত করেছে। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার সকল দুঃসহ বোঝা এই দেশের ওপর চাপিয়ে দিয়ে সে বিদায় নিয়েছে। ইংরেজ সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের দেশের কুটির শিল্পকে ধ্বংস করেছে এবং শিল্পায়নের পথে সর্ববিধ বাধা সৃষ্টি করার জন্য তৎপর থেকেছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ আমলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে সমস্ত মূলধন-প্রগাঢ় উৎপাদনপদ্ধতিসংবলিত কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে, তাতে শহরাঞ্চলের স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির কর্মসংস্থান হলেও সামগ্রিকভাবে দেশের লোকের জীবিকাসংস্থানে কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি। তার ফলে জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশই যুগজীর্ণ, জনভারাক্রান্ত কৃষিকে আঁকড়ে ধরে থেকেছে এবং বেকারসমস্যাকে তীব্র করে তুলেছে। ব্রিটিশ শাসনযুগের সেই পুরাতন বেকারসমস্যা স্বাধীনোত্তর যুগে স্বভাবতই আরও ব্যাপক ও জটিল আকার ধারণ করেছে। দ্রুত হারে জনসংখ্যাবৃদ্ধিও এই সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলেছে। সরকারী হিসাবানুযায়ী ভারতবর্ষে প্রায় ২ কোটি লোকের জন্য কর্মসংস্থানের প্রয়োজন, কিন্তু বেসরকারি হিসেব দেশের কর্মহীন লোকের সংখ্যা ৩ কোটি থেকে ৭ কোটির মত হবে।

শিল্পোন্নত দেশগুলোয় ও ভারতবর্ষে বেকারির প্রকৃতি ও রূপ এক নয়। প্রথমোক্ত দেশগুলোয় ব্যবসায়িক তেজীমন্দার চক্রাবর্তনের ফলে শিল্পশ্রমিকদের নিয়োগের তারতম্য (Cyclical Unemployment), শিল্পের সাংগঠনিক কিংবা উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন, কাঁচামালের সাময়িক অভাব প্রভৃতির জন্য 'বিঘ্নঘটিত বেকারি' (Frictional Unemployment) দেখা দেয়।

ভারতের বেকার সমস্যার বিভিন্ন রূপ

ভারতে ত এ-জাতীয় বেকারী ঘটেই, কিন্তু অনুন্নত দেশ হিসাবে তার বেকারির বৈশিষ্ট্য হল, এদেশের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশের চিরকালীন বেকারত্ব। ভারতে শর্করাশিল্প,

ধানকল, গৃহনির্মাণশিল্প, বিশেষত কৃষিক্ষেত্রে মরসুমী বেকারি (Seasonal Unemployment), মিসেস জোয়ান রবিনসন কথিত প্রচ্ছন্ন বেকারি (Disguised Unemployment) বা অর্ধনিয়োগ (Underemployment) (যখন শ্রমিকদের শ্রমশক্তির পূর্ণ নিয়োগ হয় না), বেকারির এ সমস্ত দিকই এদেশের অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার কুফল। ভারতের বেকার সমস্যার প্রধান তিনটি ক্ষেত্র আছে: প্রথম, কৃষিগত; দ্বিতীয়, শিল্পগত; এবং তৃতীয়, শিক্ষিত বেকার সমস্যা।

প্রথম কৃষিগত বেকার সমস্যা (Rural Unemployment) আলোচনা করা যেতে পারে। ভারতবর্ষে কৃষিক্ষেত্রে বেকার সমস্যার কারণ বহুবিধ। এদেশের কৃষিকার্যের মরসুমী প্রকৃতিও (Seasonal Character) কৃষকদের বেকার ও অর্ধ-বেকার অবস্থার জন্য অনেকটা পরিমাণে দায়ী। ভারতের কৃষকেরা কৃষিতে সাধারণত বৎসরের চার পাঁচ মাস কাল নিযুক্ত থাকে, অবশিষ্ট সময়ে তাদের কর্মহীন অবস্থায়ই থাকতে হয়। জমিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যাও প্রয়োজনাতিরিক্ত। ১৯৫৮ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ভারতবর্ষের গ্রামীণ অঞ্চলে লাভজনক কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ২৮ জনের কাজ সাপ্তাহিক ২৮ ঘণ্টারও কম। এটা প্রচ্ছন্ন বেকারির একটা উদাহরণ। বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রের বেকার সমস্যা ক্রমবর্ধমান। কৃষির অনগ্রসরতা ছাড়াও পরিকল্পনা কমিশনের মতে, দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি, গ্রামাঞ্চলের শিল্পগুলির অবলুপ্তি, শিল্পের অনগ্রসরতা এবং দেশ-বিভাগের জন্য বহুলোকের আগমন ও তাদের জমির ওপর নির্ভরতাও কৃষিগত বেকার সমস্যাবৃদ্ধির কারণ। তার জন্যেই গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকেরা শহরাঞ্চলে কর্মের সন্ধানে এসে ভিড় করে এবং শহরাঞ্চলের বেকার সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে।

কৃষিগত বেকার সমস্যা

দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে কৃষি অতিমাত্রায় ভারাক্রান্ত হওয়ায় এবং ভারতের শিল্পায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না ঘটায় শিল্পক্ষেত্রে বেকারসমস্যা ব্যাপক ও তীব্র হয়ে উঠেছে। ১৯৫১ সালে নিয়োগকেন্দ্রগুলোয় যে সকল কর্মপ্রার্থীর নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, তাদের সংখ্যা ছিল ৩·৩০ লক্ষ, ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে এই সংখ্যা প্রায় ২৪·৬ লক্ষে দাঁড়ায়। বেকারদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তিরা এই সমস্ত কেন্দ্রে তাদের নামকে লিপিবদ্ধ করায়। সুতরাং এই হিসেবটুকু থেকেই আমাদের দেশের শহরাঞ্চলে বেকার সমস্যা যে কি ব্যাপক ও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, তার

শিল্পক্ষেত্রে বেকার সমস্যা

একটি স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত মেলে। শিল্পক্ষেত্রে বেকার সমস্যার নানা কারণ আছে, যেমন শিল্পের অনগ্রসরতা, রপ্তানির সংকোচের ফলে রপ্তানিশিল্পে অনেক শ্রমিকের কর্মচ্যুতি, বিকল্প নিয়োগের ব্যবস্থা ছাড়াই শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন (Rationalisation), কাঁচামালের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের চটকল ও অন্যান্য কয়েকটি শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্যও অনেক শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের সামগ্রিক ব্যর্থতা ও মুদ্রাস্ফীতির জন্য চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথমভাগে ১৯৬৬-৬৭ ও ১৯৬৭-৬৮ সালে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, তার ফলে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়েছে, অজস্র শ্রমিক কর্মচ্যুত হওয়ায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের কৃষ্ণমেঘ দেখা দিয়েছে।

ভারতের শিক্ষিত বেকার সমস্যাও বর্তমানে ভয়াবহ ও তীব্র আকার ধারণ করেছে। সরকারি হিসাবানুযায়ী ভারতে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষভাগে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় ৭·৫ লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। বেসরকারি মতে, এই শ্রেণীর বেকারের সংখ্যা আরও বেশী হবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালাতেই শিক্ষিতবেকার সমস্যা তীব্রতম। শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক ত্রুটি এই বেকার সমস্যার অন্যতম কারণ সন্দেহ নেই। ভারতের ব্রিটিশ শাসক তার সাম্রাজ্য পরিচালনার সুবিধার জন্য করণিক সৃষ্টির প্রয়োজনেই এই সাহিত্যাশ্রয়ী বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল। তার ফলেই শারীরিক পরিশ্রমবিমুখ, সম্পূর্ণভাবে চাকুরিনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

ভারতের শিক্ষিত বেকার সমস্যা ও তার কারণ

শিক্ষকতা, ওকালতি, অফিসের চাকুরি প্রভৃতি তথাকথিত ভদ্র চাকুরি ছাড়া শ্রমসাধ্য বৃত্তিতে ও ব্যবসায় বাণিজ্যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর রুচি ও প্রবণতা ছিল না। বর্তমানে অবশ্য মনোভাবের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু দেশের শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতা তথা অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতাই শিক্ষিত বেকার সমস্যার মূল কারণ। শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটলে কর্মসংস্থানের সুযোগবৃদ্ধি হয়, জীবিকার ধাঁচ অনেক নমনীয় হয় এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটে এবং শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধিত হয়।

শিল্পসম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন শিক্ষিত তথা সকল ধরণের বেকার সমস্যার সমাধানের দীর্ঘমেয়াদী উপায়। কিন্তু সেই সঙ্গে এই সমস্যাসমাধানের অন্যান্য ব্যবস্থাও অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন। কারিগরী শিক্ষার বিস্তার ও অন্যান্য

ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার অবশ্য প্রয়োজনীয়।

শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধানে পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা কমিশন শিক্ষিতবেকার সমস্যা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছেন। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, কত চাকুরির প্রয়োজন শুধু তা উল্লেখ করলেই চলবে না, বিশেষ ধরনের শিক্ষা, যার জন্য চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে, সে বিষয়েও সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কর্মপদ্ধতি রচনার জন্য ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পরিকল্পনা কমিশন একটি অনুসন্ধান দল (Study Group) নিয়োগ করেছিলেন। এই দলের সুপারিশগুলো ছিল এই : হাতে কাজ করার

১৯৫৫ সালের অনুসন্ধান দলের সুপারিশ : বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও সমবায়িক পরিবহন

মত ও অন্যান্য ছোটখাট যন্ত্রপাতি, খেলার সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ইত্যাদি নির্মাণের জন্য নির্মাণশিল্প, ঢালাই-এর কাজ, পরিমাপ যন্ত্রনির্মাণ গিল্‌টি ও ঝালাই, কামারশালা (forge shops) প্রভৃতির জন্য নির্মাণ শিল্পের সাহায্যকারী অন্যান্য যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য শিল্প এবং মোটর গাড়ি, সাইকেল ও মেরামতী শিল্প (Servicing Industries) প্রভৃতি তিন শ্রেণীর ক্ষুদ্রায়তন শিল্প স্থাপন এবং সমবায়িক পরিবহনব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষিতব্যক্তিদের নিয়োগের সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করা যেতে পারে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলোর উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা সমবায়িক হলে তা শিক্ষিত বেকারসমস্যার সমাধান সহায়ক হবে, এই ছিল অনুসন্ধানদলের অভিমত।

এই অনুসন্ধানদলের সুপারিশ অনুযায়ী দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় একটি করে সর্বসমেত চারটি 'কর্ম ও দিক্‌স্থিতি পরিচায়ক শিবির' (Work-cum-orientation Camps) স্থাপিত হয়েছে, শিক্ষিতবেকারদের চাকুরি ব্যতীত অন্য প্রকার কর্মে নিযুক্ত হতে সাহায্য করা এবং তাদের মনে শ্রমমর্যাদা ও আত্ম-

কর্ম ও দিকস্থিতি পরিচায়ক শিবির

নির্ভরতার ভাব জাগ্রত করাই তাদের লক্ষ্য। এই সমস্ত কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ব্যবসায়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষাদান করা হয়। কায়িক শ্রমে অনভ্যস্ততা, বৃত্তিগত উপদেশের ও কারিগরী জ্ঞানের অভাবের দরুণ শিক্ষিত বেকার তরুণেরা যে সকল অসুবিধা ভোগ করে তা দূর করার জন্য এই কেন্দ্রগুলো কর্মরত রয়েছে। সরকারি চাকুরির নিয়োগপদ্ধতির উন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগসংস্থার

(University Employment Bureau) প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিও অনুসন্ধানদলের সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রথম দিকে বেকারসমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। কিন্তু এই পরিকল্পনার কর্মারম্ভের দুই বৎসরের মধ্যেই বেকারি দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিকল্পনাকমিশন ১১ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেন : এক, যেখানে অতিরিক্ত নির্মাণকার্য চলছে সেখানে কার্য ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ; দুই, ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায় সংস্থার জন্য ব্যক্তি ও সমবায় সমিতিকে বিশেষ সাহায্যদান ; তিন, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয়ে রাজ্যসরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহ দান ; চার, বর্তমানে এই সমস্ত কাজের যে সকল ক্ষেত্রে লোকশক্তির অভাব, তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ; পাঁচ, গ্রাম ও শহরাঞ্চলে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ; ছয়, পথ নির্মাণ ও পরিবহনের উন্নয়ন ; সাত, পল্লী অঞ্চলে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার প্রসার ; আট, ব্যক্তিগত গৃহনির্মাণকার্যে উৎসাহ দান ; নয়, শহরাঞ্চলে বস্তি উন্নয়ন ও নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের জন্য গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ ; দশ, উদ্বাস্তুদের শহর নির্মাণে সাহায্য ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্বাস্তু বসতিগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সাহায্য দান এবং এগারো, বেসরকারি মূলধনে শক্তি উৎপাদনবৃদ্ধির কর্মসূচীকে উৎসাহ দান। এই সমস্ত কার্যক্রমের জন্য ১৫০ কোটি টাকা থেকে ১৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনায় মাত্র ৪৫ লক্ষ অতিরিক্ত লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়।

প্রথম পরিকল্পনার বেকারসমস্যা সমাধানের কর্মসূচী

প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে কর্মসংস্থানের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, তার প্রমাণ হল, দ্বিতীয় পরিকল্পনার চারিটি লক্ষ্যের মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগের বিপুল প্রসারকে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনাকমিশন বলেছিলেন, বিনিয়োগের মধ্যেই কর্মসংস্থানের প্রসারের সম্ভাবনা নিহিত। কিন্তু কর্মসংস্থানাভিমুখী পরিকল্পনার শুধু বিনিয়োগব্যয় নির্ধারণেই পর্যবসিত হবে না। তার জন্য শিল্পকাঠামোর বিভিন্নতা-সাধন (Diversification of Industrial Pattern), শিল্পের স্থান নির্বাচন, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পকে সাহায্যদান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ও বিশেষ নীতি গ্রহণ, দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে নিরবচ্ছিন্নভাবে উচ্চস্তরে বজায় রাখা, শ্রমিকদের আঞ্চলিক ও জীবিকাগত গতিশীলতাবৃদ্ধির প্রয়াস—এ সমস্তই নতুন

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্মসংস্থান সম্পর্কিত নীতি

কর্মসংস্থান সৃষ্টির কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তিনদিক থেকে কর্মসংস্থানসমস্যা বিবেচিত হয়েছিল: প্রথম, শহর ও গ্রামাঞ্চলে বর্তমান বা পুরাতন বেকাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা; দ্বিতীয়, দেশে প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ হিসেবে শ্রমিক সংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির কথা মনে রেখে নতুন কর্মপ্রার্থীদের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন এবং তৃতীয়, শহর ও গ্রামাঞ্চলে কৃষিকার্যে ও গৃহস্থালী কাজকর্মে নিযুক্ত অর্ধবেকারদের জন্য পূর্ণ কর্মসংস্থান।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্পগতসমস্যার সমাধানের জন্য পরিকল্পনাকমিশন এই মৌল নীতিটি নির্দেশ করেছিলেন: যে সকল ক্ষেত্রে অধিক শ্রমিক নিয়োগ করা সম্ভব, সেখানে উৎপাদন পদ্ধতিকে শ্রম-প্রগাঢ় করে তোলা আবশ্যক। এই পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসরের মধ্যে শ্রমিকদলে ১ কোটি নতুন শ্রমিকের যোগদান অনুমিত হয়েছিল, তার মধ্যে শহরাঞ্চলের শ্রমিকসংখ্যা-বৃদ্ধির পরিমাণের হিসেব ছিল ৩৮ লক্ষ এবং গ্রামাঞ্চলে ৬২ লক্ষ এ ছাড়া ৫৩ লক্ষের মত পুরাতন কর্মপ্রার্থীও ছিল। পতিত জমি উদ্ধার, সেচব্যবস্থার প্রসার, বাগিচা, ও মিশ্রচাষের প্রসার প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে ১৬ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা হয়েছিল। সেচ কার্যের প্রসার, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলোর উন্নয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে অর্ধবেকারদের জন্য কিছু পরিমাণে পূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা করা যাবে বলেও পরিকল্পনা কমিশন আশা প্রকাশ করেছিলেন। এই পরিকল্পনা কালে শিক্ষিতবেকার-সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান দলের সুপারিশগুলো কার্যকরী করা হয়েছিল। অনুসন্ধানদলের হিসেব মত, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ২০ লক্ষ শিক্ষিত বেকারের জন্য কর্মসংস্থানের প্রয়োজন, তার মধ্যে ১৪.৪ লক্ষ লোকের নিয়োগ সম্ভবপর হবে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কর্মসংস্থানের প্রসার আশানুরূপ হয়নি। এই পরিকল্পনায় ৮০ লক্ষের মতো অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হয়, কিন্তু কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা অনুমান অপেক্ষাও ১৭ লক্ষ বেশি হয়েছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্প-গত, কৃষিগত ও শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা

মোটামুটি একটি হিসাব অনুযায়ী, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ২ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল, কৃষিতে ৩৫ লক্ষ এবং কৃষির বাইরে ১ কোটি ৫ লক্ষ, মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের নিয়োগ সম্ভব হবে, এবং এই পরিকল্পনার শেষে ১ কোটি ২০ লক্ষের মত কর্মপ্রার্থী থেকে যাবে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরের কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্রে

তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান

মাত্র ৫০ লক্ষ লোকের মত নূতন কর্মসংস্থান সৃজিত হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তির বিস্তার, গ্রামীণ শিল্পতালুক স্থাপন, গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন প্রভৃতি কর্মসূচী সংবলিত গ্রামীণ শিল্পোন্নয়ন ছাড়াও গ্রামঞ্চলে কর্মসংস্থানবৃদ্ধির আর একটি কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল, তা হল গ্রামীণ নির্মাণ কার্যসূচী (Rural Works Programme); এই কার্যসূচী ২৫ লক্ষ লোকের জন্য বৎসরে ১০০ দিনের মত অতিরিক্ত কাজের সুযোগ সৃষ্টি করবে আশা করা হয়েছিল, পরিকল্পনার শেষে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মাত্র ৪ লক্ষ লোকই সেই সুযোগ পেয়েছে।

বেকার ও কর্মপ্রার্থী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের যথোপযুক্ত সুযোগসুবিধা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোর ব্যর্থতাই স্বীকার করতে হয়। প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় ৯০ লক্ষ থেকে ১ কোটি নতুন কর্মপ্রার্থীর জন্য কর্মসংস্থান সম্ভব হয়নি।

চতুর্থ পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থান

চতুর্থ পরিকল্পনা কালে কর্মপ্রার্থী ও কর্মের সুযোগের মধ্যে বৈষম্য তৃতীয় পরিকল্পনার তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে বলে অর্থনীতিবিদেরা আশংকা প্রকাশ করেছেন। এই পরিকল্পনাকালে নতুন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা হবে ২ কোটি ৩০ লক্ষ, কিন্তু ১ কোটি ৮০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৯০ লক্ষের বেশি নতুন কর্মের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। কৃষি অংশে প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের জন্য কাজের সুযোগ করে দেওয়া হবে, অর্থাৎ ৪০ লক্ষ বা তার বেশি বেকার থেকে যাবে। অর্থাৎ চতুর্থ পরিকল্পনার প্রারম্ভেই সর্বসমেত ১ কোটি ৪০ লক্ষ বা তার অধিক সংখ্যক ব্যক্তি কর্মহীন অবস্থায় থাকবে, পরিকল্পনাকালে যারা উপার্জনের বয়সে উপনীত হবে, তাদের এই হিসেব থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

বেকার সমস্যার মত ভয়াবহ, সামাজিক ব্যাধি অতি অল্পই আছে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় বেকারিত্বের স্থায়ী সমাধানের প্রয়াসে দৃঢ়, অকম্পিত পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। বেকারির নিষ্ফলতায়

উপসংহার

দেশের জনশক্তির যেন মর্মান্তিক অপচয় না ঘটে, তা যেন আর্থিক উন্নয়নে নিয়োজিত হয়ে দেশের কল্যাণশক্তিতে পরিণত হয়। তার জন্যে যেমন গ্রামাঞ্চলে কৃষির বৈজ্ঞানিক আধুনিকীকরণ, সেচকার্যের বিস্তার, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পস্থাপন প্রয়োজন, তেমনি শহর ও শিল্পাঞ্চলে বৃহৎ মূলধননির্ভর শিল্পের সঙ্গে শ্রমনির্ভর বিভিন্ন শিল্পের সম্প্রসারণ এবং শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারও জরুরী জাতীয় কর্তব্য। কর্মসংস্থানের বাস্তবরূপায়ণের সর্বাত্মক চেষ্টায় ব্রতী হতে হবে; তবেই সফল হয়ে উঠবে আমাদের সুখী, প্রাণপ্রদীপ্ত, নৈরাশ্যের ভারমুক্ত নাগরিকদের কর্মের প্রবাহে উদ্বেল নব ভারতবর্ষ রচনার স্বপ্ন।

ভারতের রাজস্বনীতি

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- রাজস্বনীতি ও স্বাধীন ভারতের শিল্পায়ন

দেশের অর্থনৈতিক জীবনে রাজস্বনীতির প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। তাই প্রতিটি দেশকে তার অর্থনৈতিক স্বার্থের নিরাপত্তার ও উন্নয়নের জন্য সতর্কতার সঙ্গে রাজস্বনীতি নির্ধারণ করতে হয়। ভারতবর্ষ যখন পরাধীন ছিল, তখন বিদেশী শাসকের বাণিজ্যিক স্বার্থের বাহন হিসেবেই এই দুর্ভাগা পরাধীনতার অভিশাপ গ্রস্ত দেশের রাজস্বনীতি নির্ধারিত ও পরিচালিত হত।

প্রারম্ভ

ভারতবর্ষে ব্রিটেনের উপনিবেশ স্থাপনের মূল প্রেরণাই ছিল বাণিজ্যিক স্বার্থ। সেইজন্য ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের শাসক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ভারতসরকারের রাজনীতি অবাধ বাণিজ্যের (laissez faire) ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। রেলপথ, বাগিচা, খনি, পাটশিল্প প্রভৃতি এদেশের ব্রিটিশ মূলধন পরিচালিত ও রপ্তানিনির্ভর শিল্প ও খাস ব্রিটেনের শিল্পসমূহের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়েছিল। ভারতবর্ষে প্রস্তুত তুলাবস্ত্র যখন ব্রিটেনের বাজারে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিল, তখন তার ওপর বৈষম্যমূলক অন্তঃশুল্ক স্থাপন করে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে আঘাত হানতে বিদেশী শাসক কিছুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। সাম্রাজ্যিক পক্ষপাতেই (Imperial Preference) তাদের পক্ষপাতকলঙ্কিত বাণিজ্যনীতি পরিস্ফুট।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশেষ কতকগুলো পরিস্থিতির উদ্ভবে ভারতসরকার সংরক্ষণমূলক শুল্কনীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ভারতের শাসকগোষ্ঠী উপলব্ধি করেছিলেন যে এদেশে কিছু শিল্প না থাকলে যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যাদির অভাবে গুরুতর অসুবিধা দেখা দিতে পারে। ইতোমধ্যে ভারতীয় শিল্পপতিরাও কিছু শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন, তাঁদের শিশুশিল্প-সংরক্ষণ, জাতীয় নিরাপত্তাবিধান ও শিল্পে বৈচিত্র্যসাধনের জন্য সংরক্ষণের দাবী জাতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করল। এই পটভূমিতেই ১৯২১ সালে প্রথম ভারতীয় রাজস্ব কমিশন গঠিত হল। এই কমিশন বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে ভারতীয় শিল্পকে রক্ষার জন্য সামগ্রিক সংরক্ষণ নীতির পরিবর্তে কয়েকটি শর্তাধীনে

প্রথম রাজস্ব কমিশন ও প্রভেদমূলক সংরক্ষণনীতি

যে সংরক্ষণের প্রস্তাব উত্থাপিত করেন তা প্রভেদমূলক সংরক্ষণ নীতি (Policy of Discriminating Protection) নামে পরিচিত হয়। এই কমিশন বলেছিলেন, সংরক্ষণকামী শিল্পকে তিনটি শর্ত পালন করতে হবে: প্রথম, কাঁচামালের পর্যাপ্ত সরবরাহ, সুলভ শক্তি, যথেষ্ট পরিমাণে সুদক্ষ শ্রমিক এবং স্বদেশেই উৎপন্ন পণ্যের বিস্তৃত বাজার প্রভৃতি ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হবার মত সুযোগসুবিধা থাকা চাই; দ্বিতীয়ত, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে যে শিল্পের দ্রুত প্রসার কাম্য, অথচ সংরক্ষণ ব্যতীত যার বিকাশের আদৌ কোনও সম্ভাবনা নেই; তৃতীয়, শিল্পটিকে এমন হতে হবে যা ভবিষ্যতে সংরক্ষণের সুবিধা লাভ না করলেও অন্যান্য দেশের শিল্পগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সক্ষম হবে।

১৯২৩ সালে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় আইনসভা এই প্রভেদমূলক সংরক্ষণ নীতি গ্রহণপূর্বক একটি শুল্কপরিষদ (Tariff) গঠনের জন্য নির্দেশ দান করেন। ১৯২৪ সাল থেকেই পরিষদ প্রধান শিল্পগুলোর ক্ষেত্রে সংরক্ষণের যে সুপারিশ করেন, তার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ১৯২১ সালের অর্থনৈতিক সংকটের তরঙ্গাঘাতের পর ভারতীয় ইস্পাতশিল্প ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবার ক্ষমতা অর্জন করে। এই সীমাবদ্ধ সংরক্ষণনীতি ১৯২৪ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কয়েকটি ভারতীয় শিল্পের সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এর দৌলতেই ভারতে শর্করা শিল্প, লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, রসায়নশিল্প, কাগজশিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, বস্ত্রশিল্প প্রভৃতি সম্প্রসারিত হয়, সংরক্ষণের পূর্বে এসমস্ত শিল্পের মধ্যে অনেকগুলোর অস্তিত্ব ভারতবর্ষে ছিলই না বলা যায়। এই সমস্ত শিল্পের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য কয়েকটি শিল্পও এই সুযোগে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ভারতসরকার রাজস্বনীতিকে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ঐ ত্রি-শর্তের কঠিন ব্যূহ ভেদ করে সংরক্ষণের সুযোগ লাভ বেশ দুরূহই ছিল। এজাতীয় সীমাবদ্ধ সংরক্ষণ ব্যবস্থায় মূল ও ভারী শিল্পগুলো বিকাশের সুযোগ লাভ করতে পারেনি। ভারতবর্ষে সংরক্ষণনীতি প্রবর্তিত হওয়ার পরও ১৯৩২ সালের 'অটোয়া চুক্তি', 'ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যচুক্তি' এবং ভারতশাসন আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্য ভারতীয় বাজারে অন্যান্যদেশের পণ্যের তুলনায় অধিকতর সুযোগসুবিধা লাভ করেছে। বস্তুত ব্রিটিশশিল্পজাত পণ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য বিদেশী শিল্পদ্রব্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভারতীয়শিল্প যাতে গড়ে উঠতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই রাজস্বনীতি রচিত

ভারতের শিল্প বিকাশে প্রথম রাজস্বনীতির ভূমিকা

হয়েছিল। এই সংরক্ষণমূলক শুল্কনীতি ভারতবর্ষের সার্বিক শিল্পোন্নয়নের পটভূমি নির্মাণ করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও অন্তত বিচ্ছিন্ন ভাবেও কয়েকটি ভারতীয় শিল্পের বিকাশ সাধনে এই সংরক্ষণনীতির ভূমিকার নিজস্ব মূল্য অবশ্য স্বীকার্য।

ভারতীয় রাজস্বনীতির পরবর্তী পর্যায়ের পটভূমি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধকালীন বিশেষ পরিস্থিতিতে একদিকে আমদানী নিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে শিল্পসামগ্রীর ক্রমবর্ধমান বিপুল চাহিদার জন্য ১৯৪০ সালে ভারতসরকার ঘোষণা করলেন, যুদ্ধের মধ্যে স্থাপিত শিল্পগুলো সঠিক ব্যবসায়িক নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হলেই সংরক্ষণের সুবিধা লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ১৯৪৫ সালে একটি অন্তবর্তীকালীন শুল্ক পরিষদের (Interim Tariff Board) ওপর কোনও শিল্পের সংরক্ষণ লাভের যোগ্যতা নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পিত হল। এই শুল্কনীতি প্রথমটির তুলনায় অনেক উদার ও শিল্পপ্রসারের উপযোগী হলেও কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি বহন করে আনতে পারেনি। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পরই সেই সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের নতুন দিগন্তটি উন্মোচিত হল। নবজাগ্রত স্বাধীন ভারতবর্ষের ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণায় প্রদত্ত যথোপযুক্ত শুল্কনীতি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ১৯৪৯ সালে শ্রীকৃষ্ণমাচারির সভাপতিত্বে ভারতের দ্বিতীয় রাজস্বকমিশন (Fiscal Commission) গঠিত হল। সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকেই এই কমিশন শিল্পসংরক্ষণের নতুন নীতি রচনা করলেন। কোনও বিশেষ শিল্পের দৃষ্টিতে সংরক্ষণনীতি গ্রহণ নয়, দেশের সার্বিক শিল্পায়নের অন্যতম প্রধান অস্ত্র হিসেবেই রাষ্ট্রের শুল্কনীতি ব্যবহার্য, এই ছিল স্বাধীন ভারতের রাজস্বকমিশনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, শুল্ক সম্পর্কিত সমস্যা বিচারের নতুন পরিপ্রেক্ষিত। অতীতের যে শিল্পের সম্ভাবনা বা বাজার আছে তাকে সংরক্ষণদানের নীতির পরিবর্তে তার বাজার বা সম্ভাবনা সৃষ্টি করার নতুন উন্নয়নমূলক সংরক্ষণনীতি গৃহীত হল। এই নীতিই ভারতবর্ষের শিল্পায়নে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করেছে।

স্বাধীন ভারতের শিল্পায়নের উপযোগী নতুন রাজস্বনীতি

জাতীয় স্বার্থই হল এই নতুন রাষ্ট্রীয় শুল্কনীতির মূলমন্ত্র। ভারতের এই দ্বিতীয় রাজস্বকমিশন দেশের সমগ্র শিল্পকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল: প্রথম, দেশরক্ষা ও তার আনুষঙ্গিক শিল্প; দ্বিতীয়, মূল ও ভারী শিল্প; তৃতীয়, অন্যান্য শিল্প। ব্যয়ভার যতই হোক, দেশরক্ষা সম্পর্কিত শিল্পকে অবশ্যই সংরক্ষণ দিতে হবে। মূল

ও ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে শুল্ককমিশন সংরক্ষণের শর্ত ও পরিমাণ নির্ধারণ করবে এবং তাদের অগ্রগতির ওপর ধারাবাহিক দৃষ্টি রাখবে, এদের সম্পর্কে কোনও কঠিন শর্ত আরোপিত হবে না। এই শিল্পগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং প্রয়োজনানুযায়ী কৃষিজাত পণ্যও সংরক্ষণের সুবিধা লাভ করবে। এই তিনটি সূত্রের পটভূমিতে শুল্ককমিশন অন্যান্য শিল্পগুলোর সংরক্ষণ লাভের ঔচিত্য নির্ধারণ করবে: অর্থনৈতিক সুবিধা, সম্ভাব্য উৎপাদন ব্যয় এবং জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা। কাঁচামালের অভাব কিংবা আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা সম্পূর্ণ মেটাতে না পারার অক্ষমতার জন্য কোনও শিল্পকে সংরক্ষণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। যে শিল্পের আভ্যন্তরীণ বাজার, দেশে ও বিদেশে ভবিষ্যতে বাজার পাবার সম্ভাবনা আছে, কিংবা যা সম্ভাবনাপূর্ণ অন্য কোনও শিল্পের পরিপুরক এবং যার শ্রমিক সরবরাহ আছে, সে শিল্পই সংরক্ষণ লাভের যোগ্য। এই রাজস্বকমিশন সংরক্ষণী শুল্কলব্ধ অর্থ নিয়ে একটি উন্নয়ন তহবিল গঠনের ও তার থেকে বেসরকারী শিল্পকে প্রয়োজন মত আর্থিক সাহায্য (Subsidy) দানের সুপারিশও করেছিলেন। এই সমস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য একটি উচ্চ ও ব্যাপক ক্ষমতাসংবলিত স্থায়ী শুল্ক কমিশন (Tariff Commission) গঠনের জন্যও সুপারিশ করা হয়েছিল। ১৯৫২ সালের ২১শে জানুয়ারী থেকে এই কমিশনের কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই কমিশনের ক্ষমতা ও কাজের পরিধি শুল্ক পরিষদের তুলনায় অনেক বিস্তৃত। শুল্ক কমিশন সরকারের নির্দেশ ছাড়াই নিজের উদ্যোগেই কোনও শিল্পের সংরক্ষণ লাভের যোগ্যতা অনুসন্ধানের ক্ষমতা লাভ করেছে। ডাম্পিং সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ, সংরক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পগুলো তার সদ্ব্যবহার করছে কিনা তার প্রতি দৃষ্টি রাখা, সাধারণ মূল্য স্তর ও জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয়ে শিল্পসংরক্ষণের প্রভাবের পর্যালোচনা, কোনও নির্দিষ্ট শিল্পের উন্নয়নের ওপর শুল্ক সুবিধার প্রভাব পরীক্ষা ইত্যাদি কাজের দায়িত্বও শুল্ককমিশনের ওপর অর্পিত হয়েছে।

দ্বিতীয় রাজস্বকমিশনের নির্ধারিত সংরক্ষণ নীতির বিভিন্ন দিক

স্থায়ী শুল্ক কমিশন

নতুন ভারতীয় রাজস্বনীতির সমালোচনায় কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ বলেছেন, নতুন নীতি দেশের শুল্কনীতিকে আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের নীতির সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়নি, এটা একটা গুরুতর ত্রুটি। ত্রুটি সত্ত্বেও দ্বিতীয় রাজস্বনীতি যে ভারতের ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করেছে তা অনস্বীকার্য।

উপসংহার

ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা
- পল্লীঅঞ্চলে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ

[ক, বি, '৫৬]

- গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রসার
- ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের প্রস্তাব
- বাণিজ্যিক জাতীয়করণ অথবা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ—কোনটি অধিকতর বাঞ্ছনীয়?
- ভারতের মুদ্রার বাজারের বৈশিষ্ট্য ও তাহার সংহতি-সাধন, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়

হৃদপিণ্ড থেকে রক্ত অজস্র শিরাউপশিরায় সঞ্চালিত হয়ে যেমন দেহকে সচল ও কর্মক্ষম রাখে, তেমনি ব্যাঙ্কগুলো উৎপাদনে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে গতিশীল, কর্মমুখর ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাবনায় প্রাণচঞ্চল করে তোলে। জাতীয় জীবনের সম্পদ সৃষ্টির উৎস হল উৎপাদন, আর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা উৎপাদনে শক্তি জোগায়। প্রতিটি দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধিতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রারম্ভ

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের রেনেশাঁস বা নবজাগৃতির মাহেন্দ্রক্ষণে ইটালির বিখ্যাত মেদিচি পরিবারের এবং জার্মানীরও একটি বিশিষ্ট পরিবারের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় তাদের অর্থনৈতিক জীবনে যে কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা প্রত্যেক ইতিহাস পাঠকের কাছেই সুবিদিত। উন্নত, শক্তিশালী ও বহুধাব্যাপ্ত ব্যাঙ্কব্যবস্থা নিঃসন্দেহে দেশের উন্নত অবস্থার পরিচায়ক। অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত বা পশ্চাদপদ দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থাও দুর্বল, অসংগঠিত, বিচ্ছিন্ন এবং অনুৎপাদক (Unproductive)। ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কব্যবস্থায় অনুন্নত দেশের ব্যাঙ্কিং-এর এ সমস্ত লক্ষণই পরিস্ফুট। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে প্রদত্ত এক হিসেবে দেখা যায়, ভারতে মাথাপিছু ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ প্রায় ৭০ টাকা, আমেরিকার মাথাপিছু ব্যাঙ্ক-আমানতের $\frac{১}{৭০}$ ভাগ মাত্র।

ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের ইতিহাস কিন্তু সুপ্রাচীন। মনুর ধর্মশাস্ত্র ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সাক্ষ্যে জানা যায়, সুদূর অতীতেও ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠী নামে

পরিচিত বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত লগ্নী প্রথা প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই হুণ্ডির প্রচলন লক্ষণীয়। দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য, ধনভাণ্ডার, রাজস্বসংগ্রহ, যুদ্ধ ও অভিযান, প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেও অর্থ সরবরাহে ভারতীয় মহাজনেরা বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করত। দেশের অর্থনৈতিক জীবনের মত রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই শ্রেষ্ঠী-মহাজনদের প্রভাব প্রতিপত্তি যে কত গভীর ছিল, বাঙলাদেশের মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠ পরিবারের ইতিহাসই তার প্রমাণ। আর ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে দেশীয় মহাজনেরা পুরাতন কালের শ্রেষ্ঠীদের মতই সাবেকী দেশীয় প্রথায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালিত করে আসছে, অপরের টাকা আমানত হিসেবে জমা রাখার পরিবর্তে চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়াই এই ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য। গ্রামীণ অর্থনীতির অনেকগুলো সূত্রই এই গ্রাম্য মহাজনদের করধৃত, কারণ তারা একাধারে গ্রাম্য দোকানদার, মহাজন ও গ্রামাঞ্চলের কৃষিপণ্যের প্রধান ক্রেতা। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এখনও তাদের প্রচণ্ড প্রভাব। আবার ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর দেশীয় ব্যাঙ্কার আছে যারা জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং হুণ্ডির লেনদেন চালিয়ে থাকে। গ্রাম্য মহাজনেরা প্রধানত ভোগের জন্য ঋণ দেয়, কিন্তু এই ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পের জন্যও ঋণ দেয়। গ্রাম্য মহাজন ও এই দেশীয় ব্যাঙ্কারেরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রফ, মাটকার, নিধি, বেনে, নানাবতী, চেত্তিয়ার, শেঠ, ক্ষেত্রী, মুলতানী, মারওয়ারী প্রভৃতি নামে পরিচিত।

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রাচীন রূপ ও ইতিহাস

ভারতবর্ষের এই প্রাচীন, আধুনিক যুগের অনুপযোগী ব্যাঙ্কিং-প্রথার পাশেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে আধুনিক ব্যাঙ্কব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক ও জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। ১৭৭৩ সালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙলা ও বিহারের জন্য একটি সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্য ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলায়, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে এবং ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে সর্বসমেত তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক স্থাপন করে। তাদের সরকারি অর্থলেনদেনের, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নোট ছাপাবার এবং আভ্যন্তরীণ বিনিময় বাজারে অংশগ্রহণের অধিকার ছিল। অতঃপর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের

ব্রিটিশ আমলে ভারতের ব্যাঙ্কব্যবস্থার দুটি প্রধান ভিত্তি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট অনুযায়ী এই তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ককে সম্মিলিত করে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হয়েও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজকর্ম দীর্ঘকাল পরিচালিত করেছে। ১৯২৬ সালের হিলটনইয়ং কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯০৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের মাধ্যমে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূলধন ছিল ৫ কোটি টাকা, প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা হিসাবে ৫ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত, আর অধিকাংশ শেয়ারই ছিল ব্যক্তিগত শেয়ার হোল্ডারদের অধিকারে। যে সমস্ত স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নেই, সেখানে তার প্রতিনিধিত্বের অধিকার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককেই দেওয়া হয়।

ইংরেজ আমলে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলোর ভারতীয় স্বার্থের প্রতিকূলতা

ব্রিটিশ আমলে একদিকে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, বিদেশী বাণিজ্যিক ও বিনিময় ব্যাঙ্কের ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার উদগ্র, নির্লজ্জ তৎপরতা, অন্যদিকে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলোর নিতান্ত দুর্বল, পঙ্গু অবস্থা এবং আধুনিক ব্যাঙ্কিংব্যবস্থার সঙ্গে যোগা-যোগহীন দেশীয় মহাজনদের প্রাচীন বন্ধকী ও তেজারতী কারবার—এই পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিরুদ্ধ স্বার্থশক্তির সমাবেশে ভারতীয় মুদ্রার বাজার ছিল অসংগঠিত, শতধাবিক্ষিপ্ত, জাতীয় স্বার্থের ও উন্নয়নের পরিপন্থী। স্বাধীনতালাভ করার পরও ইংরেজ আমলের সেই সংহতিহীন মুদ্রার বাজারের অভিশাপের দুর্বিষহ বোঝা ভারতবর্ষকে বহন করতে হচ্ছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলোর ক্ষতিসাধনে সদাসচেষ্ট এবং ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষায় অগ্রণী ছিল, ইউরোপীয় ছাড়া পরিচালনায় কিংবা শিক্ষায় অন্যান্যদের অংশগ্রহণের পথ ছিল অবরুদ্ধ এবং বিদেশী শেয়ারমালিকেরাই মুনাফা আত্মসাৎ করত। বিদেশী শক্তিশালী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোও নবজাত ভারতীয় ব্যাঙ্কব্যবসায়কে পঙ্গু করে রাখার চেষ্টা করে এসেছে। বিদেশী বিনিময় ব্যাঙ্কগুলোও (Exchange Banks) ভারতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেও দেশের শিল্পোন্নয়নে তা বিনিয়োগ করেনি, ভারতীয় শিক্ষার্থী গ্রহণে ইচ্ছুক হয়নি, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে, তাদের কার্যকলাপ নানাদিক থেকেই ভারতের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে। ১৯৩১ সালের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি একদিকে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলোর (Indegenous Banks) বিরূপতা, অন্যদিকে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও বিনিময়ব্যাঙ্কসমূহের বৈরিতামূলক আচরণে ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর

দুঃস্থতা উল্লেখ করেছিলেন। অবশ্য তাদের ব্যবসায় পরিচালনায় নানা ত্রুটিবিচ্যুতিও তাদের দুর্গতির জন্য কম দায়ী ছিলনা।

স্বাধীনতালাভের পর ভারতীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার দায়িত্ব যে কত কঠিন ও জরুরী হয়ে দাঁড়ায়, ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় ব্যাঙ্কব্যবসায়ের এই সংক্ষিপ্ত সমীক্ষায়ই আমরা বুঝতে পারি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতীয় ব্যাঙ্কব্যবসায়ে ব্যাপক অরাজকতা দেখা দেয়। এই যুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশে মুদ্রার সরবরাহ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়, তার সুযোগ নিয়ে ব্যাঙের ছাতার মত অজস্র ব্যাঙ্ক গজিয়ে ওঠে; যুদ্ধ শেষ হবার পর তারা ফেল পড়তে থাকে। মূলধনের স্বল্পতা, অভিজ্ঞ, শিক্ষিত ও প্রকৃত ব্যবসায়িকদক্ষতা ও মনোভাবসম্পন্ন পরিচালকের অভাব, অব্যবসায়িক বিনিয়োগ-নীতি ও শেয়ারবাজারে বেপরোয়া ফাটকাবাজি, ঋণদানের ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ নীতি, অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিকর শাখাপ্রশাখার বিস্তার প্রভৃতির জন্য ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে অনেক ব্যাঙ্ক ফেল হয়, ১৯৫৯-৬০ সালে কেরালার পালাই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার জন্য দেশে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। পূর্বে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোনও ভূমিকা ছিল না। স্বাধীনতালাভের পর এই ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্যাঙ্ক, যেমন ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড, ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স প্রভৃতি কয়েকটি ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ হয়েছে। তার কেন্দ্রীয় বোর্ডের সকল ডিরেক্টার, গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর ও স্থানীয় বোর্ডের সমস্ত সদস্যের নিয়োগের অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দুটো প্রধান বিভাগ, নোটপ্রচলন ও ব্যাঙ্কিং এছাড়া তার একটি কৃষিঋণ বিভাগও আছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ

ভারতসরকার কতকগুলো আইন প্রণয়ন করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা ও দায়িত্বের পরিধিকে এমনভাবে বিস্তৃত করেছেন যার ফলে এই সংস্থা সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে একটি কার্যকরী, উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে নোট প্রচলন ছাড়াও সরকারের ব্যাঙ্কিংসংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম, বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় হার রক্ষা, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কগুলোর মত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাঙ্কারের কাজ, মুদ্রানিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ, মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ, ১৯৫২ সালের বিলবাজার পরিকল্পনা অনুযায়ী শেষ পর্যায়ের ঋণদাতার

কাজকর্ম, ঋণনিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যাঙ্কের সুদের হার পরিবর্তন, খোলাবাজারে কার্যকলাপ অর্থাৎ বাজারে সিকিউরিটি ক্রয়বিক্রয়, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর ব্যাঙ্কজমার অনুপাত পরিবর্তন, বিশেষ ধরণের ও প্রত্যক্ষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Selective and Direct Credit Control), বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর ব্যবসায়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ নোটপ্রচলন, বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্কের কাজকর্ম, শেয়ারবাজার, দেশের লেনদেন ব্যালান্স, কোম্পানীসমূহ ও সরকারেরর আর্থিক অবস্থা, শেয়ারবাজার প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত তথ্যাদি ও বিশ্লেষণ প্রকাশ, ঋণ ও সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত কাজকর্ম—প্রভৃতি গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্তমানে পালন করে থাকে। অমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতসরকার ১৯৬২ সালে যে আমানতবীমা কর্পোরেশন গঠন করেছেন তার আদায়ীকৃত মূলধন এক কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকেই এসেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দুর্বল ব্যাঙ্কগুলোকে একটি সংস্থায় একত্রিত হতে সাহায্য বা বাধ্য করে ব্যাঙ্কিংব্যবসায়ের নিরাপত্তাবিধান করেছে, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে মূলধন সরবরাহে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোকে উৎসাহ দিয়েছে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, এগ্রিকালচারাল রিফিন্যান্স কর্পোরেশন, সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্কান্বিত করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসংক্রান্ত কার্যকলাপে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণমূলক উভয়বিধ ভূমিকাই বহু ধরনের কাজকর্মের মাধ্যমে পালন করে চলেছে, বিশেষত ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য ঋণ সরবরাহের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধিতে তথা পর্যাপ্ত পরিমাণে ও উপযুক্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান গঠনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সক্রিয় হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইউনিট ট্রাস্টে শেয়ার ক্রয় করেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন দায়িত্ব

১৯৫৫ সালের ১লা জুলাইয়ে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে (State Bank of India) পরিণত হয়েছে। ১৯৪৮ সালে সর্বভারতীয় গ্রামীন ঋণ সমীক্ষা সমিতির নির্দেশক পরিষদ এমন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশ করেছিলেন, যা ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করেই সরকারী ও জাতীয় স্বার্থের ধারক ও বাহক হবে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের স্থাপনে এই নীতিই প্রতিফলিত। হায়দ্রাবাদ রাজ্য ব্যাঙ্ক, জয়পুর ব্যাঙ্ক, মহীশূর ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আটটি সরকারী ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের জন্ম ও তার ভূমিকা

অধীনস্থ হয়েছে। ভূতপূর্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মত শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানকে ঋণদান ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলেই অধিক সংখ্যক শাখাপ্রশাখা স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসার, অধিক পরিমাণে গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় সংগ্রহ ও গুদাম নির্মাণ, বিক্রয় সংগঠনের প্রসার প্রভৃতি গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নমূলক কাজকর্মে প্রভূত ঋণ সরবরাহ, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কৃষিকার্যে মধ্য ও দীর্ঘকালীন ঋণদান সমবায় ব্যাঙ্কগুলোকে ঋণ সরবরাহ, একটি সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষুদ্র কুটির শিল্পগুলোর উন্নয়নের জন্য ঋণ সরবরাহ—রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এ সমস্ত দায়িত্ব পালন করছে। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার অধীনে শিল্প ও কৃষি উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সরকারি উন্নয়ন নীতির সঙ্গে বিশুদ্ধ ব্যাঙ্কিংনীতির সামঞ্জস্য সাধনের পরিমাণের ওপরই রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের ঐ ভূমিকার সাফল্যের মাত্রা নির্ভরশীল।

অতঃপর যৌথ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের বিষয় আমাদের আলোচ্য। ইংরেজ আমলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর দুর্দ্দশা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। যৌথ ব্যাঙ্কগুলো দু' শ্রেণীতে বিভক্ত: প্রথম, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত, এই সমস্ত ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত ও সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা; দ্বিতীয়, তপশীল বহির্ভূত, এই সমস্ত ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত ও সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার কম। জনসাধারণের নিকট থেকে দাবী আমানত (Demand Deposits) ও মেয়াদী আমানত (Time deposits) উভয় ধরণের আমানত গ্রহণ, বিল নিকাশ (Clearance of bills) ও বিভিন্ন সিকিউরিটি নিয়ে দাদন দান, শিল্প ও ব্যবসায়ে স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদান প্রভৃতি কাজকর্ম এই ব্যাঙ্কগুলো নির্বাহ করে থাকে। ১৯৬১ সালে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা ছিল ৪,৪০১; ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কসহ ৬০টি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা হয় ৫৩৭৮। সাম্প্রতিককালে ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলোর প্রসার উল্লেখযোগ্যই বলা চলে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যসংক্রান্ত হুণ্ডি আদান প্রদানের কাজ যে সমস্ত বিনিময় ব্যাঙ্ক চালিয়ে থাকে তাদের অধিকাংশই বিদেশী ব্যবসায় সংস্থা; এই ব্যাঙ্কগুলো যৌথ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং কাজকর্মও করে। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে তপশীলভুক্ত বিদেশী যৌথ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ১৫, আর তাদের আমানতের পরিমাণ ৩১৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। সাম্প্রতিক-

যৌথ ও বিনিময় ব্যাঙ্ক

কালে কয়েকটি ভারতীয় ব্যাঙ্ক বিনিময় ব্যবসায় অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে ভূমিকা গৌণ।

১৯৬৪ সালের আইন অনুযায়ী ভারতে একটি শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (Industrial Development Bank) স্থাপিত হয়েছে, শিল্পোন্নয়নের জন্য ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদানই এই ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কের প্রাথমিক পর্যায়ে অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা, তাকে ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা চলবে। এই ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃত্বাধীন এবং এর পরিচালকমণ্ডলী রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরই অনুরূপ। গ্রাম্য মহাজনদের শোষণ থেকে মুক্ত করে কৃষক ও গ্রামীণ শিল্পীদের ঋণ সরবরাহের সুযোগ সুবিধাদানের জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অন্যান্য ব্যাঙ্ক

সমবায় ঋণদান সমিতির মাধ্যমে রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কগুলোর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার জাল গ্রামীণ ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে এখনও পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়নি। গ্রাম পর্যায়ে শতকরা ৫১ ভাগ সরকারি মূলধনসহ প্রচুর সংখ্যক সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন, এই সমস্ত প্রাথমিক ব্যাঙ্কগুলোর সমবায়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংগঠনিক ধাঁচে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলোর সমবায়ে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক গঠন, প্রতি স্তরেই মূলধনে ও পরিচালনায় রাজ্য-সরকারসমূহের অংশ গ্রহণ, এই সমস্ত ব্যাঙ্কের পাশাপাশি সরকারি ব্যয়ে ও পরিচালনায় প্রচুর সংখ্যক গুদাম নির্মাণ এবং তাতে ফসল জমা দেবার সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সমবায় ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলো কর্তৃক ঋণ ও অর্থের লেনদেন, যেখানে অদূর ভবিষ্যতে সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কোনও সম্ভাবনা নেই, সেখানে চলমান ব্যাঙ্কে (Mobile bank) স্থাপন—১৯৫৪ সালে সারা ভারত গ্রাম্য ঋণ অনুসন্ধান কমিটি (All India Rural Credit Survey Committee) পল্লী অঞ্চলে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের এই যে সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছিলেন, তা এখনও বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষির শোচনীয় ব্যর্থতা ও তীব্র খাদ্যসংকটের পটভূমিতে চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু গ্রাম্য মহাজন ও দেশীয় ব্যাঙ্কারদের আধিপত্য থেকে গ্রামীণ অর্থনীতিকে মুক্ত করে গ্রামাঞ্চলের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়সংগ্রহ ও গ্রামীণ কৃষি ও শিল্পউন্নয়নে যথাযথভাবে মূলধন সরবরাহের জন্য উপযুক্ত ব্যাঙ্ক

পল্লী অঞ্চলে মূলধন সরবরাহের উপযুক্ত ব্যাঙ্ক ব্যাবস্থার অভাব ও তার প্রতিকার সূত্র

ব্যবস্থা গড়ে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এখনও আরম্ভ করা হয়নি। সারাভারত গ্রাম্য ঋণ অনুসন্ধান কমিটির সমীক্ষায় দেখা যায়, সরকার ও সমবায় সমিতিগুলো মোট কৃষি ঋণের শতকরা ৬·৪ ভাগ মাত্র সরবরাহ করে, বেসরকারি ও অসংগঠিত সূত্র থেকে শতকরা ৯০ ভাগ ঋণ পাওয়া যায়, তার মধ্যে কৃষিজীবি ও পেশাদার মহাজনেরা শতকরা ৭০ ভাগ ঋণ সরবরাহ করে। অবশ্য সাম্প্রতিককালে পল্লীঅঞ্চলের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রসারের গুরুত্বের সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সরকার ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে সচেতনতা দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি ভারতীয় ব্যাঙ্কসমিতি ঘোষণা করেছেন কয়েকটি প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গ্রামের বড় ও ছোট চাষীদের মূলধন সরবরাহের জন্য একটি এগ্রিকালচারাল ফিনান্স কর্পোরেশন গঠন করবেন, তার আদায়াকৃত মূলধন হবে দশ কোটি টাকা; এই প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে যেমন, তেমনি কয়েকটি প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মাধ্যমেও প্রতি অঞ্চলে ব্যাঙ্কিং-এর কাজকর্ম নির্বাহ করবে। কিন্তু এতদিনকার বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, গ্রামের বিত্তবান ও শক্তিশালী চাষীরাই কৃষিঋণ সরবরাহের সুযোগসুবিধা অধিক পরিমাণে আত্মসাৎ করে। সেদিকে সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

প্রস্তাবিত Agricultural Finance Corporation

সাম্প্রতিককালে ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ বিভিন্ন মহলে উচ্চারিত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে মনোপলিজ কমিশনের বিবরণীতে বলা হয়েছে, মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণী বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের জন্য এই ব্যাঙ্কগুলো বহুলাংশে দায়ী। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো তাদের মুনাফা ও ব্যবসায়িক নিরাপত্তা সম্পর্কেই সচেতন, দেশের উন্নয়নশীল অর্থনীতির মৌল প্রয়োজন উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধির প্রতি তাদের কোনও লক্ষ্য নেই। প্রকৃত ও সুস্থ ব্যাঙ্কিংনীতি বিসর্জন দিয়ে একদিকে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের বেশি সুদে ঋণদান, অন্যদিকে মালিকদের নিজস্ব কোম্পানীগুলোকে অত্যন্ত কম সুদে ঋণ সরবরাহ, কর ফাঁকি দেওয়া কালো টাকায় বেনামী শেয়ার ক্রয়, ওভার-ইনভয়েসিং ও আণ্ডার-ইন্‌ভয়েসিং-এর মাধ্যমে অসৎ ব্যবসায়ীদের বৈদেশিক মুদ্রা অপহরণে সাহায্যদান—এ সমস্ত দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর সর্বাপেক্ষা মারাত্মক, অমার্জনীয় অপরাধ হল মজুতদারি ও ফাটকাবাজিতে টাকা খাটানো। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর দাদন খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্য

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ

নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের এই মুনাফাবাজি ও তজ্জনিত মূল্যবৃদ্ধির জন্য বহুলাংশে দায়ী। বস্তুত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো জাতীয় উন্নয়নে কোনও কল্যাণকর ও সৃজনশীল ভূমিকা গ্রহণ করেনি, এ অভিযোগকে অস্বীকার করা সত্যি কঠিন।

এই সমস্ত অভিযোগের পটভূমিতেই এক মহল থেকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর জাতীয়করণ, অন্য কোনও মহল থেকে তাদের ওপর সামাজিক কর্তৃত্বের অধিকার বিস্তারের দাবি উচ্চারিত হয়েছে। জাতীয়করণ দাবির প্রবক্তাদের মতে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যগুলোর বহির্ভূত, কিংবা সম্পূর্ণ বিরোধী ক্ষেত্রগুলোতে ব্যাঙ্কগুলোর ঋণদান রিজার্ভব্যাঙ্কের নানাবিধ নিয়ন্ত্রণসত্ত্বেও নিবারণ করা যায় নি। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোকে ব্যক্তিগত মুনাফাজীবি ব্যবসায়িক সংস্থার হাতে ফেলে রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের অর্থঋণের পরিকল্পনা (Credit plan) ও তৎসংক্রান্ত কর্মসূচী কখনও সম্পূর্ণরূপে সফল হতে পারে না। সেইজন্যই জাতীয় স্বার্থে ব্যাঙ্কগুলোর জাতীয়করণ প্রয়োজন।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দাবি

ব্যাঙ্কমালিকেরা তথা বেসরকারি ব্যবসায়ের প্রতিনিধিরা জাতীয়করণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবেও তাঁদের প্রবল আপত্তি। তাঁদের মতে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর কর্তৃত্ব সার্বিক, এ অবস্থায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আরও বিস্তৃত হলে ব্যাঙ্কগুলো তাদের উদ্যোগ হারিয়ে ফেলবে। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে যে সমস্ত সরকারি অথবা বেসরকারি সংস্থা নিয়োজিত, তাদের নানাবিধ ত্রুটিবিচ্যুতি ও শৈথিল্য সরকারি শাসনব্যবস্থার অক্ষমতারই প্রমাণ দেয়।

জাতীয়করণের বিপক্ষে যুক্তি

এই সমস্ত মতামত পর্যালোচনা করে আমাদের মনে হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই মুহূর্তেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর জাতীয়করণ নানা জটিল সমস্যা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারে। সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থা এই গুরুতর দায়িত্ব বহনে কতটা সক্ষম ও প্রস্তুত তা সন্দেহজনক। জাতীয়করণের জন্য যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, তার দায়ও কম নয়। নানাদিক বিবেচনা করে ব্যাঙ্কগুলোর সামাজিক নিয়ন্ত্রণকেই আবাহণ জানাতে হয়। এই সামাজিক কর্তৃত্বই জাতীয়করণের উপযুক্ত পটভূমি নির্মাণ করবে, তখন আমাদের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রগঠনের কর্মযজ্ঞ পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে।

উপসংহার

ভারতের বীমাব্যবস্থা

। এই প্রবন্ধের অনুসরণে
বীমাব্যবস্থা ও ভারতীয় জনজীবন

পদ্মপত্রে নীরের মতই মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী, নানা দুর্ঘটনায়, ব্যাধির আক্রমণে প্রতি মুহূর্তেই তার ঝরে পড়ার সম্ভাবনা। তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মৃত্যুর ফাঁদ পাতা। একজন সাধারণ চাকুরি নির্ভর মধ্যবিত্ত মানুষের অকালমৃত্যু তাঁর স্ত্রীপুত্রকন্যাদের অন্তহীন বিপর্যয়ের নীরন্ধ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত করে, বর্তমানের সকল শোকদুঃখ আঘাতের মধ্যেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা তাকে আরও দুর্বিষহ করে তোলে। অতীতের যৌথ, একান্নবর্তী পরিবারের আশ্রয় এখন ভেঙ্গে পড়েছে, বিধবা ও অনাথ পুত্রকন্যাদের ভরণপোষণ লালন-পালনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। জীবনযাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিক ভাবে ক্রমবর্ধমান। ফলে ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য সঞ্চয় করা বাঁধাধরা সাধারণ আয়ের একজন চাকুরিজীবির পক্ষে অসাধ্য। স্ত্রীপুত্রপরিবার নিয়ে বেঁচে থাকাই যেখানে একটা মর্মান্তিক কঠিন সংগ্রাম, বর্তমান শুধু অন্তহীন সমস্যা বৃদ্ধির যন্ত্রণাজর্জরিত এক একটি দিন রাত্রির দুঃসহ, তিক্ত অভিজ্ঞতা, সেখানে সঞ্চয়ের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আধুনিক যুগে সমস্যাভারাক্রান্ত নৈরাশ্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন অস্তিত্বে একটি মাত্র আশ্বাসের প্রদীপ হল জীবনবীমা।

প্রারম্ভ

আধুনিক বীমাব্যবস্থার উদ্ভবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সমুদ্রবীমারূপেই তার প্রাথমিক আবির্ভাব। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইটালির জেনেভা, পিসা, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি সামুদ্রিক ও বহির্বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রগুলোয় সমুদ্রবীমার প্রথম প্রচলন দেখি। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সমুদ্র বীমাব্যবস্থায় প্রাধান্য ছিল ইটালি ও স্পেনে। অতঃপর সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স, অষ্টাদশ শতকে ব্রিটেনে এবং উনবিংশ শতকে জার্মাণীতে এই বীমাব্যবস্থা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার পথে অগ্রসর হয়েছে। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের পর অগ্নিবীমা ব্রিটেনে প্রবর্তিত হয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসনকালেই নিতান্ত অসংলগ্ন ভাবেই আধুনিক বীমাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল।

বীমাব্যবস্থার প্রাচীন ইতিহাস

ভারতের মত দরিদ্র, অনুন্নত দেশে বীমাব্যবস্থার উপযোগিতা অত্যন্ত স্পষ্ট

কিন্তু ইংরেজ শাসক ও ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর অবহেলায় উপেক্ষায় এদেশে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বীমাব্যবস্থা যথাযোগ্য পরিমাণে সম্প্রসারিত হতে পারেনি। দেশীয় বীমকোম্পানী-গুলোর মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ, বিদেশী বিত্তবান, শক্তিশালী বীমাকোম্পানীগুলো সর্ববিধ সুযোগসুবিধা লাভ করত এবং নিজেদের দেশেই অর্থবিনিয়োগ করে আমাদের শিল্পবাণিজ্যকে বঞ্চিত করত। একটি নিতান্ত সাধারণ হিসেবেই অন্যান্য দেশের তুলানায় ভারতের বীমাব্যবস্থা যে কত দুর্বল, অসংগঠিত ও অপর্যাপ্ত ছিল তা বোঝা যায়: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে যেখানে এই দেশে মাথাপিছু জীবনবীমার পরিমাণ ছিল মাত্র ১২ টাকা, সেখানে আমেরিকায় তার পরিমাণ ছিল ২৩০০ টাকা, ক্যানাডায় ১৫৭৩ টাকা, ব্রিটেনে ৯৭৩ টাকা, অস্ট্রেলিয়ায় ৯৬০ টাকা, জার্মানীতে ২৪০ টাকা। বর্তমানে তার পরিমাণ প্রায় ৮০ টাকায় দাঁড়ালেও জীবনবীমার অগ্রগতির চিত্রকে খুব উজ্জ্বল, চিত্তাকর্ষক বলা চলে না। ব্রিটেনে বীমাকোম্পানীর সংখ্যা ১১০৯, তাদের মূলধনের পরিমাণ ৪০,০০০ কোটি টাকা। ইউরোপীয় দেশগুলোয় ও আমেরিকায় সমাজজীবনের প্রতিটি স্তরে বীমা ব্যবস্থা প্রসারিত, কোনও কোনও দেশে বীমা বাধ্যতামূলক। এই উন্নত দেশগুলোর বীমাকোম্পানীগুলোর মূলধন তাদের শিল্পবাণিজ্যগত সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উৎস। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা চল্লিশ কোটিরও বেশি, অথচ জীবনবীমা ব্যবসায়ের জাতীয়করণের পূর্বে এখানে বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫০টি।

ভারতের বীমাব্যবস্থার অনুন্নত অবস্থা

ইংরেজ আমলে শুধু বিদেশী শাসক ও বাণিজ্যিক স্বার্থগোষ্ঠীর বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্যই নয়, অধিকাংশ বীমা ব্যবসায়ীদের অসততা, বীমাকারীদের বঞ্চিত করার জন্য নানা কুটিল প্রচেষ্টা ও নিজস্ব সাংগঠনিক দুর্বলতাও এদেশের বীমা ব্যবস্থার পঙ্গুতার জন্য কম দায়ী ছিল না। দরিদ্র বীমাকারীদের কষ্টার্জিত অর্থ নিয়ে লোভের ছিনিমিনি খেলা খেলতে তাদের কিছুমাত্র বাধেনি। ভারতে অনেকগুলো বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হলেও হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর মত দু' একটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া তারা সাধারণ, দরিদ্র ব্যক্তিদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে পারেনি। অন্যদিকে প্রিমিয়ামের হার অপেক্ষাকৃত উচ্চ ছিল বলে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলো ছিল তাদের নাগালের বাইরে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর একদিকে জীবন-বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষা, অন্যদিকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পটভূমিতে জাতীয়

ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীয়করণ ও ভারতীয় জীবনবীমা কর্পোরেশন-এর প্রতিষ্ঠা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে জীবনবীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তদনুযায়ী ১৯৫৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী ভারত সরকার জীবনবীমা কোম্পানীগুলোর রাষ্ট্রীয়করণ ঘোষণা করেন, অতঃপর জীবনবীমা পরিচনালনার জন্য আইনানুযায়ী ভারতীয় জীবনবীমা কর্পোরেশন গঠিত হয়। প্রভিডেণ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোও এই সংস্থার অধীনে আসে। শুধু বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যর্থতাই নয়, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও আদর্শের জন্যও যে জীবনবীমা ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করা হয়েছিল, তদানীন্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখের ভাষণে তার অকুণ্ঠিত উল্লেখ ছিল।

জীবনবীমা কর্পোরেশন আইন অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষকে মধ্যাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল এই পাঁচটি অঞ্চলে (zone) বিভক্ত করা হয়, তাদের প্রধান কার্যালয়গুলো স্থাপিত হয়েছে যথাক্রমে কানপুর, কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও দিল্লীতে। সমগ্র দেশে এই সংস্থার ৩৬টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ১৮০টি কাযালয় ছিল, এটা কিছুকাল পুর্বের হিসাব, বর্তমানে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবনবীমা কর্পোরেশনের পরিচালনাধীনে জীবনবীমার দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছে।

জীবনবীমা কর্পোরেশনের সাংগঠনিক বিন্যাস ও অগ্রগতি

১৯৫৫ সালে দেশী ও বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলোর সম্মিলিত বীমাপত্র বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ২৮৮ কোটি টাকা, আর জীবনবীমা কর্পোরেশন ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ৪৯৫.৭২ কোটি টাকার এবং ১৯৬১ সালে ৬০৮.৮২ কোটি টাকার বীমাপত্র বিক্রয়ে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে জীবনবীমা কর্পোরেশনের বীমাপত্রের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৩ লক্ষ ২৮ হাজার এবং বীমার পরিমাণ ছিল ৩৫৭১ কোটি টাকা; ১৯৬৫ সালের মার্চে এই সংস্থার বীমাপত্রের সংখ্যা ও বীমার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১ কোটি ৮ লক্ষ ৬৮ হাজার এবং ৩৮৮৭ কোটি টাকা। জীবনবীমা কর্পোরেশন যে জনসাধারণের নিকট ক্রমশ আস্থাভাজন হয়ে উঠছে, অগ্রগতির এই চিত্রটিই তার প্রমাণ।

রাষ্ট্রীয়করণের পর জীবনবীমা ভারতবর্ষের নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষদের সমস্যাসঙ্কুল জীবনে বরাভয়স্বরূপ হয়ে উঠেছে। আর্থিক সামর্থ্য বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজন বা চাহিদা, অনুযায়ী বীমাব্যবস্থার বহুবিধ বৈচিত্র্যসাধন করা হয়েছে। মুনাফাসহ এবং মুনাফাহীন উভয় প্রকার জীবনবীমা পত্রই গ্রহণ করা যেতে পারে। আজীবন বীমা ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দেয় বীমা, উভয়বিধ বীমা ব্যবস্থাই প্রচলিত। বার্ধক্য-বীমা, বিবাহবীমা, শিক্ষাবীমা, দু' জন যৌথভাবে বীমা করার পর নির্দিষ্ট সময়ের

পূর্বে একজনের মৃত্যু হলে অপরের প্রাপক হবার সুবিধা সংবলিত যৌথবীমা, জনতা বীমা পরিকল্পনা প্রভৃতি বহু ধরণের বীমার সুবিধা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। বীমাকারী মাসিক, ষাণ্মাসিক, বার্ষিক বা এককালীন জমা হিসেবে তাঁর দেয় চাঁদা বা প্রিমিয়াম জমা দিতে পারেন। জীবনবীমা কর্পোরেশনের নব প্রবর্তিত বেতন সঞ্চয় পরিকল্পনা অনুসারে বীমাকারীর নিয়োগ কর্তাই তাঁর মাসিক বেতন থেকেই প্রিমিয়াম কেটে নিয়ে জমা দেন। এক বিশেষ ধরণের বীমায় বীমাকারীকে নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে পেনশনের মত মাসিক অথবা বার্ষিক বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জীবনবীমা কর্পোরেশন নগরাঞ্চলে গৃহনির্মাণে সাহায্যদানের একটি পরিকল্পনাও প্রবর্তন করেছে।

বিভিন্ন ধরণের জীবনবীমার ব্যবস্থা

বর্তমানে বীমাকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। অতীতে বীমাকারী তাঁর প্রিমিয়াম দিতে অক্ষম হলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বীমার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতেন। সাধারণত দুই বা তিন বৎসর বীমার দেয় প্রিমিয়াম দিয়ে যাবার পর বীমাকারী তাঁর বীমাপত্র প্রত্যর্পণের এবং প্রদত্ত অর্থের একাংশ প্রত্যর্পণ মূল্য হিসেবে ফিরে পাবার অধিকারী। বীমাপত্রের প্রত্যর্পণ মূল্য লাভের অধিকারী হবার পর বীমাকারী প্রিমিয়াম দিতে না পারলেও বীমাপত্রে সঞ্চিত অর্থ থেকে প্রিমিয়াম কেটে নিয়ে তামাদি (lapsed) বীমাপত্রকে চালু রাখা যায়। সামান্য সুদসহ বকেয়া প্রিমিয়াম জমা দিয়ে তামাদি (lapsed) বীমাপত্র পুনরুজ্জীবিত করার ব্যবস্থাও আছে। প্রত্যর্পণমূল্য লাভের অধিকারী হবার পর বীমাকারী সামান্য সুদে প্রত্যর্পণ মূল্যের শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত ঋণ গ্রহণের সুযোগ লাভ করতে পারেন।

বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষার বিভিন্ন ব্যবস্থা

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের এক আইন অনুযায়ী কর্মচারী রাজ্যবীমা কর্পোরেশন প্রবর্তন করা হয়েছে। এই কর্মচারী রাজ্যবীমা পরিকল্পনায় রাজ্য সরকার, শ্রমিক ও মালিকেরা যে অর্থ দিয়ে থাকেন, তাতে নিম্ন আয়ের কারখানার শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের ডাক ও তার এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের যে নিজস্ব বীমা ব্যবস্থা আছে, ঐ সমস্ত বিভাগের অসামরিক কর্মচারীরা তার সুযোগ নিয়ে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং সামরিক কর্মীরা ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত বীমা করতে পারেন। জীবনবীমা রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে, কিন্তু দুর্ঘটনা বীমা, নৌবীমা, অগ্নিবীমা প্রভৃতি সাধারণ বীমা ব্যবসায় (General Insurance) বেসরকারি

সংস্থার অধিকারভুক্ত। ১৯৬৫ সালের প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে ৭২টি ভারতীয় ও ৬৫টি বিদেশী প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমাব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা, পরিচালন দক্ষতা ও দীর্ঘকালের সুনাম প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য বিদেশী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় বেশী মুনাফা লাভ করে।

অন্যান্য বীমাব্যবস্থা

সাম্প্রতিককালে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের সাধারণ বীমা ব্যবসায়কে সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৫৬ সালে দশ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ যে পুনর্বীমা কর্পোরেশন (Re-insurance Corporation) স্থাপিত হয়েছে, তার সাহায্যপুষ্ট হয়ে ভারতীয় সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকতর সাফল্য অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা যায়। জীবনবীমা কর্পোরেশন ১৯৬৪ সালের ১লা এপ্রিল থেকে সাধারণ বীমা ব্যবসায়েও অবতীর্ণ হয়েছে। শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বীমা ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর জন্য ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে আমানত বীমা কর্পোরেশন স্থাপিত হয়েছে, আমানতকারীদের স্বার্থের নিরাপত্তার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোকে এই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বীমাপত্র গ্রহণ করতে হয়। রপ্তানি ব্যবসায়কে সাহায্য করার জন্য পূর্বে রপ্তানি ঝুঁকি বীমা প্রতিষ্ঠান ছিল, ১৯৬৪ সালে তাকে রপ্তানি ঋণ ও নিরাপত্তা সংস্থারূপে পুনর্গঠিত করা হয়েছে।

সাধারণ মানুষেরা সঙ্গতকারণেই জীবনবীমার রাষ্ট্রীয়করণে স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু জীবনবীমা কর্পোরেশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে নানা অভিযোগ উচ্চারিত হতে

উপসংহার

শোনা যায়। এ সমস্ত অভাব অভিযোগের কারণগুলোর মূলোচ্ছেদ করে জীবনবীমার কর্পোরেশনকে আরও কর্মদক্ষ, জনসাধারণের সেবায় তৎপর, সুসংগঠিত করে তোলা প্রয়োজন। কয়েক বৎসর পূর্বে ঋণদানের ক্ষেত্রে জীবনবীমা কর্পোরেশন মুন্দ্রা-কেলেঙ্কারির সহিত জড়িত হয়ে পড়েছিল, ভবিষ্যতে সেই জাতীয় অসাধু, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে তাকে যেন কলঙ্কিত করতে না পারে। এ ধরণের স্খলন বীমাকারীদের বিশ্বাসকে ধ্বংস করে এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনা সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। জীবনবীমা কর্পোরেশনের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ব্যয় হ্রাস করে প্রিমিয়ামের পরিমাণ যদি কমানো যায়, তবে এই বীমাব্যবস্থা অধিকতর জনপ্রিয় হবে। জীবনবীমাব্যবসায়কে আরও দৃঢ়, শক্তিশালী করে তাকে জনসাধারণের কল্যাণের দুর্জয় শক্তি করে তোলাই আশু কর্তব্য।

ভারতের রপ্তানিপ্রসার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- ভারতের বহির্বাণিজ্য
- ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানির ভূমিকা
- ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রপ্তানির স্থান

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের বাণিজ্যতরীগুলো বহুবিধ পণ্যসম্ভার নিয়ে বিস্তীর্ণ নীল আকাশের নীচে তাদের পতাকা উড্ডীন করে তরঙ্গোদ্বেল সমুদ্র দিয়ে দূরদূরান্তে উপনীত হয়েছে, পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে।

প্রারম্ভ

বাঙলাদেশের মঙ্গলকাব্যগুলোয় বাঙালি সদাগরদের এই বাণিজ্যাভিযানের বর্ণাঢ্য চিত্র পাই। খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বেও মিশর, রোম, গ্রীস, আরব, ইরাণ প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য চলত, ভারতের রপ্তানিপণ্য ছিল সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি, হস্তীদন্ত, সুগন্ধি দ্রব্যাদি, রং, মশলা, ধাতুদ্রব্য ইত্যাদি। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিপুল সুযোগ সম্ভাবনা দেখেই এদেশের মাটিতে পদার্পণ করেছিল।

তারপর ইতিহাসের অমোঘ ইঙ্গিতে একদিন বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে, ইংরেজ ভারতবর্ষের প্রভু হয়ে বসল, তখন তার বহির্বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটল। ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের কলকারখানাগুলোর খোরাক জোগাবার জন্য কাঁচামাল রপ্তানি এবং ইংলণ্ড থেকে শিল্পসামগ্রী আমদানি

বহির্বাণিজ্যের গতি পরিবর্তন

করতে হত, এই বাণিজ্যিক লেনদেনে ইংলণ্ডের লাভের অঙ্ক স্ফীত, আর ভারতের রপ্তানিবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হত। ভারতে প্রস্তুত বস্ত্র এক সময় ইংলণ্ডের বাজার অধিকার করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন ইংলণ্ড ভারতীয় বস্ত্রের ওপর অত্যধিক উচ্চ হারে আমদানি শুল্ক বসিয়ে বহির্বাণিজ্যের গুরুতর ক্ষতিসাধন করে। ভারতের বহির্বাণিজ্যে স্বভাবতই ইংলণ্ডের অংশই ছিল সর্ববৃহৎ, জাপানের সঙ্গে তার বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল শতকরা ৯'৪ ভাগ, আমেরিকার সঙ্গে শতকরা ৮ ভাগ এবং জার্মানীর সঙ্গে

অনুকূল বাণিজ্য সম্পদবৃদ্ধির উৎস

শতকরা ৬'৩ ভাগ। রপ্তানির উদ্বৃত্ত বা অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্স দেশের সম্পদবৃদ্ধির একটি প্রধান উৎস, কিন্তু ইংরেজশাসনশৃংখলিত ভারতবর্ষ ছিল তা থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের অনুপাত এবং

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বহির্বাণিজ্যের এই সম্প্রসারণে দেশের অর্থনীতিতে সত্যকারের শক্তি সঞ্চারিত হতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ ভাষণে বলেছিলেন: 'ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে!" ১৯৪৭ সালে ইংরেজ যখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করল, তখন কবির সেই আশঙ্কাকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হতে দেখলাম। ইংরেজ যাবার সময় ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ করে গেল, কৃষি-উৎপাদনের দিক থেকে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো পাকিস্তানের অংশে পড়ায় পাট, তুলো প্রভৃতি কাঁচামালের এবং খাদ্যশস্যের আমদানির জন্য ভারতকে বৈদেশিক আমদানির ওপর নির্ভর করতে হল। দীর্ঘকাল ইংরেজ সাম্রাজ্যস্বার্থশক্তির শোষণজনিত সীমাহীন দুর্গতি থেকে মুক্ত করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক জীবন উন্নয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞে আমরা ব্রতী হলাম। পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মসূচীর রূপায়ণের জন্য আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেল এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গতিতে ঘাটতি দেখা দিল, আমাদের মূল্যপ্রদান ব্যালান্স প্রতিকূল হল। প্রথম পরিকল্পনাকালে আমদানির মোট পরিমাণ ছিল ৩৬১৭ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮৮২ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় ৬২০৯ কোটি টাকা। প্রতিটি পরবর্তী পরিকল্পনায় আমদানির পরিমাণ যে কি ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এই হিসেবেই তা পরিস্ফুট।

স্বাধীন ভারতবর্ষে রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য রপ্তানি-প্রসার অপরিহার্য

এই সংকট দূরীকরণ তথা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোর সুষ্ঠু রূপায়ণের অন্যতম প্রধান কার্যকরী পথ হল যথাসম্ভব আমদানি-সংকোচ এবং বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের জন্য রপ্তানি-প্রসার। প্রতিটি পরিকল্পনায় স্বাভাবিকভাবেই রপ্তানবৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হিসাবে স্থান দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনার অর্থনৈতিক সঙ্গতিসংস্থানের জন্য বৈদেশিক সাহায্য অপেক্ষা রপ্তানিপ্রসারই বাঞ্ছনীয়, দেশের অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও শুভ। রপ্তানিবৃদ্ধি নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি।

ভারতসরকার নানাভাবে রপ্তানি প্রসারের জন্য সচেষ্ট। ভারতসরকার ১৯৫৭ সালে রপ্তানিসংক্রান্ত সমস্যাগুলোর পর্যালোচনা ও রপ্তানির আয়বৃদ্ধি সম্বন্ধে

সুপারিশ দানের জন্য শ্রী ডি. এল. ডি সুজার সভাপতিত্বে একটি রপ্তানি উন্নয়ন কমিটি (Export Promotion Committee) গঠন করেন। কমিটি তাঁদের বিবরণীতে বলেন, আমাদের রপ্তানির বাৎসরিক পরিমাণ ৭০০ কোটি টাকা থেকে ৭৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। রপ্তানিপণ্যের মূল্য, মালপ্রদানের সাম্যভিত্তিক চুক্তি এবং বিক্রয় ক্ষমতার (Salesmanship) ওপরই রপ্তানি প্রসারের সম্ভাবনা নির্ভরশীল। সুতরাং রপ্তানিসামগ্রীগুলোর মূল্যহ্রাসই রপ্তানি বৃদ্ধির প্রাথমিক প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। এই কমিটি মুদ্রার মূল্যহ্রাসের বিপক্ষেই মত প্রকাশ করেছিলেন।

রপ্তানি উন্নয়ন কমিটি গঠন

রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত করার জন্য তাদের দেয় আয়করের পরিমাণ হ্রাস এবং আমদানিকৃত কাঁচামাল ও অর্ধ-নির্মিত পণ্যদ্রব্যের (semi-processed goods) ওপর ফ্ল্যাট হারে বাণিজ্য শুল্ক স্থাপনও কমিটির সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিষ্ঠিত আমদানিকারক ও প্রকৃত ব্যবহারকারী উভয়কেই বার্ষিক আমদানি লাইসেন্স প্রদান, রপ্তানির সম্ভাবনাময় শিল্পগুলোয় অতিরিক্ত কাঁচামাল আমদানির জন্য ২৫ থেকে ৪০ কোটি টাকার মত একটি আবর্তক তহবিল এবং একটি রপ্তানি-স্থিতি বোর্ড গঠন—রপ্তানি প্রসারের জন্য মুদালিয়ার কমিটিও এই সকল সুপারিশ করেছিলেন। ১৯৬৪ সালে স্বামীনাথন কমিটি বলেছিলেন, লেনদেন ব্যালান্সের ঘাটতি দূরীকরণের জন্য যে সমস্ত শিল্প আমদানি হ্রাসে ও রপ্তানি প্রসারে সহায়ক, তাদের উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

রপ্তানি প্রসারের জন্য বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ

১৯৬৪ সাল থেকেই একটি কঠোর আমদানি নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তিত হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল করেছেন এবং কোটার বিধি নিষেধ তুলে দিয়েছেন ও অনেক সামগ্রীকে অবাধ সাধারণ লাইসেন্স দান করেছেন। তুলাবস্ত্র, সিল্ক ও রেয়ন, ইঞ্জিনিয়ারিং ও রাসায়নিক দ্রব্য, তামাক, মশলা, বাদাম, চামড়া, প্লাষ্টিক, অভ্র, খেলাধূলার সামগ্রী প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদ (Export Promotion Council) গঠিত হয়েছে। সরকার রপ্তানিবৃদ্ধিকে সহায়তা ও উৎসাহ দানের জন্য রপ্তানি প্রাপ্য নিশ্চয়তা পরিকল্পনা (Export Credit guarantee Scheme) কার্যকরী করেছেন। রপ্তানি প্রসারে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল রপ্তানি-ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন (Export Risk Insurance Corporation)

রপ্তানিবৃদ্ধির নানাবিধ প্রচেষ্টা

ও ১৯৬৪ সালে. তার পরিবর্তে ৫ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ রপ্তানি প্রাপ্য নিশ্চয়তা কর্পোরেশন (Export Guarantee Corporation) এবং ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের মাধ্যমে রপ্তানির প্রসার ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন (State Trading Corporation) স্থাপন। শেষোক্ত সংস্থার সাহায্যে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রম প্রসারিত হচ্ছে। বিজ্ঞাপন ও বিভিন্ন বিশ্বমেলায় ভারতের অংশ গ্রহণের মাধ্যমেও রপ্তানি প্রসারের পটভূমি সৃজিত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনা কমিশন বলেছিলেন, রপ্তানিবৃদ্ধির প্রচেষ্টাগুলো রপ্তানির প্রতিবন্ধকসমূহ অতিক্রম করার দিক থেকে পর্যাপ্ত নয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানিবৃদ্ধির এই সমস্ত লক্ষ্য ও উপায় নির্দেশিত হয়েছিল : এক, রপ্তানি যোগ্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টির জন্য আভ্যন্তরীণ ভোগকে যুক্তিসিদ্ধ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা উচিত ; দুই, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হলে আভ্যন্তরীণ বাজারেই ক্রমবর্ধমান মুনাফার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং তার ফলে রপ্তানি ব্যবসায়ের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে, তার জন্য রপ্তানি থেকে তুলনামূলকভাবে যাতে মুনাফা বৃদ্ধি পায় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ; তিন, রপ্তানি বাণিজ্যের বৈচিত্র্যসাধন ও তাতে নতুন পণ্যদ্রব্য ও খনিজ দ্রব্যের অংশ বৃদ্ধির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রধান রপ্তানি শিল্পগুলোকে প্রতি-যোগিতার উপযুক্ত করে তোলা এবং এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি শিল্পের ক্ষেত্রে নিয়মিত কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার ; চার, দেশের জনমত যাতে রপ্তানির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তার ভার বহনে ইচ্ছুক হয়, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা এই জাতীয় প্রচেষ্টার অংশিদার হতে পারে, বাজার অনুসন্ধান ও বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে সরকারের নিজস্ব সংগঠন শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ঋণ ও বীমার সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারণ ঘটে, তার জন্যে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে রপ্তানিকে সম্প্রসারিত করার জন্য কয়েকটি সাংগঠনিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়, যেমন, ১৯৬২ সালে বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীনে একটি নতুন বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ এবং ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সকল দিক পর্যালোচনা ও সরকারকে রপ্তানি উন্নয়ন সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ে বাণিজ্য পর্ষদ (Board of Trade) স্থাপন, প্রশিক্ষণ, ও গবেষণা ও বাজার সমীক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচীর উন্নয়নের জন্য ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্য পরিষদ

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন

তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানি বাণিজ্য

(Indian Institute of Foreign Trade) নামে একটি স্বয়ংশাসিত (Autonomous) নতুন প্রতিষ্ঠান এবং খনিজ ও ধাতুজ দ্রব্যাদির রপ্তানি উন্নয়নকল্পে খনিজ ও ধাতুজ দ্রব্য বাণিজ্য কর্পোরেশন (Minerals and Metals Trading Corporation) গঠন ইত্যাদি। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদগুলো সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে উনিশটিতে দাঁড়িয়েছে। সরকার রপ্তানিকারকদের সাহায্যের জন্য নিপুণ গবেষণা, রপ্তানির জন্য ঋণ, রপ্তানি বীমা, উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণে (ইতিমধ্যে ৮৪ শতাংশ রপ্তানি পণ্য বাধ্যতামূলক উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনা হয়েছে), প্রাকচালান পরীক্ষা, বাণিজ্যিক সালিশী, পরিবহনের সুযোগ সুবিধার প্রসার, কয়েকটি রপ্তানি শিল্পে সরকারি সাহায্য (subsidy) দান ইত্যাদি সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রথম তিনটি পরিকল্পনাকালে ভারতবর্ষের রপ্তানির প্রসার আশানুরূপ হয়নি, তার উন্নয়নের গতি অত্যন্ত মন্থর। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে ভারতবর্ষের বাৎসরিক রপ্তানির পরিমাণ ছিল গড়ে ৬০৬ কোটি টাকা, আমদানির বার্ষিক গড় ছিল ৭২৩ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় রপ্তানি ও আমদানির বার্ষিক গড় ছিল যথাক্রমে ৬০৯ কোটি টাকা ও ৯৭৫ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বার্ষিক রপ্তানির হার ৭৬২ কোটি টাকা, আর আমদানির হার ১২২০ কোটি টাকা। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতবর্ষের ঘাটতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে পেতে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগে তার পরিমাণ ৪৫৮ কোটি টাকা হয়। ভারত সরকার ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির ফলে পণ্য দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ মূল্যবৃদ্ধি ও বৈদেশিক বাজারের মূল্যের মধ্যে অধিকতর সামঞ্জস্য আনয়ন করে রপ্তানি প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালের ৬ই জুন শতকরা ৩৬.৫ ভাগ হারে টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস করেন। কিন্তু মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পর রপ্তানির সম্প্রসারণ ঘটেনি, ১৯৬৬ সালের রপ্তানি পূর্বের বৎসরের তুলনায় শতকরা ৬ ভাগ কম হয়েছে। মুদ্রার মূল্য হ্রাসের পর এক টাকার নতুন ডলার বিনিময় হার (৭.৫০ ডলার) অনুযায়ী হিসেব করলে দেখা যায়, ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমদানির পরিমাণ হয়েছে ১৬৫৮.৭ কোটি টাকা, রপ্তানি ৯৯৪.৩ কোটি টাকা; ঘাটতির পরিমাণ ৬৬৪.৪ কোটি টাকা। পণ্যদ্রব্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির জন্য মুদ্রার মূল্যহ্রাসের কার্যকারিতা বহুলাংশে নষ্ট হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রধান রপ্তানিপণ্য তুলাবস্ত্র ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত এই সময়ে শতকরা ৪৮ ভাগ

প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় রপ্তানির পরিমাণ

থেকে ৪৩ ভাগে হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে ১৯৬৬-৬৭ সালে আমদানির পরিমাণ ৩৩'৭ কোটি ডলার হ্রাস পেয়েছে এবং রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনা কালেই বৈদেশিক বাণিজ্যের দেশগত বণ্টনে পরিবর্তন আনয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তৃতীয় পরিকল্পনার সময় এ বিষয়ে অগ্রগতি হয়েছে: আমেরিকায় ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালের শতকরা ১৬ ভাগের তুলনায় ১৯৬৫-৬৬ সালে শতকরা ১৮'৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৯৬০-৬১ সালে রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোয় রপ্তানির পরিমাণ ছিল শতকরা ৭'৭ ভাগ, ১৯৬৫-৬৬ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ১৯'৩ ভাগ। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগে ও চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম ভাগে রপ্তানিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা যে গুরুতর ভাবে ব্যাহত হয়েছে, তার কারণ, মুদ্রাস্ফীতিজনিত আভ্যন্তরীণ মূল্যের রপ্তানির পক্ষে ক্ষতিকর ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতি ও রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, আভ্যন্তরীণ ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনার সামগ্রিক ব্যর্থতা এবং রপ্তানি প্রসারের কর্মসূচীর রূপায়ণের ত্রুটিবিচ্যুতি।

কৃষি উৎপাদনের মত রপ্তানি তথা বহির্বাণিজ্য যে বহুলাংশে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির নিয়ামক, তা দিবালোকের মত প্রত্যক্ষ সত্য। ভারতের উন্নয়নের সম্ভাবনা প্রসারের অপরিহার্য শর্ত হল রপ্তানি থেকে বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন বৃদ্ধি এবং ভোগের জন্য আমদানির ওপর নির্ভরতার ক্রমিক হ্রাস। আমাদের বৈদেশিক বিনিময় সঙ্গতির অবস্থা শোচনীয়, রপ্তানি বৃদ্ধিই এই সংকটত্রাণের প্রধানতম পন্থা। চতুর্থ পরিকল্পনার রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্য হল ৮০৩০ কোটি টাকা। আমরা গত পনের বছরে বিশেষ করে কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীর শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ যথাযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করতে পারিনি। ১৯৬৫-'৬৬ ও '৬৬-'৬৭ এই দু' বৎসরে কৃষি-উৎপাদনে অবনতির জন্য ভারতসরকারের বাণিজ্য-মন্ত্রকের ১৯৬৬-'৬৭ সালের বিবরণীতে, চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া প্রভৃতিতে খরা বা অনাবৃষ্টিকে দায়ী করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতির ওপর এই নির্ভরতা কৃষির আধুনিকীকরণে ব্যর্থতারই পরিচায়ক। চতুর্থ পরিকল্পনা-কালে রপ্তানি প্রসারের জন্য রপ্তানিবৃদ্ধি সম্পর্কিত পূর্ব ঘোষিত নীতি ও কর্মপন্থা-গুলোর সুষ্ঠু রূপায়ণের সঙ্গে কঠোরভাবে মুদ্রাস্ফীতি, আভ্যন্তরীণ ভোগ ও পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি ও শিল্পের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। সংকল্পের দৃঢ়তা থাকলে রপ্তানিবৃদ্ধির প্রতিবন্ধকগুলোকে জয় করা এমন কিছু কঠিন হবে না।

উপসংহার

ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- বর্তমান খাদ্যসংকট ও খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য
- ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য
- ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ভূমিকা
- ভাবতেব আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য

প্রারম্ভ

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, বিশেষত মূল ও ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের শিল্পায়নে রাষ্ট্রই উদ্যোগীর ভূমিকা গ্রহণ করবে, এ নীতি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাল থেকেই অনুসৃত হয়ে আসছে। বেসরকারী ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্ব স্বীকার করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে নিজস্ব অংশ গ্রহণ করবে, মিশ্র অর্থনীতির এই মৌল নীতি অনুযায়ী সরকারী ও বেসরকারী অংশের কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৪ সালে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কর্মধারার নীতিগত কাঠামোকে সুস্পষ্ট করে তোলা হল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ সংগঠনের সংকল্প গ্রহণে। এই সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় সংসদে ঘোষণা করা হল, আর্থনীতিক কর্মনীতির সাধারণ উদ্দেশ্য হবে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ সংগঠন, তদনুযায়ী সামাজিক নীতি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা নির্ণয়ে বিচারের মাপকাঠি হবে সামগ্রিক ভাবে সমষ্টির কল্যাণসাধন, ব্যক্তিগত মুনাফাসৃষ্টি বা মুষ্টিমেয়ের স্বার্থরক্ষা নয়। পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় বলেছেন: ভারতের পরিকল্পনাগুলোতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থার যে রূপ ফুটে উঠেছে তার অর্থ এই নয় যে সমস্ত অর্থনৈতিক উদ্যোগ সীমাবদ্ধ থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। প্রকৃত পক্ষে এই ব্যবস্থায় জাতীয় উন্নয়নে বেসরকারী কর্মোদ্যোগকেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় সরকারের সঙ্গে আমরাও আশা করেছিলাম, বেসরকারী ক্ষেত্র জাতির সার্বিক কল্যাণসাধনে তার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করবে। সরকার ১৯৫৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্যবসায় বাণিজ্যে অংশগ্রহণে অগ্রসর হননি। কিন্তু দিনের পর দিন বেসরকারী ক্ষেত্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতাই শুধু সঞ্চিত হয়েছে। নমুনা অনুযায়ী পণ্যদ্রব্য প্রেরণ না করে নিকৃষ্ট, ভেজালমিশ্রিত পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করে ভারতীয় অসাধু ব্যবসায়ীরা বৈদেশিক বাজারে ভারতের নামকে

কলঙ্কিত করেছে, তাদের নির্লজ্জ, কুৎসিত অসাধুতায় দেশের বহির্বাণিজ্য সংকুচিত হয়েছে। অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ বাজারে এই দুর্নীতির পংকস্তরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ব্যবসায়ীদের মজুতদারি, ফাটকাবাজি ও চোরা-কারবারের জন্য অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যদ্রব্য খোলাবাজার থেকে প্রায়ই উধাও হয়ে যায়, তাদের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায়। শিশুর খাদ্য বেবি ফুড পর্যন্ত এই অর্থপিশাচদের লোভের গ্রাস থেকে রক্ষা পায় নি। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগে ও চতুর্থ পরিকল্পনার প্রারম্ভে খাদ্যশস্যের ঘাটতি ও তীব্র মূল্যবৃদ্ধি জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনকে যে ভাবে দুঃসহ সমস্যায় ভারাক্রান্ত, শ্বাসরোধকারী কঠিন সংগ্রাম করে তুলেছে, তার জন্য ব্যবসায়ীদের দুর্নীতিকলংকিত কার্যকলাপ বহুলাংশে দায়ী।

বেসরকারী ব্যবসায়ীদের ভূমিকা

সেইজন্যই ভারতসরকারকে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যে (State Trading) অগ্রসর হতে হয়েছে। এ সম্পর্কে সরকারকে বহু বাতপ্রতিবাদের ঝড়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ডাঃ এস. পি. দেশমুখের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের অনুকূলে মত দিয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত এস. ভি. কৃষ্ণমূর্তি রাওয়ের নেতৃত্বাধীন কমিটি তার বিরোধিতা করেছিলেন। ভারত সরকার সকল দ্বিধা দূর করে ১৯৫৬ সালের মে মাসে পূর্ণাঙ্গ সরকারি মালিকানায় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন (State Trading Corporation) গঠন করেন। এই সংস্থার প্রারম্ভিক অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি টাকা, বর্তমানে তার পরিমাণ ৫ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার মনোনীত কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পরিচালক-মণ্ডলীর ওপর রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের পরিচালনাভার অর্পিত হয়েছে। ভারতের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে কল্যাণকর বৈদেশিক বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি কার্যকরী সংগঠনের অভাব দীর্ঘকাল ধরেই অনুভূত হচ্ছিল, এই সংস্থার প্রতিষ্ঠায় সে অভাব পূর্ণ হল।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন গঠন

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন স্থাপনের মূলে ভারতসরকারের কয়েকটি যুক্তি ছিল। প্রথমত, ভারতের সঙ্গে রাশিয়া প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমবর্ধমান। এই সমস্ত দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের বাহিবাণিজ্য ১৯৬০-৬১ সালের ৭.৭ শতাংশের তুলনায় ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৯.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই দেশ-গুলোর আমদানি রপ্তানি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন বলে ভারতেও সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে যুক্তি

বাণিজ্যসংস্থা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সরকারী অংশের পরিকল্পনার জন্য প্রচুর পরিমাণে আমদানির প্রয়োজন, ভারতের প্রতিটি পরিকল্পনায়ই তার জন্য একটি গুরুত্ব পূর্ণ স্থান নির্দিষ্ট করে রাখতে হয়। সুতরাং পরিকল্পনার প্রয়োজনানুযায়ী আমদানী ব্যবসায়কে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যসংস্থা গঠন করা প্রয়োজন, এই সংস্থার মাধ্যমে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি দূরীভূত হবে। তৃতীয়ত, আমদানি-রপ্তানির কার্য নির্বাহের জন্য যে সমস্ত ব্যবসায়িক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে, বিচ্ছিন্নতা ও প্রতিযোগিতার জন্য তাদের ব্যবসায় অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে এবং রপ্তানির লাভে অপচয় ঘটে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন একটি বৃহৎ সংস্থা হিসেবে সুসমৃদ্ধভাবে আমদানি রপ্তানিকে পরিচালনা করে ব্যয়সংকোচের সর্ববিধ সুযোগসুবিধা লাভ করবে। চতুর্থত, সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যসংস্থা রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে তৎপর হতে পারবে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয় ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের রপ্তানিবৃদ্ধি এবং সেখান থেকে ইস্পাত, সিমেণ্ট ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আমদানি, পুরাতন ও নতুন রপ্তানিদ্রব্যের জন্য নতুন বাজার সন্ধান ও অন্যান্য নানা উপায়ে ভারতীয় বাণিজ্যের বৈচিত্র্যসাধন প্রভৃতি হল রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের উল্লেখযোগ্য কর্মধারা। রপ্তানির বিনিময়ে এই সংস্থা সার, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল প্রভৃতি শিল্পের পক্ষে অত্যাবশ্যক মূলধনী দ্রব্যাদি আমদানির জন্য সম্পর্কযুক্ত, সংযোগমূলক ও বিনিময় চুক্তি (link and barter deals) করেছে। একই সঙ্গে সর্বাধিক পরিমাণে দেশের উৎপাদনব্যবস্থার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল আমদানি করে তাদের সুষ্ঠুবণ্টনে একটি কার্যকরী সুফলপ্রদ ভূমিকা গ্রহণ, কিংবা ঘাটতি ও তার আনুষঙ্গিক কুফল মূল্যবৃদ্ধি যাতে না দেখা দেয় এবং উৎপাদনের বৃদ্ধি হয় তার জন্য আমদানি ও বণ্টনের সময় নির্ধারণ—রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের এ সকল কার্যাবলীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন পাট ও লাক্ষা বীজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে রপ্তানিমূল্যকে স্থিতিশীল করতে সাহায্য করেছে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের বহুমুখী কর্মধারা

এই সংস্থার প্রধান রপ্তানিদ্রব্য হল খনিজ ধাতু, জুতা, কুটির শিল্পজাত দ্রব্য, লবণ, চিনি, চা, কফি, পশমী দ্রব্য, আর আমদানিপণ্য হল সিমেণ্ট, সোডা অ্যাস, কষ্টিক সোডা, কাঁচা রেশম, রাসায়নিক সার, নিউজপ্রিণ্ট বা সংবাদপত্র মুদ্রণের

কাগজ, গুঁড়োদুধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। আমদানি ও রপ্তানির কাজে যাতে যথোপযুক্ত সাহায্য দান করতে পারে তার জন্যে বন্দর, খনি ও পরিবহনের উন্নয়নেও এই সংস্থা একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের মধ্যস্থতায় জাপান ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে আকরিক লৌহ রপ্তানি বিষয়ে যে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তার দৌলতে বন্দর ও খনির মধ্যে রেলপথ সম্প্রসারিত হতে পেয়েছে। প্রতিষ্ঠার কাল থেকে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত এই সংস্থার মাধ্যমে ১২০.০৪ কোটি টাকার রপ্তানির লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে, এই লক্ষ্য পুরণে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পেরেশনকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

ভারতের রপ্তানি ও আমদানিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের ভূমিকা

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সমর্থকেরা বলেন, ভারতের সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের একটা গুরুত্বপুর্ণ পদ্ধতি হল রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য, বেসরকারি ব্যবসায়ের মুনাফা লুণ্ঠনের ওপর দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যকে ছেড়ে দিলেই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কোনও দিনই পরিপুর্ণভাবে সফল করে তোলা যাবে না, দৃঢ়, সবল, সাবালকোচিত পদক্ষেপে অগ্রসর হবার পরিবর্তে তাকে পঙ্গুর মত খুঁড়িয়ে চলতে হবে। ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ, তার কার্যকলাপের পরিধিকে আরও প্রসারিত করে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসায় বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের নীতিকেই গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য আমাদানি নিয়ন্ত্রণ, বেসরকারী বাণিজ্যক্ষেত্রের অশুভ, ক্ষতিকর ও কোনও কোনও ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতার অবসান, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অপসারণে রপ্তানি ও আমদানি পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস ও স্থিতিশীলতা প্রভৃতি উপকার ছাড়াও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের মাধ্যমে সরকার মূলধন গঠনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ করবেন। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন হলে বৈদেশিক বাণিজ্যে দরাদরির (Bargaining) ক্ষেত্রে নিজেদের পণ্যদ্রব্যের জন্য লাভজনক মূল্য আদায়ে সরকার সক্ষম হবেন। ভারতের বহির্বাণিজ্য এখনও বহুলাংশে বিদেশী কোম্পানীগুলোর কুক্ষিগত, তার লাভের একটি বৃহৎ অংশই বিদেশে চলে যায়, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে তা মূলধন গঠনে নিয়োজিত হতে পারবে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও তার সম্প্রসারণের স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি

শুধু বৈদেশিক বাজারেই নয়, আভ্যন্তরীণ বাজারেও, বিশেষত খাদ্যশস্যের

ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার দাবি উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে অসাধু ব্যবসায়ীদের মজুতদারি ও ফাটকাবাজির জন্য দেশের খাদ্য সমস্যা তীব্র সংকটের রূপ ধারণ করেছে। এরা একদিকে যেমন প্রকৃত উৎপাদক চাষীকে তার ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করে, অন্যদিকে তেমনি মজুতদারিতে খাদ্যশস্যের কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি বা প্রকৃত ঘাটতি বহুগুণে বৃদ্ধি করে খাদ্যশস্যের মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, তার ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা দুর্বহ হয়ে উঠেছে। তাদের চক্রান্তের ফলে সরকারের বিধিবদ্ধ রেশনিং-ব্যবস্থা শিল্পাঞ্চলের অধিবাসীদের খাদ্যশস্যের চাহিদা পুরোপুরি ভাবে মেটাতে পারছে না, এই রেশন ও সংশোধিত রেশন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা এদেরই বৈরিতার প্রাচীরে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ১৯৬৬ সালে আমদানিসহ মোট খাদ্যশস্যের সরবরাহ শতকরা ১২ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু তার মূল্য ২৫ শতাংশেরও বেশি হারে বৃদ্ধি পায়, এটা নিছক বিক্রেতার ফাটকাবাজিমূলক মুদ্রাস্ফীতির (speculative inflation) দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধির সংকটেই কৃষ্ণছায়ায়ই চতুর্থ-পরিকল্পনা সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে এবং আমাদের অর্থনৈতিক জীবন দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে। খাদ্যশস্যের ব্যবসায়কে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রয়োজনীয়তা আর কখনও এমন গভীরভাবে অনুভূত হয়নি।

খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা

ফসলের মূল্যে অস্বাভাবিক, সঙ্গতিবিহীন তীব্র ওঠানামা, তার আঞ্চলিক ও মরশুমী পার্থক্য—মুনাফাজীবি বেসরকারী ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত অবাধ বাজারের এই ঘাতপ্রতিঘাত থেকে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়কে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই ভারত সরকার সম্প্রতি দেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের মত সংস্থার মাধ্যমে খাদ্যশস্য ক্রয় ও বিক্রয়ের সংকল্প ঘোষণা করেছেন। তদনুযায়ী ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের খাদ্য কর্পোরেশন (Food Corporation of India) গঠিত হয়। ভারত-সরকারের খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের পরিকল্পনা দুটি স্তরে বিভক্ত: চূড়ান্ত পর্যায় (ultimate pattern) ও মধ্যবর্তী পরিকল্পনা (interim scheme)। খাদ্য শস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে রাষ্ট্র সেবা-সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত সংগৃহীত এবং সমবায় বিপণনের সাহায্যে ক্রেতাদের কাছে তার বিক্রয়ের ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। এই

খাদ্য-কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা ও খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের পরিকল্পনা

পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য যতদিন না প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হচ্ছে, ততদিন অন্তর্বর্তী-কালীন পরিকল্পনা অনুযায়ী শুধু ধান ও গমের ক্ষেত্রেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে, খাদ্য-কর্পোরেশনের সঙ্গে লাইসেন্সপ্রাপ্ত পাইকারী ব্যবসায়ীরাও সরকার নির্দিষ্ট মূল্যে চাষীদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করবে।

খাদ্যশস্যের এই আংশিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের সীমাহীন মুনাফালোভের হিংস্র নখরাঘাত থেকে সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষকে রক্ষা করতে পারেনি। একই সঙ্গে ফুড কর্পোরেশন ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য সরকারের ন্যায্যমূল্যে খাদ্যশস্যের বণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে তাকে দুর্বলই করে রেখেছে। ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসমস্যা ব্যাপক ও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, ফুড কর্পোরেশন চালকলের মালিক, জোতদার প্রভৃতির চক্রান্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ৭৪৬টি চালকল এবং ৬,০০০ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ধানমাড়াইকল আছে, তারা তাদের প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ গোপন রেখে ও কালোবাজারে ধানচাল পাচার করে সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহের প্রচেষ্টাকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করেছে। সরকার এই চালকলগুলোকে বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হয়েছেন। এই চালকলগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে অবিলম্বে খাদ্যশস্যের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এপ্রসঙ্গে সরকারের অনভিজ্ঞতা, উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি বাধার কথা বলা হয়ে থাকে, কিন্তু এ সকল বাধা অনতিক্রমনীয় নয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, কংগ্রেসের ভুবনেশ্বর অধিবেশনে ভারতের প্রায় ৪৩ হাজার চালকল জাতীয়করণের এবং তাদের পরিচালনাভার রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব কোনও কোনও মহল থেকে উত্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধতায় তা গৃহীত হতে পারেনি।

খাদ্যশস্যের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বেসরকারি ব্যবসায়িক স্বার্থের প্রবক্তারা তাঁদের চিরাচরিত ভঙ্গিতে পুরাতন যুক্তিগুলোই উচ্চারণ করে চলেছেন। তাঁদের মতে, র‍্যাশনিং, কণ্ট্রোল, পারমিট, লাইসেন্স প্রভৃতি সরকারি বিধিনিষেধই হল সকল অনিষ্টের মূল, দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক; সরকারি নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ অপসৃত হলে পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ ও মূল্য স্বাভাবিক হয়ে আসবে। বৈদেশিক বাণিজ্যে দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, উদ্যোগ ও তৎপরতা বেসরকারি ব্যবসায়ে যেমনভাবে সম্মিলিত

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের বিপক্ষে সমালোচনা

হয়েছে, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যে তার অভাব সমগ্রভাবে দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের পক্ষেই ক্ষতিকর হবে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বেসরকারি উদ্যোগকে ক্রমশ খর্ব করে তাকে উৎসাহহীন ও নিশ্চেষ্ট করে তুলবে এবং তার ফল হবে অশুভ। সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা, লালফিতার দৌরাত্ম্য ও অন্যান্য শৈথিল্য ক্রমাগত অপচয় ও ক্ষতিই ঘটাতে থাকবে, বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ব্যয়বাহুল্যে ভারাক্রান্ত হবে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনা সম্পর্কে এ সমস্ত সমালোচনা যে বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু বাস্তব রূপায়ণে যতই ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটুক, নীতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যকে সমর্থন করা ছাড়া আমাদের অন্য কোনও উপায় নেই। আমরা পূর্বেই বলেছি, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ভারতের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য ও অবিচ্ছিন্ন অংশ। যে ব্যবসায়ীরা খাদ্যশস্য নিয়েও অমানুষিক লোভের ছিনিমিনি খেলা খেলতে পারে, তাদের অবাধ মুনাফা-লুণ্ঠনকে চলতে দিলে আমাদের পরিকল্পনা বার বার চোরাবালিতে আটকে যাবে, দুর্যোগের অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে, ক্ষুধার্ত জনসাধারণের ক্ষোভ রোষে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃংখলায় ফেটে পড়ার আশংকা আমাদের দুর্বল ও অবসন্ন করে রাখবে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ছাড়া এই অনিশ্চিত, সংকটজনক, বিপদসংকুল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের আর কোনও আশু ফলপ্রদ উপায় নেই।

উপসংহার

ভারতের পুনর্বাসন সমস্যা ও দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা

এই প্রবন্ধের অনুসরণে
- পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী পুনর্বাসন সমস্যা
- দেশবিভাগজনিত পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা
- উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সমস্যা ও তাহার স্থায়ী সমাধানের উপায়

প্রারম্ভ

লর্ড কার্জনের কুটিল ষড়যন্ত্রের ছুরিকা ১৯০৫ সালে বাঙলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু বাঙালীর প্রতিবাদ উত্তাল হয়ে উঠে তাকে নিরস্ত করে। বাঙালী সেদিন ভাবতেও পারেনি, বঙ্গবিভাগের সেই ব্যর্থ, সম্মিলিত প্রতিরোধে প্রতিহত ষড়যন্ত্র অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে একদিন রক্তাক্ত বাস্তব সত্যে পরিণত হবে। ১৯৪৭ সালে বহু আঘাত, বেদনা, অশ্রু ও রক্তপাতের মধ্যে দেশবিভাগের বিনিময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল, পাঞ্জাব ও বাঙলা দ্বিখণ্ডিত হল। সে সময় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল, সর্বরিক্ত অজস্র উদ্বাস্তু ভারতবর্ষে এসে আশ্রয়প্রার্থী হয়। পশ্চিম ও পূর্ব পাঞ্জাবে প্রকৃতপক্ষে লোক ও সম্পত্তি বিনিময় হয়েছে, পশ্চিমপাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীরা পূর্বপাঞ্জাব ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে পুনর্বাসন লাভ করেছে, সেখানে এখন আর উদ্বাস্তু-পুনর্বাসনের সমস্যার কোনও অস্তিত্ব নেই।

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্যের পালা আজও শেষ হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমনের স্রোত এখনও অব্যাহত। কয়েক বৎসর অন্তর অন্তরই পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য দাঙ্গা বাঁধানো হয়েছে, আর দলে দলে উদ্বাস্তুরা আশ্রয়ের ব্যাকুল সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গে এসে ভিড় করেছে। ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে পূর্বপাকিস্তান থেকে ৮০১৫০৯ বাস্তুহারা এদেশে এসেছে। অদূর ভবিষ্যতেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থী আগমনের স্রোত রুদ্ধ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে দুঃসহ, সঙ্কটজনক চাপ সৃষ্ট হয়েছে, সমাজজীবনেও নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। দেশ বিভাগের পর প্রায় দীর্ঘ কুড়িটি বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, আজও সেই আঘাতের ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হল না, নানা সমস্যাজর্জরিত পশ্চিমবঙ্গকে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের

সমস্যায় অবসন্ন হতে হচ্ছে, এই উদ্বাস্তরা রেলওয়ে স্টেশনে ফুটপাথে অস্থায়ী শিবিরগুলোয় ক্ষুধায় ব্যাধিতে রৌদ্রেবৃষ্টিতে ঝড়ে নারকীয় পরিবেশে বীভৎস জীবন যাপন করে চলেছে, এ ট্র্যাজেডি শুধু বাঙালীর ও পশ্চিমবঙ্গের নয়,সমগ্র ভারতবর্ষের।

ভারতসরকার অবশ্য উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৪৪৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা,তাহার মধ্যে পুর্বপাকিস্তানের আশ্রয় প্রার্থীদের পুনর্বাসন ও সাহায্যের খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৪৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। প্রথম পরিকল্পনার পুর্বে পশ্চিম পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য ৬২·৩৪ কোটি টাকা, পুর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য ৮·৫৩ কোটি টাকা, প্রথম পরিকল্পনায় পশ্চিম ও পুর্বপাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য যথাক্রমে ৫৫·৭০ ও ৪১·৫৮ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৪·৯৫ ও ৫৫·৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় পুনর্বাসন খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি টাকা।

প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় পুনর্বাসন খাতে ব্যয় বরাদ্দ

শহর ও গ্রামাঞ্চলে গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণদান ও সরকারি ব্যয়ে গৃহসংস্থান, বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে ও তাদের প্রতিষ্ঠায় বাস্তুহারাদের কর্মসংস্থান, সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা—এই সমস্ত হল পুনর্বাসন ও ত্রাণকার্যের প্রধান দিক। প্রথম পরিকল্পনার শেষ ভাগ পর্যন্ত পুর্বাঞ্চলে প্রায় ৫০০,০০০ পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়, তার মধ্যে প্রায় ৪০০,০০০টি পরিবার গ্রামাঞ্চলে জমিতে এবং আনুষঙ্গিক পেশায় পুনর্বাসন লাভ করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রায় ১৭০,০৭০ পরিবারের পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে জমির ওপর অত্যধিক চাপ থাকার জন্য অন্যান্য রাজ্যে পুর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গ্রামীণ অঞ্চলে প্রায় ৭৮,০০০ পরিবার পুনর্বাসন লাভ করে। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পগুলোয় প্রায় ১৪,০০০ ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয়। যে সকল অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের ঘন সমাবেশ ঘটেছে, সেখানে নিজস্ব উদ্যোগে বা বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের জন্য ৫ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ পুনর্বাসন শিল্প কর্পোরেশন (Rehabilitation Industries Corporation) স্থাপিত হয়েছে।

পুনর্বাসনের বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রথম দু'টি পরিকল্পনায় পুনর্বাসনে অগ্রগতি

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ৪২·৪ কোটি টাকা ব্যয়িত

হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৮০০,০০০এর বেশী উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় প্রার্থী হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রায় ৩০০,০০০ জনকে অস্থায়ী ও ত্রাণশিবিরে স্থান দেওয়া হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে শরণার্থীদের আগমন এখনও অব্যাহত, তাই অস্থায়ী শিবিরবাসী ৪০,০০০ কি তারও বেশি সংখ্যক পরিবারের জন্যই শুধু নয়, ভবিষ্যতে তাদের সম্ভাব্য সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্যও ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে। ব্রহ্মদেশ, সিংহল, আফ্রিকার বিভিন্ন রাজ্য থেকেও প্রচুরসংখ্যক শরণার্থী ভারতে আগত, তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে। চতুর্থ পরিকল্পনায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন খাতে ৯০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ প্রস্তাবিত হয়েছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনায় পুনর্বাসন

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা, নানা ত্রুটিবিচ্যুতি ও শৈথিল্যের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর বার বার শোনা গেছে। উদ্বাস্তুদের জীবিকাগত পুনর্বাসন যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি তাদের মানসিক পুনর্বাসন, অর্থাৎ আত্মীয়তার স্পর্শে তারা যাতে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এবং নিজেদের দেশবাসীদের অবিচ্ছিন্ন অংশ বলে ভাবতে পারে এমন পরিবেশ রচনাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উদ্বাস্তুরা যে দেশের মূল্যবান জনশক্তি একথা উপলব্ধির সুযোগ তাদের দেওয়া হয়নি; তারা যেন অবাঞ্ছিত, বিরক্তিকর দায়, একান্তভাবেই সরকারি সাহায্যনির্ভর, এই হৃদয়হীন আমলাতান্ত্রিক মনোভাবই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আচরণে ধরা পড়ে। পূর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের নিশ্চেষ্টতার তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের শরণার্থীদের আত্মনির্ভরশীলতা ও নিজেদের পরিশ্রমে অধ্যবসায়ে প্রাথমিক সমস্ত বাধা অসুবিধাকে জয় করে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবার দৃঢ় সঙ্কল্প বার বার উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা যে কর্তৃপক্ষের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়েছে, বিহার, আসাম, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি অমানুষিক হৃদয়হীন ব্যবহারে জর্জরিত হয়ে আবার তারা পশ্চিমবঙ্গে ব্যাকুলভাবে ছুটে এসেছে, তারা নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত মাটিটুকু পর্যন্ত পায়নি, এই নির্মম সত্য থেকে আমরা কিছুতেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি না।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে ত্রুটিবিচ্যুতি

সমস্ত দিক বিবেচনা করলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দিক থেকে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাকেই সব থেকে সম্ভাবনা পূর্ণ বলে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চল উদ্ধার ও উন্নয়নের কাজ সম্পূর্ণ হলে সেখানে অনেক উদ্বাস্তু পরিবারের

পুনর্বাসন সম্ভব হবে। আন্দামানেও কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু আশ্রয় লাভ করেছে।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা

তাহলেও পূর্বপাকিস্তান থেকে শরণার্থীদের আগমনের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত এবং পশ্চিমবঙ্গের জমি ও অর্থ-নৈতিক জীবনের ওপর গুরুতর চাপের জন্য এই শরণার্থীদের পুনর্বাসন সমস্যা যে বিশেষভাবে কঠিন হয়ে উঠেছে, সে সম্বন্ধে তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন যথার্থই বলেছেন: 'The problem of rehabilitation of displaced persons from East Pakistan was rendered specially difficult in view of the contiuning nature of the influx over many years and the heavy pressure on land and economic life in West Bengal।' দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গে শিবিরবাসী পূর্বপাকিস্তান হতে আগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্যই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে দণ্ডকারণ্য উন্নয়নসংস্থা গঠিত হয়েছে, তার ওপরই এই অঞ্চলের উন্নয়নের ভার অর্পিত।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের মধ্যে কৃষকের সংখ্যাই সর্বাধিক, সুতরাং তাদের এমন স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যেখানে কৃষিগত জীবিকার সুযোগসুবিধা বর্তমান। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সেদিক থেকে বিশেষ উপযোগী। এই অঞ্চল খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ বলে এখানে বিভিন্ন ধরণের শিল্পপ্রতিষ্ঠায় উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থানের উজ্জ্বল সম্ভাবনাও আছে।

দণ্ডকারণ্যের আয়তন ও লোকসংখ্যা

রামসীতালক্ষ্মণের বনবাসের স্থান রূপে রামায়ণে বর্ণিত এই দণ্ডকারণ্যের আয়তন প্রায় ৮০ হাজার বর্গমাইল, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও অন্ধ্রের অংশ নিয়ে এই অঞ্চলটি গঠিত। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন মাত্র ৩৫ হাজার বর্গমাইল, আর এই জনসংখ্যা ভারাক্রান্ত, দুঃস্থ রাজ্যের লোকসংখ্যা যেখানে তিন কোটি কিংবা তার কিছু বেশি, সেখানে দণ্ডকারণ্যের লোকসংখ্যা মাত্র ৩০ লক্ষ। স্বভাবতই এই অঞ্চলটি উন্নীত, সংস্কৃত হলে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর ভারবহনে সক্ষম হবে।

১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পুনর্বাসন কমিটি ও জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ, পরিকল্পনা কমিশন, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর, কৃষি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত অন্ধ্র. মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা সম্পর্কিত কমিটি যা সংক্ষেপে এ্যাম্পো কমিটি নামে পরিচিত, তার দ্বারা প্রস্তুত দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক

এই পরিকল্পনার প্রধান কর্মসূচীগুলো হল, সর্ব ঋতুর উপযোগী রাস্তাঘাট নির্মাণ ও

রেলওয়ে পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ; ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদসাধন; সেচ ও ভূমি উদ্ধার ও অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন, ব্যাপক মৎস্য চাষের সুযোগসুবিধা সৃষ্টি, শাল. সেগুন, বাঁশ, খয়ের, বেত, ভেষজ উদ্ভিদ ইত্যাদি বনজসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার, দণ্ডকারণ্যের লৌহ, আকরিক বারসাইট, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজসম্পদের সদ্ব্যবহার, বিভিন্ন ধরণের শিল্পপ্রতিষ্ঠা, উদ্বাস্তুদের জন্য সুপরিকল্পিত ভিত্তিতে উপনিবেশ স্থাপন এবং সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগসুবিধাদান। নদীবহুল বলে দণ্ডকারণ্য বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনায়ও সমৃদ্ধ। দণ্ডকারণ্যের আদিবাসীরাও যাতে উন্নয়নকর্মসূচীর সুযোগসুবিধা লাভ করে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার অগ্রগতি ও চতুর্থ পরিকল্পনার কর্মসূচী

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা প্রবর্তিত হবার পর থেকে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভ পর্যন্ত ২১,০০০ একরেরও বেশি জমি পরিষ্কৃত এবং ১৩,০০০ একরের বেশি জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দণ্ডকারণ্য-পরিকল্পনার জন্য ৭'৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগ পর্যন্ত ২৩৯১ উদ্বাস্তু পরিবারকে দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হয়, এই পরিবারসমূহের মোট লোক-সংখ্যা ১০,৫৯৯। তৃতীয় পরিকল্পনায় দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের জন্য ২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন, এপর্যন্ত এই পরিকল্পনার অধীনে প্রায় ১৮০টি গ্রাম স্থাপিত হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রায় ৯০০০ পরিবার আশ্রয় লাভ করেছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই প্রকল্পের জন্য আপাতত ২৭ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাবিত হয়েছে। এই পরিকল্পনার কর্মসূচীগুলো হল: ২০০টি নতুন গ্রাম প্রতিষ্ঠা, তিনটি শিল্পতালুক (industrial estate) স্থাপন, প্রায় ১২,০০০ উদ্বাস্তুর জন্য পুনর্বাসন শিল্পকর্পোরেশন কর্তৃক ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপন, ২০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৪টি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ৪০টি নতুন চিকিৎসালয় ও ১০টি ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন।

কিন্তু গভীর বেদনার সঙ্গেই আমাদের একথা বলতে হয় যে, দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা তার প্রবর্তনের সময় আমাদের মনে যে আশ্বাস উদ্দীপনা জাগ্রত করেছিল, বাস্তব অভিজ্ঞতার নির্মম আঘাতে তা ধূলিসাৎ হয়েছে। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরেই কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে মতভেদ

বর্তমান। ১৯৬০ সালে সর্বসময়ের জন্য একজন চেয়ারম্যানসহ দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থা পুনর্গঠিত হলেও অবস্থার কোনও উন্নতি ঘটেনি। ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার সঙ্গে গুরুতর মতবিরোধের ফলে তদানীন্তন চেয়ারম্যান শ্রীফ্লেচারের অবসর গ্রহণ, ১৯৬৪ সালে চেয়ারম্যানের কাজকর্মে প্রধান পরিচালকের ও পুনর্বাসন দপ্তরের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ও বাধাদানের জন্য চেয়ারম্যান শ্রীশৈবাল গুপ্তের পদত্যাগ দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এমন এক দুষ্ট স্বার্থচক্রের অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় যা এই অঞ্চলে পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের পুনর্বাসনকে যথাসাধ্য ব্যাহত করতেই সমধিক উদ্যোগী। শ্রীগুপ্তের মত সৎ সুদক্ষ আই. সি. এস অফিসারের দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে পদত্যাগের পর এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকেনা। এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের জন্য কোনও বাঙালি মন্ত্রীকে গ্রহণ করা হয়নি, এটা কম সন্দেহজনক নয়।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মতবিরোধ

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের ১৯৬৬-৬৭ সালের বিবরণীতে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার সামগ্রিক ব্যর্থতার যে নৈরাশ্যজনক চিত্রটি উদ্ঘাটিত হয়েছে, তাতেও তার প্রশাসনিক ব্যবস্থা যে কত ত্রুটিবিচ্যুতিতে শতছিদ্রময়, আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। এই বিবরণীতে বলা হয়েছে, এই অঞ্চলে স্থানান্তরিত ১৩,৩৮৯ পরিবারের মধ্যে ১০,০৫১ পরিবারকেই যথাস্থানে দেখা গেছে। অবশিষ্ট ৩,৩৩৮ পরিবার সম্পর্কে বিবরণীটি নীরব থাকলেও আমাদের অনুমান করতে অসুবিধে হয় না যে তারা এই অঞ্চল পরিত্যাগ করে চলে গেছে। বণ্টিত জমির মধ্যে প্রায় ১,২৯,৪০০ একর, অর্থাৎ ২০০ বর্গমাইল জমি চাষযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ১০,০৫১ পরিবারের মধ্যে ৯,৮০৮ সংখ্যক পরিবার কৃষিতে ও ২৪৩টি পরিবার কৃষিবহির্ভূত কর্মে পুনর্বাসন লাভ করেছে। বিবরণীটি পড়তে পড়তে আমাদের মনে অনিবার্যভাবেই এ প্রশ্নই দেখা দেয়, এটা কি সুষ্ঠু পুনর্বাসনের নমুনা? প্রতি চাষীপরিবারকে এধরণের ৫.৫ একর অনুর্বর জমি, এক জোড়াবলদ ও কিছু অর্থ দিলেই কি তাদের পুনর্বাসনের সমস্যা মিটে যায়? ১৯৬৩ সালে একটি কৃষিবিশেষজ্ঞ দল বলেছিলেন, দণ্ডকারণ্যে সেচব্যবস্থা ছাড়া কৃষিগত পুনর্বাসনের সকল আশা মরীচিকায় পরিণত হবে। অথচ এখানে সেচব্যবস্থা নিতান্ত অপর্যাপ্ত। রাসায়নিক সারের ব্যাপক প্রয়োগ, একটি যথোপযুক্ত বিপণন সংস্থা গঠন এবং ব্যক্তিগত চাষের পরিবর্তে যৌথ বা সমবায় চাষ পদ্ধতি গ্রহণ—ঐ দলের এই সুপারিশগুলোও

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের ১৯৬৬-৬৭ সালের বিবরণী

কার্যকরী করা হয় নি। শিল্পপ্রসারের দিক থেকেও দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার অগ্রগতি মোটেই আশাপ্রদ নয়। ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে একটি বিশেষজ্ঞ দল দণ্ডকারণ্যে সিমেণ্ট, পাইপ, এ্যাসবেস্‌টস, কাগজ ইত্যাদি বহুবিধ শিল্পস্থাপনের সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সে সমস্ত সুপারিশও গৃহীত হয়নি, দণ্ডকারণ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থারও কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে নি।

তবু আমদের দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে সমস্ত আশা ভরসা জলাঞ্জলি দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই পরিকল্পনা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষারই সংগ্রাম। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক ও সামাজিক কল্যাণ দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। এই পরিকল্পনার রূপায়ণে আমাদের দায়িত্ব ও অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যেতেই হবে। আমাদের সংকল্প ও আত্মবিশ্বাস যদি অটুট থাকে তবে দণ্ডকারণ্য একদিন ছিন্নমূল উদ্বাস্তু বাঙ্গালীদের নতুন জীবনের ধাত্রী হয়ে উঠবে, নতুন মাতৃভূমির প্রাণরসে পুষ্ট হয়ে তারা নবভারত রচনার কর্মযজ্ঞকে সফল করে তুলবে, জনশক্তির শোচনীয় অপচয় ও সামাজিক বিশৃংখলার বিভীষিকা থেকে দেশ মুক্তি পাবে চিরকালের মত।

উপসংহার

ভারতের প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- দেশের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি [ব, বি, '৬২]
- ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রতিরক্ষা
- ভারতের স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ, বাধ্যতামূলক আমানত ও বার্ষিক আমানত পরিকল্পনা

প্রারম্ভ

বহু বৎসর ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যশক্তির শোষণে ভারতবর্ষ রিক্ত হয়েছে, বেকারি, দারিদ্র্য, ব্যাধি, কৃষি ও শিল্পের শোচনীয় অনগ্রসরতা, দেশবিভাগজনিত ক্ষয়ক্ষতি প্রভৃতি সমস্যায় এই দেশ জর্জরিত। ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলো শতাব্দীবিস্তৃত অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে বর্তমান উন্নতির তটভূমিতে উত্তীর্ণ হয়েছে, বিদেশী শাসনশৃংখলিত ভারতবর্ষ সেই স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ থেকে ছিল বঞ্চিত। স্বাধীনতালাভের পর ভারতবর্ষকে অল্পসময়ের মধ্যেই তার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের সুকঠিন, জটিল সমস্যাকীর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোর জন্য সঙ্গতিসংগ্রহই ত কঠিন সমস্যা। তার ওপর ১৯৬২ সালে ভারতের লাদাক ও নেফা সীমান্তে চীনের আকস্মিক, বিশ্বাসঘাতকোচিত আক্রমণ এবং ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তানী আক্রমণের ফলে ভারতকে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে তোলার জন্য বিপুল ব্যয়ভার গ্রহণ করতে হয়েছে। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার দায়িত্বপালনই সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের খাতে বিপুল পরিমাণ ব্যয়

চৈনিক আক্রমণের কাল ১৯৬২ ছিল তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসর। সে আক্রমণ স্বল্পকালস্থায়ী হলেও ভারতের উত্তর সীমান্তে তার হিংস্রনখর উদ্যত হয়েই রয়েছে। সেই জন্য প্রতিরক্ষার সমস্যার দিক থেকে তৃতীয় পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিত নতুনভাবে রচনা করতে হয়। ১৯৫১-৫২ সালে যেখানে ভারতের প্রতিরক্ষার ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৭০.৯৬ কোটি টাকা সেখানে ১৯৬৩-৬৪ সালে তার পরিমাণ ৭০৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, ১৯৬৪-৬৫ ও ১৯৬৫-৬৬ সালে তার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৯৩ ও ৭৬৯ কোটি টাকা। অন্যদিকে

সরকারের পরিকল্পনাব্যয়ও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৯৬২-৬৩ সালে তার পরিমাণ ছিল ১৪১৪ কোটি টাকা, ১৯৬৩-৬৪তে ১৬৫৪ কোটি টাকা, ১৯৬৪-৬৫ সালে ১৯৮৪ কোটি টাকা, ১৯৬৫-৬৬তে ২২২৫ কোটি টাকা। উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার এই বিপুল ব্যয়ভার আমাদের অর্থনীতিতে যে কি প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে তা সহজেই অনুমেয়।

তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরেই জরুরী আপৎকালীন অবস্থার পটভূমিতে ভারতবর্ষের কোনও কোনও মহল এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারতের মত অনগ্রসর দেশে যেখানে নিজস্ব মূলধন সঞ্চয় নিতান্ত স্বল্প, বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান শোচনীয়, সেখানে দেশরক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমান্তরাল রেখায় চলতে পারে না, চালাতে গেলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। দেশ রক্ষাই যখন জাতির প্রাথমিক কর্তব্য, তখন উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বাতিল করে দেশের ভৌগলিক সীমানার পবিত্র অখণ্ডতা রক্ষাতেই মনোনিবেশ করতে হবে। দেশরক্ষার প্রয়োজন ও উন্নয়ন পরস্পরবিরোধী, সুতরাং সাময়িক ভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে স্থগিত রাখা প্রয়োজন।

এক মহলের অভিমত : প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পরবিরোধী

ভারত সরকার এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করেননি। পরিকল্পনা একটি ধারাবাহিক, নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষ করার পর তৃতীয় পরিকল্পনাকে বর্জন করলে আমাদের গুরুতর ক্ষতি ঘটত ও অর্থনৈতিক বিশৃংখলা দেখা দিত। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা জাতীয় জীবনের অপরিহার্য অংশ। তৃতীয় পরিকল্পনায় সামগ্রিক ব্যয় হ্রাস না করার এবং দেশরক্ষার প্রয়োজনানুযায়ী পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দে পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্তই ভারতসরকার গ্রহণ করেছিলেন। রাজ্যসরকারগুলোর পরিকল্পনায়ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনের প্রতি সর্বাধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়। প্রতিরক্ষাসংশ্লিষ্ট শিল্পোন্নয়নের প্রয়াস, শিক্ষা প্রভৃতির মত জনকল্যাণমূলক ও সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনাসংক্রান্ত কর্মসূচীর ব্যয়বরাদ্দের হ্রাস, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয়সংকোচ—এ সমস্তই ছিল তৃতীয় পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাসের ভিত্তি।

একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব-পালনের সরকারি নীতি

সামগ্রিক বিচারে ভারতসরকারের এই নীতি সঠিক হয়েছে সন্দেহ নেই। কোনও দেশই শুধু বৈদেশিক সাহায্যের ও বিদেশ থেকে সমরোপকরণ আমদানির ওপর নির্ভর করে জাতীয় সম্মান রক্ষায় সমর্থ হয় না। আধুনিক যুদ্ধের জন্য লৌহ ও ইস্পাত, মেসিনটুল, নানাধরনের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, বিভিন্ন ধাতু,

যানবাহন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। সুতরাং দেশের প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে লৌহ-দুর্গের মত দুর্ভেদ্য করে তুলতে গেলে শিল্পপ্রসার অপরিহার্য, আর শিল্পায়ন ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর প্রতিরক্ষা একান্তভাবেই নির্ভরশীল। বিদেশী আক্রমণে রক্তাপ্লুত মাতৃভূমির স্বাধীনতারক্ষার জন্য সমগ্র দেশে যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা জাগ্রত হয়েছে, তাকে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধিতে যথাযথভাবে নিয়োজিত করতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। চৈনিক ও পাকিস্তানী আক্রমণের সময় আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের জনতা প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞে যেভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পরিকল্পনা কমিশন যথার্থই বলেছেন, একই সঙ্গে পূর্ণসংকল্পে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির ও উন্নয়নের গতির হার বৃদ্ধির যুগ্ম লক্ষ্য অনুসরণ করেই জরুরী আপৎকালীন অবস্থার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব। The challenge posed by the present Emergency will be met only if the twin objectives of higher defence preparedness and a higher tempo of development are pursued simultaneously and with the fullest determination.

দেশরক্ষা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ওপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল

ভারতসরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য নানা ভাবে সঙ্গতিসংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছেন। সরকার করবৃদ্ধি, প্রতিরক্ষা তহবিল গঠন, প্রতিরক্ষা বণ্ড ও সার্টিফিকেট বিক্রয় প্রভৃতি অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। আর সরকার জরুরী আপৎকালীন অবস্থার প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে সমস্ত নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, তা হল স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা, বাধ্যতামূলক আমানত পরিকল্পনা (Compulsory Deposit Scheme) ও তার বিকল্প বার্ষিক আমানত পরিকল্পনা (Annuity Deposit Scheme) ইত্যাদি। ১৯৬৩ সালের ৯ই জানুয়ারি স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৪ ক্যারেটের অধিক পরিমাণ স্বর্ণ দ্বারা অলংকার নির্মাণ নিষিদ্ধ করা ও কোনও ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে অলংকার ছাড়া অন্য স্বর্ণ থাকলে তা সরকারকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানাবার জন্য নির্দেশ জারী করা হয়। স্বর্ণকে জাতির প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নে নিয়োজিত করার জন্য স্বর্ণের চাহিদা ও মূল্য

জরুরী আপৎকালীন অবস্থার জন্য সরকারের অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা : কর বৃদ্ধি, প্রতিরক্ষা তহবিল, প্রতিরক্ষা বণ্ড ও সার্টিফিকেট এবং স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ

নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। কিন্তু স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বিশেষ সুফলপ্রসূ না হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার এই বিধি ১৯৬৬ সালে বাতিল করেছেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার জন্য অর্থসংগ্রহের উৎস হিসাবে ভারত সরকার ১৯৬৩-৬৪ সালে বাধ্যতামূলক আমানত বা সঞ্চয় পরিকল্পনা (Compulsory Deposit or Savings Scheme) প্রবর্তন করেন। এই জাতীয় অর্থসংগ্রহ পরিকল্পনার উদ্ভাবক লর্ড কেইন্‌স্। যে সকল ব্যক্তিকে ভূমিরাজস্ব দিতে হয়, শহরাঞ্চলে জমির মালিক, আয়কর দিতে হয় না এ ধরণের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ি ও চাকুরিজীবি, আয়করপ্রদানকারী চাকুরিজীবি—এই সমস্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়; এই পরিকল্পনায় বাধ্যতামূলক আমানতের ওপর শতকরা চার টাকা হারে সুদ এবং পাঁচ বৎসর পরে সুদসহ সঞ্চিত আমানত প্রত্যার্পণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। কিন্তু নিম্ন আয়ের অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষেই এই সঞ্চয়ের ভার বহন নিদারুণ কষ্টকর। তাছাড়া, লর্ড কেইন্‌স এই পরিকল্পনার শর্ত হিসাবে নির্দিষ্ট মূল্যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা রাখার কথা বলেছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিকে রোধ করা সম্ভব হয়নি। এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেই ভারতসরকার এই ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে ১৯৬৪-৬৫ সালে বার্ষিক আমানত পরিকল্পনা (Annuity Deposit Scheme) প্রবর্তন করেন, এই পরিকল্পনানুযায়ী বার্ষিক ১৫,০০০ টাকার অধিক আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে সঞ্চয় সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চ আয় গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের অধীনে আনয়ন করার এই পরিকল্পনা সমর্থনযোগ্য।

বাধ্যতামূলক আমানত পরিকল্পনা ও বার্ষিক আমানত পরিকল্পনা

কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ প্রান্তে উপনীত হবার পর ভারত যে গুরুতর অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে, তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে আমরা প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের যৌথ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারিনি। বৈদেশিক সাহায্যের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি এবং তার ওপর নির্ভরতা যে কত বিপজ্জনক তা ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানী আক্রমণের সময় উদ্ঘাটিত হয়েছে। রপ্তানির আয়ও বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি। তৃতীয় পরিকল্পনার সামগ্রিক ব্যর্থতা সত্যই বেদনাদায়ক। কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য অপেক্ষা উৎপাদন অনেক কম হয়েছে। বিশেষত কৃষির শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ

তৃতীয় পরিকল্পনার সামগ্রিক ব্যর্থতা

পর্যায়ে যে খাদ্যাভাব ও তজ্জনিত খাদ্যশস্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, তাতে আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তীব্র সংকট সৃজিত হয়েছে এবং চতুর্থ পরিকল্পনা সম্পর্কে নানা সংশয় ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের দুর্গতি

একদিকে উৎপাদন হ্রাস, অন্যদিকে উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার বিপুল পরিমাণ ব্যয়-সংকুলান করতে গিয়ে সরকারের ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় গ্রহণ যেভাবে খাদ্যশস্যের সঙ্গে অন্যান্য অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষদের জীবনযাত্রা দুর্বহ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে অসাধু ব্যবসায়ীদের খাদ্যশস্যের মজুতদারি ও ফাটকাবাজি তার ঘাটতি ও মূল্যবৃদ্ধিকে তীব্র করে তুলে জনসাধারণকে এক দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে এবং উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষা খাতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের ফলে বাজারে যে অর্থ অস্বাভাবিক হারে প্রচলিত হয়েছে, তা মুষ্টিমেয় বিত্তবান শ্রেণীর হাতে গিয়েই পড়েছে। চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে একই সঙ্গে দেশরক্ষা ও উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভারতের অর্থনীতির উপর অসহনীয় চাপ পড়েছিল, তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা ও তৎসম্পর্কিত অর্থনৈতিক সংকটের কারণ হিসেবে এটা বার বার উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু তার জন্য পরিকল্পনার স্ট্র্যাটেজি বা কৌশলের ও তার কর্মসূচীগুলোর বাস্তবরূপায়ণের গুরুতর ত্রুটিবিচ্যুতিরও কম দায়িত্ব নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১৯৬৬ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে যথার্থই বলা হয়েছে, বৈদেশিক আক্রমণের মত অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক চাপ যাতে সামলানো যায় তার জন্যে আমাদের অর্থনীতিতে কিছু অতিরিক্ত সহনক্ষমতা থাকা উচিত।

উপসংহার

চতুর্থ পরিকল্পনায় আপাতত ২৩,৭৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাবিত হয়েছে। অন্যদিকে আমাদের দেশরক্ষার জন্য সামরিক প্রস্তুতিকেও চালিয়ে যেতে হবে। ১৯৬৭ সালের শেষভাগে তিব্বত-সিকিম সীমান্তে নাথুলা ও চোলায় চীনের আক্রমণ আমরা যে আমাদের সীমান্তে সকল সময়েই বৈদেশিক আক্রমণের উদ্যত খড়্গের নীচে বাস করছি তা নতুন ভাবে প্রমাণিত করেছে। পাকিস্তানের মনোভাবও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে বিশেষ অনুকূল নয়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালেও সীমান্ত সংঘর্ষের আগ্নেয়-বিস্ফোরণের সম্ভাবনার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতেই হবে। সীমান্তে জওয়ানদের মত ক্ষেতে-খামারে, কল-কারখানায় যে সকল কৃষক ও শ্রমিক কর্মরত, তারাও ত সৈনিক, তাদের দুই বাহুকে সচল রাখার দায়িত্বও ত দেশরক্ষারই অপরিহার্য অঙ্গ।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- বেসরকারি উদ্যোগ বনাম সরকারি উদ্যোগ
- অনগ্রসর দেশে শিল্পপ্রসারের উপযোগিতা

[ব. বি. ১৯৬২]

অনুন্নত দেশের শিল্পপ্রসারে সরকারি সংস্থার

ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি ও রাষ্ট্রের ভূমিকা

ভারতের মিশ্র অর্থনীতি

প্রকৃতির অকৃপণ অফুরন্ত দানে সম্পদশালিনী ভারতবর্ষ আজ অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে রিক্ত। নিষ্ঠুর দারিদ্র্যে, অনাহারে ব্যাধিতে তার সন্তানদের জীবন বিপর্যস্ত। অন্নপূর্ণারূপিণী ভারতকে আজ তার ক্ষুধিত, নিরন্ন সন্তানদের জন্য বিভিন্ন দেশের কাছে খাদ্যের অনুনয়কাতর প্রার্থনা নিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে, দেশের পূর্বাঞ্চলে, বিহারে, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষের শীর্ণ, কঙ্কালসার প্রেতমূর্তি আবির্ভূত হয়ে বিভীষিকা সৃষ্টি করছে। আর উন্নত, সুখী দেশগুলো তার উদ্দেশে নানা ধিক্কারবাণী, হৃদয়হীন উপদেশ উচ্চারণ করে চলেছে।

প্রারম্ভ

যে ভারতবর্ষকে আজ অনুন্নত দেশের সকল গ্লানি বহন করতে হচ্ছে, তার মূলে আছে ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থের দুই শতাব্দীব্যাপী শোষণ। ইংরেজ এদেশের রক্তমোক্ষণ ঘটিয়ে তার সম্পদকে নিষ্ঠুরভাবে লুণ্ঠন করেছে, আর সেই লুণ্ঠনে তার নিজের দেশের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার হয়েছে পূর্ণ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা উপায়ে ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন করা ছাড়াও ইংরেজ বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত এদেশের জাতীয় আয়ের শতকরা দশভাগ প্রতি বৎসর আত্মসাৎ করত। এই শোষণে ভারতের কৃষি পঙ্গু ও কৃষকেরা শোচনীয়ভাবে দৈন্যগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। বস্তুত ভারতীয় সম্পদের কোনও উদ্বৃত্তই মূলধন হিসেবে কৃষি ও শিল্পে নিয়োজিত হয়নি। বিখ্যাত ইংরেজ মহিলা অর্থনীতিবিদ শ্রীমতী ভেরা আনষ্টে যথার্থই বলেছেন : অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলক বিচারে উন্নতই ছিল, এদেশের উৎপাদন পদ্ধতি এবং শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠনের ধাঁচ পৃথিবীর যে কোনও দেশের তুলনায় প্রাগ্রসর ছিল ; যখন ইংরেজ জাতির পূর্বপুরুষেরা নিছক আদিম জীবনযাপন করত, তখন ভারত সূক্ষ্মতম মসলিন ও অন্যান্য বিলাসপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি

ভারতে ব্রিটিশ শোষণের চিত্র

করত, এই দেশই সেই আদিম বর্বরদের বংশধরদের আনীত অর্থনৈতিক বিপ্লবের অংশভাগী হতে পারল না!

ভারতবর্ষের বর্তমান অনুন্নত অবস্থার পশ্চাদপটভূমিরূপে এই শোষণের; অসংখ্য ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য, রক্ত, বেদনা ও অশ্রুর ইতিহাসটিকে ভুললে চলবে না। স্বাধীনতালাভের পরও ভারতকে সেই পরাধীন, শৃংখলিত জীবনের সকল ক্ষতচিহ্ন বহন করতে হচ্ছে। এদেশের অনুন্নত, শিল্প ও কৃষিতে পশ্চাদপদ অর্থনীতির প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের মূলই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যস্বার্থশক্তির শোষণেই নিহিত। ভারতের অর্থনৈতিক দৈন্যের একটা প্রধান দিক হল, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ, যথাযোগ্য ব্যবহারের অভাব। মূলধনের অভাব ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক অনুন্নত অবস্থার আর একটি দিক। মূলধনের অভাবের কারণ, দীর্ঘকাল শোষণের ফলে ভারতের জাতীয় আয় থেকে মূলধনগঠনযোগ্য সঞ্চয়ের হার লাভ করা যায় নি। বিনিয়োগের ধাঁচ ও উৎপাদনপদ্ধতির মধ্যে মূলধনের অভাব বিশেষভাবে প্রকট।

ভারতের অনুন্নত অবস্থার নানা দিক

সেইজন্যই এবং অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণেও ভারতের কৃষি নিতান্ত অনুন্নত, নিছক খাদ্যসংস্থানেই সীমাবদ্ধ, অথচ দেশের বৃহত্তম জনসংখ্যার জীবিকার ও জাতীয় আয়ের বৃহৎ অংশের উৎস হল কৃষি। মূলধনের বিনিয়োগের অভাবে ভারতবর্ষ শিল্পক্ষেত্রেও অনগ্রসর। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক অনগ্রসরতা তথা উৎপাদন ক্ষমতার স্বল্পতার জন্য ভারতের রপ্তানি-আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় অনেক বেশি এবং তার লেনদেন ব্যালান্স সকল সময়ই তার প্রতিকূল। ভারতের অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার আর একটি দিক হল, তার ক্রমবর্ধমান বিপুল জনসংখ্যা। এই বিপুল জনশক্তির বৃহদাংশ অর্থনৈতিক উৎপাদনে নিযুক্ত হয় না বলে তা দেশের পক্ষে একটি বিরাট অপচয়ের দুর্বিষহ বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশের প্রত্যক্ষ বেকারি ত সীমাহীন, তাছাড়া সাময়িক বেকারি, প্রচ্ছন্ন-বেকারি প্রভৃতিও নানা-ধরনের কর্মহীনতা জাতীয়জীবনকে পঙ্গু, দৈন্যগ্রস্ত করে রেখেছে। এই সমস্ত কিছুর যোগফল হল অসংখ্য ভারতবাসীর দুর্বিষহ দারিদ্র, শিক্ষাহীনতা, অনাহার, ব্যাধির আক্রমণে অসহায় অবস্থা, নৈরাশ্যের নিরন্ধ্রঅন্ধকারপূর্ণ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। যে জীবন ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদরূপে গণ্য হওয়া উচিত, তা এখানে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। একটি সাধারণ প্রাথমিক হিসেবেই আমরা উন্নত দেশগুলোর তুলনায় যে কত পশ্চাদপদ তা পরিস্ফুট হয়: ১৯৫৭ সালে আমেরিকার মাথাপিছু আয় ছিল ৯৬৮০ টাকা, ইংলণ্ডে ৪৫২০ টাকা, পশ্চিম জার্মানীতে ৩৫১৩ টাকা,

আর ভারতবর্ষে মাত্র ২৭৬ টাকা। প্রকৃত আয়ের পরিমাণ এর থেকে আরও অনেক কম।

স্বাধীনতালাভের পর আমাদের জাতীয় সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই অভিশাপ মোচনের কর্মযজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন। মুখ্যত রাষ্ট্রের নেতৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণে সর্ববিধ অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, এই জাতীয় চিন্তাধারা ও লক্ষ্যই স্বাধীন ভারতবর্ষের পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছে। পরিকল্পনার লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ সংগঠন, সমষ্টির কল্যাণ-সাধন; ব্যক্তিগত মুনাফাসৃষ্টি বা মুষ্টিমেয়ের স্বার্থরক্ষা নয়। স্বতরাং জাতীয় উন্নয়নে তাদের ভূমিকা দ্বারাই বর্তমান সামাজিক ও আর্থনীতিক সংস্থাগুলোর মূল্য বিচার্য। তারা যে পরিমাণে লক্ষীভূত সামাজিক উদ্দেশ্যরূপায়ণে ব্যর্থ হবে, সেই পরিমাণেই তাদের সংস্কার বা পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে। সামাজিক ও আর্থনীতিক সংস্থাগুলোর পুনর্গঠনে সমগ্র সমাজের দিক থেকেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব বিরাট। প্রাপ্য সম্পদের সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রকে তার নিজের লগ্নি সম্পর্কে যেমন পরিকল্পনা করতে হয়, তেমনি বেসরকারি ক্ষেত্রে আর্থনীতিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করাও প্রয়োজন হয়। শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের নির্দেশক নীতিতে জীবিকাধারণের যথোচিত ব্যবস্থা, কর্ম ও শিক্ষালাভের অধিকার, বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে, অসুস্থতায়, অক্ষমতায় এবং অন্যান্য প্রকারের অবাঞ্ছিত অভাবের ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকারকে সামাজিক লক্ষ্যরূপে দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই সকল আদর্শ রূপায়ণের জন্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে বণ্টন করতে হবে যাতে সর্বসাধারণের উপকার হয় এবং অর্থনীতি যেন এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে সম্পদ ও আর্থনীতিক শক্তি পুঞ্জীভূত না হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোয় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রস্থাপনের এ সমস্ত আদর্শকেই অনুসরণ করার চেষ্টা চলছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ভূমিকার মূলনীতি

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মপ্রচেষ্টায় রাশিয়া প্রমুখ সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর পুঁজির রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং ব্রিটেন আমেরিকা ইত্যাদি দেশের অবাধ ধনতন্ত্র বা বেসরকারী ব্যবস্থা—এ দুটোর কোনওটিকেই গ্রহণ না করে তাদের মধ্যবর্তী একটি ব্যবস্থা

ভারতে মিশ্র অর্থনীতি

গৃহীত হয়েছে, অর্থনৈতিক পরিভাষায় তার নাম মিশ্র অর্থনীতি (mixed economy)। মিশ্র অর্থনীতির লক্ষ্য হল, অবাধ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং পূর্ণ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উভয় ব্যবস্থার দোষত্রুটি পরিহার ও গুণগুলোকে যথাসম্ভব রক্ষা করে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন সাধন।

তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন : ভারতের পরিকল্পনাগুলোয় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থার যে রূপ ফুটে উঠেছে তার অর্থ এই নয় যে সমস্ত আর্থনীতিক উদ্যোগ রাষ্ট্রের হাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। বেসরকারী ক্ষেত্র মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়ে জাতীয় পরিকল্পনার মধ্যে যে মূল্য নিহিত আছে তা উপলব্ধি করে সরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করবে, এই ধারণার ভিত্তিতেই জাতীয় উন্নয়নে বেসরকারি কর্মোদ্যোগকেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। তবে জাতীয় অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকাকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকার বিমান পরিবহন, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত করেছেন। জমিদারি প্রথার বিলোপও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ১৯৫৬ সালের নতুন শিল্পনীতি অনুযায়ী লৌহ ও ইস্পাত, খনিজ তৈল, আণবিক শক্তি, কয়েক শ্রেণীর পরিবহন প্রভৃতির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব রূপে চিহ্নিত, আর অন্যান্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সম্প্রসারণের নীতিই গৃহীত হয়েছে।

রাষ্ট্রের ভূমিকার সপক্ষের মত

অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকার এই ব্যাপক প্রাধান্যের সপক্ষে বলা হয়, ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুকঠিন ব্রত গ্রহণের ক্ষমতা ও মানসিকতা ব্যক্তিগত মুনাফাজীবি বেসরকারি সংস্থার নেই, রাষ্ট্রকেই তা গ্রহণ করতে হবে। সমগ্র জাতীয় স্বার্থের পটভূমিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা ও তদনুযায়ী ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য এই বিরাট দেশের প্রতিটি অংশকে কর্মচঞ্চল করে তোলার দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থা পালন করতে সক্ষম নয়। এমন কতকগুলো মূল, ভারি শিল্প আছে, যারা আশুলাভজনক নয়, অথচ দেশের শিল্পায়নে অপরিহার্য, এ সমস্ত শিল্পের প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রকেই উদ্যোগী হতে হয়।

বিপক্ষ মত

অর্থনৈতিক উন্নয়নে যাঁরা রাষ্ট্রীয় ভূমিকার বিরোধী তথা ব্যক্তিগত অবাধ উদ্যোগের প্রবক্তা, তাঁরা বলেন, সরকারি উদ্যোগের সম্প্রসারণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উৎসাহ ও দক্ষতার ওপর আঘাত হেনে জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষতিসাধনই করে চলেছে। সরকারি উদ্যোগ প্রতিযোগিতাকে সংকুচিত করে ফলে সরকারি কর্মচারীদের অদক্ষতায়, সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থার চিরাচরিত

শৈথিল্যে ও লালফিতার দৌরাত্ম্যে অপচয়ের পরিমাণ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমবর্ধমান করের বোঝায় জনসাধারণ উৎপীড়িত হয়।

সাম্প্রতিককালে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শোচনীয় ও ব্যাপক ব্যর্থতায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকার কার্যকারিতা সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে সন্দেহ ও নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষভাগে তীব্র খাদ্যাভাব-জনিত সংকট ও নিত্য ব্যবহার্য পণ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিম্ন আয়ের লোকদের এক অসহনীয় দুর্গতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলে অনাহারে মৃত্যু ঘটেছে; খাদ্যের জন্য চারদিকে অজস্র ক্ষুধার্ত পুরুষ, নারী, শিশুর মর্মান্তিক হাহাকার। অর্থনৈতিক মন্দার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বহু ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প আজ তীব্র সংকটের সম্মুখীন, অনেক শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে এবং অজস্র শ্রমিকের ওপর ছাঁটাইয়ের খড়্গ উদ্যত। চা, পাট, তুলাবস্ত্র প্রভৃতির মত ভারতবর্ষের সনাতন রপ্তানি শিল্পগুলো সংকটের রাহুগ্রস্ত। রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, বৈদেশিক বিনিময় ঘাটতি এক নিদারুণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক রিপোর্টে তৃতীয় পরিকল্পনায় সামগ্রিক ব্যর্থতার চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে; তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যের তুলনায় উৎপাদন অনেক কম। ৫ শতাংশ হারে কৃষি-উৎপাদনের বৃদ্ধি পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু বৎসরে গড়ে ২.৮ শতাংশের বেশি হারে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি। তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৭০ ভাগ হবে আশা করা হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত বৃদ্ধির হার শতকরা ৩৯ ভাগ মাত্র। তৃতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৎসরে গড়ে ৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে পরিকল্পনা কমিশন হিসেব করেছিলেন, কিন্তু এই পরিকল্পনার শেষ প্রান্তে উপনীত হবার পর দেখা যায়, জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ২.৫ শতাংশ হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষভাগে ও চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম পর্বে অর্থনৈতিক সংকটের কালো ছায়ায় জাতীয় জীবন যে ভাবে তিমিরাচ্ছন্ন হচ্ছে, রাজনৈতিক জীবনে তার অশুভ ফল হিসেবে নানা অনিশ্চয়তা, জনসাধারণের বিক্ষোভ, অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে একটা বিপজ্জনক, বিস্ফোরক অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে রাষ্ট্রীয় ভূমিকার বিরোধীপক্ষ বলছেন, দীর্ঘ পনের বৎসরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনার তথা রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার ভূমিকা গ্রহণের পরিণাম কি এই, শুধু জনসাধারণের দুর্গতি বৃদ্ধি, দেশের রিক্ততা, দৈন্য, অর্থনৈতিক

রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে তৃতীয় পরিকল্পনার সাক্ষ্য

মন্দা, এক অসহনীয় অর্থনৈতিক অরাজকতা! আমদানিরপ্তানি ও অন্যান্য নানা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে লাইসেন্স, পারমিট, নানাধরনের নিয়ন্ত্রণ, র‍্যাশনিং—সরকারি নিয়ন্ত্রণের এই নাগপাশে ব্যবসায় বাণিজ্য শিল্পোদ্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, দুর্নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে এবং জনসাধারণের দুঃখকষ্ট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা তাই রাষ্ট্রের ভূমিকাকে খর্ব করার দাবীতে উচ্চকণ্ঠ।

কিন্তু বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা যে দেশের সামগ্রিক স্বার্থের পক্ষে কত ক্ষতিকর হয়েছে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতায়ই ত তা পরিস্ফুট। সরকারি ভূমিকার দোষক্রটির তালিকা প্রস্তুত করা নিশ্চয়ই এমন কিছু কঠিন নয়, কিন্তু বেসরকারি ব্যবসায়ীরা কি জনসাধারণের কল্যাণ তথা জাতীয় স্বার্থসম্পর্কে কোনও উৎকণ্ঠা, ন্যূনতম দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন? আয়কর ফাঁকি, ঔষধে, খাদ্যে, ভেজাল, খাদ্যশস্যের মজুতদারি ও ফাটকাবাজির মত অমানুষিক, হীনতম অপরাধ, আণ্ডার-ইন্‌ভয়েসিং ও ওভার-ইনভয়েসিং-এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অপহরণ, শ্রমিকদের উপযুক্ত, ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা, সীমাহীন মুনাফার লোভে অসাধু উপায়ে অর্জিত অনুৎপাদক কালোটাকার গোপন সঞ্চয়বৃদ্ধি এবং তার সাহায্যে ফাটকাবাজি, বিলাসব্যাসনে অর্থের অপচয় ঘটিয়ে, নানা অনুৎপাদক ব্যয়ে মূলধন গঠনের ক্ষতিসাধন—স্বাধীনোত্তর যুগে বেসরকারি ক্ষেত্রের এই সমস্ত ঘৃণ্য-কার্যকলাপ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি অচলায়তন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে মনোপলি কমিশন ও মহলানবিশ কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, তিনটি পরিকল্পনাকালে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর হাতেই অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হবার পরিবর্তে আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান আর্থিক সংকটের জন্য সরকারি ভূমিকা গ্রহণের নীতি নয়, সেই নীতিকে বাস্তব রূপদানের শৈথিল্য ও ক্রটিবিচ্যুতিই দায়ী। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ভূমিকাকে আরও সম্প্রসারিত ও কার্যকরী করা যায়নি বলেই বেসরকারি সংস্থা যথেচ্ছ লুণ্ঠনের, মজুতদারি ও ফাটকাবাজির সুযোগ পেয়েছে। কোনও কোনও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের এই অভিমত।

বেসরকারী সংস্থার জাতীয় স্বার্থ বিরোধী ভূমিকা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মযজ্ঞকে সফল করে তোলার জন্য খাদ্যশস্যের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিপণন, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রভৃতি রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্প্রসারণের ও শক্তিশালী করার প্রস্তাব বিভিন্ন

মহলে উত্থাপিত হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ ডি. আর. গ্যাডগিল সম্প্রতি বলেছেন, ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক অর্থনীতির ব্যাধিগুলোর প্রতিকারের পথ সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস নয়, অধিকতর নিয়ন্ত্রণ। তাঁর মতে, ভারতীয় অর্থনীতি মূলত একটি অবাধ অর্থনীতির দ্বারাই চালিত হচ্ছে, এটা শুধু বিশেষ বিশেষ কয়েকটি বিধির দ্বারা অংশত নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ডাঃ গ্যাডগিলের অভিমত এই যে, পরিকল্পনার তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সমাজের সর্বশ্রেণীর মধ্যে যথাযথভাবে বণ্টিত হওয়ার পরিবর্তে বণ্টনের ক্ষেত্রে এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের এবং সমাজের এক স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নয়নের কর্মসূচীগুলো অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে যাতে বৈষম্য বৃদ্ধি না পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা পরিকল্পনার একটি মূল লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। তাই আমাদের অর্থনৈতিক দুর্গতি মোচনের জন্য চাই বলিষ্ঠ সরকারি নেতৃত্ব, রাষ্ট্রের অধিকতর শক্তিশালী, সংকল্পকঠিন ভূমিকা।

ডাঃ গ্যাডগিলের অভিমত

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের রাষ্ট্রের ভূমিকা গ্রহণ সম্বন্ধে আমরা যে অভিযোগই উচ্চারণ করিনা কেন, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ যে পরাধীনতার দায়ভাগগ্রস্ত নিশ্চল, স্থবির ভারতীয় অর্থনীতিতে ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনাময় গতিবেগ সঞ্চারিত করেছে, তা অবশ্য স্বীকার্য। এই গতিতে সাময়িকভাবে নানা আবর্জনা এসে তাকে মন্থর করে তুলতে পারে, কিন্তু সে তার নিজস্ব শক্তিতেই সে সমস্ত বাধাকে জয় করবেই করবে।

উপসংহার

ভারতের সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনা

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- নগর ও পল্লীর ব্যবধান অপসারণ [ক. বি. '৫৭]
- পল্লী অঞ্চলের আর্থিক উন্নয়ন [ক. বি. '৫৮]
- গ্রামীণ বাংলার উন্নতি কোন পথে? কৃষি না শিল্প? [ক. বি. '৬৩]

ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন ও তার অর্থনীতির প্রাথমিক ভিত্তি হল তরুচ্ছায়া-বেষ্টিত স্নিগ্ধশ্যাম অজস্র গ্রাম, দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগই গ্রামবাসী। অথচ ভারতীয় জনজীবনের প্রাণশক্তির মূল উৎস গ্রামগুলোই দারিদ্র্য, ব্যাধি আর শিক্ষাহীনতার গাঢ় তমিস্রায় নিমজ্জিত রয়েছে, আর তাদের রক্ত শোষণ করে মুষ্টিমেয় শহরগুলো দিনের পর দিন স্ফীত হয়েছে। শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত বিত্তবান শ্রেণী শহরে জীবিকার্জন ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আকর্ষণে গ্রাম পরিত্যাগ করে দলে দলে এসে শহরে ভিড় করেছে, আর অবহেলিত, পরিত্যক্ত গ্রামগুলো শ্মশানে পরিণত হয়ে দেশের দুর্ভাগ্যের এক করুণ, মর্মান্তিক চিত্রকেই তুলে ধরেছে। এদেশে

প্রারম্ভ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গ্রামীণ জীবনের এই শোচনীয় অবক্ষয় শুরু হয়। প্রদীপের আলোকের ঠিক নীচেই যেমন অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে, তেমনি আলোকোজ্জ্বল, জনবহুল কর্মমুখর শহরগুলোর সমৃদ্ধির পশ্চাদপটভূমিতে গ্রামীণ জীবনের যে কি অপরিসীম দীনতা, রিক্ততা, অশ্রু ও বেদনা সঞ্চিত ছিল সেদিকে বিশেষ কারোর দৃষ্টি পড়েনি। ভারতবর্ষে গ্রাম ও শহরের এই মেরুপ্রমাণ ব্যবধান সমগ্র জাতীয় জীবনের পক্ষেই অশুভ।

স্বাধীনতালাভের পর ভারতবর্ষের জাতীয় সরকার যখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সমগ্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে ব্রতী হলেন, তখন গ্রামীণ জীবনের উন্নয়নের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের দৃষ্টি পতিত হল। ভারতের কৃষি-অর্থনীতির কাঠামো উন্নয়নের জন্ম জলসেচ, কৃষিঋণ, সার ও বীজ সরবরাহ, পতিত জমি উদ্ধার প্রভৃতি পরিকল্পনাসংক্রান্ত কর্মসূচীই পর্যাপ্ত বলে মনে হল না, গ্রামাঞ্চলে নতুন পরিবর্তনের স্রোত প্রবাহিত করার নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হল। গ্রামীণ অর্থ-নীতিতে উন্নয়নের স্বয়ংনির্ভর শক্তি সঞ্চারের জন্যই সমাজ বা সমষ্টিউন্নয়ন পরিকল্পনার

(Community Development Project) প্রবর্তন করা হয় ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর পুণ্য জন্মদিবসে। সমাজ উন্নয়নপরিকল্পনার অর্থ হল, একটি বিশেষ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামবাসীদের মধ্যে গ্রামীণজীবনের উন্নয়নের চেতনার উদ্বোধন এবং কৃষির উন্নয়নের জন্য তাদের আত্মনির্ভরশীলতার সম্যক পুষ্টিসাধন। "Help the poor to help themselves", এটাই হল সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনার মূলনীতি; এক জাতীয় স্বার্থসম্পন্ন, সমদৃষ্টিভঙ্গিবিশিষ্ট এক বা একাধিক গ্রামের জনসাধারণ যন্ত্রজ্ঞান, কুশলতা ও দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থনৈতিক অভাব-অভিযোগ ও কার্যকলাপ, সামাজিক শিক্ষা, সংস্কার ও মানসিকতা ইত্যাদি সকলক্ষেত্রে একযোগে উন্নতিসাধনে সক্ষম হলেই সামগ্রিকভাবে কৃষিউন্নয়ন সম্ভবপর; সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা এই লক্ষ্যের রূপায়ণের ভিত্তিতেই পরিচালিত।

সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতসরকারের সহযোগিতার পটভূমিকায়ই সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনা এদেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অঙ্গরূপে প্রবর্তিত হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কারিগরি সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে এক চতুর্মুখী সাহায্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, তার পূর্বেই ভারতের ফরিদাবাদ, এটোয়া, নীলখেরী প্রভৃতি স্থানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গ্রামোন্নয়নের প্রয়াসে আমেরিকা সাহায্যদান করে আসছিল। অতঃপর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সমাজউন্নয়ন প্রকল্পকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করার জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠন করলেন। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ইতিহাসের পরিবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী ভারত ও আমেরিকার মধ্যে ভারতে মার্কিন কারিগরী সাহায্য বিষয়ক চুক্তি, যা এই পরিকল্পনাকে মূল্যবান সাহায্যদান করেছে। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রবর্তনের সময় মাত্র ৫৫টি নির্বাচিত প্রোজেক্ট ছিল, তাদের অধীনে ছিল ৫০০ বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট দু'লক্ষ লোকের ৩০০টি গ্রাম। গ্রামীণ ভারতবর্ষে সেই প্রথম ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের জলকল্লোল শ্রুত হল, যে গ্রামবাসীরা ছিল নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, দৈবশক্তির ওপর নির্ভরশীল, তারাই দীর্ঘকালের জড়তা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মবিশ্বাসে ও কর্মোদ্দীপনায় চঞ্চল হয়ে উঠল।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাথমিক ইতিহাস

সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনার সংগঠন বিভিন্ন স্তরে প্রসারিত। সর্বোচ্চ স্তরে পরিকল্পনার মূল দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সমাজউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ওপর এবং তার

মৌলিক নীতি নিরূপণের ভার একটি কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর ন্যস্ত। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, খাদ্য ও কৃষি, সমাজউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত, তার সভাপতি প্রধানমন্ত্রী ; কমিটির অধীনে একজন প্রোজেক্ট পরিচালকও আছেন। সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটি কমিটিও নিযুক্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনা রচনাই কেন্দ্রীয় স্তরের সংগঠনের মৌল দায়িত্ব। পরিকল্পনা রূপায়ণের ভার রাজ্যস্তরের সংগঠনের ওপর অর্পিত। এটা হল রাজ্যউন্নয়ন কমিটি, তার সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী, উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রীবৃন্দ এবং কর্মসচিব রাজ্য উন্নয়ন কমিশনার ; তিনিই সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত কর্মসূচীর পরিচালক এবং উন্নয়ন বিভাগের কর্মধারার মধ্যে শৃংখলা ও যোগসূত্র রক্ষাকারী।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাংগঠনিক বিন্যাস : কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তর

সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনার সাংগঠনিক বিন্যাসের পরবর্তী স্তর হল জেলা। নবগঠিত জেলাপরিষদগুলোর ওপর জেলাপর্যায়ে সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মসূচী রূপায়ণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, এই সংস্থার সদস্য হলেন ব্লক পঞ্চায়েৎ সমিতিগুলোর সভাপতি, জেলার সংসদ সদস্যগণ, বিধানসভার সদস্যগণ প্রভৃতি জনসাধারণ নির্বাচিত প্রতিনিধি। প্রত্যেক জেলার জন্য জেলা উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে একজন জেলাউন্নয়ন অফিসার নিযুক্ত আছেন। ১½ লক্ষ একর কর্ষিত জমি, ২ লক্ষ গ্রামবাসী ও ৩০০ গ্রাম সংবলিত প্রায় ৫০০ বর্গমাইলব্যাপী স্থান নিয়ে প্রতিটি প্রোজেক্ট-এর কর্মাঞ্চল গঠিত, এই অঞ্চলগুলো আবার তিনটি করে উন্নয়ন ব্লকে বিভক্ত, ১০০ গ্রাম ও প্রায় ৭০০ অধিবাসী নিয়ে প্রত্যেকটি ব্লক গঠিত। প্রতিটি প্রোজেক্ট-এর জন্য একজন প্রোজেক্ট অফিসার এবং প্রতি ব্লক পরিচালনার জন্য একজন ব্লক ডেভালাপমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হন, তাঁদের সাহায্যের জন্য কৃষি, সমবায়, পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কর্মচারীরা থাকেন। সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনার ব্লক সংগঠনের প্রাথমিক রূপ এই ছিল।

জেলা ও ব্লক পর্যায়

সমষ্টিউন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কর্মসূচী কয়েকটি গ্রামীণ অঞ্চলের তিনবৎসর ব্যাপী আত্যন্তিক (intensive) উন্নতির জন্য গৃহীত হয়, এই গ্রামোন্নয়নকে একটি স্থায়ী ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হিসাবে সমাজউন্নয়নের নীতিকে ব্যাপকভাবে কার্যকরী করে তোলবার জন্য অধিক খাদ্য বাড়াও কমিটির (Grow more Food Committee) সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার আমেরিকার সম্প্রসারণ কার্যধারার আদর্শে ১৯৫৩ সালে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (National Evtension Service) কার্যক্রম

প্রবর্তন করেন।[৫] এই সম্প্রসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হল, এক একটি অঞ্চলে ১০০ থেকে ১২০টি গ্রাম সহ সম্প্রসারণ উন্নয়ন ব্লক গঠিত হবে, একজন সম্প্রসারণ অফিসারের ওপর তার দায়িত্ব থাকবে, তাঁকে সাহায্য করার জন্য কৃষি, পশু প্রজনন ও সংরক্ষণ, সমবায় ও পঞ্চায়েত, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিভাগে একজন করে ও সামাজিক শিক্ষাবিভাগে একজন পুরুষ ও স্ত্রীলোক সহ সর্বসমেত ৬ জন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হবেন; প্রতি পাঁচ থেকে দশটি গ্রামের জন্য একজন উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রামসেবককেও রাখা হবে। গ্রামীণ জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ছাড়াও দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও সম্প্রসারণ কার্যধারার অন্তর্ভুক্ত। উন্নয়নপরিকল্পনায় গ্রামীণ জনসাধারণের সচেতন অংশগ্রহণ ও তাদের সমবেত স্বেচ্ছামূলক প্রচেষ্টার মূলনীতিই হল জাতীয় সম্প্রসারণের ভিত্তি। এ সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন, জাতীয় সম্প্রসারণ এমন এক বিশেষ সংগঠন যার মাধ্যমে প্রতিটি কৃষকের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নতজীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে সচেতনতা সঞ্চারের জন্য চেষ্টা করা হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, গ্রামীণ জীবনের উন্নতি মূলত কৃষির ওপরই নির্ভরশীল, শিল্প তার সহায়ক।

সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনার রূপান্তরের প্রথম পর্যায়: জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কার্যধারারার অগ্রগতি পরীক্ষার জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত কার্যসূচী মূল্যায়ন সংস্থার বিভিন্ন সমীক্ষায় বলা হয়েছে, জলসেচ, ভূমিক্ষয় নিরোধ, পতিত জমির উদ্ধার, বিচ্ছিন্ন জোতের সংহতিসাধন, কুটিরশিল্পের প্রসার—ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি মূল লক্ষ্যানুযায়ী হয়নি এবং তা গ্রামবাসীদের মনে উৎসাহ ও আত্মনির্ভরশীলতা উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি, অর্থগত ও ধর্মগত কৌলীন্যের অধিকারী গ্রামবাসীরাই দরিদ্র ও অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের তুলনায় উন্নয়ন কার্যধারার সুযোগসুবিধা ও সুফল অধিক পরিমাণে আত্মসাৎ করেছে। জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কার্যধারা আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং এই পরিকল্পনা কার্যত গ্রামবাসীদের সরকারি সাহায্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে তুলে স্থানীয় উদ্যোগকে পুষ্ট করার পরিবর্তে স্তিমিত করেই ফেলেছে। সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনার এই মৌলিক দুর্বলতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এই পরিকল্পনার কর্মপ্রবাহ পরীক্ষা করে দেখবার জন্য শ্রীবলওয়ান্তি মেহতার সভাপতিত্বে একটি পর্যবেক্ষক কমিটি নিযুক্ত করা হয়। মেহতা কমিটি

বলওয়ান্তি মেহতা কমিটির গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের সুপারিশ

সুপারিশ করেন, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের পরিবর্তে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচীর ওপরই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত্ এবং সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনায় শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণই (democratic decentralisation) কৃষিউন্নয়নের যথার্থ পথ; এই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ব্লক স্তরে পঞ্চায়েৎ সমিতি ও জেলা স্তরে জেলা পরিষদ স্থাপন করা প্রয়োজন।

মেহতা কমিটির এই সুপারিশের ভিত্তিতেই ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবর্তিত কর্মসূচী গৃহীত হয়। পঞ্চায়েতী-রাজ তারই ফল। নব-রূপায়িত পরিকল্পনা অনুযায়ী পঞ্চায়েতগুলোকেই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমে পঞ্চায়েৎ, শীর্ষে জেলা পরিষদ এবং মধ্যে পঞ্চায়েৎ সমিতি—এই ত্রিস্তরবিশিষ্ট সংযুক্ত সংগঠন গড়ে তুলে তার মাধ্যমে সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত কর্মসূচী রূপায়নের কাজ চলছে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ মেহতা কমিটির সুপারিশগুলো বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জেলা, ব্লক এবং গ্রাম পর্যায়ের গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলোকে প্রশাসনের একটি সুসংলগ্ন কাঠামোর অংশরূপেই দেখা উচিত। এই পরিষদ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরই গ্রামীণ উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করার সাধারণ নীতি অনুমোদন করেন। তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন, সরকারী নির্দেশ ও পরিদর্শন সাপেক্ষ বর্তমানে বিভিন্ন প্রদেশে যে সমস্ত পদ্ধতি গৃহীত হচ্ছে তদনুযায়ী ব্লকে উন্নয়ন কর্মসূচীর রূপায়ণের সর্বশেষ দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে গ্রাম পর্যায়ে পঞ্চায়েতের সঙ্গে এবং জেলা পর্যায়ে পরিষদের সঙ্গে কর্মরত ব্লক পঞ্চায়েৎ সমিতির ওপর ন্যস্ত হবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতীরাজ পরিকল্পনার এই লক্ষ্যগুলো উল্লিখিত হয়: কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ শিল্পগুলোর উন্নয়ন, সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর পুষ্টিবিধান, স্থানীয় জনশক্তি ও অন্যান্য সঙ্গতি এবং পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠানগুলোর লভ্য বিভিন্ন ধরনের সঙ্গতি—এ সমস্তের পূর্ণ সদ্ব্যবহার, অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রামীণ সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অংশগুলোকে সাহায্যদান, স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে কর্তৃত্ব ও উদ্যোগের ক্রমিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং গ্রামীণ সমাজের আত্মনির্ভরশীলতাকে উৎসাহদান। অন্ধ্র, আসাম, মহীশূর, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, রাজস্থান, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশে পঞ্চায়েতীরাজ গঠিত হয়েছে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপান্তরের দ্বিতীয় পর্যায়: পঞ্চায়েতী-রাজ

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৪০ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় ২৯৪ কোটি টাকা ও পঞ্চায়েতের জন্য ২৮ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতির সমীক্ষায় দেখা যায়, আট বৎসর পুর্বে এই পরিকল্পনা প্রবর্তনের সময় থেকে সমাজ উন্নয়ন কার্যসূচী ২৯০০-এরও অধিক ব্লকে প্রবর্তিত হয়েছে এবং বর্তমানে এর মাধ্যমে প্রায় ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ লোক উপকৃত। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগে এই কার্যক্রম ৩১০০ ব্লকের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৪ লক্ষ গ্রামে সম্প্রসারিত হয়, এদের মধ্যে প্রায় এক হাজারেরও বেশি ব্লকে পাঁচবৎসর সম্পূর্ণ করে সমাজউন্নয়ন কার্যসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগে এই কর্মসূচী প্রায় ২১০০টি ব্লক পর্যায়ে, প্রায় ২০০০ দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে এবং ১০০০ এরও কিছু বেশি ব্লকে উন্নয়ন কর্মের ১০ বৎসর পুর্ণ হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পঞ্চায়েৎ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ২৬০ কোটি টাকা। পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় বলেছেন, দেশব্যাপী কৃষিউন্নয়ন ও পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার জন্যই সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনার সম্প্রসারণ কার্যব্যবস্থাকে নিয়োগ করা হবে। স্থানীয় সঙ্গতিগুলোর যথাযথ যোজনা প্রকল্পগুলোর রূপায়ণ ও নবসৃষ্ট সম্পত্তির (Assets) সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজের জন্য পঞ্চায়েতী সংগঠনকে অধিকতর কার্যক্ষম করে তোলাও চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যসূচী

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার আর্থিক সঙ্গতির প্রধানতম উৎস হল কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার এবং জনসাধারণ, টাকায়, পণ্যে অথবা শ্রমে তারা তাদের অর্থের দেয় অংশ দিতে পারে। সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের আর্থিক সাহায্যের আনুপাতিক হার হল ৩ : ১। জলসেচ, পতিত জমির উদ্ধার প্রভৃতি কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যাবলীর জন্য রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় মূলধন ঋণ হিসাবে লাভ করতে পারেন। ১৯৬২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত জনসাধারণের কাছ থেকে যে অর্থ পাওয়া গেছে তার পরিমাণ হল ১৮১'৯০ কোটি টাকা, আর সরকারের প্রদত্ত অর্থের অর্থসংস্থান পরিমাণ ২৮২১'২১ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিযুক্ত কর্মীদের বেতন খাতে ব্যয়ের অর্ধাংশও বহন করেন। সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনায় আমেরিকা ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশন থেকেও সাহায্য আসে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার

সমাজউন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় ১১ ভাগ ভারত-আমেরিকা কারিগরি সহযোগিতা পরিকল্পনা অনুযায়ী আমেরিকার কাছ থেকে লাভ করা গিয়েছিল।

আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আদর্শ ও লক্ষ্যের এবং তাদের বাস্তব-রূপায়ণের মধ্যে ব্যবধানের যে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাও তার ব্যতিক্রম নয়। স্থানীয় উদ্যোগ, স্থানীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা ও সুযোগগুলোর বিকাশ সাধনের পরিবর্তে শুধু বৈষয়িক সাহায্যদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য গ্রামীণ নেতৃত্ব যথাযথভাবে সংগঠিত ও দৃঢ় হতে পারেনি। পরিকল্পনাকমিশননিযুক্ত কার্যসূচী মূল্যনির্ধারক সংস্থাগুলোর বিভিন্ন বিবরণীতে বলা হয়েছে, বহু ক্ষেত্রেই সমাজ উন্নয়নপরিকল্পনার কাজ লক্ষ্যানুযায়ী হয়নি, পঞ্চায়েতগুলোর মাধ্যমে কৃষিমূলধন সরবরাহে সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য, সেচব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে কৃষিউন্নয়নের অগ্রগতি মন্থর। জাতিসংঘের কারিগরি সাহায্যদান সংস্থা কর্তৃক নিযুক্ত একটি মিশন সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি পরীক্ষা করে বলেছেন, কৃষিউন্নয়ন অপেক্ষা যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্যই সমাজউন্নয়ন-পরিকল্পনার বেশির ভাগ অর্থব্যয় করা হয়েছে, কিন্তু বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কৃষি-উন্নয়ন কার্যসূচীকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দান করা উচিত। বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কার্যধারার সঙ্গে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মসূচীর রূপায়ণের সঙ্গতির অভাব, আমলাতান্ত্রিক ধাঁচে জাতীয় সম্প্রসারণসেবার কার্যকলাপের পরিচালনা, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মীদের মধ্যে গ্রামীণ জীবনের আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ইত্যাদিও সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে সফল হতে দেয়নি।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতি

পঞ্চায়েতীরাজ পরিকল্পনা সম্পর্কেও নানা অভিযোগ উচ্চারিত হয়েছে। আমাদের গ্রামীণ সমাজ এখনও নানা অন্ধ সংস্কার ও বিশ্বাসে, জাতিভেদ ও শ্রেণী বৈষম্যে পঙ্গু, গণতন্ত্রের অনুপযোগী। গ্রামপঞ্চায়েতগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাবান সুবিধা ভোগী শ্রেণীর গোষ্ঠীগত, রাজনৈতিক দলাদলি, ঈর্ষা-বিদ্বেষকুটিল, স্বার্থকলুষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার, যথেচ্ছাচারের ক্ষেত্রে পর্যবসিত হয়েছে, তারা প্রকৃত গ্রামীণ নেতৃত্ব বিকাশের সহায়তা করেনি। পঞ্চায়েতগুলো গ্রামীণ গণতান্ত্রিকতার পাদপীঠ হবার পরিবর্তে আমলাতান্ত্রিক

পঞ্চায়েতী-রাজের ত্রুটি সত্ত্বেও সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনার বিপুল সম্ভাবনা

সংস্থায় পরিণত হয়েছে এবং কৃষিউন্নয়নের কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু এ সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও আমাদের নিরাশ হলে চলবে না।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায়ই গ্রামীণ ভারতবর্ষের বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা নিহিত। আজ প্রতিটি শহরবাসীকেই উপলব্ধি করতে হবে, গ্রামকে উপবাসী, রিক্ত রেখে শহরগুলোকে ক্রমাগত স্ফীত করে তুললে তা পরিণামে দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না, সকল সময়ই মনে রাখতে হবে, শহরবাসীর ক্ষুধার অন্ন ও সুখাস্বাচ্ছন্দ্যের মূল উপকরণগুলো গ্রাম থেকেই আসে।

উপসংহার

[illegible]

জীবনের উদ্ধারের সোনার কাঠি করে তুলতে হবে। সরকার এই পরিকল্পনাকে কৃষি-উন্নয়নের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দিয়েছেন। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবন তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই নবভারত গঠণের পুণ্যপীঠস্থান হয়ে উঠুক! এই পরিকল্পনাচিহ্নিত পথে কৃষির হাত ধরে শিল্পও গ্রামীণ জীবনকে নতুন শক্তির আধার করে তুলুক।

ভারতের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- ভারতে কুটির শিল্পের উপযোগিতা [ক. বি. '৬২]
- ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কুটির শিল্পের ভূমিকা
- ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান
- ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৃহৎ শিল্প এবং কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের কুটিরশিল্পজাত পণ্যদ্রব্যগুলি রুচিসুষমায় ও শিল্পকলা-লাবণ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের নাগরিকদের মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে এসেছে। এদেশের নানা বিলাসদ্রব্য ইউরোপের অনেক দেশের অভিজাত নাগরিকদের মনোরঞ্জন করত। ভারতের বিভিন্ন বন্দরে থেকে জাহাজগুলো পণ্যসম্ভারে পূর্ণ হয়ে দুস্তর-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দূর দূরান্তের বন্দরে উপনীত হত।

প্রারম্ভ

ভারতের তুলা, পশম, রেশম প্রভৃতির বস্ত্র, পিতল ও কাঁসার দ্রব্য, সুগন্ধী দ্রব্য, অলংকার বিশ্বের বাজারে খ্যাতি অর্জন করেছিল, ঢাকাই মসলিন, কাশ্মীরী শাল প্রভৃতির খ্যাতি ছিল সুদূরবিস্তৃত। গুজরাট, খান্দেশ, জৌনপুর, কাশী, পাটনা থেকে উড়িষ্যা ও বাঙলা পর্যন্ত ভারতের বস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্রগুলো ছড়িয়ে ছিল। বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক বের্ণিয়ের মুঘল বাদশাহের কারখানার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে সে যুগের ভারতবর্ষের শিল্পসমৃদ্ধির একটি উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায়: 'বড় বড় হল ঘরে কোথায়ও সূচীকর্ম, কর্মরত স্বর্ণকার, চিত্রকরদের দল দেখা যাচ্ছে, কোথায়ও বা রং-মিস্ত্রী, কোথাও দরজী, ছুতোর বা মুচি; কোথায়ও রেশমের কাজ চলছে, ছুঁচের সাহায্যে চমৎকার সুন্দর ফুল ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে।'

কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতকে ইংরেজের কাছে দাসত্ব স্বীকার করতে হল, বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল।

ইংরেজ আমলে ভারতের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ধ্বংস সাধন

ইংরেজ তার বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারতের কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পকে ধ্বংস করল। ব্রিটেনের শিল্পস্বার্থের যুপকাষ্ঠে ভারতের শিল্পকে নির্মম ভাবে বলি দেওয়া হল। রেশমের কারিগর ও তাঁতিরা নিষ্ঠুর অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে তাদের পৈতৃক ব্যবসায় ও বৃত্তি পরিত্যাগ করেছিল। যে ভারতবর্ষ ছিল বস্ত্রশিল্পে বিশেষ সমৃদ্ধ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বস্ত্রের রপ্তানিকারক, তার সেই

শিল্পের ধ্বংসসাধনে তাকে বস্ত্রের জন্য ব্রিটেনের মুখোপেক্ষী হতে হল। অন্যান্য শিল্পের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। 'তাঁতি, কর্মকার, করে হাহাকর'-এ—সে যুগের কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের অত্যাচারর্জ্জরিত কর্মীদের আর্তনাদই ধ্বনিত হয়েছিল।

স্বাধীনতালাভের পর ভারতবর্ষের জাতীয় সরকার কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণে ব্রতী হয়েছেন। স্বাধীনোত্তর যুগে ভারতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন প্রচেষ্টার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার পূর্বে আধুনিক শিল্পজগতের মানদণ্ড অনুযায়ী তাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করা প্রয়োজন।

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের সংজ্ঞা

আংশিক বা পূর্ণবৃত্তি হিসাবে যে সমস্ত শিল্প সম্পূর্ণভাবে বা প্রধানত কারিগরের উদ্যোগে, তাদের নিজেদের পরিবারের কিংবা আশেপাশের লোকজনদের সহযোগিতায় ও নিজস্ব মূলধনে পরিচালিত হয়, তাকেই কুটিরশিল্প বলা হয়ে থাকে। কুটিরশিল্পের তুলনায় উন্নততর যন্ত্র ও অধিকতর মূলধনসংবলিত যে সকল শিল্পে ভাড়াটে শ্রমিকদের সাহায্যে স্বল্পমাত্রায় উৎপাদন করা হয় তাদেরই ক্ষুদ্রশিল্প আখ্যা দেওয়া হয়।

কেউ কেউ কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পকে গ্রামীণ এবং পৌর বা শহরাঞ্চলীয় এই দু' শ্রেণীতেও বিভক্ত করেছেন। সুতাকাটা ও বয়ন, ঝুড়ি, দড়ি তৈয়ারি, মাটির খেলনা, মৃন্ময়পাত্রাদি ও মূর্তি নির্মাণ, ছুরি কাঁচি দা ইত্যাদি নির্মাণের কামারশালা, বেতের কাজ—ইত্যাদি গ্রামীণ কুটির শিল্পগুলোর কোনও কোনওটি সর্বসময়ের জীবিকা হিসাবে গৃহীত হয়, কোনও কোনওটি আবার কৃষকেরা তাদের মূল জীবিকার পাশে উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। চাল ও ময়দার কল, ইক্ষু থেকে গুড় ও খান্দসারী তৈয়ারীর কারখানা প্রভৃতি হল গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র শিল্প। হাতীর দাঁত ও কাঠ খোদাই, সূচীশিল্প, খেলনা নির্মাণ, জরির কাজ ইত্যাদি পৌর কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত এবং ছাপাখানা, গেঞ্জী তৈয়ারি, ছোটখাট যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা ইত্যাদি হল পৌর ক্ষুদ্রশিল্পের দৃষ্টান্ত।

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের শ্রেণীবিভাগ

ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তথা তার পরিকল্পিত অর্থনীতিতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা বা উপযোগিতা কি সে বিষয়ে প্রবল মতভেদ আছে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে এই শিল্পগুলোর প্রয়োজনীয়তা আমাদের স্বীকার করতে হয়। আমেরিকা ও জাপানের মত শিল্পোন্নত দেশেও সুসংগঠিত ক্ষুদ্র শিল্পের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ভারতে এই শিল্পসমূহের উপযোগিতাগুলো হল এই: এক, গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মরশুমী ও অর্ধবেকারী দূরীকরণে, জমির ওপর থেকে

জনসংখ্যার চাপ লাঘবে ও সাধারণভাবে কর্মসংস্থানে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিশিষ্ট ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য। দুই, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে স্বল্প-পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং বিশেষ সংগঠন দক্ষতা ও কলাকৌশলের প্রয়োজন হয় না, সেইজন্য ভারতের মত অনুন্নত দেশে এই জাতীয় শিল্পের ব্যাপক প্রসার ও তার মাধ্যমে অত্যাবশ্যক ভোগপণ্যদ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ ও মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা সম্ভব। তিন, বৃহৎ শিল্প মুষ্টিমেয় শ্রেণীর হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে, কিন্তু কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের ফলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে বলে তা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ রচনায় বিশেষ সহায়ক। চার, যে সকল পণ্যদ্রব্যের জন্য সূক্ষ্ম কারুকার্য, ব্যক্তিগত সৃজনশীল ভূমিকা ও অভিনিবেশের প্রয়োজন, তাদের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প অপরিহার্য। পাঁচ, ক্ষুদ্র শিল্প বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক হিসাবেও কাজ করে থাকে, বৃহৎ কারখানায় নির্মিত দ্রব্যের অংশবিশেষ অনেক সময় ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলো নির্মাণ করে দেশের শিল্পায়নে মূল্যবান সাহায্য দান করতে পারে। ছয়, বিদেশের বাজারে ভারতের সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত নানাদ্রব্যের চাহিদা ক্রমবর্ধমান, সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের দিক থেকেও কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পগুলোর উপযোগিতা আছে।

ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের স্থান

ভারতসরকার সঙ্গত কারণেই দেশের অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠনে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। ভারতসরকারের ১৯৪৮ সালের ঘোষিত শিল্পনীতিতে জাতীয় অর্থনীতিতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকার গুরুত্ব উল্লিখিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে দেখার জন্য যে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প কমিটি বা কার্ভে কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল, ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে সেই কমিটি বলেছিলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের চাহিদা যাতে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের দ্বারাই মেটানো এবং বেকারিকে রোধ করা যায়, তার জন্য ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী যন্ত্রভিত্তিক বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য এই কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো করেছিলেন; বিকেন্দ্রীকরণ ও সমবায়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন, সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম কর্পোরেশন স্থাপন; রাজ্য অর্থ কর্পোরেশন

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে কার্ভে ও স্রফ কমিটির সুপারিশ

(State Finance Corporation)-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের আর্থিক সাহায্যদান এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দানের জন্য এই কর্পোরেশনে কুটিরশিল্প-বিভাগ স্থাপন এবং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণ সরবরাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সক্রিয় অংশ গ্রহণ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পূর্বে ১৯৫৪ সালের বেসরকারি শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সমস্যা অনুসন্ধানী কমিটি বা শ্রফ কমিটি এই মন্তব্য করেছিলেন, সরকারের ক্রীত ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধে বিলম্ব হয় বলে ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থাগুলোকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, এই বিষয়ে সরকারের তৎপরতার প্রয়োজন।

আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের একটি আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাদল ১৯৫৪ সালে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে এই সুপারিশগুলো করেছিলেন: এক, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের কলাকৌশল ও অন্যান্য সম্পর্কে গবেষণা এবং কারিগরদের ছোট যন্ত্র সরবরাহ, উন্নততর যান্ত্রিক পদ্ধতি, কলাকৌশল, রুচি, প্যাটার্ণ প্রভৃতি শিক্ষাদানের জন্য ভারতের চারিটি স্থানে চারিটি আঞ্চলিক যান্ত্রিক কৌশল বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (Institues of Technology) এবং ডিজাইন ও ফ্যাশান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় ডিজাইন শিক্ষায়তন স্থাপন; দুই, দেশে ও বিদেশে সরবরাহের উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলার জন্য ক্রেতা সেবা কর্পোরেশন এবং ইউরোপে ও আমেরিকায় একটি করে রপ্তানি উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন; তিন ক্ষুদ্র শিল্পোগুলোকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর আঞ্চলিক শাখার ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলোর অধিকতর ঋণদান, প্রতিটি রাজ্যের অর্থ কর্পোরেশনগুলোর মূলধনের একাংশ ক্ষুদ্রশিল্পে বিনিয়োগের জন্য পৃথক করে রাখা এবং দ্রব্য ও সম্পত্তি বন্ধকের বিনিময়ে ঋণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ; চার, কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন, তবে এদের সকল সময়েই সরকারের নেতৃত্বাধীন করে রাখা উচিত হবে না এবং পাঁচ, বিক্রয়, বণ্টন এবং বাজার সম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহের জন্য একটি বিক্রয়কার্য কর্পোরেশন (Marketing Service Corporation) স্থাপন।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাদলের সুপারিশ

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে এমন কতকগুলো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় যা তাদের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধক, যেমন বিক্রয়-করণের (marketing) অসুবিধা, কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধা, প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি ও কলাকৌশল, বৃহৎ শিল্পসংস্থাসমূহ ক উৎপন্ন ও আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্যের প্রতিযোগিতা। কার্ভে কমিটি ও আন্তর্জাতিক

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিভিন্ন অসুবিধা এবং তাদের দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন

পরিকল্পনা দলের স্থপারিশগুলোয় এই সমস্ত অস্থবিধা দূরীকরণের ব্যবস্থাই নির্দেশিত হয়েছে, সরকারও তার জন্য কতকগুলো সংগঠন গড়ে তুলেছেন। ১৯৫৫ সালে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (National Small Industries Corporation) গঠিত হয়েছে, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সমন্বয়সাধন তার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন রাজ্যসরকারগুলোর সহযোগিতায় হস্তশিল্প উন্নয়নের জন্য নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংসদ, কেন্দ্রীয় রেশম সংসদ, নিখিল ভারত তাঁতশিল্প সংসদ, নিখিল ভারত খাদি ও গ্রাম্যশিল্প সংসদ, ক্ষুদ্র শিল্প সংসদ, ক্ষুদ্র শিল্পসহায়ক সংসদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে কর্মরত।

প্রথম পরিকল্পনাকালে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনাকালে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন প্রচেষ্টা হিসাবে সর্বভারতীয় তাঁতশিল্প সংসদ, ক্ষুদ্র শিল্প সংসদ প্রভৃতি সংস্থা গঠন, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সাহায্যের জন্য বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনের ওপর সেস্ (cess) স্থাপন এবং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে রেয়াৎ (rebate) দান, এই শিল্পসমূহে মূলধন সরবরাহের জন্য রাজ্য অর্থ কর্পোরেশন স্থাপন ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাদলের স্থপারিশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের অর্থসাহায্যের দায়িত্ব গ্রহণ, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলোর উৎপাদন ও বিক্রয়ে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলো যাতে সাহায্য দানে সক্ষম হয় তার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক তাদের অর্থপ্রদান, আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলের স্থপারিশ অনুযায়ী মাদুরাই, বোম্বাই, ফরিদাবাদ ও কলিকাতায় চারিটি ক্ষুদ্র শিল্পসেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রথম পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন খাতে ৩৩·৬ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উন্নয়ন কর্মসূচী

কার্ভে কমিটির স্থপারিশের ভিত্তিতেই দ্বিতীয় পরিকল্পনার কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচী গৃহীত হয়। বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও তাদের বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যম হিসাবে শিল্প সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা, বিক্রয়করণ ব্যবস্থার সংহতি সাধন, মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থাসমূহের সম্প্রসারণ, ঋণদানের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তাদানের জন্য গ্যারান্টি স্কীম প্রবর্তন এবং তার পরিচালনার জন্য গ্যারান্টি সংস্থা নামে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি উপবিভাগ গঠন, ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য শিল্পশিক্ষা ব্যবস্থাসমূহের সম্প্রসারণ, ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে

৬৬টি শিল্প উপনিবেশ স্থাপন—ইত্যাদি হল দ্বিতীয় পরিকল্পনার কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মধারা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৭৫ কোটি টাকা।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২৬৪ কোটি টাকা। শিল্প সমবায় সমিতি ও শিল্প উপনিবেশ গঠনের ওপর অধিক পরিমাণে গুরুত্ব আরোপ, বাজার সংরক্ষণ, অর্থ সাহায্য, রেয়াৎ প্রভৃতি পরোক্ষ সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস করে কলাকৌশল, ঋণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলোকে স্বাবলম্বী করে তোলা এবং সুদূর গ্রামাঞ্চলেও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিষ্ঠা—এই ছিল তৃতীয় পরিকল্পনার কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসংক্রান্ত নীতি। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের অগ্রগতির হিসাবে দেখা যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে যেখানে তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন ছিল ১৯৩ কোটি গজ, সেখানে ১৯৬২-৬৩ সালের শেষে তার পরিমাণ ২২৫ কোটি গজে দাঁড়ায়, এই সময়ে শিল্প উপনিবেশের সংখ্যা ৬৬ থেকে ১০৫-এ বৃদ্ধি পায় এবং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে ২·৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়। দেশে তাঁতবস্ত্রের চাহিদা ক্রমবর্ধমান।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের কর্মসূচী

কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ক্ষুদ্র শিল্পের অগ্রগতি বিশেষ আশাপ্রদ নয়। এ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বুলেটিনের ১৯৬৭ সালের ৬ই জুন সংখ্যায় বলা হয়েছে, উৎপাদনের দিক থেকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলো তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলোর সঙ্গে তাল রেখে অগ্রসর হতে পারেনি, ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে রাজ্য অর্থ কর্পোরেশনের ভূমিকা আশানুরূপ নয়। রাজ্য অর্থ কর্পোরেশনের দাদন যেখানে ১৩ কোটি টাকা থেকে ৫০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে প্রদত্ত তার অংশ স্বল্প, মোট দাদনের ২২ শতাংশ মাত্র। কর্ম সংস্থানের সম্ভাব্য সুযোগ দান, আয়ের সুষম বণ্টন, মূলধনের কার্যকরী ব্যবহার এবং একটি উদ্যোগী শ্রেণীর আবির্ভাবের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করা প্রভৃতি উপযোগিতার জন্য আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থাগুলোর সংখ্যা ২০০,০০০ বা তার কিছু বেশি, তার মধ্যে আবার মাত্র এক চতুর্থাংশ কারখানা আইন অনুযায়ী নিবন্ধভুক্ত (registered)। এই জাতীয় কারখানার মধ্যে মাত্র ২৭,০০০টি ইউনিট বা প্রায়

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ক্ষুদ্র শিল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমীক্ষা

৬০ শতাংশ সংস্থা তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলোর ঋণ সরবরাহ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণে সমর্থ হয়েছে, এটা আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পগুলোর অসংগঠিত অবস্থারই প্রমাণ।

চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য ৬৯০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাবিত হয়েছে। তার মধ্যে সরকারি অংশের পরিমাণ ৩৭০ কোটি টাকা এবং বেসরকারি অংশের পরিমাণ ৩২০ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনাকালে ২৫০টি নতুন শিল্প উপনিবেশ স্থাপন করার কথা আছে। মূলধন সরবরাহ ও

উপসংহার

অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়ে রয়েছে, তাদের দূরীকরণের জন্য সর্বতোভাবে উদ্যোগী হতে হবে। একদিকে যেমন চিরাচরিত, পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতি সংবলিত গ্রামীণ শিল্পগুলোর আধুনিকীকরণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি আধুনিক যন্ত্রসজ্জিত নতুন শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণও প্রয়োজন। বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের স্রোত মিলিত হয়ে ভারতের শিল্পায়নের কর্মযজ্ঞকে সফল করে তুলবে।

ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট

এই প্রবন্ধের অনুসরণে
। সংগতি সংগ্রহে ইউনিট ট্রাস্ট

যথাসম্ভব দ্রুত শিল্পায়নই ভারতের পশ্চাদপদ, অনুন্নত অর্থনীতির সকল সমস্যা দূরীকরণের এবং তার জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনের মানোন্নয়নের একমাত্র পথ। ভারতের জনসংখ্যার ৭০ শতাংশই যে যুগজীর্ণ, অবৈজ্ঞানিক কৃষি ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল, তা এদেশের অর্থনৈতিক দুস্থতারই একটি চিহ্ন। কৃষির উন্নতিও শিল্প সম্প্রসারণের ওপর নির্ভরশীল। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাই শিল্প সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইংরেজ ভারতবর্ষকে

প্রারম্ভ

শুধু শোষণ ও লুণ্ঠনই করে এসেছে, এদেশের শিল্পপ্রসারকে সর্বপ্রকারে বাধাদানেই সচেষ্ট থেকেছে। সেই জন্যই আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত শিল্পোন্নয়ন কর্মসূচীগুলোর রূপায়ণের জন্য মূলধন সংগ্রহ কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন কর স্থাপন ও পুরাতন কর বৃদ্ধি, বৈদেশিক সাহায্য, ঘাটতি ব্যয় প্রভৃতি সঙ্গতি সংগ্রহের যে কয়েকটি পদ্ধতি আছে, আমরা যা গ্রহণও করেছি, তাদের প্রত্যেকটিরই কোনও না কোনও ক্ষতিকর দিক জাতীয় অর্থনীতিতে অশুভ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। স্বল্প সঞ্চয়ই হল পরিকল্পনার জন্য সঙ্গতি সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা শুভ ও বাঞ্ছিত উৎস।

ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত দরিদ্র জনসাধারণ কায়ক্লেশে জীবন নির্বাহ করে থাকে, জীবন রক্ষাই তাদের পক্ষে একটা কঠিন সমস্যা। প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে তাদের আয় থেকে সঞ্চয়যোগ্য উদ্বৃত্ত বিশেষ থাকেনা। তাহলেও এরাই ভারতের বৃহত্তম জনসংখ্যা এবং এদের মধ্যে কারুর কারুর সঞ্চয়যোগ্য অর্থও

শ্রফ কমিটির সুপারিশ
অনুযায়ী ইউনিট ট্রাস্ট গঠন

থাকে বলে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য তাকে সংগ্রহ করার যথাযথ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এদের সামনে যদি অর্থ লগ্নীর লাভজনক ও নিরাপদ সুযোগসুবিধা উন্মুক্ত হয়, তবে তারা তাতে উৎসাহিত হবে ও তাদের অর্থকে সংগ্রহ করে শিল্প-সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করা যাবে। নানারকম দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপে শেয়ারের বাজার আবিল থাকে বলে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার ক্রয় করতে বিশেষ উৎসাহী হয় না। ভারত সরকার মধ্যবিত্তদের স্বল্পসঞ্চয়

বিনিয়োগের সম্ভাবনা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ও শিল্পপতি শ্রী এ. ডি. শ্রফের সভাপতিত্বে যে কমিটি গঠন করেন, তার সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৬২ সালে ভারতীয় সংসদে ইউনিট ট্রাস্ট গঠনের আইন গৃহীত হয়, ১৯৬৪ সালের জুলাই মাস থেকে এই প্রতিষ্ঠান তার কাজ আরম্ভ করেছে।

ইউনিট ট্রাস্টের সংগঠন

ইউনিট ট্রাস্ট স্বয়ংশাসিত সংস্থা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মনোনীত ৬ জন সহ মোট ১০ জন নিয়ে গঠিত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের ওপর এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ভার ন্যস্ত। এই বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যদের মধ্যে ৪ জন বেসরকারি প্রতিনিধি, তাদের মধ্যে তিনজন ব্যবসায়িক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের এবং একজন অডিটার ফার্মের প্রতিনিধি। ইউনিট ট্রাস্টের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মনোনীত সদস্যদেরই অন্যতম। জনসাধারণের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দান করা হয়েছে। ইউনিট ট্রাস্টের ৫ কোটি টাকার প্রারম্ভিক মূলধনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অংশের পরিমাণ ২.৫০ কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের ৭৫ লক্ষ টাকা, জীবনবীমা কর্পোরেশনেরও ৭৫ লক্ষ টাকা এবং স্টেট ব্যাঙ্ক ও ৩৬টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অংশ ১ কোটি টাকারও কিছু বেশি। নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো যাতে তাদের প্রয়োজনমত মূলধন লাভ করে এবং শেয়ার মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির করতলগত না হয়ে অধিকসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে বণ্টিত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই ইউনিট ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে।

আইন অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কোম্পানীর কাগজে, যৌথ মূলধনী কারবারের প্রেফারেন্স ও অর্ডিনারী শেয়ারে, ডিবেঞ্চারে এবং স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থার ঋণপত্রে লগ্নী করবেন; কিংবা ব্যাঙ্কেও টাকা আমানত রাখার অধিকার

ইউনিট ট্রাস্টের শেয়ার বা ইউনিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা

আছে। সেই সম্পত্তির ভিত্তিতেই ট্রাস্টের মূলধন দশ টাকার প্রতি ইউনিটে বিভক্ত করে জনসাধারণের কাছে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করা হবে, ন্যূনপক্ষে দশটি ইউনিটের কম কিংবা দশ ইউনিটের লট ছাড়া ইউনিট বিক্রীত হবে না। ইউনিট-গুলোর লিখিত মূল্য বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ওঠানামা করবে, কিন্তু ইউনিটের মূল্য লিখিত মূল্যের নীচে হ্রাস পাবে না, এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ইউনিট বিক্রয় করতে পারবেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ও তার সহায়ক ব্যাঙ্কগুলো, ডাকঘর, কয়েকটি অনুমোদিত তপশিলী ব্যাঙ্ক এবং বিভিন্ন স্টক এক্সচেঞ্জের দালালদের ইউনিট বিক্রয়ের জন্য ট্রাস্টের প্রতিনিধিরূপে

নিযুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ৩৫০০ শাখা থেকে ইউনিট ট্রাস্টের ইউনিট বা শেয়ার বিক্রীত হচ্ছে।

ইউনিট ট্রাস্টের লভ্যাংশ বণ্টনের নীতি হল এই : ইউনিট তহবিলে ঋণের জন্য সুদ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট আয়ের মধ্যে শতকরা পাঁচ ভাগ জাতীয় উন্নয়নপরিকল্পনার লাভজনক কোনও ক্ষেত্রে লগ্নী করা হবে, অবশিষ্ট অংশের মধ্যে ৯০ শতাংশ ইউনিট ক্রেতাদের মধ্যে হারাহারিভাবে বণ্টিত হবে। লভ্যাংশের হার ন্যূনতম পরিমাণ ৬ টাকা, ঊর্ধ্বতম পরিমাণ ১০ শতাংশ। মোট আয়ের ১০ শতাংশই পরিচালনা ব্যয়, সুদদান ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। ইউনিট বিক্রয়লব্ধ তহবিলের জন্য কোনও সুদ দেওয়া হলে তা বাদ দিয়ে অন্যান্য ব্যয় যদি বাৎসরিক আয়ের তুলনায় ৫ শতাংশের অধিক হয়, তবে তার সমান অর্থ ট্রাস্ট তহবিল থেকেই দেওয়া হবে এবং সুদ ছাড়া মোট ব্যয়ের অবশিষ্টাংশ প্রারম্ভিক মূলধন সরবরাহকারীদেরই বহন করতে হবে।

ট্রাস্টের লভ্যাংশ বণ্টনের নীতি

স্বল্পআয়ের ব্যক্তিরা ইউনিট ট্রাস্টে তাঁদের স্বল্প সঞ্চয় লগ্নীতে উৎসাহী হন, সেই উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনাটিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য লগ্নীকারকদের কয়েকটি সুযোগ সুবিধা দান করা হয়েছে। প্রথমত, বিভিন্ন লগ্নীর ওপর মুনাফা বা সুদের জন্য ট্রাস্টকে আয়কর, মুনাফাকর ইত্যাদি জাতীয় কর দিতে হবে না, ট্রাস্ট পুরো সুদ বা লভ্যাংশের অধিকারী হবে। দ্বিতীয়ত, ইউনিট ক্রেতা লভ্যাংশ হিসেবে যে অর্থ পাবেন, তার মধ্যে প্রথম এক হাজার টাকার ওপর আয়কর ধার্য করা হবে না। এই লভ্যাংশ যুক্ত হওয়ার জন্য যাঁদের আয় অতিরিক্ত করের আওতায় আসবে, তাঁরা সুপার ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি পাবেন। তৃতীয়ত, ইউনিট ক্রয়বিক্রয়ে ব্যাপক সুযোগসুবিধা দান করা হয়েছে। ইউনিট ক্রেতারা তাঁদের শেয়ারগুলো নগদ টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করতে পারবেন, তাঁরা ইউনিটগুলো বন্ধক রেখে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে সঙ্গত পরিমাণ ঋণ লাভেরও অধিকারী। এই সমস্ত সুযোগসুবিধা নিঃসন্দেহে স্বল্পসঞ্চয়কারীদের নিকট আকর্ষণীয়।

ইউনিট ট্রাস্টের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা

ইউনিট ট্রাস্ট সম্পর্কে কোনও কোনও সমালোচকের কণ্ঠে বিরূপ সমালোচনাও উচ্চারিত হয়েছে। আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশগুলোর স্বল্পমূলধনলগ্নীর প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকেই এই পরিকল্পনার মূল আদর্শ গৃহীত হয়েছে। এই সকল দেশে দেখা গেছে, এই মধ্যবর্তী বিনিয়োগ সংস্থানগুলো নানা ধরনের ব্যয় দেখিয়ে এবং

প্রকৃত লভ্যাংশের হার গোপন রেখে স্বল্পসঞ্চয়ের লগ্নী-কারকদের বঞ্চিত করে, তাদের ফাটকাবাজির জন্য ক্ষতির বোঝা এঁদেরই বহন করতে হয়। অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ইউনিট ট্রাস্ট সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে সে সমস্ত বিপদের সম্ভাবনা এক্ষেত্রে বিশেষ নেই। কিন্তু ট্রাস্টের কর্তৃপক্ষ যে ভাবে শেয়ারবাজারের স্ফীত দরে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করেছেন, তার সমালোচনায় বলা হয়েছে, 'এর ফলে মুনাফা হ্রাস পাবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মূলধন লগ্নীর পর তাদের পরিচালকমণ্ডলীতে কোনও সরকারি প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা না থাকায় তাদের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনের কোনও উপায় ট্রাস্টের হাতে নেই। ইউনিট ট্রাস্টের লগ্নী সম্পর্কে অধিকতর সতর্কতা বাঞ্ছনীয়।

ইউনিট ট্রাস্টের বিরূপ সমালোচনা

সমস্ত দিক বিবেচনার পর একথা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গেই বলা যায় যে স্বল্প-সঞ্চয়কারীদের নিকট ইউনিট ট্রাস্ট পরিকল্পনার উপযোগিতা সর্বাধিক, তাঁদের সঞ্চয় লগ্নী করার এত সুবিধা ও লাভজনক এবং নিরাপদ ব্যবস্থা অন্য কোথাও নেই। ভারতের ব্যাঙ্কগুলো থেকে যেখানে সঞ্চয়ের ওপর আয়কর সহ শতকরা ৪ টাকা সুদ দেওয়া হয়, সেখানে ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রতি দশ টাকা লিখিত মূল্যের ইউনিটের ওপর শতকরা ৭ টাকা আয়কর মুক্ত লভ্যাংশ ঘোষিত হয়েছে। স্বল্পসঞ্চয়কারীরা সাধারণত স্বর্ণ বা জমিক্রয়ের মত অনুৎপাদক ক্ষেত্রে তাঁদের সঞ্চয়কে আবদ্ধ করে থাকতেন, জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক থেকে তাকে অপচয় ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ইউনিট ট্রাস্ট সেই সঞ্চয়গুলোকে দেশের শিল্পায়নে ব্যবহার করার সুবর্ণসুযোগ এনে দিয়েছে। অসংখ্য জলবিন্দুতেই সিন্ধুর সৃষ্টি, সেইরূপ দেশের ক্ষুদ্র সঞ্চয় সমূহ একত্রিত হয়েই দেশের শিল্পায়নের বিশাল ভিত্তিকে নির্মাণ করবে।

উপসংহার

ভারতের সর্বোদয় আন্দোলন

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- ভারতের ভূদান ও গ্রামদান আন্দোলন
- ভারতের শান্তিপূর্ণ কৃষিবিপ্লব
- ভারতের সর্বোদয় সমাজ গঠন
- গ্রামদান আন্দোলন [ক. বি. '৫৯]

প্রারম্ভ

বহু সাম্রাজ্যের উত্থানপতনে, উৎসবপ্রমত্ত আলোকোজ্জ্বল রজনীর দীপ-নির্বাপিত, ক্লান্ত, ম্লান অবসানের মত কালের দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে গর্বোদ্ধত এক একজন সম্রাটের ক্ষমতা, ঐশ্বর্য-বিলাসের সমারোহপূর্ণ জীবনের নিশ্চিহ্ন বিলয়ে, রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ঘটনার চমকপ্রদ পটপরিবর্তনে যদি ভারতবর্ষের সমাজজীবনের কোনও চিরন্তন সত্য ও রূপ আমাদের অনুভব করতে হয়, তবে তা হল ভারতীয় কৃষকের আবহমানকাল সচল, পরিশ্রম তৎপর দুটি ঘর্মাক্ত, শিরাস্ফীত বাহু, আর যুগযুগব্যাপী অত্যাচারে উৎপীড়নে, দৈবশক্তির ওপর অসহায় নির্ভরতায় ভাষাহীন, ব্যথায় নির্নিমেষদৃষ্টি দুটি চোখ।

সর্বোদয় আন্দোলনের পটভূমি

ভারতবর্ষের অর্থনীতি কৃষিকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও নির্মম শোষণ উৎপীড়নে, সীমাহীন দারিদ্র্যে ও দৈবশক্তির ওপর অন্ধবিশ্বাসজনিত নির্ভরতায় তার কৃষকসমাজ দুঃস্থ। ইংরেজ সাম্রাজ্যশক্তি অবাধে ভারতবর্ষের সকল মৃত্তিকাসম্পদ লুণ্ঠন করে কৃষকদের দুর্গতির নিশ্ছিদ্র অন্ধকারেই ফেলে রেখেছে, নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে মধ্য স্বত্বভোগী যে জমিদার-শ্রেণী সৃষ্টি করেছিল, তারাও এই মৃত্তিকা সন্তানদের দুঃখ-দুর্গতিকে তীব্র করে তুলেছে। স্বভাবতই স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের কৃষকদের সেই দুর্বিষহ শোষণের বোঝা বহন করতে হচ্ছে। তবে এখন আর তাদের কণ্ঠ পূর্বের মত নীরব নয়, বিদ্রোহের অশান্ত উত্তেজনায় মুখর, চোখের দৃষ্টি মৌন অভিযোগে ব্যথাহত নয়, প্রচণ্ড ক্রোধে-ক্ষোভে বহ্নিময়। তাদের অসন্তোষ যেভাবে দিনের পর দিন ধূমায়িত হয়ে উঠছে, তাতে তা যে কোনও দিন রক্তাক্ত, বিদ্বেষ-প্রতিহিংসাকলুষিত, অশুভ সংঘাতের অগ্ন্যুদ্গার ঘটাতে পারে। তার পরিণাম সমগ্র দেশের পক্ষেই হবে মারাত্মক এবং ভয়াবহরূপে বিপজ্জনক।

মানবকল্যাণব্রতী গান্ধীজী তাই শ্রেণী সংঘাতের রক্তাক্ত, পিচ্ছিল পথ পরিহার করে পারস্পরিক সদিচ্ছায় ও শুভবোধে, সমষ্টিগত স্বার্থবোধের উদ্বোধনে, রক্তপাতহীন, অহিংস, শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বপ্রকার শ্রেণীবৈষম্য ও শোষণমুক্ত, সার্বিক কল্যাণের শুচিসুন্দর আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। প্রীতি ও প্রেমের মন্ত্র সঞ্জীবিত এই সমাজে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে, বিবেক ও সামাজিক ন্যায়বোধের আত্মিক শক্তি ধ্রুবতারকার মত অনির্বাণ দীপ্তি নিয়ে এ সমাজকে পরিচালিত করবে।

গান্ধীজীর শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পথ

গান্ধীজীর অকালমৃত্যুতে এই সর্বোদয় সমাজ গঠনের আন্দোলন গুরুতরভাবে ব্যাহত হলেও তাঁর তপস্যার হোমাগ্নি থেকে প্রজ্জ্বলিত এই আন্দোলনের দীপশিখাটিকে আজও অনির্বাণ রেখেছেন তাঁর সাধনার উত্তরাধিকারী, অহিংসা-মৈত্রী ও সমাজসেবার মন্ত্রদীক্ষিত সর্বোদয়কর্মিবৃন্দ, আচার্য বিনোবাভাবে যাঁদের নেতা। ১৯৫১ সালে হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানায় ভূমিহীন কৃষকেরা রক্তপিচ্ছিল, হিংসার উন্মত্ত সংগ্রামের মাধ্যমে জমিদারদের কাছ থেকে জমি নেবার আন্দোলনে অগ্রসর হয়েছিল। আচার্য বিনোবা ভাবে এই বিপজ্জনক শ্রেণী-সংঘর্ষের পটভূমিকায়ই রক্তাক্ত বিপ্লবের বিকল্প হিসাবে শান্তিপূর্ণ, অহিংস কৃষি-বিপ্লবের মঙ্গলজ্যোতি সমুজ্জ্বল পথ প্রদর্শন করলেন। ভূমিহীনদের মধ্যে বিনামূল্যে ভূমিবিতরণ গান্ধীজীর সর্বোদয় সমাজ পরিকল্পনায় একটি বিশিষ্ট দিক। বিনা সংঘর্ষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণই যে সর্বোদয় আন্দোলনের প্রাণমন্ত্র, বিনোবাজীর উদাত্ত ঘোষণায় তা পরিস্ফুট : In a just and equitable order of society, land must belong to all. That is why we do not beg for gifts but demand a share to which the poor are rightly entitled. The main objective is to propagate the right thought by which social and economic maladjustments can be corrected without serious conflicts. তাঁর মতে, গান্ধীজীর ধ্যানের সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল ভূদান-যজ্ঞ এবং প্রাচীনকালের রাজসূয় যজ্ঞের মতই এটা হবে বর্তমানকালের প্রজাসূয় যজ্ঞ। ভূমির মালিকদের শুভেচ্ছাপ্রণোদিত দানের মাধ্যমে

আচার্য বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলন

ভূমিবণ্টন ও আর্থিক বৈষম্য হ্রাস

ভারতবর্ষের ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমিবিতরণ এবং পল্লী অঞ্চলে আর্থিক বৈষম্য হ্রাসই ভূদান আন্দোলনের লক্ষ্য।

ভারতে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ৫ কোটি। প্রত্যেক ভূমিহীন কৃষক যাতে ১ একর জমি লাভ করে তার জন্যেই এই ভূদান-আন্দোলন। আচার্য বিনোবা ভাবে প্রত্যেক জমিদারকে তাঁদের ভূমির এক ষষ্ঠাংশ এই সর্বরিক্ত কৃষকদের দান করতে আহ্বান জানিয়েছেন। ভূদানযজ্ঞ কমিটি এইভাবে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের জন্য ৫ কোটি একর জমি সংগ্রহে ব্রতী।

ভূদানযজ্ঞ কমিটি

সর্বোদয় আন্দোলন শুধু ভূদান-আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ নয়, তার পরিধি আরও নানাক্ষেত্রে প্রসারিত। শ্রমদান, গৃহদান, সম্পত্তিদান, যুক্তিদান, এমন কি জীবনদান —এ সমস্ত ত্যাগব্রতও ভূদান-আন্দোলন তথা সর্বোদয় আন্দোলনের অংশ। এই ত্যাগ ও মানবিকতাই-ত সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ। ভূদান-আন্দোলনযজ্ঞ বিস্তৃততর রূপ পরিগ্রহ করেছে গ্রামদান-আন্দোলনে। ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর জনপদ স্বার্থচেতনায় সমগ্র গ্রামকে গ্রামসমাজের হাতে সমর্পণ করাই গ্রামদান-আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। গ্রামবাসীদের নিজস্ব গ্রামীণ সংগঠনের নেতৃত্বে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামের কৃষি শিল্প ইত্যাদির উৎপাদন-কার্য নির্বাহ করা হবে এবং এই ভাবেই গ্রামীণজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত, কল্যাণশ্রীমণ্ডিত বিকাশ ঘটবে।

সর্বোদয় আন্দোলনের বিভিন্ন রূপ

সর্বোদয়-আন্দোলনের অগ্রগতির সমীক্ষায় দেখা যায়, ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ভূদান-যজ্ঞে চল্লিশলক্ষ একর জমি সংগৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে দশলক্ষ একর জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। আর এ পর্যন্ত ৫,৩৪২টি গ্রাম গ্রাম-আন্দোলনের অংশিদার হয়েছে বলে জানা যায়। গ্রামদানের অংশিদার গ্রামগুলোকে সমাজ উন্নয়নের কর্মধারার অগ্রাধিকারদান, ভূদান-আন্দোলনের সাফল্যের বাধা দূরীকরণের জন্য আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধাদান, গ্রাম-আন্দোলনের আহ্বানে উৎসর্গীকৃত গ্রামগুলোকে সমবায় সমিতি আইনের পরিধি-ভুক্ত করার জন্য বিধিরচনা—সর্বোদয়-আন্দোলনকে পুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে এ সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও আর্থিক সাহায্যদান করা হয়েছে। ভারতসরকার দেশে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রস্থাপনের লক্ষ্যের সহায়কশক্তি হিসেবে ভূদান-আন্দোলনকে সর্বপ্রকার আনুকূল্য দান করে আসছেন।

সর্বোদয় আন্দোলনের অগ্রগতি

কিন্তু সর্বোদয় আন্দোলন এবং তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভূদান-যজ্ঞের অগ্রগতি বিশেষ আশাপ্রদ নয়। ভূদানযজ্ঞে সংগৃহীত জমির পরিমাণ মূল লক্ষ্যের তুলনায় অনেক কম।

সরকারী আনুকূল্য

সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় হল, ভূদানের মধ্য দিয়ে জমিদারদের সুবিধাবাদী চতুর মনোভাব যতটা প্রতিফলিত হয়েছে, অন্তরের শুভবুদ্ধি ততটা হয় নি। কোথাও নিতান্ত অনুর্বর, বন্ধ্যা জমি দান করা হয়েছে, কোথাও দেখা গেছে, দান-করা জমি আইননির্দিষ্ট সর্বোচ্চ পরিমাণ জোতের উদ্বৃত্ত অংশ, অর্থাৎ ভূমিসংস্কার আইন অনুসারে যতটুকু জমি রাষ্ট্রকে ছেড়ে দেওয়া দরকার জমিদারেরা ততটুকুই ভূদান-আন্দোলনে দান করেছে। এ প্রকৃত দান নয়, দানের অভিনয় মাত্র।

ভূমি-সংস্কার আইন ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমি-বণ্টনে সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি, ভূদান আন্দোলন সেক্ষেত্রে একটি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে, এ আশা সফল হয়নি, তা দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হয়। গ্রামীণ অর্থনীতির শক্তি যে জমিদার-জোতদার শ্রেণীর করতলগত, তারা ক্ষুদ্র স্বার্থবোধের গণ্ডি পরিত্যাগ করে সর্বোদয় আন্দোলনের মানবিকতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভূমিহীন কৃষকদের কল্যাণসাধনে অগ্রসর হয়নি। কিন্তু ভূদান-আন্দোলনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমাদের বার বার কবির সেই বাণীকে স্মরণ করতে হবে, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। সর্বোদয় আন্দোলনের মাধ্যমে শুধু মানুষের শুভবোধের প্রতি আবেদনের ওপর নির্ভর করে ভারতের ভূমিসমস্যার সমাধান করা যাবে, এ আশা বোধ হয় মরীচিকাস্বপ্ন। কিন্তু ভূদান-আন্দোলন পরিণামে সরকারের ভূমিসংস্কার প্রচেষ্টাকেই যে শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। চারদিকের সীমাহীন গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটি মাত্র প্রদীপের শিখাই যেমন জীবনের আশ্বাস হয়ে জ্বলতে থাকে, তেমনি মানুষের সকল স্বার্থবোধ, ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষাবিদ্বেষ, মিথ্যাচার ও প্রবঞ্চনা ও ছলনার মধ্যে সর্বোদয় আন্দোলনের মনুষ্যত্ব আবাহনের মন্ত্র ভবিষ্যতের শুচিসুন্দর মঙ্গল মাধুর্যসিক্ত জীবনের মহৎ প্রতি-শ্রুতিরূপে আমাদের হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করে রাখবে।

উপসংহার

ভারতে সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা

এই প্রবন্ধের অনুসরণে
- জাতীয় উন্নয়নে সমবায়ের স্থান [ক. বি. '৫৩]
- ভারতীয় পল্লীসমাজ ও সমবায়
- ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতিতে সমবায়ের ভূমিকা

প্রারম্ভ

'সমবায়' শব্দটির মধ্যে নিহিত আছে সহযোগিতা এবং সংঘবদ্ধতার ইঙ্গিত। বিবর্তনশীল সভ্যতার মূল-ভিত্তিই হল পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংঘবদ্ধতা, কারণ যেখানে মানুষ একক সেখানে মানুষের শক্তি সীমিত, কিন্তু যেখানে মানুষ একতাবদ্ধ সেখানে মানুষের ক্ষমতা সীমাহীন। এই সংহত শক্তি-বলে মানুষ বহু প্রতিবন্ধকতার অসংখ্য বাধা অতিক্রম করেছে। সভ্যতার রথকে তারা সমবেত শক্তির বলেই বিংশ শতাব্দীর পুর্ণতার কালে এগিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। মানব সভ্যতার এই সত্যকে পাথেয় করেই বিশ্বে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত ও শুভযাত্রা।

সমবায়ের মূলনীতি

সৎ উপায়ে বহু মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূ করে তোলার নাম সমবায়। স্বনির্ভরতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, সমস্বার্থে সংঘবদ্ধতা, স্বেচ্ছাধীনতা ও আত্মপ্রত্যয়ের মন্ত্রই—সমবায়ের মূল মন্ত্র। প্রাজ্ঞ পুরুষ কালভার্ড অর্থনৈতিক স্বার্থসাধনের প্রয়াসে কিছু সংখ্যক বা বহু সংখ্যক ব্যক্তির স্বেচ্ছা মিলনকেই সমবায় আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং সমবায় আন্দোলনের সংগঠন ও সম্প্রসারণ, জনসাধারণের অমিত উদ্যোগ, অপরিসীম উৎসাহ ও সুচারু কর্মোদ্যমের ওপর নির্ভরশীল।

ভারতে সমবায়ের সূত্রপাত—শোষণ মুক্তির ইতিহাসের সূচনা

ভারতের দারিদ্র ও শোষণের ইতিহাসের সূত্রপাত বিস্মৃত অতীতে। যুগ যুগ ধরে গ্রামীণ ভারতের কোটি কোটি অসহায় মানুষ কায়েমী স্বার্থের যুপকাষ্ঠে হয়েছে বলিপ্রদত্ত। নির্মম শোষণের চাকায় পিষ্ট হয়ে লক্ষ কোটি সবল গ্রামবাসী হয়েছে রিক্ত, নিঃস্ব। স্বার্থান্ধ মানুষের দল এই সব অশিক্ষিত উপেক্ষিত মানুষগুলোর দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে নিজেদের সঞ্চয়কে করে তুলেছে স্ফীত। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে ও বিংশ শতাব্দীর সূচনা-মুহূর্তে ভারতে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত হল, তখনই শোনা গেল গ্রাম্য-ভারতের শোষণ-মুক্তির উদাত্ত শঙ্খনিনাদ।

সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসে যে ব্যক্তির নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে তিনি জার্মান সমাজ সংস্কারক মনীষী রাইফিজেন। ইনি তাঁর দেশের সুতীব্র দারিদ্র নিপীড়িত, শোষিত কৃষকদের মুক্তির জন্যই এই প্রথার প্রবর্তন করেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যলগ্নে। ভারতের সমবায় আন্দোলনের মূল প্রেরণা সুদূর জার্মান দেশ থেকেই এসেছে, একথা অত্যুক্তি নয়।

ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রেরণা

মহাজন নিপীড়িত ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায়ের চিরাগত দারিদ্রের ও জীবনব্যাপী ঋণগ্রস্ততার ইতিকথা চিরন্তন, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্বে ভারতীয় কৃষিজীবীদের এই দুঃখ দুর্দ্দশা চরমতম রূপ ধারণ করেছিল। নির্মম, নিষ্ঠুর মহাজনদের হৃদয়হীনতার চাপে কৃষককুল ক্রমেই নিশ্চিত ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছিল। সেই সময় বিদেশী সরকার এই ঋণগ্রস্ততার নাগপাশে জর্জ্জরিত এই কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্যই অগ্রণী হয়েছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশ সমূহ প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ সরকার ফ্রেডারিক নিকলসন নামক একজন ইংরেজকে রাইফিজেন সমিতির কার্যপদ্ধতির তথ্য-সংগ্রহের জন্য জার্মানীতে প্রেরণ করেন। এই ইংরেজ সিভিলিয়ান ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে রাইফিজেন সমিতির অনুসরণে এদেশের দরিদ্র ও ঋণভারে আবদ্ধ কৃষককুলকে স্বল্পহার সুদে ঋণদানের জন্য জমিবন্ধকী ও কৃষিঋণ দান ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশ করেন। এই সুচিন্তিত সুপারিশের ভিত্তিতেই ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সমবায় ঋণদান সমিতি আইন বিধিবদ্ধ হয়।

সমবায় ও বৃটিশ সরকারের ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিধিবদ্ধ এই আইনটির মৌল উদ্দেশ্য গ্রামীণ ভারতের কৃষক, কারিগর ও স্বল্প উপার্জনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে স্বনির্ভরতা ও সমবায় শক্তির সুফল উপলব্ধির প্রসারণ। বলা বাহুল্য, এই উপলব্ধি ক্রমেই সঞ্চারিত হল দরিদ্র, নিপীড়িত ভারতবাসীর মনে। একপ্রান্তে থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল এই শোষণ মুক্তির বাণী। ক্রমে ক্রমে সমবায় পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার ঘটল জীবনের নানা ক্ষেত্রে। তবে ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রকৃত অগ্রগতির সূত্রপাত ঘটে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। সমবায় আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তদানীন্তন ভারত সরকার ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এডওয়ার্ড ম্যাকলাগানের নেতৃত্বে ম্যাকলাগান কমিটি' নামে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। যদিও এই কমিটি ১৯১৫

সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি

খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলো মূল্যবান সুপারিশ সম্বলিত একটি রিপোর্ট পেশ করে, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের বিপর্যস্ততার মধ্যে এই সুপারিশ কার্যকরী হয়নি। এরপর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে শাসন সংস্কার আইন বলে সমবায় সমিতিগুলির দায়িত্ব অর্পিত হয় প্রাদেশিক সরকারের ওপর। ফল হয় অভূতপূর্ব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বোম্বাই সরকার ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে, মাদ্রাজ সরকার ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে, বিহার ও উড়িষ্যা সরকার ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং বাংলা সরকার ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে সমবায় আইন সংশোধন করেন।

সমবায় আন্দোলন প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্বাধীনে অভূতপূর্ব গতি লাভ করে সেই গতি এসে বাধা পায় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বব্যাপী মন্দায়। এই মন্দার ফলে যখন ভারতীয় কৃষির অবস্থা ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসা সঙ্কটজনক হয়ে উঠল, তখন চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন সরকার ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে কৃষি ঋণ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে। এরপর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত হয় সমবায় পরিকল্পনা কমিটি। এই কমিটি প্রাথমিক সমিতিগুলির নানামুখী সমিতিতে রূপান্তর ও আগামী দশ বছরে সমিতিগুলির অধীনে গ্রাম সমূহের পঞ্চাশ শতাংশ ও গ্রামের জনসংখ্যার শতকরা ত্রিশ ভাগের অন্তর্ভুক্তি সুপারিশ করে। এছাড়া সমিতিগুলিকে আরও বেশী ঋণদানের সুপারিশও করা হয়। অর্থাৎ অর্ধোন্নত দীর্ঘকাল শোষিত ভারতীয় অর্থনীতিতে স্বীকৃত হল সমবায় পদ্ধতির যোগ্যভূমিকা, কিন্তু এই সব সুপারিশ বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই এল দেশবিভাগের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

সমবায় পরিচালনা কমিটি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতীয় সমবায় আন্দোলনকে এক ধাপ এগিয়ে দিলেও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে সমবায় আন্দোলনের ধারা জাতীয় সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় নতুন জীবনী শক্তিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ভারতের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাম্য ঋণ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পরামর্শদানের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ। এই কমিটি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যে রিপোর্ট পেশ করে তাতে তাঁরা এক, সমবায় আন্দোলনের সর্বস্তরে অধিকতর সরকারী অংশ গ্রহণ; দুই, সমবায় সমিতির ঋণদান ব্যবস্থার সঙ্গে অন্য আর্থিক কার্যাবলীর, বিশেষ করে বাজারজাতকরণের ও পণ্যের শ্রেণী বিন্যাসের ব্যবস্থা; তিন, প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতিগুলির উন্নয়ন; এবং চার, সমবায়

উপদেষ্টা কমিটি গঠন : ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ

কর্মিগুলীর শিক্ষাদান ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই রিপোর্টে আরও বলা হয় যে, কৃষক সমাজের ঋণের তিন শতাংশ মাত্র বহন করে সমবায় সমিতিগুলি। তাই এই কমিটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওপর দেশব্যাপী ঋণ সংগঠনের এবং সুসংহত পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব দেওয়ার সুপারিশ করেন। এই সব সুপারিশক্রমেই ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া আইন সংশোধিত হয় এবং জাতীয় দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি ঋণ তহবিল আর জাতীয় কৃষি ঋণ স্থিতিকরণ তহবিল গঠিত হয়।

দীর্ঘ দিন ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের কর্মাবলী শুধুমাত্র ঋণদান ব্যবস্থার মধ্যেই ছিল সীমিত। কিন্তু গ্রাম-ভারতের অন্তহীন সমস্যার সমাধান করতে শুধু-মাত্র সমবায় ঋণদান ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়; এর জন্য জীবনের সমস্যাকণ্টকিত সমস্ত ক্ষেত্রেই সমবায় আন্দোলনের ধারা সম্প্রসারিত হওয়া একান্ত জরুরী। কারণ সমবায় আন্দোলনই এই সব সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান ঘটাতে পারে। তাই গ্রাম্য ঋণদান, বাজারজাতকরণ, শস্যের শ্রেণী বিন্যাস, শস্যের ভাণ্ডার স্থাপন, গুদামজাতকরণ প্রভৃতি সমবায় সম্মত কার্যাবলীর প্রসারণ প্রয়োজন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রামীণ সমাজের ভিত্তিতে সংগঠিত হয় সমবায় সমিতি এবং গ্রাম পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব ও কার্যভার অর্পিত হয় গ্রাম সমবায় ও পঞ্চায়েতীরাজের ওপর।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত

পরিকল্পিত অর্থনীতিতে সমবায় যে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে সমর্থ, সরকার প্রকাশিত চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া (Fourth Five Year Plan—A Draft Outline) গ্রন্থে প্রদত্ত সংখ্যা তত্ত্বই তার সাক্ষ্য বহন করছে। এই গ্রন্থে দেখান হয়েছে যে যেখানে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের শতকরা ৭৫ ভাগ গ্রাম সমবায় সমিতিগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল সেখানে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে শতকরা ৮৩ ভাগ গ্রাম এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সদস্য সংখ্যাও এই সময়ে ১৭০ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪০ লক্ষে। অর্থাৎ ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ভারতের মোট গ্রামীণ লোক সংখ্যার ৩৩ ভাগ সমবায় সমিতিগুলোর সদস্য হয়েছে। আশা করা যায়, চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলির সদস্য সংখ্যা দাঁড়াবে ৪৫০ লক্ষে। অর্থাৎ ভারতের মোট কৃষি পরিবারেরও শতকরা ৭৫ ভাগ পরিবার এই সব সমবায় সমিতিগুলোর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ভারতের সমস্ত গ্রামই সমবায় প্রথার অন্তর্ভুক্ত হবে।

সরকারী সংখ্যাতত্ত্বে সমবায়ের অগ্রগতির চিত্র

পরিকল্পিত অর্থনীতিতে সমবায় আন্দোলনের পূর্ণতর বিকাশের জন্য ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য সমবায় মন্ত্রী সম্মেলন যে সিদ্ধান্ত করেন, তার বাস্তব রূপায়নের জন্য শ্রী ভি. এল. মেহেতার নেতৃত্বে সমবায় ঋণদান সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে যে রির্পোট পেশ করে, ঐ বছরই শ্রীনগর অধিবেশনে রাজ্য সমবায় মন্ত্রীগণের দ্বারা তা আলোচিত হওয়ার পর তারই ভিত্তিতে বর্তমানে রাজ্য সমবায় নীতি গঠিত হচ্ছে। এতে সমবায়ের মূল মন্ত্রকেই সার্থক করার সংকল্প ঘোষিত হয়েছে। এবং এখানে সমবায় সমিতিগুলোর দীর্ঘ স্থায়িত্ব, স্বেচ্ছামূলকতা, সুনিবিড় সংস্পর্শ, সামাজিক ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সমবায় নীতি

এর কিছুদিন আগে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে সমবায় কৃষি, সমবায়ী খামার ও সেবা সমবায় সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সমবায়-কৃষি ভারতে কৃষি-বিপ্লবের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। খাদ্যাভাব জর্জরিত ভারতের কোটি কোটি নিরন্ন মানুষের মুখে অন্ন যোগাবার দায়িত্ব নিয়েছে এই সমবায় কৃষি। আবার অন্যদিকে, আশার কথা হল এই যে, সাম্প্রতিক খাদ্য সঙ্কট ও পণ্য মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ প্রয়াসে জনসাধারণ সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছে। ক্রেতা সমবায় আন্দোলন এখন ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে। সমবায় সমিতিগুলির যথাযথ পরিচালনা সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্য শ্রীরামনিবাস মৃধার নেতৃত্বে ভারতসরকার ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি সুপারিশ করেন যে: এক, দুর্বল সমিতিগুলোকে একত্রিত করতে হবে; দুই, মৃতপ্রায় সমিতিগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে; তিন, সমবায় সমিতিগুলোকে লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে স্বল্প-কালীন ঋণ দানে সরকারী সাহায্য করতে হবে; চার, ঋণ উৎপাদনমুখী করে তোলার জন্য শস্য ঋণ পদ্ধতি চালু করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে এইসব সুপারিশ মেনে নেন।

সমবায় কৃষি ও সেবা সমবায়

মৃধা কমিটির সুপারিশ (১৯৬৫)

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যে আন্দোলনের শুভ যাত্রা শুরু, এই শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে এসেও সেই যাত্রা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেনি। এই অসফলতার মূলে আছে জনসাধারণের অশিক্ষা, প্রচার কার্যের ত্রুটি, পরিচালনা ব্যবস্থার দৈন্য, মূলধনের

অগ্রগতির পথে অন্তরায়

অভাব, অর্থাৎ সাংগঠনিক ও পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটির ফলেই এই আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। দক্ষতার অভাব এবং অভিজ্ঞতার দৈন্যও এ ব্যাপারে কম দায়ী নয়। শুধু তাই নয়, এর জন্য সরকারী অর্থ সাহায্যের আতিশয্য ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বও অনেকাংশে দায়ী। স্যার ম্যালকম ডার্লিং ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত রিপোর্টে এই দিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। কারণ সমবায়ের প্রকৃত সার্থকতা নির্ভর করে জনসাধারণের উৎসাহিত অংশ গ্রহণের ওপর, কিন্তু তার পরিবর্তে আন্দোলন যদি শুধু মাত্র State run, State controlled, State financed হয়, তবে তা যে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হবে না, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তবে সমবায়কে আঞ্চলিকতা থেকে মুক্তি দিয়ে, তাকে ভারতব্যাপী প্রসারিত করার চেষ্টা সম্প্রতি গতি লাভ করেছে এর জন্য সমবায় শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের কথা উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার

সমবায় ভারতীয় জীবানর পক্ষে অপরিহার্য। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজকীয় কমিশন মন্তব্য করেছিলেন: If co-operation fails then will fail the best hope of rural India, অর্থাৎ ভারতে সমবায় ব্যর্থ হওয়ার অর্থ হল গ্রামীণ ভারতের সর্বোচ্চ আশার ব্যর্থতা। সুতরাং দারিদ্র ও শোষণ মুক্তির স্বর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে যে সমবায় আন্দোলনের যাত্রারম্ভ তাকে সার্থক করতেই হবে। চতুর্থ পরিকল্পনায় তাই বিভিন্ন ধরণের সমবায় খাতে মোট ২০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সুতরাং রাজনৈতিক দলাদলি, গ্রাম্য সঙ্কীর্ণতা, ব্যক্তিগত কলুষতা ও অবিশ্বাসের উর্দ্ধে রেখেই সমবায় আন্দোলনের মূল মন্ত্রকে সকল ভারতবাসীর জীবনে সফল করার বলিষ্ঠ সঙ্কল্প আজ গ্রহণ করতে হবে। অন্য পথ নেই।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

ভারতের মূল্যবৃদ্ধি সমস্যা ও ক্রেতা সমবায়

মধ্যবিত্তের সমস্যা ও সমবায়

- বর্তমান সময়ে মধ্যবিত্ত সংসারে কৃচ্ছতা [ক. বি. '৬২]
- প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও তাহার প্রতিকার [ক. বি. '৬১]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিঘাতে আমাদের সমাজের মানুষের নীতিবোধ আহত হয়েছিল, কিন্তু এরপর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, দেশ বিভাগ জনিত বিপর্যয়, শ্রেণীপক্ষপাত পূর্ণ সরকারী নীতি, এবং সম্প্রতি সীমান্ত যুদ্ধ আমাদের সমাজের সেই আহত নৈতিক মানকে ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। ফলে সমাজ জীবন আজ দুর্নীতির বিষবাষ্পে কলুষিত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মাত্রাতিরিক্ত মুনাফার লোভে একদিকে যেমন আকাশচুম্বী মূল্য-বৃদ্ধি করছে; অন্যদিকে তেমনি ভেজালের রাজত্ব গড়ে তুলছে। ফলে ক্রেতা সমাজের স্বার্থ আজ পদদলিত। নীতিহীন ব্যবসায়ীমহল অন্যায় পথে অর্জিত অর্থে পুষ্ট হয়ে সরকারী আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার স্পর্দ্ধা দেখাচ্ছেন। ভারতীয় ক্রেতাসাধারণ আজ তাই বিপন্ন বোধ করছেন।

প্রারম্ভ

দীর্ঘকাল ধরে সরকারের মুখাপেক্ষী থেকে জনসাধারণ মনে করেছিলেন সরকার উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করে দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এই আস্ফালন ও আইন-ফাঁকি দেওয়ার অপরাধের শাস্তিবিধান করে জনস্বার্থ রক্ষা করতে সমর্থ হবে, কিন্তু বাস্তবে ক্রেতা-সাধারণ শক্তিহীন অসহায় সরকারের ব্যর্থতাই প্রকট হয়ে উঠতে দেখেছে। সমগ্র দেশে খাদ্য মজুত থাকা সত্ত্বেও পণ্যমূল্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। বর্তমানে আমাদের দেশে পণ্য মূল্য নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের অর্থনৈতিক সূত্র বাতিল বলে গণ্য হতে চলেছে। ব্যবসায়ীগণ এই সূত্রকে অচল করে দিয়েছে।

সরকারের ব্যর্থতা: মূল্য নির্দ্ধারণে চাহিদা ও যোগানের সূত্র বাতিল

শুধু তাই নয়, অসাধু ও অসৎ ব্যবসায়ীগণ অন্যায় মুনাফার লোভে নিজেদের মধ্যে জোটবদ্ধ হওয়ার এক অলিখিত চুক্তি সম্পাদন করেছেন। এবং সরকারের সঙ্গে যেন শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। অবস্থার যখন ক্রমেই অবনতি ঘটছে, সরকার

ব্যবসায়ীরা জোটবদ্ধ, ক্রেতাসাধারণের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ

যখন নিতান্তই অসহায় বলে মনে হচ্ছে, তখন একমাত্র জনসাধারণ সংঘবদ্ধ ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারেন। ক্রেতাসমবায় হল জনস্বার্থ রক্ষার দুর্ভেদ্য দুর্গ।

বিগত ১৯৬২ সালে প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীনের অতর্কিত আক্রমণের ফলে রাষ্ট্রের সেই বিপর্যস্ত অবস্থার সুযোগে ও ১৯৬৩ সালে খাদ্য সংক্রান্ত সরকারী বিবৃতির সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীগণ দেশে খাদ্যদ্রব্য মজুত থাকা সত্ত্বেও কয়েকদিনের মধ্যে চালের মূল্য ৩০৲-৩১৲ টাকা থেকে ৪৫৲-৫০৲ টাকায় বৃদ্ধি করে দেশে এক কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি করে তোলে। অতিমুনাফা লোভী ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে যখন এমন চরম অবস্থা দেখা দেয়, তখন দমদমের জনসাধারণ জোটবদ্ধ হয়ে কিছু বিক্রেতাকে ন্যায্য মূল্যে চাল ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রী করতে বাধ্য করে। দৈনিক পত্রিকাগুলি এই ব্যবস্থাকে 'দমদম দাওয়াই' নামে অভিহিত করে। একথা সত্য, সাময়িক ভাবে এই ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয়েছিল কিন্তু এতে সমস্যার মূলোৎপাটন সম্ভব নয়। কারণ খুচরা ব্যবসায়ীরা অপরাধী হলেও সমগ্র দায়িত্ব তাদের কাঁধে চাপানো যায় না। সমস্যা আরও গভীরে। তা খুঁজে বের করতে হবে।

অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা : কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ

তাহলে প্রশ্ন হল—স্থায়ী সমাধানের পথ কি? অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, বর্তমান নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যবৃদ্ধি যদি এখনই প্রতিরোধ করা না যায় তবে আবার এক সংকট জনক পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। তখন দমদম দাওয়াই প্রয়োগ করে এই সমস্যার হাত থেকে স্থায়ী মুক্তি পাওয়া যাবে না। কারণ মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে খুচরা ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব খুবই সামান্য, সেক্ষেত্রে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করলে, তারা লোকসানের ভয়ে পণ্য বিক্রি হয়ত বন্ধ করবে, তাতে সমাধানে পৌঁছানো যাবে না। প্রকৃত সমাধানের পথ তবে কি?

সমাধানের প্রকৃত পথ কি?

সমাধানের পথ খুঁজতে বেশীদূর যেতে হবে না। যে বিক্ষুব্ধ ক্রেতা সাধারণ ব্যবসায়ীদের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য সাময়িক ভাবে সংঘবদ্ধ হতে পারেন সমস্যা সমাধানের চাবিটি তাঁদেরই হাতে। অর্থাৎ ক্রেতাসাধরণ ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে এবং খুচরা ব্যবসায়ীদের ওপর হামলা না করে নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের সরবরাহের দায়িত্ব তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে গ্রহণ করেন, তবে এই তীব্র সমস্যার সাময়িক নয়—স্থায়ী সমাধান সম্ভব। এই ব্যবস্থারই নাম—ক্রেতা সমবায়।

সমস্যার সমাধান ক্রেতাদের হাতে : ক্রেতা সমবায় গঠনে

আমাদের দেশে ক্রেতা সমবায় আন্দোলন অল্পদিনের হলেও—এর জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডে। ভারতবর্ষে এই ক্রেতা সমবায় ভাণ্ডারের সূত্রপাত হয় বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। ঐ সময় এবং ঐ সময়ের বহু-পরেও অনেক পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু থাকায় পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রেশনিং প্রথার অন্তর্ভুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দেয়। তখন অত্যাবশ্যক পণ্যের বণ্টন কিছুটা সুষম করার জন্যেই বহুসংখ্যক ক্রেতা সমবায় সমিতির সৃষ্টি হয়। পরবর্তী কালে নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হতে থাকলে এই ক্রেতা সমিতিগুলির কাজকর্মে ভাঁটা পড়ে। খোলা বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হওয়ার ফলে এই সমিতিগুলির খুব অল্প সংখ্যকই টিঁকে থাকতে পারল। কারণ এই সব সমিতির ব্যবসায়িক ভিত্তিই শুধু দুর্বল ছিল তাই নয়, পরিচালনপদ্ধতিতে ছিল প্রচুর গলদ। ফলে বহু সংখ্যক সমিতিরই মৃত্যু ঘটে।

ভারতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ক্রেতাসমবায়ের সূত্রপাত

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ শুরু হলে, মূলধন-আত্যন্তিক ভিত্তিমূলক পরিকল্পনার জন্য দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ ক্রমেই অনুভূত হতে থাকে। এর ওপর ব্যবসায়ীদের অসাধুতা ও কারসাজী পণ্য-মূল্য বৃদ্ধির সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। সরকার আইন ও বিধি ব্যবস্থা করেও এই অন্যায় মূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে সক্ষম হলেন না। শেষ পর্যন্ত দেশের সর্বত্র পণ্য বণ্টনের জন্য ক্রেতা সমবায় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। এ বিষয়ে সম্যক অনুসন্ধান করে সুপারিশ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নাটিসান কমিটির (Natisan Committee) ওপর ভার দিলেন। ১৯৬২ সালে এই কমিটির রিপোর্টে ক্রেতা সমবায়গুলোকে বেশী করে সাহায্য করার সুপারিশ করেন। বহু বিবেচনার পর কেন্দ্রীয় সরকার এই সুপারিশ অনুযায়ী ক্রেতা সমবায়গুলিকে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন। ১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রায় ৭০০ ক্রেতা সমবায় ছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলি ঠিক মত কাজ করেনি। ক্রেতা সমবায় সম্প্রসারণের প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত হওয়ার পর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই সমবায়ের সংখ্যা ২২৫০টি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংগঠনের সাফল্যের জন্য ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে ক্রেতা সমবায় ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার (Centrally sponsored scheme for the organization of Consumer Co-operative Store) পরিকল্পনা কার্যকরী হয়।

নাটিসান কমিটির রিপোর্ট

এই কেন্দ্রীয় উদ্যোগ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান বিশিষ্টতা হল এই যে, শুধু খুচরা পণ্য বণ্টনের জন্য ক্রেতা সমবায় ভাণ্ডার গঠন করলেই চলবে না, এই সব ভাণ্ডারে নিয়মিত পণ্য সরবরাহ করার জন্য অন্ততঃ ৫০টি পাইকারী ভাণ্ডার স্থাপন করতে হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের 'আর্থিক আনুকূল্যে রাজ্যসরকারের ব্যপস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত, এই সব পাইকারী ভাণ্ডারের প্রত্যেকটির উদ্যোগে কয়েকটি করে খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রও খোলা হবে। এই কেন্দ্রগুলোতে পরে প্রাথমিক ভাণ্ডারে পরিণত করা হবে।

কেন্দ্রীয় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য ; পাইকারী ভাণ্ডার স্থাপন

দেশের সর্বত্রই ক্রেতা সমবায় ভাণ্ডারের প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে শহর ও শহরতলীর অঞ্চলের চাহিদার ব্যাপকতায় ও তীব্রতায় এবং পরিচালনা করার আপেক্ষিক সুবিধে থাকায় এর কার্যকারিতার সুযোগ বেশী। সমস্ত জায়গায় ক্রেতা-সমবায় ভাণ্ডারের সংগঠন রীতি এক নয়। সরকারও সর্বত্রই এক ধরণের সাহায্য করেন না। সাধারণতঃ ক্রেতা-সমবায় চার শ্রেণীর ক্রেতা-সমবায় প্রকল্পে বিভক্ত হয়ে থাকে। (১) শহর ও শহরতলীর জনসাধারণের জন্য ভাণ্ডার ; (২) শিল্প শ্রমিকদের জন্য ভাণ্ডার ; (৩) সরকারী কর্মচারীদের জন্য ভাণ্ডার এবং (৪) পল্লী অঞ্চলের জন্য ভাণ্ডার।

শহরাঞ্চলে ক্রেতা সমবায় ভাণ্ডারের বেশী সুযোগ সুবিধা ; চার শ্রেণীর সমবায়

সমগ্র দেশে বিশেষ ভাবে শহর এলাকায় ৪০০০ প্রাথমিক সমবায় ভাণ্ডারসহ ২৫০টি সমবায় পাইকারী ভাণ্ডার স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। এদের মধ্যে পশ্চিম-বাংলায় ২৭টি পাইকারী ও ৫০০টি খুচরা ক্রেতা-ভাণ্ডার স্থাপনের কথা। এর মধ্যে পশ্চিমবাংলায় ২৭টি পাইকারী ভাণ্ডার ও প্রায় ১৫০০০ খুচরা ক্রেতা সমবায় ভাণ্ডার খোগ হয়েছে। শহর এলাকায় সাধারণতঃ দুহাজারটি বাসগৃহ এবং ১০,০০০ অধিবাসী সমন্বিত এলাকা নিয়ে এক একটি প্রাথমিক ক্রেতা-সমবায় ভাণ্ডার কাজ করবে। কয়েকটি ক্রেতা-সমবায় ভাণ্ডার নিয়ে এক একটি পাইকারী সমবায় ভাণ্ডার গড়ে উঠবে। পাইকারী ভাণ্ডার থেকে প্রাথমিক ক্রেতা-সমবায় সমিতি-গুলিকে প্রয়োজন মত জিনিষপত্র ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করা হবে। প্রাথমিক ও পাইকারী ভাণ্ডারগুলির সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকার মূলধন ও অন্যান্য প্রকার আর্থিক সাহায্য করবেন। এ ছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বণ্টনে সুব্যবস্থার জন্য সারা ভারতে ৪৩টি বিভাগীয় ভাণ্ডার (Department Stores) সংগঠিত হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন ; মূল বণ্টন ব্যবস্থা

গ্রামাঞ্চলে ক্রেতা সমবায় ভাণ্ডার হিসাবে কোন পৃথক সংস্থা সংগঠনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি, তবে অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহের পণ্য স্থানীয় সেবা সমবায় এবং বিপণন সমিতিগুলি কাজ করতে পারে। বর্তমানে প্রায় পনের হাজার সমিতি এই ভাবে কাজ চালাচ্ছে। তবে এই সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। পরে এই সংখ্যাকে অন্তত: তিন গুণ করে পল্লী এলাকার প্রয়োজন মেটানোর কথা আছে।

গ্রামাঞ্চলের ক্রেতা সমবায় ব্যবস্থা

বর্তমানে জরুরী অবস্থার জন্য ক্রেতা সমবায় ভাণ্ডারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, তাই নয়, স্বাভাবিক অবস্থাতেও ক্রেতাসমবায় ভাণ্ডারের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। কারণ ক্রেতা সমবায় গঠিত হলে ব্যবসায়ী ও দালালদের হাতে বিভিন্ন স্তরে দ্রব্যের যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে তা থেকে অনেকাংশে মুক্তি পাওয়া যাবে। তবে ক্রেতা সমবায়ের সাফল্য নির্ভর করে ন্যায্য মূল্যে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেবার ওপর।

বর্তমান কালে ক্রেতা সমবায়ের উপযোগিতা

অন্যান্য অনেক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মত ক্রেতা সমবায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক। প্রত্যেকটি সদস্যের একটি মাত্র ভোট দেবার অধিকার থাকবে, তা তাঁর একাধিক শেয়ার থাকলেও। ব্যবসায়ের ফলে উদ্বৃত্ত মুনাফা সদস্যগণ যে যেমন পরিমাণ জিনিষ কিনবেন, সেই অনুপাতে রিবেট হিসেবে ফিরে পাবেন। সদস্যগণ সাধারণভাবে প্রতিবছর (কিংবা এই সমিতির সংবিধান অনুযায়ী যদি অন্য কোন রীতি থাকে তবে সেই অনুসারে) সমিতির পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। এবং এই পরিচালক কমিটির হাতেই সমিতির পরিচালন ব্যবস্থা থাকবে ন্যস্ত।

পরিচালন-পদ্ধতি

বর্তমানে অবস্থা যখন চরমে পৌঁছেছে, যখন ক্রমাগত পণ্যমূল্য বৃদ্ধি জনজীবনকে অক্টোপাসের মত চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, তখনও জনসাধারণ ক্রেতা সমবায় গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। এর কারণ শুধু শ্লথতাই নয়— পরস্পর অবিশ্বাস ও সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, আর একদল মানুষ আছেন যাঁদের হাতে আছে প্রচুর পরিমাণ কালো টাকা, তাঁরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে বিচলিত নন। তাছাড়া কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন প্রতি-ক্রিয়াশীল সম্প্রদায়ের অভিসন্ধিও এই আন্দোলনের গতিকে রুদ্ধ করেছে, কিন্তু দিন আসছে যখন জনগণের সংঘবদ্ধ দুর্বার শক্তি এই সব বাধা ভেঙে নিজেদের বাঁচার পথটি আবিষ্কার করে নিতে দ্বিধা করবে না। সার্থক ক্রেতা সমবায় গড়ে উঠবে।

উপসংহার

ভারতের পথ পরিবহন ও পর্যটন

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- ভারতের পথ পরিবহন
- ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে রেলওয়ের সহায়তা [ক. বি. ডিগ্রী কোর্স, ১৯৬২]
- স্থলপথে ও জলপথে পরিবহন সমস্যা [ক. বি. '৬২]
- ভারতের পর্যটন ব্যবসায়

প্রারম্ভ

যান্ত্রিক পরিবহনব্যবস্থা আধুনিক সভ্যতার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এই ব্যবস্থার ফলেই দূর হয়েছে নিকট, পর হয়েছে আপন, মানুষের জ্ঞানের দিগন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে বিস্ময়কর ভাবে। হৃদ্‌পিণ্ড থেকে রক্ত অজস্র শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে যেমন দেহকে সচল করে রাখে, তেমনি আধুনিক সভ্যতার প্রাণশক্তি বিভিন্ন ধরণের পরিবহন-ব্যবস্থাকে আশ্রয় করেই সজীব ও কর্মমুখর হয়ে রয়েছে। রেলের ঘূর্ণ্যমান চাকার ছন্দোময় শব্দে, জাহাজের-স্টীমারের সমুদ্র ও নদীর বক্ষমন্থনের ধ্বনিতে, কিংবা নভোচারী বিমানের গর্জনে আমরা তার সেই হৃৎস্পন্দনকেই শুনতে পাই।

পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব

অর্থনৈতিক, সামরিক, শাসনতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই পরিবহন ব্যবস্থার যে অপরিসীম গুরুত্ব দেখা যায় তাতে তাকে স্বচ্ছন্দে দেশের স্নায়ুতন্ত্র আখ্যা দিতে পারি। ইংরেজ কবি কিপ্‌লিং যথার্থই বলেছেন 'পরিবহনই সভ্যতা।' উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিনায়কেরা বিশাল ভারতবর্ষের দূরদূরান্তের অঞ্চলগুলো থেকে কাঁচা-মাল সংগ্রহ করে ইংলণ্ডে নিয়ে সেখান থেকে শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য এদেশের বাজারে ছড়িয়ে দেবার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য পরিবহন ব্যবস্থায় উদ্যোগী হয়েছিল, ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসির আমলেই তার সূত্রপাত। কিন্তু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকার দরুণ ইংরেজ প্রবর্তিত পরিবহন ব্যবস্থা আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করলেও সত্যকারের কোনও সৃজনশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি।

স্বাধীনতালাভের পরই পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে জাতীয়জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়। ভারত-

বর্ষের পরিবহন ব্যবস্থা চতুর্বিধ, রেলপথ, রাজপথ, জলপথ এবং বিমানপথ। অর্থনৈতিক উন্নয়নে যান্ত্রিক পরিহন ব্যবস্থার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী শিল্পায়ন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি, পশ্চাদপদ অঞ্চলগুলোর উন্নয়ন, শিল্পপ্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান নির্বাচন প্রভৃতি স্বাধীন ভারতের পরিবহন ব্যবস্থার ও সংগঠনের মৌল নীতিরূপে গৃহীত হয়েছে।

ভারতের চতুর্বিধ পরিবহন ব্যবস্থা

ভারতবর্ষের স্থলপরিবহন ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ হল রেলওয়ে। নিছক সাম্রাজ্য-স্বার্থ সাধনের জন্যই ইংরেজ এদেশে রেলওয়ে প্রবর্তন করেছিল। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসীর আমলে বোম্বাই থেকে কল্যাণ পর্যন্ত ১৮ মাইল ও কলকাতা থেকে হুগলী পর্যন্ত ২৩ মাইল ব্যাপী রেলপথ স্থাপিত হয়েছিল, রেলপথ স্থাপনের জন্য আটটি ব্রিটিশ যৌথ কোম্পানির সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তি হয়। লর্ড ডালহৌসীর একটি পত্রে ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপনের মূলে যে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থই ছিল, তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিদেশী রেলওয়ে কোম্পানিগুলো মাল-পরিবহনের মাশুলের হার যেভাবে নির্ধারণ করত তা এদেশে শিল্পপ্রসারের প্রতিকূল ছিল। নানা অব্যবস্থার জন্য এই কোম্পানিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকলে ভারত সরকার রেলওয়ের রাষ্ট্রায়াত্তকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৭৯ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে রাষ্ট্রায়াত্ত করা হয়, তারপর একে একে ভারতসরকার বিভিন্ন রেলওয়ের পরিচালনভার গ্রহণ করতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯২১ সালে এ্যাকওয়ার্থ কমিটির (Acworth Committee) অধিকাংশ সদস্য রেলওয়ের রাষ্ট্রীয় পরিচালনার জন্য সুপারিশ করেছিলেন।

ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় রেলপথ

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরই জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজন অনুযায়ী রেলওয়ের পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। দেশ বিভাগের ফলে অবিভক্ত ভারতবর্ষের ৪০.৫ হাজার মাইল রেলপথের প্রায় ৬ হাজার মাইল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বাধীন ভারতবর্ষের কোনও কোনও রেলপথ খণ্ডিত হল, যেমন আসাম বাংলা রেলপথ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ২৬টি শাখা লাইনকে উৎপাটিত করা হয়েছিল। স্বভাবতই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে ভারতীয় রেলপথের ওপর নানা চাপ পড়েছিল। প্রথম পরিকল্পনায় রেলপথ উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য ছিল বয়ঃসীমা উত্তীর্ণ, পুরাতন রোলিংস্টক বা সাজসরঞ্জাম ও স্থায়ী সম্পত্তিসমূহের পুনর্বাসন এবং রেলপথগুলোর কয়েকটি অংশের মুখ্য

বাধাগুলোর অপসারণ। সেই সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়ন কর্মসূচীসঞ্জাত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে যতদূর সম্ভব অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনাকালে রেলপরিবহনের জন্য ৪৩২.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। এই পরিকল্পনাকালে ৪৩০ মাইল উৎপাটিত রেলপথ পুনঃস্থাপিত, ৩৮০ মাইল নতুন লাইন নির্মিত এবং ৪৬ মাইল সংকীর্ণ গেজ লাইন প্রশস্ত গেজ লাইনে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনার সূচনায় ১৯৫০-৫১ সালে রেলপথগুলোয় মোট ৯ কোটি ১৪ লক্ষ টন মাল বাহিত হয়েছিল, পরিকল্পনার শেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে এই মালের পরিমাণ প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। প্রথম পরিকল্পনাকালে চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানায় ৪২৪টি ইঞ্জিন নির্মিত হয়। ১৯৫৫ সালে স্থাপিত পেরাম্বুর রেলকামরা কারখানায়ও বগি নির্মাণের কাজ সন্তোষজনকভাবে চলে। প্রথম পরিকল্পনাকালে রেলওয়ের বৈদ্যুতীকরণেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। এ সময় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। ১৯৫৩ সালেই ভারতসরকার রেলপথগুলোকে সুসম্বদ্ধ করার জন্য তাদের ছয়টি অঞ্চলে বিন্যস্ত করেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ভারতীয় রেলপথের পুনর্গঠন

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রেল পরিবহনব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মসূচীর লক্ষ্য ছিল যতদূর সম্ভব পুনঃস্থাপনের অবশিষ্ট কাজ, বিশেষ করে পরিকল্পনাকালে ভারী শিল্পোন্নয়নসঞ্জাত বর্ধিত যাত্রী ও মালের জন্য আবশ্যক অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা প্রবর্তনের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। আভ্যন্তরীণ সরবরাহ সূত্রগুলোর উন্নয়নের মাধ্যমে সরঞ্জামের ক্ষেত্রে রেলপথগুলোকে ক্রমশ স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্য সংবলিত বিভিন্ন কার্যসূচীও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায়ও এই লক্ষ্যগুলো অনুসৃত হয়েছে। লৌহ ইস্পাত কারখানা কয়লাখনি প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রায় ৫০০ মাইল নতুন রেললাইন নির্মাণ, সাজসরঞ্জাম ও পুরাতন রেললাইনের পুনর্নবীকরণ, বৈদ্যুতিকরণের সম্প্রসারণ, যাত্রীবাহী ও মালবাহী গাড়ির সংখ্যাবৃদ্ধি, সংকেতের (Signalling) উন্নত ব্যবস্থা, এ সমস্তই ছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের কার্যসূচী। এই পরিকল্পনায় রেলপথের উন্নয়নে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১১২৫ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় রেলওয়ে উন্নয়ন খাতে প্রায় ১৩২৩ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় রেলপথের উন্নয়ন এবং চতুর্থ পরিকল্পনার কর্মসূচী

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে রেলপথে মাল ও যাত্রী শতকরা ৩০ ভাগেরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই পরিকল্পনাকালে শহরতলী বহির্ভূত অঞ্চলে বাৎসরিক শতকরা ৩ ভাগ যাত্রী বৃদ্ধি এবং শহরতলী অঞ্চলে তার বেশী সংখ্যক যাত্রী বৃদ্ধির সম্ভাবনা ধরে নিয়ে তার জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে রেলপথে মাল চলাচলের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে পরিকল্পনা কমিশন উল্লেখ করেছেন। এই পরিকল্পনায় রেলওয়ে খাতে ১৪১০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাবিত হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পার কালে ৪০,০০০ ওয়াগন নির্মাণ, বারানসীর কারখানায় ১৫০টি ডিজেল ইঞ্জিন নির্মাণ এবং চিত্তরঞ্জন কারখানায় বাষ্পইঞ্জিন-এর নির্মাণ সংখ্যা হ্রাস করে সমসংখ্যক ডিজেল ইঞ্জিন নির্মাণ, যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যের ভিত্তিতে ডিজেল ও বৈদ্যুতিক শক্তিবাহিত রেলওয়ে পরিবহনের সম্প্রসারণ, ১২০০ কিলোমিটার লাইনে স্বয়ংক্রিয় সিগ্ন্যালিং-এর এবং ৬৫০ কিলোমিটার লাইন স্বয়ংক্রিয় গাড়ী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, মূল ও ভারী শিল্প এবং লৌহ ও কয়লার মত খনিজ দ্রব্যগুলির চলাচলের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে তৃতীয় পরিকল্পনার ১৭৭৫ কিলোমিটার লাইনের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজসহ মোট ২২০০০ কিলোমিটার নতুন লাইন স্থাপন, বৈদ্যুতিক সিগন্যালিং-এর যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য একটি কারখানা স্থাপন—এগুলোই হল চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় চিহ্নিত লক্ষ্য। রেলওয়ে-পরিবহন ও পথ-পরিহনকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করে তাদের একটি সুসম্বদ্ধ সামগ্রিক পরিকল্পনার অধীনে আনয়ন করা দরকার। পথ-পরিবহনের প্রতিযোগিতায় রেলপথের সম্প্রসারণ অনেক সময়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কলকাতার মত জনবহুল শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোয় যাত্রীদের ভিড়ের প্রচণ্ড চাপজনিত বিশৃঙ্খলা ও দুর্গতি হ্রাসের জন্য বিদ্যুতিক ট্রেণের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সার্কুলার রেলওয়ে পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকরী করা উচিত।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে রেলের কর্মসূচী

আভ্যন্তরীণ পরিবহন-ব্যবস্থায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল পথ-পরিবহনের। ভারতবর্ষের মত বিশাল বিস্তৃত দেশে, স্বাধীনোত্তর যুগে পথ-পরিবহনের উন্নয়নের কাজ একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়েছে। অবশ্য ব্রিটিশ আমলে এইক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিকল্পনা ও কাজের সূত্রপাত হয়েছিল। পথ উন্নয়নের জন্য ১৯২৭ সালে ভারতসরকারের গঠিত কেন্দ্রীয় পথ উন্নয়ন জয়াকর কমিটি পেট্রোলের ওপর কর বসিয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারগুলোকে আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করায় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পথ উন্নয়ন তহবিল সৃষ্ট হতে এবং তা পথ-পরিবহনের উন্নয়নে

সহায়তা করতে পেরেছিল। ১৯৩১ সালে মিচেল কার্কনেস কমিটি এবং ১৯৩৭ সালে ওয়েজ-উড্ কমিটি রেল-পরিবহনের প্রতিযোগিতার সমস্যাটি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। ১৯৪৩ সালে রচিত নাগপুর পরিকল্পনারূপে পরিচিত 'দীর্ঘমেয়াদী পথ-পরিকল্পনায় কুড়ি বৎসরের মধ্যে প্রতিটি উন্নত কৃষি অঞ্চলকে রাজপথের ৫ মাইল দূরত্বের মধ্যে আনয়নের জন্য ঘোষিত হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভ করার পর এই পরিকল্পনাকেই প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে ১৯৪৮ সালে পথ-পরিবহনের উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করা হয়। ১৯৬১-৮১ সাল পর্যন্ত একটি ২০ বৎসরের পথ-উন্নয়ন কর্মসূচী কিছুকাল পুর্বে রচিত হয়েছে, উন্নত এবং কৃষি অঞ্চলের কোনও গ্রাম পিচরাস্তা থেকে চার মাইলের বেশি দূরে এবং যে কোন শ্রেণীর রাস্তা থেকে দেড় মাইলের বেশি দূরে থাকবে না। অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত অঞ্চলগুলোর বিশেষ প্রয়োজন এবং গত ১০ বৎসরের জেলা ও গ্রাম্য রাস্তার জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এই কুড়িবর্ষ পরিকল্পনায় কর্মসূচীর অগ্রাধিকারের ক্রম এভাবে রচিত হয়েছে : এক, সমস্ত প্রধান পথে যেখানে সেতু নেই সেখানে সেতু নির্মাণ; দুই, বৃহৎ শহরগুলোর নিকটবর্তী প্রধান রাজপথগুলো প্রশস্ত করে দুই বা তদূর্ধ্ব সারির করা এবং তিন, প্রধান গুরুত্বপুর্ণ পথগুলোয় অন্তত দু সারি যানের পথের ব্যবস্থা করা এবং গ্রাম্য রাস্তাগুলোকে উত্তম আবহাওয়ায় ব্যবহারযোগ্য করে তোলা। এই পরিকল্পনায় ২০ বৎসর পরে মোট ২,৫২,০০০ মাইল পিচ ঢালা সড়ক এবং ৪,০৫,০০০ মাইল পিচ ঢালা হয়নি এরূপ সড়ক নির্মাণের জন্য ঘোষিত হয়েছিল। এই পরিকল্পনাই তৃতীয় ও পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহের পথ-উন্নয়ন কর্মসূচীর নির্দেশক। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে নাগপুর পরিকল্পনার ৩,৩১,০০০ মাইল পথ নির্মাণের লক্ষ্যের অপেক্ষা ৬৩,০০০ মাইল বেশি পথ নির্মিত হয়। প্রথম পরিকল্পনায় সড়ক উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ১৫৫ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৫০ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় ৪৫৫ কোটি টাকা। ১৯৫০-৫১ সালের ৪০০,০০০ কিলোমিটার পথ। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষভাগে ১৯৬৫-৬৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৫০,০০০ কিলোমিটার হয়েছে।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় পথ উন্নয়ন

কিন্তু প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় পথ উন্নয়নের অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনও অনেক গুরুত্বপুর্ণ কাজ বাকি রয়েছে, বিভিন্ন পথের মধ্যে বহু বিচ্ছিন্ন অংশের যোগসাধন হয়নি, প্রয়োজনীয় সেতু নির্মাণ, দুর্বল সেতু, কালভার্ট এবং অপ্রশস্ত পথের সংস্কার-সাধন করা যায়নি। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগেও প্রায় ১০০ কিলোমিটার

পথের বিচ্ছিন্ন অংশের যোগসাধন, ৫০টি বৃহৎ সেতু ও প্রায় ১৮,০০০ কিলোমিটার একসারির রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি বকেয়া কাজ রয়েছে যাদের দায়িত্ব চতুর্থ পরিকল্পনা-কালে গ্রহণ করতে হবে। দেশে এখনও সুসম্বদ্ধ পথব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়নি, সেইজন্য জাতীয় সড়ক, রাজ্য-সড়ক, আন্তঃরাজ্য সড়ক প্রভৃতি উন্নয়নের কর্মসূচী সম্পর্কে একটি সামগ্রিক দৃষ্টি গ্রহণ এবং অতীতের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের রাস্তার ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। চতুর্থ পরিকল্পনায় পথ উন্নয়ন খাতে ৭৬০ কোটি টাকার বিনিয়োগ ধার্য করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় পথ ও পথপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন

এই পরিকল্পনাকালে ৫৬,০০০ কিলোমিটার নতুন পথ নির্মিত হবে আশা করা যায়। ভারতবর্ষে এখনও গরুর গাড়িতে বৎসরে ১০ কোটি টনেরও বেশি পণ্যদ্রব্য বাহিত হয়, এতেই আধুনিক পরিবহনব্যবস্থার দিক থেকে আমরা কত পশ্চাদপদ তার প্রমাণ মেলে। মোটরপরিবহনে সরকারি উদ্যোগ আশাপ্রদ নয়, বর্তমানে তা রাষ্ট্রীয় যাত্রী পরিবহনের সম্প্রসারণ, কোনও কোনও অঞ্চল পরিবহন সমবায় সমিতি-গুলোকে সাহায্যদান এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ও রেলওয়ের যৌথপ্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ অন্তঃরাজ্য পথসমূহে ও সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে মাল চলাচলের জন্য একটি অন্তঃরাজ্যপরিবহন কর্পোরেশন স্থাপনেই সীমাবদ্ধ। 'চতুর্থ পরিকল্পনায় পথপরিবহন খাতে সরকারি অংশে বিনিয়োগের প্রস্তাবিত পরিমাণ ৬৫ কোটি টাকা, আর বেসরকারি অংশে ৬৩০ কোটি টাকা। পথপরিবহনের উন্নয়নে রাষ্ট্রের অংশ আরও অধিক হওয়াই উচিত বলে অনেকে মনে করেন। পরিবহন নীতি ও ঐক্যসাধন কমিটি (The Committee on Transport Policy and Co-ordination) ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা যাতে বড় ইউনিটে সংঘবদ্ধ হতে পারে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেখানে অনুকূল সেখানে যাতে সরকারি নীতি হিসেবেই সমবায় পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় তার জন্য সুপারিশ করেছেন। সরকারি উদ্যোগে মোটর নির্মাণের কারখানাও স্থাপন করা প্রয়োজন।

জলপথপরিবহন দুই শ্রেণীর, অন্তর্দেশীয় ও সামুদ্রিক। নদীমাতৃক ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ পথ, জলপথের দৈর্ঘ্য ৫০০০ মাইলেরও অধিক। অতীতে এদেশে নৌপরিবহনের সবিশেষ প্রাধান্য ছিল। পরাধীনতার যুগে ব্রিটিশ স্টীমার কোম্পানি-গুলো অন্তর্দেশীয় জলপথপরিবহনের একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতসরকার তার উন্নয়নে ব্রতী হয়েছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহনের উন্নয়নের জন্য প্রায় এক কোটি টাকা,

ব্যয় করা হয় (দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা)

অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন

গঙ্গাব্রহ্মপুত্রের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ১৯৫২ সালে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র পরিবহনসমন্বয় পর্ষদ (Ganga Brahmaputra Transport Co-ordination Board) গঠিত হয়, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারসমূহকে পরামর্শ দানের জন্য একটি অন্তর্দেশীয় জলপরিবহন দপ্তরও (Directorate of Inland Water Transport) স্থাপিত হয়েছে। উত্তরপূর্ব অঞ্চলের জলপথে অন্তর্দেশীয় পরিবহনের জন্য দায়ী জয়েন্ট-স্টীমার কোম্পানী-গুলো তাদের জীর্ণ ও আধুনিকযুগে অচল জলযানগুলোর আধুনিকীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ১৯৫৯ সালে গঠিত অন্তর্দেশীয় জলপথপরিবহন কমিটির (Inland Water Transport Committee) সুপারিশের পটভূমিকায় তৃতীয় পরিকল্পনায় তার উন্নয়নের কর্মসূচী রচনা ও তার জন্য প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়, কিন্তু প্রথমে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি টাকা। প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় এ বিষয়ে যে বিশেষ অগ্রগতি হয়নি, তা পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় সুস্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ করেছেন। এই পরিকল্পনায় আপাতত অন্তর্দেশীয় জলপথপরিবহনের উন্নয়ন খাতে ১৩ কোটি টাকার বিনিয়োগ ধার্য হয়েছে, তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশের পরিমাণ ৮ কোটি টাকা, রাজ্যসরকারগুলোর পরিমাণ ৩ কোটি টাকা। ফারাক্কা বাঁধ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হলে ভাগীরথী তথা পশ্চিমবঙ্গে জলপথপরিবহনে বিপুল উন্নতি সাধিত হবে।

ব্রিটিশ আমলে বিদেশী স্বার্থশক্তি জাহাজ নির্মাণ এবং মাল ও যাত্রীবাহী জাহাজ পরিচালনা—জাহাজশিল্পের এ দুটো দিককেই ভারতীয় মালিকানায় প্রসারিত হতে দেয় নি। ভারতের মত ৩২০০ মাইল সামুদ্রিক উপকূলবেষ্টিত বিশাল দেশের অর্থনৈতিক শক্তির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হল নিজস্ব জাহাজশিল্প। ভারতবর্ষে ১৯১৯ সালে প্রথম জাহাজকোম্পানী নিবন্ধীভুক্ত (registered) হয় এবং তীব্র, অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে ভারতীয় জাহাজশিল্প কোনও মতে নিজের অস্তিত্বের ক্ষীণশিখাটিকে জ্বালিয়ে রাখে। স্বাধীনতালাভের পর ভারতসরকার স্বয়ংনির্ভরতার ভিত্তিতে ভারতীয় জাহাজশিল্পকে প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত করতে উদ্যোগী হন। এই ক্ষেত্রে পরনির্ভরতার জন্য ভারতকে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয় তা দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯৫৯ সালের শেষ পর্যন্ত শুধু খাদ্যশস্য আমদানির জন্যই ভারত-সরকারকে বিদেশী জাহাজ কোম্পানীগুলোকে ২১২ কোটি টাকা মাশুল হিসেবে

দিতে হয়। ভারত সরকার ১৯৪৭ সালের জাহাজী পরিবহন নীতি নির্ণায়ক (Shipping Policy Commitee) কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫০ সালে উপকূলীয় বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজকোম্পানীগুলোকে একচ্ছত্র অধিকার দান এবং ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যের ৭৫ ভাগ এবং দূরবর্তী দেশগুলোর সঙ্গে এই বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ ভারতীয় জাহাজগুলোর জন্য সংরক্ষিত করেন। প্রথম পরিকল্পনায় জাহাজসম্পর্কিত কর্মসূচীর জন্য ১৮.৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। ১৯৫০-৫১ সালে দেশের জাহাজব্যবস্থায় মোট টনেজের পরিমাণ ছিল ৩.৯১ লক্ষ জি-আর-টি, প্রথম পরিকল্পনার শেষভাগে তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪.৮০ লক্ষ জি-আর-টি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই কর্মসূচীর জন্য ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫২.৭ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে টনেজ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জাহাজকোম্পানীগুলোকে ঋণ মঞ্জুর করবার জন্য একটি তামাদিবিহীন জাহাজউন্নয়ন তহবিল স্থাপিত হয়েছে। ভারতসরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য জাতীয় জাহাজসংস্থা (National Shipping Board) গঠন, জাহাজব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইস্টার্ণ সিপিং কর্পোরেশন লিমিটেড এবং ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দি ওয়েস্টার্ণ সিপিং কর্পোরেশন স্থাপন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় পরিকল্পনায় জাহাজ সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ ৪১ কোটি টাকা হয়েছে। এই পরিকল্পনাকালে টনেজের বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫.৪ লক্ষ জি. আর. টিতে। চতুর্থ পরিকল্পনায় জাহাজীপরিবহন উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৬৭ কোটি টাকার মত হবে বলে হিসেব করা হয়েছে। নতুন বন্দর নির্মাণ ও পুরাতন বন্দরগুলোর আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র বন্দরগুলোর উন্নয়ন, তৈলশোধনাগারগুলোর জন্য বন্দরের সুযোগসুবিধার উন্নয়ন, জাহাজ থেকে বন্দরে মালখালাসের ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ সামুদ্রিক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এ সমস্ত কর্মসূচীও বিভিন্ন পরিকল্পনায় গৃহীত হয়েছে। কলকাতা, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম এবং কোচিনের বন্দরগুলো সম্প্রসারিত হয়েছে। পলি পড়ে হুগলী নদীর যে ক্রমাবনতি ঘটছে তার জন্য কলকাতা বন্দরে বিশেষ কর্মসূচীসমূহ গৃহীত হয়েছে, ফরাকাবাঁধ নির্মাণে অন্যতম উদ্দেশ্য হল কলকাতা বন্দরের জন্য হুগলী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি। ভারতসরকার ১৯৫১ সালে গুজরাটে কাণ্ডলা বন্দর নির্মাণ করেছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উড়িষ্যায় পরাদীপ বন্দর নির্মিত হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে নবস্থাপিত হলদিয়া বন্দরও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

সামুদ্রিক পথ পরিহনের অগ্রগতি

সীমাবদ্ধ অর্থনৈতিক শক্তি সত্ত্বেও স্বাধীন ভারতের অসামরিক বিমান-পরিবহন ব্যবস্থা দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বিমানবন্দরের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩, ১৯৬৫ সালে তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮২-তে। ১৯৫০ সালের রাজাধ্যক্ষ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারতসরকার ১৯৫৩ সালে ভারতীয় বিমান-পরিবহনের রাষ্ট্রীয়করণ এবং দুটি কর্পোরেশন বা যৌথসংস্থার অধীনে তার ভার অর্পণ করেন। অসামরিক বিমানপরিবহন খাতে প্রথম পরিকল্পনায় ২৩'২ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৭১'০ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫০ কোটি টাকা আবহাওয়া সংক্রান্ত কর্মসূচীর জন্য ব্যয় করা হয়।

অসামরিক বিমান পরিবহন

নতুন বিমানঘাঁটি নির্মাণ, পুরাতন বিমানঘাঁটিগুলোর যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের আধুনিকীকরণ, পুরাতন বিমানগুলোর পরিবর্তে নতুন ধরনের বিমান এবং শান্তাক্রুজ, দমদম ও পালাম বিমানবন্দরগুলোয় জেটবিমান চলাচলের উপযোগী উন্নয়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রভৃতি কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। চতুর্থ-পরিকল্পনায় অসামরিক বিমানপরিবহনের উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১২৫ কোটি টাকা।

ভ্রমণের নেশা মানুষের রক্তে দুর্নিবার, অতীতেও মানুষ সুদূরের আহ্বানে উদ্দাম, চঞ্চল হয়ে আফ্রিকার কৃষ্ণকুটিল অরণ্য থেকে আরম্ভ করে তুষারাস্তীর্ণ উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে উপনীত হয়েছে এবং কখনও কখনও তাই ভ্রমণাভিযানে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু এই নেশাকে কেন্দ্র করে জাতীয় আয়বৃদ্ধির অন্যতম উৎস হিসেবে পর্যটনব্যবসায় সংগঠন আধুনিক কালের বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশই নানাভাবে বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য সচেষ্ট। পর্যটনব্যবসায় বহুলপরিমাণে সুইজারল্যাণ্ডের বৈষয়িক সমৃদ্ধির কারণ। ভারতবর্ষ তার সমুদ্রতীর, অরণ্য ও বিভিন্ন পশু, হ্রদ, নদনদী, হিমালয়ের সৌন্দর্য, বিভিন্ন অঞ্চলের জীবনধারা উৎসবের বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য এবং ভুবনেশ্বর, কোনারক, রাজগীর নালন্দা, দিল্লী, আগ্রার প্রাসাদসমূহ, তাজমহল, খাজুরাহো অজন্তা, দক্ষিণ ভারতের মন্দির প্রভৃতি প্রাচীন শিল্পকলার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্মৃতিজড়িত দ্রষ্টব্যস্থানগুলো নিয়ে বহুদিন ধরেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকদের আকৃষ্ট করে আসছে। আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-গুলোর জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে ভারতসরকার টুরিজম-এর সুযোগসুবিধার সম্প্রসারণে সচেষ্ট। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যেমন, তেমনি রাজ্য সরকারগুলোর অধীনেও পর্যটনবিভাগ গঠন করা হয়েছে। বিদেশী

টুরিজ্‌ম্‌ বা পর্যটন ব্যবস্থা

পর্যটকদের আগমনের ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পমিাণ ১৯৫০ সালে অর্জিত ৪'২ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫৮ সালে ১৭'৫ কোটি টাকায় পৌছেছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভ্রমণবিষয়ক উন্নয়নসূচীর মধ্যে ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণকেন্দ্রগুলোয় থাকবার ব্যবস্থা, পরিবহন ও চিত্তবিনোদনের সুযোগসুবিধাদান। তৃতীয় পরিকল্পনায় পর্যটনব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ৬ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়, চতুর্থ পরিকল্পনায় এই খাতে ২৫ কোটি টাকার বরাদ্দ ধার্য হয়েছে। ইণ্ডিয়ান টুরিজম্ কর্পোরেশনের মাধ্যমেও বিদেশী পর্যটকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কেবল অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয়, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের দিক থেকেও টুরিজ্‌ম্ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, প্রতিটি বিদেশী পর্যটককে তাঁর নিজের দেশের দূতরূপেই আমাদের গণ্য করতে হবে। ভিখারীদের উৎপীড়ন ও অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রবঞ্চনা, পরিবহনের অব্যবস্থা, কাস্টম্‌স্-এর আইন-কানুনের দুর্বিষহ বাধা ও কর্মচারীদের সৌজন্যের অভাব প্রভৃতির অভিজ্ঞতা বিদেশীপর্যটকদের মনকে বিরূপ করে তোলে, এদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ অবস্থার বিদেশী পর্যটকদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা নেই; অবশ্য সাম্প্রতিককালে এদিকে সরকারের দৃষ্টি পড়েছে। আভ্যন্তরীণ ভ্রমণব্যবস্থার ও সরকার অনুমোদিত দোকান থেকে এদেশের পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের সুযোগসুবিধা আরও সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন।

উপসংহার

সাম্প্রতিককালে ভারতের পরিবহন ও পর্যটনব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ উল্লেখযোগ্য হলেও তাদের অগ্রগতি এখনও আশানুরূপ নয়। এবিষয়ে সরকারকে আরও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে হবে। দেশের বিভিন্ন পরিবহনব্যবস্থাগুলো পৃথক মন্ত্রকের অধীন হওয়ার জন্য তাদের কর্মধারার মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না, তায় ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের কার্যকারিতা অনেকটা হ্রাস পাচ্ছে। ভারতের পরিবাহন ব্যবস্থাগুলোর সংহতি ও সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরী।

ভিক্ষুক সমস্যা ও সমাধান

এই প্রবন্ধের অনুসরণে
- ভারতে ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধের প্রয়োজনীতা
- ভিক্ষাবৃত্তি জাতীয় জীবনের কলঙ্ক

প্রারম্ভ

দুশো বছরের ইংরেজ শাসন ভারতে এক নজিরবিহীন শোষণের ইতিহাস রচনা করেছিল। পরদেশী ইংরেজের অন্তহীন ক্ষুধা মেটাতে এদেশ হয়েছে নিঃস্ব, রিক্ত, দরিদ্র, আর সমুদ্র পারে ইংরেজ গড়েছে ঐশ্বর্য আর সম্পদের পাহাড়। পরাধীন ভারতের আকাশ বাতাস তাই মানবাত্মার সকরুণ আর্তনাদে হয়ে উঠেছিল ভরপুর। পথে প্রান্তরে সহরে গ্রামে দেখা যেত লাঞ্ছিত মানবত্মার প্রেত শোভাযাত্রা। চলমান কঙ্কালের সারি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে এসে দাঁড়াত একমুঠো অন্নের প্রত্যাশায়। জীবন সংগ্রামে পরাজিত জীবন্ত শবগুলো এর পরিবর্তে পেয়েছে লাঞ্ছনা, পেয়েছে অপমান, হয়েছে ধিকৃত। কোনদিন মুখ তুলে এই ধিক্কারের প্রতিবাদ করেনি। প্রশ্ন তোলেনি: কোন এত অপমান? এই সব মূঢ় ম্লান মুখ নীরবে সহ্য করেছে, যতদিন পেয়েছে কৃপার দান অন্ন খুটে কষ্টে ক্লিষ্টে প্রাণ ধারণের গ্লানিটুকু বহন করে চলেছে, তারপর একদিন সবার অলক্ষ্যে নিঃশব্দে মৃত্যুর কোলে নিয়েছে আশ্রয়। উত্তরাধিকার সূত্রে এইসব অপমানিতের দল রেখে গেছে তাদের বংশধরদের জন্য দারিদ্র্যের অভিশাপ, রেখে গেছে ভিক্ষার পাত্র। এমনি করেই অবাঞ্ছিত অসম্মানিত মানুষের দল যুগ থেকে যুগে ভিক্ষার ঝুলি বহন করে চলেছে, দল বেঁধে এরা চলেছে অন্ধকারের অভিসারে।

অন্যদেশের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য

পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সুদূর অতীতে এমনি একদল মানুষ শীর্ণকায় ভগ্নস্বাস্থ্য ন্যুব্জপৃষ্ঠ নিয়ে চলতে চলতে বিদ্রোহ করেছে। দেখা দিয়েছে ফরাসী বিপ্লব, ঘটেছে রুশবিপ্লব, এই সেদিন চীনে দেখা দিল বিপ্লব। এই সব দেশের অপমানিত, নির্যাতিত মানুষের মূঢ় ম্লান মুখ পেয়েছিল প্রতিবাদের ভাষা। কিন্তু এদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত দরিদ্র মানুষের দল অসম্মানের ও লাঞ্ছনার বোঝা নিজে নিয়ে পথ চলেছে, অভিযোগ জানায়নি। ভারতীয় দরিদ্র মানুষের দল সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক। "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল

উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের হিসেব নিলে না, আশা করা গিয়েছিল স্বাধীন ভারতের মানুষ তাদের চোখের জলের হিসেব নেবে, তাদের অধিকার হবে স্বীকৃত। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর বিশ বছর কেটে গেল তবুও ভারতের দারিদ্র ঘুচল না। ভিক্ষুক সমস্যার কোন সুষ্ঠ সমাধান হল না। এ বড় বেদনার কথা।

ভারতে ভিক্ষুক সমস্যার ইতিহাস শুধু দুশো বছরের নয় আরও প্রাচীন। প্রাচীন ভারতবর্ষের বুকে এই ইতিহাসের জন্ম। কখনও রাজ্যতন্ত্র, কখনও রাজনৈতিক ঘূর্ণির মধ্যে এই সমস্যার বীজটি একটু একটু করে অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে, ব্রিটিশ শাসনকালে সেই অঙ্কুরিত বীজটি মহীরুহে পরিণত হয়ে ওঠার আবহাওয়া লাভ করেছে। আমলাতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র এই সমস্যাকে জীইয়ে রাখার অনুকূল পরিবেশ রচনা করে দিয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের অবসানে ইংরেজ এদেশে যে দীনতার আবর্জনা পেছনে ফেলে রেখে গেছে, স্বাধীন ভারতকে সেই দীনতার আবর্জনা সরিয়েই নিজের চলার পথ করে নিতে হয়েছে। কূটকৌশলী ইংরেজ অসংখ্য সমস্যাজীর্ণ এক ভারতকে স্বাধীন সরকারের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার এমনি বহু সমস্যার সমাধানের কাজে অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু পথে পথে নিরাশ্রয় নির্যাতিত মানবাত্মার অপমানের কলঙ্ক মোচনে আজও আমাদের সচেতনতা সুস্পষ্ট নয়। এটা পরিতাপের বিষয়।

ভিক্ষুক সমস্যার উদ্ভব, স্বাধীন ভারতেও এই সমস্যা বর্তমান

অতীত ভারতে যাঁরা দার্শনিক চিন্তায় জ্ঞান অন্বেষণায় ব্যাপৃত থাকতেন, সমাজ তাঁদের কঠোর জীবন-সংগ্রামের হাত থেকে মুক্ত রেখেছিল। তাঁদের জন্য অখণ্ড অবসর সৃষ্ট করা হয়েছিল, তাই তাঁরা যখন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়াতেন, তখন সেটা অপমানের বস্তু ছিল না, ছিল সম্মানের। তখন সমাজের চোখে তাঁরা ছিলেন শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত। কিন্তু কালে কালে একদল মানুষ কঠিন শ্রমের পরিবর্তে এই পথটিকেই জীবনধারণের সহজ পথ হিসেবে বেছে নিল। জ্ঞানান্বেষণ বা দর্শন চিন্তায় তাঁরা অধিকারী ছিলেন না। এঁরা হলেন পরশ্রম-জীবী। গার্হস্থ্য-আশ্রম এই শ্রেণীকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলল। ক্রমে ভিক্ষাবৃত্তি হয়ে দাঁড়াল বংশানুক্রমিক। কালের বিবর্তনে সমাজ-দৃষ্টিরও বিবর্তন ঘটল। এখন আর ভিক্ষাবৃত্তি সম্মানজনক একটি পদ্ধতি নয়। আজ ভিক্ষুক শ্রেণী সমাজের গলগ্রহ। এরা সমাজের করুণা, দয়া আর দাক্ষিণ্যের পাত্র মাত্র।

কালের বিবর্তনে একই সমস্যার ভিন্নরূপ। একদল পরিশ্রমজীবির উদ্ভব

পৃথিবীর যে যে রাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিক অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থা বর্তমান সেই সেই রাষ্ট্রে ভিক্ষুক সমস্যা বর্তমান; কেননা ভিক্ষুক সমস্যা ধনতান্ত্রিক সমাজেরই কুফল বিশেষ। ভারতের বুকে যে সাম্রাজ্যবাদ প্রায় দুশো বছর শাসনের নামে শোষণ করেছে, সেই শাসন-আমলে এ দেশে এই সমস্যা পরিবর্দ্ধিত হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশটি লাভ করেছে। তারপর এই নগ্ন সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। নবভারত এখন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তনের স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু এই স্বপ্ন সফল হতে এখনও বহু সময় লাগবে। ভারতে যে অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে তা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নামান্তর। তাই এই জাতীয় আবহাওয়ায় বহু পুরোণো ভিক্ষুক সমস্যা শুধু অস্তিত্বই টিঁকিয়ে রাখেনি; বাদ্ধত হওয়ারও সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত সাম্যবাদ যে দেশে প্রতিষ্ঠিত সেই দেশে ভিক্ষুক বৃত্তি বলে কোন বৃত্তির অস্তিত্ব নেই, কেননা সে দেশে ভিক্ষুকের প্রতি দান বা দাক্ষিণ্য প্রদর্শনকে মানবতার অপমান বলেই মনে করা হয়। তাই সাম্যবাদী দেশে যে দরিদ্র মানুষের দল দুই হাতে ভিক্ষার পাত্র এগিয়ে দেয় সেই দুটো হাতকেই উৎপাদন কাজে লাগান হয়। এরা নিযুক্ত হয় রাষ্ট্রের কল্যাণে। ভিক্ষাবৃত্তির চিরশত্রু সমাজবাদ।

ভিক্ষুক সমস্যা ধনতান্ত্রিক সমাজের কুফল বিশেষ

অন্যান্য দেশের মত ভারতের ভিক্ষুকেরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। একদল ভিক্ষুক আছে যারা ভিক্ষাকে আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ বলে মনে করে তাই সাধু, সন্ন্যাসী, বাউল, বোষ্টমের দল হাতে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে যা সংগ্রহ করে তাই দিয়ে জীবন ধারণ করে। ঈশ্বরের নাম কীর্তন করে ভিক্ষা সংগ্রহ করলেও সমাজের চোখে এরা ভিক্ষান্ন জীবির দল মাত্র, সম্মানিত নয়। আর একদল ভিক্ষুক আছে যাদের চির কালের ভিক্ষুক বলা চলে। এই দল বারমাস ভিক্ষা করে বেঁচে থাকে। ভিক্ষা করাই এদের পেশা। এদের আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে: একক ভিক্ষুক ও সংঘবদ্ধ ভিক্ষুক। একক ভিক্ষুকেরা স্বতন্ত্রভাবে ভিক্ষার মাধ্যমে যা উপার্জন করে তাই দিয়ে নিজের ভরণ-পোষণ চালায়; আর সংঘবদ্ধ ভিক্ষুকের দল একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তারা সমস্ত দিনে যা উপার্জন করে তা এই সংঘপরিচালকদের হাতেই তুলে দিতে হয়, পরিবর্তে তারা পায় সামান্য মজুরি মাত্র। এই সংঘবদ্ধ ভিক্ষুক দল একটি পাপচক্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। এদের কার্যকলাপের প্রভাব সুদূর প্রসারী। এরা

ভিক্ষুকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ
শ্রেণী বিন্যাস;
সংঘবদ্ধ ভিক্ষুকদল
: পাপচক্র

কখনও শিশু ও কিশোর কখনও বা নারী অপহরণ করে নানা সাম্রাজ্য বিরোধী পাপকার্যে নিযুক্ত করে। এই জাতীয় পাপচক্র শুধু মাত্র ভারতের কোন একটি রাজ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এই প্রতিষ্ঠান সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এমনকি কোন কোন আন্তর্জাতিক পাপচক্রের সঙ্গেও এদের সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয়েছে। এরা অপহৃত শিশু বা কিশোরকে বিকলাঙ্গ করে শহরের পথে পথে চলমান মানুষের চোখের সামনে এনে বসিয়ে দেয়। করুণাপরবশ হয়ে মানুষ এদের ভিক্ষা দেয়। এই দলই নারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য করে। এমনিভাবে সমস্ত ভারতে এদের কার্যকলাপের ফলে বহু জীবন অপচয়িত হচ্ছে। মানবাত্মা হচ্ছে লাঞ্ছিত। কিন্তু আজও আমাদের দেশের সরকার বা সৎ মানুষের দল এই ঘৃণ্য প্রথার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শক্তি প্রয়োগ করে তাকে উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয়নি। ভারতের গণতন্ত্রকে যদি সফল করতে হয় তবে অন্যান্য পরিকল্পনার সঙ্গে মানবাত্মার এই অবক্ষয় রোধ করার জন্য প্রয়োজন বলিষ্ঠ ও দৃঢ় পদক্ষেপ।

এছাড়া আর এক শ্রেণীর ভিক্ষুক দেখা যায় তারা সাময়িক ভিক্ষুক ; মূলতঃ এরা কৃষিসম্প্রদায় ভুক্ত। বছরের যে সময়ে চাষবাসের কাজ থাকে না, কিংবা অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, খরা প্লাবন বা দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে এই সহায় সম্বলহীন দরিদ্র কৃষকের দল প্রাণ-ধারণের তাগিদে স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে এসে আশ্রয় নেয়। কিছুদিন অতিকষ্টে দিন যাপন করে চাষের সময় তারা আবার ফিরে যায় নিজের নিজের গ্রামে। ভিক্ষা এদের পেশা নয়, এদের স্বভাবগতও নয়। এরা অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক রোষের শিকার মাত্র। সহৃদয় সরকার একটু মনোযোগ দিলে এই জাতীয় ভিক্ষুক সমস্যায় মূলোৎপাটন করতে পারেন বলেই সকলের বিশ্বাস।

সাময়িক ভিক্ষুক সমস্যা

ভিক্ষুকসমস্যা সুস্থ জাতীয় জীবনে দুষিত ক্ষত স্বরূপ। এই ক্ষতের নিরাময় প্রয়োজন। ক্ষত চিকিৎসার দায়িত্ব নিঃসন্দেহে সরকারের, কিন্তু সুস্থ ও সৎ নাগরিকদের দায়িত্ব কম নয়। একলঙ্ক মোচন করতে হলে সরকার ও জনগণের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। ভিক্ষাবৃত্তি ঘৃণাকর, লজ্জাকর ভিক্ষুকসম্প্রদায়ের মনে এই বোধ জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন সুস্থ জনগণ। বিশেষতঃ দেশের ছাত্র সম্প্রদায় যদি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন তবে সকলের আশা হবে বাস্তবায়িত। অন্যদিকে সরকার আইন প্রণয়ন করে, শাস্তি বিধান করে এই

ভিক্ষুকসমস্যা জাতীয় জীবনের দুষিত ক্ষত

লজ্জাজনক জীবনধারণ পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয় যে, শুধুমাত্র টুকরো টুকরো কয়েকটি ব্যবস্থায় নয়—সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর আমূল সংস্কারের মধ্যেই নিহিত আছে এই সমস্যা সমাধানের মূল চাবিকাঠিটি। অর্থাৎ জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় সুস্থ, সবল, সুন্দর সমাজ গঠনই হবে সরকারের একমাত্র লক্ষ্য।

সরকার ও জনগণের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন

ব্রিটিশ শাসনকালেই ১৯৪৩ সালে ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ আইন পাশ হয়। এই আইনের লক্ষ্য ছিল ভিক্ষাজীবী, ভবঘুরে ও বয়স্ক শিশুদের খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এদের সুস্থ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। আবার আইনের দিকটিও কঠোর করা হয়েছে। পুলিশ কমিশনার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ভিক্ষুকদের গ্রেপ্তার করে জেল দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের জন্য আছে ভিক্ষুক অধিকার। কলকাতা নগরীতে ছটি ভিক্ষুক কেন্দ্র আছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বেলেঘাটার কুষ্ঠ ভিক্ষুককেন্দ্র, চাকুরিয়ার বৃদ্ধ ভিক্ষুক কেন্দ্র, ক্যানাল স্ট্রীটের নারী ভিক্ষুক কেন্দ্র; এই সব কেন্দ্রে প্রায় তিন হাজার ভিক্ষুকের স্থান আছে। এ ছাড়া বর্ধমানের সাময়িক ভিক্ষুককেন্দ্র, তোষখানার শিশু ভিক্ষুককেন্দ্রও উল্লেখযোগ্য।

ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ আইন : ১৯৪৩

সমাজ দেহের এই দুষ্ট ব্রণ নিরাময়ের জন্য রাজ্যসরকার যে ব্যবস্থা করেছেন তা ব্যাপক না হলেও, প্রচেষ্টা যে প্রশংসনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সরকারের প্রচেষ্টায় কিছু সংখ্যক ভিক্ষুক প্রবণতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ লাভ করে কর্মে নিযুক্ত হয়েছে, কিছু ভিক্ষুক পুনর্বাসিত হয়েছে, কিছু নারী ভিক্ষুক বিবাহিত জীবন যাপনের সুযোগ পর্যন্ত লাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাওড়া জেলার একটি স্থানে প্রায় চারশো বিঘে জমির ওপর যুবক ভিক্ষুকদের শিক্ষার জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু যোগ্য পরিচালনার অভাবে, এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অবহেলা, অসততা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতির ফলে সরকারের সৎ উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তাই এ বিষয়ে দেশের সর্বস্তরের সদাজাগ্রত দৃষ্টির প্রয়োজন। শুধু মাত্র আইন তৈরী করলেই হয় না তার সার্থক প্রয়োগ আবশ্যক। অথচ আমাদের দেশে তারই অভাব।

সরকারী প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, কিন্তু সুফল সীমিত

জাতীয় জীবনের কলঙ্ক এই ভিক্ষাবৃত্তি—মানবতার চরম লাঞ্ছনা, মানবীয়

সম্পদের সুবিপুল অপচয় আর মানবাত্মার লজ্জাজনক অবক্ষয়। শুধু মাত্র আইনের সাহায্যে এই লাঞ্ছনা, অপচয় ও অবক্ষয়ের হাত থেকে জাতির জীবনকে রক্ষা করা যাবে না। এর জন্য চাই আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও সর্বব্যাপী প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসা। পাপ ঘৃণ্য—পাপী নয়। এই বিশ্বাস নিয়েই সমাজদেহের পচনশীল অংশটির সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সংশোধনের মাধ্যমে বিপথগামী মানুষগুলিকে ফিরিয়ে এনে সুস্থ জীবনের অধিকার দিতে হবে। সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম করে তুলতে হবে এদের। করে তুলতে হবে জীবন সংগ্রামের উপযুক্ত সৈনিক। স্বাধীন দেশের মানুষ মানবাত্মার এই দুঃসহ অপমানে যেন আর অপমানিত না হয়। আজ এই শপথ নেওয়ার সময় এসেছে।

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

● গ্রামীণ বাংলার উন্নতি কোন পথে—কৃষি না শিল্পে? [ব, বি, '৬২]

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়ন [ব, বি, '৬৪]
শিল্পকেন্দ্র দুর্গাপুর [ক, বি, '৬৪]
পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকেন্দ্রের সমস্যা
পশ্চিমবঙ্গের (ভারতের) চা-শিল্পের সংকট
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশই ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের নতুন চিন্তা ধ্যান ধারণা, নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের পীঠস্থান। সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই এই রাজ্য ছিল অগ্রণী। বিত্ত বাঙালীর কোনও সময়েই খুব বেশী ছিল না, কিন্তু চিত্তসম্পদে সে ছিল সকলের শ্রেষ্ঠ। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষিরা বাঙলার আকাশেই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত আবির্ভূত হয়ে সমগ্র দেশকে আলোকিত করে গেছেন। কিন্তু ১৯৪৬ সালে আগস্ট মাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তস্নানের পর বাঙলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হল, পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে ছিন্নমূল আশ্রয়প্রার্থীরা ক্ষতবিক্ষত পশ্চিমবঙ্গে এসে উপস্থিত হল। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, বেকারী, খাদ্যাভাব প্রভৃতি সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গ আজ জর্জরিত। বৈষয়িক সমৃদ্ধিগর্বিত, দেশের স্বাধীনতালাভের সকল সুফলভোগী অন্যান্য প্রদেশের এই দুঃস্থ রাজ্যটির প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের আর সীমা নেই।

প্রারম্ভ

গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গের সত্যি শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অন্যান্য প্রদেশ, বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে এই রাজ্যের যতটুকু সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া উচিত ছিল, এই দুর্ভাগা অভিশপ্ত রাজ্য তা পায়নি। তাকে নিজস্ব শক্তির ওপর নির্ভর করেই তার সমস্যা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ কৃষি উন্নয়নে, না শিল্পসম্প্রসারণে,—প্রথমেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে। কয়েক বৎসর ধরেই পশ্চিমবঙ্গে গুরুতর খাদ্য-সংকট চলছে, ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে তা তীব্র হয়ে ওঠে। অসাধু ব্যবসায়ি ও জোতদারদের

পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি কিসে—কৃষি না শিল্পে—এই প্রশ্নের উত্তরে কৃষির স্বপক্ষে অভিমত

মজুতদারির ফলে জনসাধারণের দুর্গতির বোঝা আরও দুঃসহ হয়ে ওঠে। ভারতের খাদ্যশস্যের দিক থেকে উদ্বৃত্ত অঞ্চলগুলো ঘাটতি অঞ্চলগুলোকে সাহায্যদানের ব্যাপারে বরাবরই অনিচ্ছা দেখিয়ে এসেছে। এই অবস্থায় কৃষির ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত, কোন কোন মহল থেকে এবংবিধ অভিমত উচ্চারিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে খাদ্যশস্যে এই প্রদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। খাদ্যশস্যের উৎপাদনই সমগ্র অর্থনীতির মূল ভিত্তি, একথা আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান শিল্প পাটশিল্প কৃষিভিত্তিক, সেদিক থেকেও কৃষির গুরুত্ব কম নয়।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার সমাধান ও উন্নতির জন্য কৃষি ও শিল্পের যুগপৎ উন্নয়নের প্রয়োজন

কিন্তু শিল্পসম্প্রসারণকে উপেক্ষা করে শুধু কৃষি উন্নয়নেই সর্বশক্তি নিয়োজিত করলে আমরা ভূল করব। খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য আমাদের সর্বতোভাবে প্রয়াসী হতে হবে। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না, পশ্চিমবঙ্গে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ এবং পূর্ববঙ্গ থেকে বহুসংখ্যক কৃষিজীবি উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে জমির ওপর অত্যধিক লোকসংখ্যার চাপ উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। সম্পূর্ণভাবে কৃষির ওপর নির্ভর করলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠবে। উন্নততর যন্ত্রপাতি, সেচের যান্ত্রিক ব্যবস্থা ইত্যাদি কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য, তার জন্যও শিল্পোন্নয়ন প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের বেকারসমস্যা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, তার সমাধানের একমাত্র পথ শিল্পসম্প্রসারণ। পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি কিসে—কৃষি না শিল্পে—এ প্রশ্নের উত্তরে একথাই বলা যায়, এদের মধ্যে কোনটিকে খর্ব বা অবহেলা করে নয়, পরন্তু তাদের যুগপৎ উন্নয়নেই পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ও তার ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভরশীল।

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন

স্বাধীনতালাভের পর প্রথম পরিকল্পনাকালেই সুপরিকল্পিত ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পরিকল্পনায় কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলোকে মূলধন সরবরাহ, শিল্প গবেষণা এবং বিপনণের সুযোগসুবিধা (marketing facilities) দানেই রাষ্ট্রের শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টা সীমিত ছিল। মাদুরশিল্পের ক্ষেত্রে ১৮টি সমবায় সমিতি ও ৬টি কেন্দ্র, খাদিশিল্পের জন্য ৩৫টি শিক্ষণকেন্দ্র, গুড়শিল্পের জন্য ১৭৪টি শিক্ষণকেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পরিকল্পনাকালে

স্থাপিত হয়েছে। এখনও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেও শিক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন শিল্পের উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়নখাতে ঋণ হিসাবে ৯ লক্ষ টাকা দান করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পরিকল্পনায় ১২০ কোটি ব্যয় করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, ভারী ও মূল শিল্পের সম্প্রসারণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ন্যস্ত বলে এ ক্ষেত্রে রাজসরকারকেই অগ্রণী হতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টা দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, একটি কারখানা—উৎপাদন, আর একটি শিল্প-উপনিবেশ স্থাপন। খাদি, গুড়, হাতে তৈরী কাগজ, তালা নির্মাণ, ঘানি, দেশলাই, দড়ি, জুতো, শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি শিল্পের সম্প্রসারণ ছাড়াও ২৫ হাজার মাকুবিশিষ্ট তিনটি সুতাকল, ২৩০টি হস্ত-চালিত তাঁতশিল্পের কেন্দ্র, হাওড়ার ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকার প্রতিষ্ঠিত একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনে প্রায় ৬ শত ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ইউনিট প্রভৃতি স্থাপন এবং রেশমশিল্পের উন্নয়ন ছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান কর্মসূচী। এই পরিকল্পনাকালে দুর্গাপুর কোক-ওভেন প্ল্যাণ্ট, পাওয়ার প্ল্যাণ্ট ইত্যাদি কতকগুলো বিশেষ শিল্পপ্রকল্প গৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের জন্য ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ, দুর্গাপুরে রাসায়নিক সারের কারখানা স্থাপন ও অন্যান্য শিল্পের প্রসার ইত্যাদি কর্মসূচী গৃহীত হয়, পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকার বেশী। কিন্তু এই পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের অগ্রগতি নৈরাশ্যজনক হয়েছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়ন

বেকারদের কর্মসংস্থান, গ্রামগুলোর শিল্পোন্নয়নের প্রসার, অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, ব্যয়সংকোচ প্রভৃতি উপকার শিল্প উপনিবেশ (Industrial Estates) পরিকল্পনা থেকে লাভ করা যায় বলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সরকারী উদ্যোগে রাস্তাঘাট নির্মাণ, স্বল্পমূল্যে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ, সরকারী ব্যয়ে নির্মিত শ্রমিকদের গৃহ ও শেড অল্পভাড়ায় দান—ইত্যাদির মাধ্যমে একটি স্থানে ক্ষুদ্রশিল্পের একাধিক ইউনিট স্থাপনে উৎসাহ দানই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য।

শিল্প উপনিবেশ স্থাপন

পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ এই ধরণের শিল্প উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রথমে কল্যাণী শিল্পউপনিবেশ গঠন করা হয়, তারপর বারুইপুর শিল্পউপনিবেশ, শক্তিগড় উপনিবেশ, হাওড়া ও শিলিগুড়ি উপনিবেশ গঠনে হাত দেওয়া হয়। শিল্পউপনিবেশ স্থাপনের জন্য প্রায় ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। হাওড়া উপনিবেশ গঠনের কাজ মূলত তৃতীয় পরিকল্পনায়ই চলে।

আমরা এবার পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রধান শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করব। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ওপরই সমগ্র দেশের শিল্পায়ন নির্ভরশীল। ব্রিটিশ আমলে ১৮৭৫ সালে কুলটিতে বরাকর লৌহ কারখানা নামে যে শিল্পসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে শুধু লৌহই উৎপন্ন হত। বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বার্ণপুরে অবস্থিত বর্তমান ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠানের স্থান টাটার লৌহ ও ইস্পাত কারখানার পরেই। সরকারি উদ্যোগে স্থাপিত তৃতীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠান হল পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরের কারখানা

পশ্চিমবঙ্গের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প: বার্ণপুর ও দুর্গাপুর কারখানা

রাণীগঞ্জের কয়লা, উড়িষ্যার লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ, স্থানীয় দক্ষ শ্রমিক, দামোদর নদের জল এই ইস্পাত কারখানার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়ক হয়েছে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ভারতের মোট কাঁচা লৌহের চাহিদার শতকরা ২৫ ভাগ এবং বিভিন্ন ইস্পাত দ্রব্যের চাহিদারও শতকরা ১৮ ভাগ থেকে ৪১ ভাগ পূরণে সক্ষম। এই কারখানার বর্তমান উৎপাদন ১০ লক্ষ টন, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে তার উৎপাদনক্ষমতা ১৬ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করবার লক্ষ ধার্য করা হয়। দুর্গাপুর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ইসকন (ISCON) নামক ব্রিটিশশিল্প প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় নির্মিত।

পশ্চিমবঙ্গের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একটি বিশাল শিল্প-নগরীরূপে দুর্গাপুরকে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপায়িত। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করছে। এই কারখানাজাত কাঁচা লৌহ, ইস্পাতদ্রব্য, রেলওয়ের সরঞ্জাম, বিলেট, বেঞ্জিন, ও ন্যাপথলিন এবং কোকচুল্লীজাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। দুর্গাপুর লৌহ ও ইস্পাত কারখানাকে কেন্দ্র করে বহুবিধ শিল্প গড়ে উঠেছে ও উঠছে। এখানে জাপান ও কানাডার যুক্ত সহযোগিতায় ৬০ হাজার টন উৎপাদনবিশিষ্ট ভারতের প্রথম বিশেষ ইস্পাত উৎপাদনের কারখানা নির্মীয়মান। এখানে কাটার, কনভেয়র,

শিল্প নগরী দুর্গাপুর পশ্চিম-বঙ্গের রূঢ়

সেভার প্রভৃতি কয়লা খনি নির্মাণের যন্ত্রপাতির কারখানাও স্থাপিত হয়েছে। পশ্চিম-বঙ্গ সরকার দুর্গাপুরে এক কোকচুল্লী কারখানা স্থাপন করেছেন। এই কারখানায় দৈনিক এক হাজার টন কোক উৎপাদন করা যায়। এখানকার উৎপন্ন গ্যাস কলকাতায় সরবরাহ করা হচ্ছে। স্থানীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটির উৎপাদনক্ষমতাও পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফ্রান্সের সহযোগিতায় দুর্গাপুরে একটি রাসায়নিক কারখানাও স্থাপন করেছেন। রাজ্যসরকারের উদ্যোগে এক রাসায়নিক সারের কারখানাও স্থাপিত হয়েছে। রাশিয়ার সহযোগিতায় এখান চশমার কাঁচ নির্মাণের কারখানাও স্থাপিত হবে বলে আশা করা যায়। এখানে দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের বিদ্যুৎকেন্দ্রটিও স্থাপিত। দুর্গাপুরে বেসরকারি উদ্যোগে বয়লার কারখানা, মোটরগাড়ীর চাকা নির্মাণের কারখানা এবং আরও অনেক শিল্প স্থাপিত হয়েছে। দুর্গাপুরই পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞের প্রধান পীঠভূমি হয়ে উঠেছে। রুর হল পশ্চিম জার্মানীর প্রধান শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল, দুর্গাপুরকেও পশ্চিমবঙ্গের রুর আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বস্ত্র ও শর্করাশিল্প

১৮১৮সালের কলকাতার নিকটবর্তী ঘুষুড়ী নামক স্থানে ভারতের প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। কিন্তু বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল তুলার অভাবে এখানে তার প্রসার বিশেষ হয়নি। ভারতের ৪৮১টি কাপড়ের মিলের মধ্যে যেখানে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে ১৯৯টি, মাদ্রাজে ১৩৫টি অবস্থিত, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে তার সংখ্যা মাত্র ৩০টি। সমগ্রদেশে বস্ত্রশিল্পে পশ্চিমবঙ্গের স্থান তৃতীয়। বাঙলা দেশের তাঁতশিল্পের শিল্পকলানৈপুণ্যের খ্যাতি অতীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা সেই ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারিনি। মাদ্রাজের তাঁত-শিল্পজাত বস্ত্রাদি পশ্চিমবঙ্গের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। তাঁতশিল্পের সম্প্রসারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে শর্করা-শিল্পের সম্প্রসারণের প্রভূত সম্ভাবনা আছে। এখানকার মৃত্তিকা ও জলবায়ু ইক্ষু উৎপাদনের বিশেষ অনুকূল এবং কয়লাও সুলভে পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে মাত্র ৩টি চিনির কল আছে, রাজ্যের চাহিদার তুলনায় তাদের উৎপাদনের পরিমাণ নিতান্ত স্বল্প। পশ্চিমবঙ্গে শর্করাশিল্পের উন্নয়নেও রাজ্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে।

পাট-শিল্পই পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা সুগঠিত ও কেন্দ্রীভূত শিল্প। বর্তমানে ভারতের ১১২টি পাটকলের মধ্যে ১০১টিই কলকাতার আশেপাশে হুগলী নদীর দুই

তীরে অবস্থিত। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দিক থেকে পাটশিল্পের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশ বিভাগের পর পাট উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলো পূর্ব-পাকিস্তানের অংশে পড়ায় কাঁচামালের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্প সংকটের সম্মুখীন হয়। কাঁচামাল সংগ্রহের সমস্যা এই পাটশিল্পের অস্তিত্বকেই এক সময় বিপন্ন করে তুলেছিল। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমানে পাট উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় কাঁচামালের অভাব বহুলাংশে পুরণ করা সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের পাট শিল্পের প্রতিযোগিতা এবং চটের থলের নানা বিকল্পও সমস্যা সৃষ্টি করেছে। পাটকলগুলোর আধুনিকীকরণ, নানা ধরনের পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন প্রভৃতির সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্প বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবার চেষ্টা করছে।

পশ্চিমবঙ্গের পাট-শিল্প

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে চা-শিল্পের স্থানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের রপ্তানিতে চা অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই বাঙলাদেশে তথা ভারতবর্ষে চায়ের চাষ আরম্ভ হয়। ভারতের উৎপাদনে আসামের স্থান প্রথম, তারপরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় চা উৎপন্ন হয়। সিংহল ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশগুলোর তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে ভারতের চায়ের রপ্তানির যে হ্রাস ঘটেছে, তা রীতিমত উদ্বেগজনক। সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক সভায় কেন্দ্রীয় বাণিজ্য-মন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং চা-শিল্পের বর্তমান সংকটের জন্য যে সমস্ত মৌলিক চ্যুতিবিচ্যুতির উল্লেখ করেছেন, তা হল, এক গত চল্লিশ বৎসর ধরে চায়ের জমির পরিমাণ একই আছে; দুই, চা-শিল্পের মালিকেরা তাঁদের লাভের খুব কম অংশই বাগিচার উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করেন বলে নতুন চারা রোপণের কাজ অত্যন্ত মন্থরভাবে চলেছে; তিন, চায়ের চাষের পদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ এবং চার, ভারতীয় চায়ের মর্যাদা-বৃদ্ধির উপযুক্ত প্রচার কার্য চালানো হয়নি। চা-শিল্পপতিরা এই অভিযোগ উচ্চারণ করেছেন যে অত্যধিক করভার বহন করতে হয় বলে চায়ের উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, তার ফলে তার বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিদেশের বাজারে ভারতীয় চায়ের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে চা শিল্পের যে প্রবেশ কর ধার্য করা হয়েছে, তা বাতিল করার জন্য শিল্পপতিরা দাবি করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারও আপত্তি জানিয়েছেন। চায়ের ওপর অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক স্থাপন না করলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবেশ কর বাতিল করতে অসম্মত। পারস্পরিক আলোচনার

চা-শিল্প

ভিত্তিতেই এই মতভেদের মীমাংসার সূত্র আবিষ্কার করে রাজ্য সরকার ও শিল্পপতিদের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের চা শিল্পের উন্নয়নের ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের মালিকানা বিদেশী ও অবাঙ্গালী বণিকদের করায়ত্ত হওয়ার জন্য এই প্রদেশের অসুবিধা

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল। সমগ্র দেশের ৯৫ শতাংশ পাটশিল্প, ৫০ শতাংশ কাগজশিল্প, ৩০ শতাংশ লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, ৫০ শতাংশ এনামেল শিল্প, ৪০ শতাংশ কাঁচশিল্প, ৬০ শতাংশ মৃৎশিল্প, ৮০ শতাংশ হোসিয়ারী শিল্প এবং ২৮ শতাংশ চা-শিল্প পশ্চিমবঙ্গেই অবস্থিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ শিল্পের মালিকই ইউরোপীয় ও বিভিন্ন প্রদেশের বণিক, শিল্পশ্রমিকদের বৃহৎ অংশও বহিরাগত। তার ফলে এই সমস্ত শিল্প থেকে পশ্চিমবঙ্গের লাভের পরিমাণ যথোচিত হয়নি। এই রাজ্যে শিল্প প্রসারে বাঙালীদের আরও উদ্যোগী ও সচেষ্ট হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে ২ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ একটি শিল্প মূলধন প্রতিষ্ঠান (Industrial Finance Corporation) গঠিত হয়েছে, এই সংস্থা পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম হবে আশা করা যায়।

বর্তমান অর্থ নৈতিক মন্দায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে বিশৃংখলা

সম্প্রতিকালে ভারতবর্ষে যে তীব্র অর্থ নৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, তার আঘাত পশ্চিমবঙ্গকেই সর্বাধিক পরিমাণ বহন করতে হচ্ছে। এই মন্দার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এই জাতীয় শিল্পের অধিকাংশই রেলওয়ের ওপর নির্ভরশীল, রেলওয়ের অর্ডার হ্রাস পাওয়ার ফলে বহু ছোট-খাট কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, অনেক বৃহৎ কারখানার উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের কোনও কোনও ইউনিট বন্ধ হয়েছে বা হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অনেক শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছে। বহুসংখ্যক শ্রমিকের ওপর ছাঁটাইয়ের খড়্গ উদ্যত হয়ে রয়েছে। তার ফলে শ্রমিকদের ঘেরাও আন্দোলন, অনেক কারখানার লক্‌-আউট ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে এক বিষাক্ত, অসুস্থ উত্তেজনাপূর্ণ, অশুভ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান শ্রমিক ও মালিক, সরকার ও মালিকপক্ষের মধ্যে যে যুদ্ধং দেহি জাতীয় মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাতে এই সমস্যা জর্জরিত রাজ্যটির অর্থ নৈতিক স্বার্থ বিপন্ন ও শিল্প প্রসার গুরুতরভাবে ব্যাহত হবে। পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে হবে, পরস্পরের প্রতি আক্রমণের মুষ্টি উদ্যত করে নয়।

সংকট যত তীব্র ও জটিলই হোক, একদিন তার অবসান ঘটবেই. এ বিশ্বাসের ভিত্তি আকাশকুসুম কল্পনা নয়, বাস্তব ইতিহাস। পশ্চিমবঙ্গও সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক মন্দাজনিত সংকট অতিক্রম করে শিল্পায়নের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে, অমিত উৎসাহে, প্রাণপ্রাচুর্যে অগ্রসর হবে, এই বিশ্বাস প্রতিটি বাঙালীর হৃদয়ে ধ্রুবতারকার অনির্বাণ জ্যোতি হয়ে থাকুক। আঘাত বিপর্যয়ের যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই ত নবজন্মের ইতিহাস রচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ পরিকল্পনার রূপ এখনও চূড়ান্তভাবে স্থির হয়নি, তা যে আকারই ধারণ করুক, এই রাজ্যের শিল্পায়নের গতি অব্যাহত থাকবে। হলদিয়া বন্দরকে কেন্দ্র করে একটি নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। বাঙালী শুধু ধ্বংসাত্মক আন্দোলনেই তৎপর, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তার নামে এই নিন্দা অবিরাম উচ্চারিত হচ্ছে। সেই অপবাদ খণ্ডন করে, তার সমুচিত উত্তর দিয়ে শিল্প গঠনে বাঙালীর কর্মক্ষমতার প্রমাণ দিবার মুহূর্তটি এখন সমাগত।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে
● গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা
● কলকাতা বন্দরের উন্নয়নে ফরাক্কা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

ফারাক্কা—একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ।

পুণ্য-সলিলা ভাগরথী একদিন কল-কল, ছল-ছল তান তুলে নৃত্যপটিয়সী নর্তকীর মত সমুদ্রের উদ্দেশ্যে বয়ে চলত, আজ সেই নর্তকীর চলার ছন্দে আর তান ওঠে না। আজ আর তরঙ্গে নৃত্যে উদ্বেলিত দেহ নিয়ে সে ধেয়ে চলে না। আজ ভাগীরথী শীর্ণকায়; আজ সে মৃত্যু লগ্নের জন্য প্রতীক্ষারতা।

শীর্ণকায় ভাগীরথীকে পুনর্জীবিত করে তোলার জন্যে রচিত পরিকল্পনার নাম ফারাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা।

প্রারম্ভ

অতীতে গঙ্গার মূল জলধারা পুষ্ট ভাগীরথী আজ জল-কার্পণ্যে স্তিমিত। প্রায় চারশো বছর পূর্বে ভৌগলিক কারণে গঙ্গানদীর প্রধান স্রোত ভাগীরথী নদী থেকে সরে গিয়ে পদ্মানদীতে আশ্রয় নেওয়ার ফলে ভাগীরথী আজ গতি মন্থর। গতি মন্থরতার ফলে এ নদীর বুকে জেগে উঠছে বিরাট বিরাট চর। নাব্যতা যাচ্ছে লোপ পেয়ে। তাই কলকাতা বন্দর আজ বিপন্ন। বৃহদাকার জাহাজগুলো এখন আর কলকাতা বন্দরের মুখ দেখতে পায় না। তার বিশাখাপত্তম বন্দরে গিয়ে ভেড়ে। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার জাহাজ গুলোকে জোয়ার ভাঁটার জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়। শুধু তাই নয় পথ প্রদর্শক জাহাজের পশ্চাদনুসরণ করে অতি সাবধানে মন্থর গতিতে তাদের এ বন্দরে প্রবেশ করতে হয়। তাও সম্ভব হয় শুধু মাত্র ড্রেজারের সাহায্যে নদীর মাটি কাটার ফলে। এর জন্য বছরে ব্যয় হয় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। সমগ্র পূর্ব ও উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য নগরী কলকাতার ভাগ্যে এমনি ভাবেই ক্রমে ক্রমে ঘনিয়ে আসছে দুর্যোগের অমারাত্রি, আসছে বিলোপের চরম মুহূর্ত। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে কলকাতা বন্দরকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে—ফারাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা।

মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, গঙ্গা ও ভাগীরথীর সংযোগ স্থল থেকে একটি স্রোত পূর্ব বাহিনী হয়ে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়। ভৌগলিক কারণে ভূপৃষ্ঠের উত্থান পতনের ফলে ও অন্যান্য কারণে পূর্ব বাহিনী ধারা ক্রমশ গভীর ও

প্রশস্ত হয়ে ওঠে কালে কালে গঙ্গার মূল জলস্রোত সেই পূর্বমুখী নদী খাতে প্রবাহিত হতে থাকে; ফলে ভাগীরথীর ধারা ক্রমে শীর্ণ হয়ে আসে। এর অন্য আর একটি কারণও বর্তমান। ভারতে নদী পরিকল্পনাগুলি গৃহীত হওয়ার ফলে দামোদর নদ বাঁধা পড়ে সিমেণ্ট কংক্রীটের কঠিন বাঁধনে। দামোদর নদ হল ভাগীরথীর অন্যতম উপনদী। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার ফলে এখন আর দুরন্ত দামোদর নদ প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ জলরাশি এনে ভাগীরথীর বুকে ঢালে না। ফলে প্রসারতা ও গভীরতা হারিয়ে ভাগীরথীর জলস্রোত হয়ে পড়েছে ক্ষীণ।

ভাগীরথী শীর্ণকায় হওয়ার ভৌগোলিক কারণ

ভাগীরথীর জল-প্রাচুর্যের অভাবে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই নদী তীরবর্তী অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যবন্দর কলকাতার অচল হওয়ার উপক্রম ঘটেছে। বড় বড় জাহাজগুলি এই বন্দরে আসে না, এতে আর্থিক ক্ষতি হয়; মাঝারি ও ছোট জাহাজগুলিকে বন্দরে আনার জন্য প্রতি বছর ড্রেজারের সাহায্যে যে মাটি কাটতে হয় তাতেও ব্যয় হয় অনেক, ফলে কলকাতা বন্দরকে ব্যবহারের উপযোগী করে রাখতে বন্দর কর্তৃপক্ষের ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছে। এমনি ভাবে চলেতে থাকলে অচিরেই হয়ত কলকাতা বন্দর অচল হয়ে পড়বে। সমগ্র কলকাতা নগরীর পানীয় জল সরবরাহ করে ভাগীরথী, কিন্তু ভাগীরথীতে জলাভাব দেখা দেওয়ায় কলকাতার পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা আজ সঙ্কটের সম্মুখীন। কারণ ভাগীরথীর স্রোতের প্রবল বেগ না থাকার ফলে সমুদ্রের লবণাক্ত জল আজ অনেক দূর পর্যন্ত প্রবেশ করে। ফলে জলের স্বাদুতা যাচ্ছে নষ্ট হয়ে। শুধু তাই নয়, লবণাক্ত জল পরিশ্রুত করবার জন্য কলকাতা পৌরনিগম বহু অর্থব্যয়ে বিদেশ থেকে যে সব মূল্যবান যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে, সেগুলি লবণাক্ত জলের জন্য দ্রুত বিকল হয়ে পড়েছে। সমগ্র পূর্ব ভারতের একমাত্র জলপথ বলতে সাধারণত এই নদীটিকেই বোঝায়। অথচ এই নদীটির নাব্যতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পূর্ব ও উত্তর ভারতের অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে বিপর্যয়। কলকাতা নগরীকে কেন্দ্র করে যে বিরাট শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে তাও আজ দারুণ সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। মোটকথা ভাগীরথীর মৃতপ্রায় অবস্থার ফলে শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই নয়, সমগ্র পূর্ব ও উত্তর ভারতের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও জনস্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ভাগীরথী মৃতপ্রায় হওয়ার ফল : বন্দরের অচল অবস্থা, ব্যয় বৃদ্ধি, কলকাতার পানীয় জলের অভাব, পরিবহনের অসুবিধে ও শিল্পাঞ্চলের সমস্যা

গঙ্গার মূল ধারার দাক্ষিণ্য বঞ্চিত ভাগীরথীর মৃতপ্রায় অবস্থার ফলে ও কলকাতা

বন্দরের কর্মচঞ্চলতা স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় কলকাতাকে বাঁচাবার আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। শুধু বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীর স্বার্থেই নয়—সমগ্র ভারতের স্বার্থে আজ ভাগীরথীকে পুনর্জীবিত ও কলকাতা বন্দরকে বাঁচানো প্রয়োজন। এ প্রয়োজনের কথা শুধু স্বদেশেই নয়, বিদেশেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশ্ব প্রতিষ্ঠান সমূহ এই নদীকে পুনর্জীবিত করে তোলার ও কলকাতা বন্দরকে রক্ষাকরার যৌক্তিকতা স্বীকার করেছে। এই সব ভাবনার ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা দিয়েছে—ফরাক্কাবাঁধ পরিকল্পনা।

সমগ্র ভারতের স্বার্থেই ফরাক্কা বাঁধের প্রয়োজন

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে মিশরের নীলনদ বাঁধের পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণকারী বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার উইলকক্স সাহেব ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার সীমান্তে পদ্মা ও মাথাভাঙ্গা নদীর মিলনক্ষেত্রে একটা বাঁধ দিয়ে নদীয়ার নদীগুলোর সঙ্গে ভাগীরথীর জলপ্রবাহ রক্ষার একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। বিহারে মোকামার সেতু নির্মাণের আগেও এই যেগোযোগ ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা-নদীর ওপর বাঁধ বেঁধে রক্ষা করার জন্য বিশেষ চাপ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। এর পর ১৯৪৮ সালে বিশিষ্ট ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ও ইঞ্জিনিয়ার শ্রী বিশ্বেশ্বরায়ার সভাপতিত্বে একটি কমিশন ফরাক্কা বাঁধের প্রস্তাবকে পরীক্ষা করে দেখে মোকামাতেই ঐ বাঁধ নির্মাণের সুপারিশ করে। কিন্তু ১৯৬৩ সালে কেন্দ্রীয় শক্তি ও জল কমিশন (Central Power of Water Commission) ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী গঙ্গাবাঁধের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে।

ফরাক্কার পূর্ববর্তী পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনা অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলায় ধুলিয়ানের কাছে তিলডাঙ্গা নামক স্থানে গঙ্গার ওপর একটা বাঁধ নির্মিত হওয়ার কথা স্থির হয়। গঙ্গা ও ভাগীরথীর মিলন স্থল থেকে ২০ মাইল উজানে এবং রাজমহল থেকে ১৮ মাইল দক্ষিণে ফরাক্কা নামক স্থানে সম্পূর্ণ ভারতীয় এলাকায় গঙ্গানদীর ওপর ৭৮১২ ফুট দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা হয়েছে। এই বাঁধের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে। এক, ফরাক্কার গঙ্গার ওপর আড়াআড়ি ভাবে একটা বাঁধ নির্মাণ; দুই, বাঁধের পেছনে গঙ্গার দক্ষিণ তীর থেকে একটি ৯ ফুট গভীর ও ২৫০ ফুট চওড়া এবং ২৬½ মাইল দীর্ঘ ফিডার খাল কেটে জঙ্গীপুরে ভাগীরথীর ধারার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। জঙ্গীপুরের যে স্থানটিতে এসে এই খালটি ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত

ফরাক্কার স্থান নির্ণয়, নির্মাণ ও ব্যয়ের বিবরণ

হবে সেই স্থানটিতে একটি জলাধার নির্মাণ; তিন, জঙ্গীপুরে ভাগীরথী ও ফিডার খালের সংযোগস্থলের ওপর আড়াআড়ি ভাবে আর একটা বাঁধ নির্মাণ। এক কথায় বলতে গেলে দুটো বাঁধ নির্মাণ ও একটা খাল খনন নিয়ে রচিত হয়েছে সমগ্র ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্প। এই কর্মসূচী রূপায়নের জন্য মোট ব্যয়ের হিসাব ধরা হয়েছে ৬৮·৫৯ কোটি টাকা। এবং এই কাজ সমাপ্ত করতে সময় লাগবে ৮ বছর।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি

কিন্তু ১৯৬৬ সালের জুন মাসে মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে বাঁধের জন্য বেশী দামে বিদেশী জিনিস আনায় অতিরিক্ত ৬ কোটি টাকা (অর্থাৎ ৯ কোটি থেকে ১৫ কোটি টাকা) বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে বর্তমানে ফরাক্কা বাঁধের মোট আনুমানিক ব্যয় হবে ৭৫ কোটি টাকা বলে ধরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ডঃ কে. এল. রাও ব্যয় বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্পের কাজ বন্ধ করা হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে তাঁর ধারণা—কাজ ত্বরান্বিত হলে এত বেশী টাকা প্রয়োজন হত না।

গঙ্গার ধারা থেকে কিছু পরিমাণ জল ভাগীরথীর বুকে প্রবাহিত করে দিতে পারলে—মৃতপ্রায় ভাগীরথী আবার পুর্ণ জীবিতা হয়ে উঠবে। এই জল বহন করে আনবে ২৬৫ মাইল দীর্ঘ ফিডার খালটি। এই খাল পথে প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ হাজার ঘন ফুট জল পদ্মা থেকে শুষ্কপ্রায় ভাগীরথীতে এসে পড়বে এবং সমগ্র ভাগীরথীর জলপ্রবাহ বর্ধিত হয়ে অবাঞ্ছিত বালির চড়াগুলো ধুয়ে অপসারিত হবে। জলের

ফরাক্কার সমাপ্তিতে প্রাপ্তব্য ফলাফল

চাপ ও গতিবেগ সঞ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীর হারানো নাব্যতা আবার ফিরে আসবে, ফলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন হতে বসেছিল তা আবার সংযোজিত হবে। মুমূর্ষু ভাগীরথী বেঁচে উঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহীন, ক্ষীণ স্পন্দিত কলকাতা বন্দর আবার কর্মমুখর হয়ে উঠবে। বন্দর কর্তৃপক্ষকে মাটি কাটার জন্য অযথা ব্যয় করতে হবে না। ভারী জাহাজগুলো আবার কলকাতা বন্দরে ভিড়লে বন্দরের আয় বৃদ্ধি পাবে। মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, সরস্বতী, যমুনা, কুন্তী, চূর্ণী প্রভৃতি ভাগীরথীর সহিত সংযুক্ত নদীগুলির জলধারণ ও জলবহন শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ফরাক্কায় জল-নিয়ন্ত্রণের ফলে আকস্মিক বন্যার হাত থেকে অববাহিকা এলাকার শস্যোৎপাদন রক্ষা পাবে, এমন কি শীতকালীন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী শিল্পাঞ্চলের সমস্যার সমাধান হবে। কলকাতা নগরীর পানীয় জলের সুরাহা হবে। লবণাক্ত জলে জল শোধনের যন্ত্রপাতি আর সহজে নষ্ট হবে

না। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তর ভারতের নদীপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। গঙ্গায় আড়াআড়িভাবে বাঁধ দেওয়ার ফলে ফরাক্কা বাঁধের ওপর দিয়ে রেলপথ ও যানবাহন চলাচল এবং লোক চলাচলের প্রশস্ত রাস্তা নির্মিত হবে। ফলে অর্থ-নৈতিক সর্বাঙ্গীন উন্নতি হবে। সব চাইতে বড় কথা, প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর এবং পূর্ব ও উত্তর ভারতের অর্থনীতির স্নায়ুকেন্দ্র কলকাতা অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে।

শুধু কলকাতার স্বার্থে নয়—সমগ্র দেশের স্বার্থে ফরাক্কার কাজ যত শীঘ্র সম্ভব শেষ হওয়া দরকার। কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রী ডঃ রাও দলমতের উর্ধ্বে এই সমস্যার সমাধানের অগ্রাধিকার দেওয়ায় দেশবাসী আশ্বস্ত হয়েছেন। ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তির ফলে সোভিয়েত রাশিয়া ভারতকে বুলডোজার, পাইল ড্রাইভার, ভাইব্রো সিংকার প্রভৃতি ন লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি দিয়েছেন। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ১৯৭০-৭১ সালে এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা হয়েছিল; কিন্তু নদী গর্ভে প্রোথিত কয়েকটি স্তম্ভ সম্ভবত ইন্‌জিনিয়ারিং কার্যের ত্রুটির জন্য ভেসে যাওয়ায় শুধু ৭০ লক্ষ টাকাই জলে ভেসে যায়নি, সমগ্র প্রকল্পের কাজের দ্রুত সমাপ্ত হওয়ার সম্ভবনাও হয়েছে বিনষ্ট। এটা পরিতাপের কথা। তবুও ফরাক্কা বাঁধ সম্পূর্ণ হলে বিভক্ত বাংলার পশ্চিম অংশের অর্থনীতিই শুধু রাহুমুক্ত হবে না—সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির রুদ্ধ দ্বারগুলির একটি নিঃসন্দেহে উন্মুক্ত হবে।

উপসংহার

হলদিয়া ঃ এক সম্ভাবনাময় বন্দর

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- হলদিয়া বন্দর ও অবাধ বাণিজ্য
- পূর্ব ভারতের অর্থনীতিতে হলদিয়া বন্দরের স্থান

একদিন হুগলী নদী ছিল প্রাণোচ্ছল। সেই প্রাণোচ্ছল ধারার অকৃপণ দাক্ষিণ্য লাভ করে গড়ে উঠেছিল ভারতের সমৃদ্ধময় ও বৃহত্তম কলকাতা বন্দর। হুগলীর সেই তরঙ্গ উদ্বেল ধারা আজ মৃত্যুর আশঙ্কায় মৃয়মান। এর ফলে অতীতের সমৃদ্ধ কলকাতা বন্দরের ভবিষ্যত হয়ে পড়েছে অনিশ্চিত। এ বন্দর আজ মহা সঙ্কটের সম্মুখীন। সমৃদ্ধ নয়,—সঙ্কটজনক কলকাতা বন্দরের ভবিষ্যত নিয়ে তাই সরকারী ও বেসরকারীর মহলে শুরু হয়েছে জল্পনা-কল্পনা। বহু বছরের কর্ম-জর্জর কলকাতা বন্দরের অন্তিম-লগ্ন যখন সমাসন্ন তখন সেই বিষাদ লগ্নেই পূর্ব ভারতের

প্রারম্ভ

অতীত বাণিজ্য কেন্দ্র তাম্রলিপ্তে নতুন সম্ভবনার সূচনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্তিম পথ যাত্রী কলকাতা বন্দরকে সাহায্যের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি বহন করে জন্ম নিচ্ছে সম্ভাবনাময় বন্দর—হলদিয়া।

মেদিনীপুর জেলার অখ্যাত ও অজ্ঞাত হলদিয়া গ্রাম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতীতের বিশ্ব বিখ্যাত তাম্রলিপ্ত বন্দরের বিপুল ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। আজ এই বিপুল ঐতিহ্যের বুকে জন্ম লাভ করছে হলদিয়া। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের বহু

ঐতিহ্যময় তাম্রলিপ্তের কোলে হলদিয়ার নবজন্ম

পূর্ব থেকেই পশ্চিমবঙ্গের তাম্রলিপ্ত ছিল বন্দর হিসেবে সুপরিচিত। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থের পাতায় এ বন্দরের ঐতিহ্যময় নাম উল্লিখিত হয়েছে বহুবার। মহামতি অশোক এখানে নির্মাণ করেছিলেন একটা বৌদ্ধস্তুপ। এখানে ছিল একটা বৌদ্ধ মঠ। এই স্থানটি ছিল বৌদ্ধদের পুণ্য তীর্থ। তাম্রলিপ্তের অতীত ইতিহাস তাই গৌরবময়। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে এই গৌরব রবি হল অস্তমিত। তরঙ্গ-লালিত তাম্রলিপ্তকে ধূ ধূ বালুচরে পরিণত করে বঙ্গোপসাগর ধাবিত হল আরও দক্ষিণে। মাতৃবক্ষচ্যুত, অবহেলিত সন্তানের মত ক্লান্ত তাম্রলিপ্ত নিদ্রিত হল।

বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে আজ যেন আবার সেই নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে। অস্তমিত সূর্য পূর্বাকাশে অনেক সম্ভাবনার আলোক বিচ্ছুরণ করে উদিত হচ্ছে। মৃত্যুমুখী

কলকাতা বন্দরকে রক্ষা করার বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি নিয়ে জন্ম লাভ করেছে তাম্রলিপ্ত —নতুন নাম নিয়ে। নাম তার হলদিয়া। গঙ্গার মূল ধারা পুষ্ট হুগলী নদী আজ মাতৃস্তন্য বঞ্চিত সন্তানের মতই মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। দ্রুত পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে ক্রমেই মজে যাচ্ছে হুগলী নদীর ধারা। ফলে আজ আর বড় বড় জাহাজ কলকাতা বন্দরে সহজে আসতে অক্ষম। অথচ এশিয়ার বৃহত্তম বন্দরগুলির অন্যতম এই বন্দরে ভারতে আগত মোট বিদেশী জাহাজের একের পাঁচ ভাগ জাহাজ এসে ভিড়ত। একমাত্র সহায়ক বন্দরের সাহায্যেই জাহাজগুলোর আবার কলকাতা বন্দরে আসা সম্ভব।

কোন প্রয়োজনে হলদিয়ার নবজন্ম

জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজীবাণিজ্যে দক্ষ জাপানের বৃহত্তম বন্দর টোকিওর সহায়ক বন্দর ইয়োকাহামার মত পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের বৃহত্তম বন্দর কলকাতার সহায়ক বন্দর রূপেই গড়ে উঠেছে হলদিয়া। প্রতিবেশী রাজ্য উড়িষ্যায় গড়ে উঠেছে নতুন বন্দর—পারাদীপ। এ বন্দরের বিপুল সম্ভাবনা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ আশাবাদী; কলকাতার সহায়ক বা বিকল্প বন্দর হলদিয়ার ভবিষ্যত সম্ভবত তার চেয়েও উজ্জ্বল। বিশ্ব ব্যাঙ্ক এই বন্দরটির ওপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা ১৯৬০ সালে তাঁদের সুপারিশে ১৯৬৪-৬৫ অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনা কালের মধ্যেই এই বন্দরটিকে কার্যক্ষম করে তোলার কথা বলেন। কলকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং সংস্থাও তাঁদের রিপোর্টে লিখেছেন: The importance of the deep sea-port at Haldia as an auxiliary to the Port of Calcutta has been well established with the development of the Haldia Port, urbanization of the immediate vicinity would be inevitable.

সহায়ক বন্দর হলদিয়া

হুগলী ও হলদি নদীর সঙ্গম স্থলে, হলদি নদীর বাঁ তীরে এই স্থানটি মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত। গঙ্গার ধারা বঞ্চিত হুগলী আজ জীর্ণ, কিন্তু কাসাই ও কেলঘাই-এর যুগ্মধারা পুষ্ট হলদি নদী আজও যৌবনোচ্ছল। নদী ধারা সঞ্জীবিত কৃষি প্রধান এই স্থানটিতে কুটির শিল্পের প্রসারও উল্লেখযোগ্য, ফলে লোক বসতিও যথেষ্ট। বহুদিন ধরে এই অঞ্চলের কৃষিজাত দ্রব্য, শিল্প ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি কলকাতার বাজারে চালান দেওয়া হয়। এখন সে নিত্যই কোন কোন দ্রব্য বহির্বিশ্বে প্রেরণের সুযোগ পাবে। বলা বাহুল্য, বড় জনপদ গড়ে ওঠার পক্ষে প্রাথমিক সুবিধেগুলো হলদিয়ার

স্থানোপযোগিতা

এখনই বর্তমান। ভবিষ্যতে এই স্থানে সিমেণ্ট, কাগজ, চীনাবাসন, যন্ত্রপাতির কারখানা গড়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এই সঙ্গে একটি তেল শোধনাগার স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়।

কলকাতা থেকে মাত্র ৫৬ মাইল উত্তরে, হুগলী নদীর পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই স্থানটি থেকে সমুদ্রের দূরত্ব মাত্র ৩০ মাইল। এই বন্দরটি সম্পূর্ণ ভাবে গড়ে উঠলে, কলকাতার মতই এই বন্দরটির পশ্চাদভূমি হবে সমগ্র পূর্ব্বভারত—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কৃষি ও শিল্প-সমৃদ্ধ অঞ্চল। এই পশ্চাদ্‌ভূমিকে নব নির্মিত বন্দরের সঙ্গে যুক্ত করবার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক রেলপথের ও রাজপথের। এখনই সে পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথের পাঁশকুড়া স্টেশনের সঙ্গে ব্রডগেজ রেলপথের এই স্থানটির সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে। এর জন্য খরচ হবে আনুমানিক ৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। শুধুমাত্র রেলপথই নয়, এর জন্য সড়ক ও জলপথের ব্যবস্থা ও সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা হয়েছে। জলপথের সুব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হল উড়িষ্যা ক্যানাল ও হিজলি টাইড্যাল ক্যানাল। সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে হলদিয়া থেকে সুতাহাটা ও তমলুক থেকে পাঁশকুড়া পর্যন্ত দ্রুত যানের উপযোগী করে পথ তৈরী হচ্ছে। বিশেষভাবে মাত্র ৫৬ মাইল দূরের কলকাতার সঙ্গে তার নিবিড় যোগ একান্ত প্রয়োজন। বন্দরের সমৃদ্ধি অনেকখানি পরিমাণে সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

পশ্চাদভূমি

রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা

কলকাতার সার্থক বিকল্প বন্দর হিসেবে এই নতুন বন্দরে থাকবে পাঁচটি বার্থ সম্বলিত একটা ডক। এই পাঁচটি বার্থের দুটি কয়লার, দুটি সাধারণ জাহাজী মাল ও একটি আকরিক লোহার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। এর সঙ্গে খনিজ তেলের জন্য একটা জেটিও থাকবে। কারণ ইতিমধ্যেই ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে এখানে একটি তেল-শোধনাগারের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। হলদিয়া বন্দর নির্মাণ করতে আনুমানিক ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে ধরা হয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে বরাদ্দ হয়েছিল ৭ কোটি টাকা। কথা ছিল ১৯৬৭ সালের মধ্যেই এই বন্দরটির নির্মাণ কার্য শেষ হবে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তা সম্ভব নয়। গত কয়েক বছর ভারতকে নানা সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্ছে বলে অনেক ক্ষেত্রেই আশাজনক অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। বিশেষতঃ ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে টাকার

গঠন পরিকল্পনা ও ব্যয় বরাদ্দ

ব্যয়-বৃদ্ধি

বহির্মূল্য হ্রাস হওয়ায়, বৈদেশিক মালপত্র আনতে এখন বেশি ব্যয় হবে। তাই এই প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত ১৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। চতুর্থ পরিকল্পনা কালের মধ্যেই এই বন্দরটির নির্মাণ কার্য শেষ হওয়ার কথা, তবে তা নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দ্রুত সাহায্য দানের ওপর। আশার কথা এই যে, বিশ্বব্যাঙ্ক এ বিষয়ে কিছুটা তৎপর হয়েছে।

কয়েকটি শিল্প প্রকল্পের কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এই সঙ্গে মার্কিণ প্রতিষ্ঠান ফিলিপস্ পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর সহায়তায় হলদিয়ায় ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি রাসায়নিক সার কারখানা স্থাপিত হওয়ার আয়োজন হচ্ছে।

সার কারখানা স্থাপন

এতে এই অঞ্চলটি শিল্প সমৃদ্ধ হবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বন্দরের সঙ্গে সমগ্র ভারতের আশা আকাঙ্খা জড়িত থাকায়, এরই মধ্যে অনেকের মনে নানা অভাব বোধ জেগেছে। ভারতীয় অনুসন্ধান সমিতি হলদিয়া বন্দরের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রস্তাব করেছে: এই

অবাধ বাণিজ্য বন্দর

বন্দরটিকে একটি "Free Port" রূপে গড়ে তোলা হোক; এই অনুসন্ধান সমিতি এই বন্দরটিকে সবদিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে গোড়ে তোলার জন্য সুপারিশ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভবত এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, কারণ কিছুদিন আগে ভূতপুর্ব কেন্দ্রীয় জাহাজী মন্ত্রী শ্রী রাজ বাহাদুর হলদিয়ার এক সভায় বলেন, কাণ্ডলা বন্দরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই হলদিয়া বন্দরকে অবাধ বাণিজ্য বন্দর রূপে স্থাপন করা হবে। ভারতীয় স্থপতি সমিতিও এই বন্দরকে অবাধ আমদানি অঞ্চল রূপে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী। প্রাচ্যে হংকং,

অবাধ আমদানি এলাকা

সিঙ্গাপুর, প্রভৃতি বন্দরের মতই এই বন্দরটি গড়ে উঠবে। এর জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারিত করে দিতে হবে। কারুর কারুর মতে এই এলাকা হবে ১২৫ মাইল বিস্তৃত, আবার কারুর মতে অন্ততঃ ২০০ বর্গমাইল। তাঁদের মতে হুগলী ও হলদি নদী এবং টাইডাল ক্যানালের মধ্যবর্তী দুশো বর্গ মাইল এলাকা অবাধ বাণিজ্য এলাকা বলে চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। অবাধ বাণিজ্যের সম্ভাবনাকে সার্থক রূপ দান করতে হলে এই অঞ্চলে শিল্প সম্ভাবনার দিকটি ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে। এই অঞ্চলের সুযোগ সুবিধা নেওয়ার জন্য উন্নত দেশগুলো এগিয়ে আসলে ভারতীয় শিল্প তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হতে পারে। সুতরাং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা গুলোকে বিশেষজ্ঞদের পরিচালনায় যোগ্য করে তুলতে হবে। এবং এর জন্য প্রয়োজন হবে এই সব কারখানাকে আমদানি ও রপ্তানি কর মুক্ত করা। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় অনুসন্ধান

সমিতি যা সুপারিশ করেছে, তা হলো : এক অঞ্চলটি ভারতীয় শুল্ক আওতার বাইরে থাকবে; দুই, আভ্যন্তরীণ বাজারেও সে এই সব সুবিধা ভোগ করবে; তিন, ভারতীয় ও বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলো সামান্যতম বিধি নিষেধের মধ্যে থেকে কারখানা স্থাপন ও যন্ত্র-যোজনা করতে পারবে; চার, কাঁচামাল যন্ত্রপাতির অংশবিশেষ ও মূলধনী দ্রব্য শুল্কবিহীন ভাবে আমদানি করতে পারবে; পাঁচ, শ্রমিকেরা দেশী ও বিদেশী হতে পারবে; ছয়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর হবে সুবিধা জনক। এই ভাবে অবাধ বাণিজ্যের বন্দর হিসেবে গড়ে উঠলে হলদিয়া অঞ্চল সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠে শুধু ভারতের প্রতিকুল বাণিজ্যের গতি অনুকূলেই ফিরিয়ে আনবে না, বহির্বাণিজ্য প্রসারের ফলে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার শূন্য ভাণ্ডারটি হয়ে উঠবে পূর্ণ।

প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা ও তার প্রতিকার

নানা দিক থেকে পর্যালোচনা করে সমিতি তার রিপোর্টে এই বন্দরের ভবিষ্যত ভূমিকার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিতে গিয়ে উল্লেখ করেছে যে, বিদেশী কলকারখানা-গুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে বলেই ভারতীয় কলকারখানাগুলো শক্তিশালী হয়ে ওঠার যথাযোগ্য চেষ্টা করবে। দুই, বিঘোষিত সুযোগ সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যেই বহু বিদেশী প্রতিষ্ঠান আকৃষ্ট হয়ে বাণিজ্যের পসরা নিয়ে উপস্থিত হবে, তাতে এ দেশের বাণিজ্য সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে; তিন, এই বন্দর এলাকায় যে সমস্ত কলকারখানা স্থাপিত হবে তাদের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ ভারত থেকেই সংগৃহীত হবে, এতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে, ব্যাঙ্ক, বীমা ও জাহাজী ব্যবসার মাধ্যমে; চার, বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ মজুত রাখবে, তাতে ভারতের সাহায্য হবে; পাঁচ, বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলো যে সমস্ত উৎপন্ন ও আংশিক উৎপন্ন দ্রব্য ভারতকে দেবে তা ভারতেই যোজনা করতে হবে এবং সরবরাহের জন্য প্যাকিং-এর ব্যবস্থাও করতে হবে। ফলে অনেক ভারতীয় উপকরণ যেমন কাজে লাগবে তেমনি নিযুক্ত হবে অনেক ভারতীয় শ্রমিক। এতে দু ধরণের সুবিধা লাভের সম্ভাবনা—বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান।

ভবিষ্যত ভূমিকা

ভারতের বর্তমান সঙ্কটজনক বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের পরি-প্রেক্ষিতে অবাধ বাণিজ্য বন্দর রূপে হলদিয়াকে গড়ে তোলার উৎসাহ থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কলকাতার মত বহু প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত বন্দরে যদি

বহির্বাণিজ্যে শুল্কারোপ ব্যবস্থা চালু থাকে, তা হলে এই বন্দরকে অবাধ বাণিজ্য বন্দর করলে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা এবং অসম শুল্কনীতির প্রতিক্রিয়া ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে। সুতরাং বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে। সুতরাং উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে ক্ষতির দিকটি বিস্মৃত হওয়া সমীচীন নয়। এ ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অবাধ বাণিজ্য বন্দর যেমন হংকং, সিঙ্গাপুর, এডেন প্রভৃতির দিকে তাকালে দেখা যায় এই সব বন্দর সমাজবিরোধীদের তীর্থভূমি, দুষ্টচরিত্রদের স্বর্গরাজ্য, দুর্নীতির লীলাক্ষেত্র। সেখানে মানবিক ও সামাজিক দিক থেকে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখা সুকঠিন। সুতরাং নৈতিক দিক থেকে বিষয়টি অবশ্য বিচার্য।

ক্ষতির দিকও উপেক্ষনীয় নয়

আশঙ্কার কারণ থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা তুচ্ছ। সমস্যা জর্জ্জরিত ভারতের পক্ষে এই বন্দর স্থাপনের আশু প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মুদ্রামূল্য হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও যে রকম উৎসাহে এখানে কাজ অগ্রসর হচ্ছে, তাতে আশা করা অন্যায় নয় যে মৃতকল্প কলকাতা বন্দরের বলিষ্ঠ সহায়ক ও বিকল্প বন্দর রূপে হলদিয়া অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠবে। দেখা দেবে ভারতের অর্থ নৈতিক আকাশে নতুন সূর্যোদয়ের ঊষা-লগ্ন।

উপসংহার

ইউরোপীয় সাধারণ বাজার ও ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ

এই প্রবন্ধের অনুসরণে
- বৃটেনের ইউরোপীয় বাজারে যোগদান বনাম ভারতীয় অর্থনীতি [ব, বি, '৬২ ত্রৈবার্ষিক]

প্রারম্ভ

এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তৃত মহাদেশ জুড়ে অসংখ্য উপনিবেশই ছিল ইউরোপীয় শক্তি গোষ্ঠীর প্রধান আশ্রয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিধ্বংসী অভিঘাতে আজ ইউরোপীয় দেশগুলো সেই আশ্রয় থেকে চ্যুত হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, ঘুমন্ত এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে যে জাগরণের পালা শুরু হয়েছে; দেখা দিয়েছে বৈষয়িক উন্নতির বিপুল সম্ভাবনা তাতে ইউরোপ বুঝতে পেরেছ যে এই সব দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে সম্পদ আহরণের সুযোগ চিরগত। তাই সর্বস্বান্ত ইউরোপ অনুভব করল যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন আশু প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজন একক ভাবে নয়—ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় মাধ্যমেই করা সম্ভব। ১৯৪৫ সাল থেকেই ইউরোপ এই প্রয়োজন অনুভব করতে থাকে এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। এই সঙ্কল্পেরই বাস্তব রূপ হল: ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংস্থা [EFTA] ও ইউরোপীয় সাধারণ বাজার [ECM]।

তৃতীয় শক্তি রূপে ইউরোপ

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রশ্নটিই বিবেচিত হয়নি, তার পাশাপাশি রাজনৈতিক কারণটিও আলোচিত হয়েছিল। কারণ একদিকে পারমানবিক শক্তির অধিকারী সোভিয়েট ইউনিয়ান ও অন্যদিকে মার্কিনী শক্তিশিবির। এই দুই শক্তির প্রতিস্পর্দ্ধীয় তৃতীয় শক্তি নেই। যদিও এই দুই বৃহৎ শক্তির একটি—সোভিয়েত ইউনিয়ান সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত, তবুও ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ আন্দোলনের অংশ গ্রহণকারীরা, বিশেষতঃ ফরাসী মন্ত্রীরা সোভিয়েত রাশিয়ার ঘোর বিরোধী। আবার ইউরোপে মার্কিন শক্তি ও সংস্কৃতির প্রসারও তাদের অভিপ্রেত নয়। তাই তাঁরা এই দুই শক্তিকে অগ্রাহ্য করে ইউরোপের ক্ষুদ্র শক্তিগুলো সম্মিলিত করে তৃতীয় শক্তিচক্র গড়ে তুলতে প্রয়াসী হল। আমেরিকা এই তৃতীয় শক্তি গোষ্ঠী গড়ার ইচ্ছাকে সমর্থন জানালেও ফরাসী নেতৃবৃন্দ তা গ্রহণ করেননি। তখন শুধুমাত্র ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলি একত্রে মিলিত হয়ে তৃতীয় শক্তি গোষ্ঠী গড়ে তুলল।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কিন্তু একটু ভিন্ন তথ্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৪৭ সালে ইউরোপের ১৬টি দেশ যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল আমেরিকার তৎকালীন সেক্রেটারী মার্শালের কাছে। এবং তাঁরা সাহায্যও লাভ করেন। এই মার্শাল পরিকল্পনাকে ইউরোপের পুর্নগঠন কর্মসূচী (European Recovery Programme) নামে চিহ্নিত করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপের ১৭টি দেশ ১৯৪৮ সাল থেকে চারবছর ২০০ লক্ষ ডলার সাহায্য পায়। এই দেশগুলো হল ইতালী, গ্রীস আইসল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, নরওয়ে, পর্ত্তুগাল, সুইডেন, টার্কী, ব্রিটেন পশ্চিমজার্মানী ও ত্রিয়েস্তা। চার বছর ধরে আমেরিকার পক্ষের এই কার্য পরিচালনা করে অর্থনৈতিক সংযোগ পরিচালন সংস্থা (Economic Co-operation Administration)। বলাবাহুল্য, এই সংস্থা বিপর্যস্ত ইউরোপের বিধ্বস্ত আর্থনীতিক ব্যবস্থাকে অনেকখানি পরিমাণে দৃঢ় ভিত্তিক করে তুলতে পেরেছিল। ১৯৫২ সালে এই পরিকল্পনায় আয়ুষ্কাল শেষ হয়।

মার্শাল পরিকল্পনা:
ইউরোপীয় পুনর্গঠন কর্ম্মসূচী

এই একই সময়ে আরও কয়েকটি পরিকল্পনার কথা ইউরোপে শোনা গেছে, যেমন: কাউন্সিল অব ইউরোপ (Council of Europe) নাটো (NATO) শুম্যান প্ল্যান (Schuman Plan) প্লীভেন প্ল্যান (Plevan Plan) বোনেফস প্ল্যান (Bonefous Plan) ফ্লিমলিন প্ল্যান (Flimlin Plan) প্রভৃতি। তবে এই সব পরিকল্পনার মধ্যে সব চাইতে বেশী তাৎপর্য পূর্ণ হল ইউরেটাম (Euretom) এবং ইউরোপীয় সাধারণ বাজার (European Common Market)।

আরও কয়েকটি
পরিকল্পনা

মার্শাল পরিকল্পনার মাধ্যমে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব একটু একটু করে দানা বেঁধে উঠছিল; ১৯৫৭ সালের ২৫শে মার্চ তারই সার্থক রূপায়ন ঘটল রোমচুক্তিতে (Treaty of Rome)। ২৪০টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত এই চুক্তির ফলে ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও লুক্সেমবার্গ এই ছটি দেশ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সংহতি সৃষ্টির সঙ্কল্প গ্রহণ করল। এই রাষ্ট্র ছটিই ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সমাজ নামে পরিচিত। এই ছ-টি রাষ্ট্রকে সংক্ষেপে আভ্যন্তরীণ ছয় (inner six) বলা হয়। চুক্তি অনুসারে চোদ্দ বছরের মধ্যে এই দেশগুলো পরস্পরের

রোম চুক্তি:
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক
ও সাংস্কৃতিক বন্ধন

মধ্যে শুল্ক বিহীন অবাধবাণিজ্য এবং চুক্তি বহির্ভূত দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য ব্যাপারে একটি শুল্ক প্রাচীর স্থাপনেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই যে ছয়টি রাষ্ট্র জুড়ে অবাধবাণিজ্যের ব্যাপারে সম্পর্ক গড়ে উঠল এর নাম হল ইউরোপীয় সাধারণ বাজার। ছটি সদস্য রাষ্ট্র তাদের সঙ্কল্পকে সার্থক করার উদ্দেশ্য পরিচালনার জন্য একটি কমিশন (Common Market Commission), ছয় রাষ্ট্রের আইন সভার সদস্যদের নিয়ে একটি সংসদীয় সদস্য সমিতি (Assembly of Parliamentarians), একটি যুক্ত মন্ত্রী পরিষদ (Council of Ministers) ও একটি আদালত (Court of Justice) গঠন করেছে।

ইউরোপীয় সাধারণ বাজার প্রতিষ্ঠা

ব্রিটেন প্রথমে আভ্যন্তরীণ ছয়-এর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে ব্রিটেন সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, পর্তুগাল ও সুইজ্যারল্যাণ্ড—এই সাতটি দেশ ধাপে ধাপে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে সমতালে শুল্ক হ্রাস ও শুল্কবিহীন অবাধ বাণিজ্য স্থাপনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এই সাতটি রাষ্ট্র হল বহিস্থ সপ্তক (Outer Seven)। এই বহিস্থ সপ্তকের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলো ইতিপূর্বে ব্রিটেনের নেতৃত্বে ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংস্থা (European Free Trade Association) গঠন করেছিল। ব্রিটেনে এই সংস্থার স্বার্থেই ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদানে বিরত ছিল। কিন্তু অন্তর্বিরোধের ফলে এই সংস্থাটির অকাল মৃত্যু ঘটে, ফলে ব্রিটেনের ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে প্রবেশের সিদ্ধান্তটি নিয়ে পুনর্বিবেচনায় বসতে হয়। শেষ পর্যন্ত সে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বহিস্থ সপ্তক

ব্রিটেন যে প্রথম থেকেই ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগ দিতে সম্মত হয়নি তার কারণ হিসেবে অনেকে বলেন যে, ফরাসী নেতৃত্বে আমেরিকাকে উপেক্ষা করে যে সমাজের উদ্ভব এবং যে অর্থনৈতিক জোট, ব্রিটেনের অবাধ বাণিজ্যের আদর্শের পরিপন্থী ব্রিটেন তার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারে না। উপরন্তু ফরাসী নেতাদের জোট সাধনের একটি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল জার্মাণ-ফরাসী মৈত্রী বন্ধন দৃঢ় করা। ব্রিটেন এই ব্যাপারটিও সহজ দৃষ্টিতে দেখেনি। সর্বশেষে কমনওয়েলের স্বার্থেও ব্রিটেন এই বাজারে যোগদান করেনি।

সাধারণ বাজারে যোগ না দেওয়ার অন্যান্য কারণ

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে ব্রিটেনের যোগদানের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের

পেছনে কতকগুলো অর্থনৈতিক কারণ বর্তমান। যেমন, পরস্পর বিরুদ্ধ বাণিজ্য গোষ্ঠীর অবস্থানে অতলান্তিক চুক্তির কার্যকরীতা গুরুত্ব হারাচ্ছিল : ব্রিটেন বাইরে থাকায় ১৭ কোটি লোক সমৃদ্ধ সম্প্রসারণশীল ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে পণ্য বিক্রির স্বর্ণ সুযোগ হারাচ্ছিল; অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে এই সদস্য রাষ্ট্রগুলির সাহায্য ব্রিটিনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কমনওয়েলথভুক্ত দেশ ও উপনিবেশগুলিতে ব্রিটেনের বাণিজ্য নিম্নমুখী; শুল্ক প্রাচীরের বাইরে থাকায় শুল্ক বৈষম্যর সম্মুখীন; দুই শক্তিগোষ্ঠীর পাশাপাশি নিজের স্থান করে নিতে ব্রিটেনের আগ্রহ; শিল্পের ক্ষেত্রে নব নব আবিষ্কারের সুযোগ লাভ করা একান্ত প্রয়োজন এবং ব্রিটেনের ধারণা হল ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে প্রবেশ করলেই সে কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ বেশী করে রক্ষা করতে সমর্থ হবে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির বৈষয়িক সমৃদ্ধির রুদ্ধ দুয়ার যাবে উন্মুক্ত হয়ে। কিন্তু ব্রিটেন সাধারণ বাজারে যোগদানের জন্য এই ছ-রাষ্ট্রের কাছে যে আবেদন পত্র পেশ করে, ১৯৬৩ সালে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের কর্তৃপক্ষ তা নাকচ করে দেন।

যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে ব্রিটেনের যোগদানের সম্ভাবনা এখনও সম্পূর্ণ ভাবে তিরোহিত হয়নি। ইউরোপীয় সাধারণ বাজার চালু হয়েছে এবং সদস্যদের সংহতি ও শক্তির স্বার্থে গতিশীল সংস্থা হিসেবে (Dynamic Institution) এ সংস্থা সক্রিয় থাকবে বলেই আশা করা যায়। ব্রিটেন শেষ পর্যন্ত এই বাজারে যোগ দলে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির অসুবিধা হওয়ারই কথা। ব্রিটেন সমেত ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের চা রপ্তানী শতকরা ১৯ ভাগ, জামাইকার চিনি রপ্তানী শতকরা ২৩ ভাগ, নাইজিরিয়ার তৈলবীজ ও বাদাম রপ্তানী শতকরা ৪৩ ভাগ, সিংহলের চা রপ্তানী শতকরা ৬১ ভাগ এবং ঘানার কোকো রপ্তানী শতকরা ৬২ ভাগ ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টেও এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের খ্যাতনামা সদস্য শ্রী ডগলাস জে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে মে সংখ্যার নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকায় এই মত প্রকাশ করেন যে, অনিশ্চিত এবং সম্ভবত ভূয়া অর্থনৈতিক লাভের আশায় ব্রিটেনের পক্ষে কমনওয়েলথের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগ দেওয়া সঙ্গত নয়।

ব্রিটেন সাধারণ বাজারে যোগদান করলে কমনওয়েলথের ক্ষতি

ব্রিটেন উৎপাদন ও মুনাফা উভয় দিক থেকেই ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির তুলনায় ক্রমেই পেছিয়ে পড়েছে। ব্রিটেনের কর্তৃত্বাধীন সংস্থা ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল (EFTA) ঠিকভাবে চালু থাকলে হয়তো ব্রিটেন সাধারণ বাজারে যোগদানের প্রশ্নটি এভাবে দেখত না। এখন ব্রিটেন নিজের স্বার্থেই যোগদান করবে। বলা বাহুল্য, নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্রিটেন যদি কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি না রেখে সাধারণ বাজারে যোগদান করে, তবে ভারতও পরিবর্তিত অবস্থার নিরিখে আত্মরক্ষার জন্য নতুন বহির্বাণিজ্য-নীতি অনুসরণেও প্রবৃত্ত হবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভারত এখন অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে লিপ্ত থাকায় ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের প্রশ্নটি স্বভাবতই তাকে উদ্বিগ্ন করেছে।

বহির্বাণিজ্যে ভারত তার নিজের পথ সুনির্দিষ্ট করে নেবে

ইউরোপীয় সাধারণ বাজার গঠনের ফলে ইউরোপীয় দেশগুলো অর্থনৈতিক স্বার্থে যেভাবে একতাবদ্ধ হয়েছে, তাতে আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে তার প্রতিক্রিয়া না দেখা দিয়ে পারে না। ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের সহযোগী সদস্য হিসেবে যোগদান করলে বিশেষ সুবিধে পাওয়া যাবে না বলেই অনেকের বিশ্বাস। তাই এই পরিস্থিতিতে অনেকেই আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোকে নিয়ে, কেউ কেউ আবার শুধুমাত্র এশিয়ার দেশগুলোকে নিয়ে নতুন সাধারণ বাজার গড়ে তোলার কথা বলেছেন। এই জাতীয় সাধারণ বাজারের সাফল্য সম্পর্কে তাঁরা আশাবাদী।

এশিয় সাধারণ বাজারের প্রস্তাব

ভারত আজ যখন পরিকল্পিত অর্থনীতির সুষ্ঠু রূপায়ন ও আপন ভাগ্যের ভিত্তি রচনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলেছে তখন তাকে বাণিজ্য-নীতির পুনর্বিবেচনা ও পুনর্বিন্যাসে মনোযোগী হতেই হবে; তাকে হতে হবে নতুন পথের পথিক। কারণ কমনওয়েলথভুক্ত দেশ হিসেবে কিছু কিছু সুবিধে ভোগ করলেও, দীর্ঘমেয়াদে ভারত কোনরকম সুবিধে পাবে বলে আশা নেই—এই জন্যই প্রথমতঃ ভারতের রপ্তানী শিল্পগুলোকে ব্যাপকভাবে পুনর্গঠিত (Rationalised) করে উৎপাদন ব্যয় বিশেষ ভাবে হ্রাস করতে হবে ও পণ্যের মানের উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। শুল্ক প্রাচীর অতিক্রম করে সাধারণ বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হবে ভারতের আত্মরক্ষামূলক বাণিজ্যনীতির সবচেয়ে শানিত অস্ত্র। এই সঙ্গে পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যিক গাঁটছড়া বেঁধেও ভারতকে দ্রুত উন্নতির পথে দুর্বার অভিযান করতে হবে।

উপসংহার

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভূমিকা ও ভবিষ্যত

এই প্রবন্ধের অনুসরণে
● ইউ, এন, ও [ক, বি, '৫৯]

বিজ্ঞানের আশীর্বাদ-ধন্য বিংশ শতাব্দী যুদ্ধাভিশাপে অভিশপ্তও বটে। একই শতকে পর পর দুটি বিশ্ব-যুদ্ধে মানব জাতি দেখেছে মানবাত্মার চরমতম লাঞ্ছনা; মানবতার অপমৃত্যু। বিশ্বযুদ্ধের রক্তমুখী অগ্নিশিখায় পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে অসংখ্য অসহায় নরনারীর করুণ, বিকৃত মুখচ্ছবি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে

প্রারম্ভ

আণবিক বোমার নিঃশব্দ আক্রমণে হিরোসিমা ও নাগাসাকি যেদিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল সেদিন মানুষ লক্ষ্য করেছিল দাম্ভিক শক্তিমানের পৈশাচিক প্রেতনৃত্য। জাপানের বুকে সেদিন রচিত হয়েছিল মানবতার চিতাশয্যা। এমনি করেই অতীত যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যুদ্ধাগ্নিতে শ্যামল ধরিত্রী, সম্পদশালী নগরী, সম্ভাবনাময় জনপদ গেছে ধ্বংস হয়ে। আবার এই অগ্নিশিখা নির্বাপিত হলে এই মানুষেই চোখের জলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। যুদ্ধ-ক্লান্ত মানুষ শান্তির জন্য প্রার্থনা জানিয়েছে।

বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্কটকালে মানুষের শুভবুদ্ধিই বিশ্বকল্যাণ স্থাপনের একমাত্র পথ। পৃথীবিতে মানুষে মানুষে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে আদর্শগত পার্থক্য চিরদিনই ছিল

রাষ্ট্রসঙ্ঘের জন্ম-লগ্ন

ভবিষ্যতেও থাকবে; মত ও পথের ভিন্নতা ও পথস্বাতন্ত্র্য শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম-সঙ্কটকে ডেকে আনলে বিশ্ব দাঁড়াবে অনিবার্য ধ্বংসের মুখে। সভ্যতার উন্নতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ মানুষকে যদি হিংস্র পশুর আরণ্যক জীবনের পারস্পরিক হিংসার পরিবেশে এনে উপস্থিত করে, তাহলে হাজার হাজর বছরের মানুষের সাধনা অগণিত মানুষের আত্মদান মুহূর্তের মধ্যে হয়ে দাঁড়াবে মূল্যহীন। সুতরাং পারস্পরিক বোঝাপড়াই হল আন্তর্জাতিক মত ও পথভিন্নতার মধ্যে সর্বসম্মত আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রকৃত পথ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বগ্রাসী মারণযজ্ঞে রসদ যুগিয়ে পৃথিবী যখন অবসন্ন, যখন পুনরায় যুদ্ধবাজের দল নতুন নতুন অস্ত্র শানাতে ব্যস্ত; যখন শিবিরে শিবিরে চলেছে তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি; সেই সঙ্কটময়-লগ্নে ভূমিষ্ঠ হল রাষ্ট্রসঙ্ঘ। মানব জাতিকে সার্বিক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাকরার শুভকামনায় উদ্বুদ্ধ বিরাশীটি রাষ্ট্রের সম্মেলনে গড়ে উঠল রাষ্ট্রসঙ্ঘ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের উপর বহু রাষ্ট্র সমবেত হয়ে শান্তির প্রত্যাশায় গড়ে তুলেছিল জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) ১৯২০ সালে, কিন্তু এই আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থায়ী হতে পারেনি। কুড়ি বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণদামামা বিশ্বের আকাশ বাতাস মুখরিত করে শান্তিকামী মানুষের কণ্ঠস্বরকে দিল ডুবিয়ে। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির তীব্র বিরোধিতার ফলে জাতিসঙ্ঘ সেদিন পারেনি নিরপরাধ পৃথিবীকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের হাত থেকে রক্ষা করতে। আন্তর্জাতিকে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও বিশ্বের নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার মৌল আদর্শ সম্মুখে রেখে যে জাতিসঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল তা ব্যর্থ হয়ে গেল। আণবিক মারণাস্ত্রের পৈশাচিক আক্রমণে পৃথিবী আবার মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠল, হিরোসিমা ও নাগাসাকির লক্ষ কোটি মানুষ ও মানুষের ভবিষ্যত ধূলিসাৎ হয়ে গেছে যুদ্ধবাজদের সমর-তৃষ্ণা নিবারণ করতে। এই আক্রমণ পৃথিবীর বুকে যে বীভৎস নারকীয়তার সৃষ্টি করেছিল তাই শান্তিকামী ৮২টি রাষ্ট্রের শুভবুদ্ধির উদ্বোধন ঘটিয়েছিল।

জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস স্তূপের ওপর গড়ে উঠেছিল জাতি সঙ্ঘ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত হল রাষ্ট্রসঙ্ঘ—১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। তবে এই আন্তর্জাতিক বিশ্বসংস্থা আগের প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক বেশী বলিষ্ঠ। ১৯৬৭ সালেও এই সংস্থা ক্রমবর্ধমান। চারিদিকের প্রবল ঝঞ্ঝাকে অস্বীকার করেও, অন্ধকারের গোপন ষড়যন্ত্রকে অস্বীকার করেও যে আজও বিশ্বশান্তির এই প্রদীপটি প্রজ্জলিত আছে এটা মানব জাতির পক্ষে পরম আশার আশ্বাস এনেছে। যেদিন এই মঙ্গল প্রদীপটি নির্বাপিত হবে সেদিন বিশ্বের বুকে নেমে আসবে অমঙ্গলের অমানিশা।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ-মানব জাতির আশার প্রদীপ

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের বিরাশীটি রাষ্ট্রের সমাহারে যে সংস্থা গড়ে উঠেছিল সেই সংস্থার পতাকা তলে আজ আফ্রিকা এশিয়ার সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি এসে একে একে সমবেত হওয়ায় এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বর্তমানে একশো আটাশে। এরা সকলেই সাধারণ পরিষদের (General Assembly) সদস্য। বিবদমান বিশ্বের যে কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার এই পরিষদের আছে। এই সব সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতে এদের আছে শুধু মাত্র নৈতিক ক্ষমতা। কিন্তু এই সাধারণ পরিষদ ব্যতীত আর একটি পরিষদ আছে তার নাম নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)। কোন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্র

সাধারণ পরিষদ ও নিরপত্তা পরিষদের অধিকার সীমা

কর্তৃক আক্রান্ত হলে নিরাপত্তা পরিষদের কাছে আবেদন করতে পারে। এই নিরাপত্তা পরিষদে আছে এগারটি সদস্য দেশ, এর মধ্যে রাশিয়া, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীন এই পাঁচটি দেশে স্থায়ী সদস্য অবশিষ্ট ছুজন সদস্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দু বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। পাঁচটি সদস্য দেশের হাতে একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে তা হল 'ভেটো' প্রয়োগের ক্ষমতা অর্থাৎ নাচক বা বাতিল করার ক্ষমতা। যদি কোন সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয় তবে স্থায়ী সদস্যের যে কেউ তা ভেটো প্রয়োগ করে বাতিল করার অধিকার রাখে। যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

যুদ্ধাতঙ্কে উৎকণ্ঠিত বিশ্বকে শান্তির ললিত বাণী শোনানই রাষ্ট্রসঙ্ঘের একমাত্র কর্তব্য নয়। তার কার্যাবলী বহুমুখী ও বিচিত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরও পৃথিবীতে কোনো কোনো বিরোধ থেকে রক্তাক্ষয়ী সংঘর্ষের সূচনা হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্মতৎপরতায় সংঘর্ষ সূচনাতেই সমাপ্তি লাভ করেছে। কোরিয়া ও কঙ্গোর যুদ্ধ যে তৃতীয় মহাযুদ্ধে পরিণত হয়নি, তার কৃতিত্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘের। এই রাষ্ট্রসঙ্ঘই ইঙ্গমার্কিণ বোমার আঘাত থেকে সমাজতন্ত্রী মিশরকে রক্ষা করেছে, মার্কিণ সৈন্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে দুর্বল লেবাননকে। যদিও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে ভারত-পাক উপমহাদেশের 'কাশ্মীর বিরোধ' ও ভিয়েতনামে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের উলঙ্গ আক্রমণের কোন নিষ্পত্তি আজও রাষ্ট্রসঙ্ঘ করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখযোগ্য।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ; নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা

শুধু মাত্র রাজনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের মধ্যেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্তব্য সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক পৃথিবীতে একটি বৃহৎ যৌথ পরিবার হিসেবে বাস করার শিক্ষাদানের ব্রতও সে গ্রহণ করেছে। রাজনৈতিক বিরোধ ছাড়াও অর্থনৈতিক বৈষম্যও যে বিশ্বের অশান্তির মূলীভূত কারণ এ সম্পর্কেও রাষ্ট্রসঙ্ঘ সচেতন। তাই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের অনুন্নত রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যাগুলির সমাধান ও মানবিক অধিকারগুলির প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দীক্ষায়ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ দীক্ষিত।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থিক, সাংস্কৃতিক উন্নতি

অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিশ্বের শক্তিমান দেশগুলো যখন তাদের কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে তখন শক্তিমান বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাধে

সংঘর্ষ; দেখা দেয় সংঘাত। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই সংঘাতের অগ্নি যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তারই জন্য সদা তৎপর। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই তৎপরতার পরিচয় দিয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য-সাধনে যে সংস্থাটি আছে তার নাম অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা (Economic and Social Council).

পৃথিবীতে যতদিন অনুন্নত দেশগুলি সার্বিক সমুন্নতি লাভ না করছে, ততদিন ঠিক যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে মানবজাতির মুক্তি নেই। তাই অনগ্রসর দেশগুলিকে নানা দিক থেকে অগ্রসর করে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান বিতরণের আয়োজন করে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জেনেভায় ৮৭টি রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ মিলিত হন। এই সম্মেলনে অনুন্নত দেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার জরীপ, মূলধন গঠনের ব্যবস্থা, মানব সম্পদের উন্নতি, বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও কারিগরি সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নানা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দপ্তর স্থাপিত হয়।

১৯৬৩র জেনেভা সম্মেলন

বিশ্ব ব্যাঙ্ক (World Bank) আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (I. M. F.), রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (ITO), শিশুদের জন্য আন্তর্জাতিক জরুরী তহবিল (UNICEF), শুল্ক ও বাণিজ্যের সাধারণ চুক্তি (GATT), রাষ্ট্রসঙ্ঘের কারিগরি সাহায্য কার্যসূচী (UNTAP), আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMP), পুনর্গঠন উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (IBRD), আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি (IDA), প্রভৃতি অর্থ নৈতিক সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া আছে এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন (ECAFE)। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্গত এই সমস্ত সংস্থা মানবজাতির সেবায় নিযুক্ত। এইসব অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানব কল্যাণ-মূলক কাজে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিশ্বের সকল জাতিকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে। উচ্চারণ করেছে সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছার মন্ত্র।

নানা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দপ্তর

দীর্ঘদিন ধরে দেশের অনুন্নত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা হয়েছে শোষিত। শোষণের ফলে অনেক সম্পদ ও সম্ভাবনার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এইসব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো দরিদ্র অক্ষম ও শ্রীহীনই থেকে গেছে। আজ রাষ্ট্রসঙ্ঘের কল্যাণে এই ক্ষুদ্র, শক্তিহীন দেশগুলোর সামনে খুলে গেছে উজ্জল ভবিষ্যতের রুদ্ধ দুয়ার।

এতদিন যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর সম্পদ নিয়ে বাণিজ্য করেছে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো, আজ সেই সম্পদের অধিকার পেয়েছে তারা নিজেরাই। তাই বিশ্ববাণিজ্য-লক্ষ্মী আজ আর বৃহৎ শক্তিগুলির কাছে স্বর্ণশৃঙ্খলে বন্দিনী নন, আজ বন্দিনী বাণিজ্যলক্ষ্মী পেয়েছেন মুক্তি। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি আজ বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতাতেও অবতীর্ণ হয়েছে। এবং নিজেদের বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করছে। বিশ্বে আজ দুটি শক্তিশিবির বর্তমান। এই দুই শক্তি শিবিরের মধ্যে ছিল দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। রাষ্ট্রসঙ্ঘ সে প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়েছে। বিশ্ববাণিজ্যের ভবিষ্যত তাই হয়েছে স্বর্ণোজ্জ্বল সম্ভাবনায় উদ্ভাসিত।

দুর্বল রাষ্ট্রগুলির স্বাধিকার লাভ ও বিশ্ববাণিজ্যের দুয়ার হয়েছে উন্মুক্ত

এত সত্ত্বেও কি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাফল্য সন্দেহাতীত? দ্বিধাবিহীনকণ্ঠে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ আজও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাফল্য সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সন্দেহের অবসান ঘটেনি। এখনও এবিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, ধনতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও বর্ণবৈষম্যের কুৎসিত আক্রমণে মানবতা নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অপমানিত। এইসঙ্গে আছে কয়েকটি সামরিক জোট। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে সামরিক আঁতাতে হয়েছে চুক্তিবদ্ধ। অতলান্তিক চুক্তি গড়ে উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, স্পেন ও পর্তুগ্যালকে নিয়ে। এই সামরিক জোটের ছত্রছায়ায় থেকে স্পেন ও পর্তুগ্যাল বিশ্বের বুকে আজও চালিয়ে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক গোপন ও ঘৃণ্য যড়যন্ত্র। এই সমষ্টি শক্তির ওপর নির্ভর করে এই ক্ষুদ্র দেশ দুটি চালাচ্ছে বর্বর অত্যাচার। সাম্রাজ্যবাদ কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সময়ে এমনি করেই, ন্যাটো, সিয়াটো, বাগদাদ চুক্তি সম্পাদন করেছে। এই সামরিক চুক্তিগুলি রাষ্ট্রসঙ্ঘকে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন করেছে। বিশ্বের কোন কোন রাষ্ট্রে কুৎসিত বর্ণবৈষম্য প্রথার ফলে মানবাত্মার অপমান ও লাঞ্ছনাও আজ রাষ্ট্রসঙ্ঘের দুয়ারে প্রতিকার প্রার্থনা করছে। আজও দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলি বর্ণাভিমানী মানুষরূপী পশুদের শিকার হয়ে রয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ কি এই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না?

রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণ-বৈষম্যের ত্রিমুখী আক্রমণের সম্মুখীন

রাষ্ট্রসঙ্ঘ যদি বিশ্বরাষ্ট্র গোষ্ঠীর সহযোগিতার মাধ্যমে 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি'তে 'নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্বের অবসান' ঘটিয়ে, বিদ্বেষ ও সন্দেহের পথ রুদ্ধ করে সকল জাতির মনে বিশ্বাস, মৈত্রী জাগ্রত করতে পারে, যদি বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়, তবে রণক্লান্ত বিশ্বের বুকেই প্রতিষ্ঠিত হবে মানব কল্যাণ ও সমৃদ্ধির চিরন্তন স্বর্গরাজ্য।

উপসংহার

গণতান্ত্রিক সমাজবাদঃ ভারতের লক্ষ্য

এই প্রবন্ধের অনুসরণে
● গণতন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা [ব বি '৬২]

মানব সভ্যতার সূচনাকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত পৃথিবী বহুবার রক্তস্নান করেছে। হিংসা-পীড়িত ও ঘৃণা জর্জর বিশ্বের মানুষ দু দুটো মহাযুদ্ধের বীভৎস রূপ দেখে আতঙ্কিত হয়েছে। শঙ্কাতুর পৃথিবীর মানুষ তাই অতীতকাল থেকেই সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রত্যাশী। দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ, সমর-ক্লান্ত বিশ্বের মানুষ তাই এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেছে, যে সমাজের মানুষ মানুষের প্রতি করবে না অন্যায় অবিচার, নির্মম নিপীড়ন;

প্রারম্ভ

এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীকে শোষণ করে তাদের নিঃস্বতা, রিক্ততা ও দারিদ্র্যের চরম অভিশাপে অভিশপ্ত করে তুলবে না। এমন এক সমাজ গড়ে উঠবে যেখানে থাকবে না শ্রেণী-সংঘাতের বিদ্বেষাগ্নি, নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ, থাকবে না ধনবৈষম্যের কদর্য রূপ। ন্যায় সঙ্গত বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে যেদিন এমন এক ধনবৈষম্যহীন সমাজ গড়ে উঠবে যেখানে সকলের থাকবে সমান সুযোগ ও সমান অধিকার, বিশ্বের বুকে সেইদিন প্রকৃত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে।

ধনী ও নির্ধনের দ্বন্দ্ব, অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের সংঘাত আজকের পৃথিবীতেই নতুন নয়। অতীতেও ছিল মানবতার চরমতম লাঞ্ছনা। তাই প্লেটো তাঁর বিখ্যাত 'Republic' গ্রন্থে সেই সমাজের কল্পনা করেছিলেন যেখানে সম্পদ হবে সমবণ্টিত। তিনি বিশ্বাস করতেন: অর্থনৈতিক জীবনের ব্যাধি দূর করার এই হল একমাত্র পথ। খ্রীষ্টান ধর্ম-নেতারাও নিপীড়িত মানবতার জন্যও খ্রীষ্টান সমাজতন্ত্রের (Christian Socialism) কথা ঘোষণা করেছিলেন।

প্লেটোর রিপাবলিক গ্রন্থের সমাজব্যবস্থা

এরপর পৃথিবীর বুকে দেখা দিয়েছিল অন্ধকার মধ্যযুগ। এই যুগে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে অধিকাংশ মানুষ ক্রীতদাস হিসাবেই জীবনে অন্তহীন দারিদ্র্য ও দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেছে। জগতে মানবতার এই চরম লাঞ্ছনা ও সুতীব্র অপমান আদর্শবাদী মানুষের মনকে বারবার নাড়া দিয়েছে। তাঁরা তখন এমন এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার কল্পনা করেছেন যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হবে বিলুপ্ত, এবং প্রতিটি মানুষ জীবন ধারণের জন্য জীবিকা অর্জন করবে। এই স্বপ্নেরই

অনেকখানি রূপায়ন ঘটেছে বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট রাশিয়ায়। সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সার্থক রূপায়নে আজ বিশ্বের বহু শোষিত অনুন্নত ও পরাধীন দেশ এই আদর্শের প্রতি হয়েছে আকৃষ্ট।

অবাধ বাণিজ্য (Laissez Faire) নীতির প্রতিবাদ স্বরূপই পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছে সমাজতন্ত্রের সার্থক-নীতি। প্রথমোক্ত নীতি ছিল স্বাধীনতার ছদ্মাবরণে অন্যকে শোষণ করারই উপায় মাত্র। কিছু ব্যক্তির হাতে প্রচুর পরিমাণ সম্পদের কেন্দ্রীকরণেরও প্রতিবাদ হল—সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জন্য ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করা এবং সম্পদের সমবণ্টন করা। বহুকে বঞ্চনা করার অন্যায় পথে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে সমাজতন্ত্রে চৌর্যবৃত্তি বলেই ঘৃণা করা হয়। সমাজতন্ত্রবাদ এমন এক সমাজব্যবস্থার কথা ঘোষণা করে—যে সমাজে সকলের থাকবে সমান সুযোগ; সম্পদ হবে সমবণ্টিত এবং সকলের থাকবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

অবাধ বাণিজ্য বনাম সমাজতন্ত্র

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার দাবী নিয়ে ফ্রান্সে যে বিপ্লব হয়েছিল; পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রবলতম গণ-জেহাদ হিসাবেই লিখিত আছে। এই গণ-বিপ্লব মানুষের সমান অধিকারের দাবী ও সার্বভৌমত্বের দাবীতে হয়ে উঠেছিল সোচ্চার। এরপর আসে উৎপাদনের ক্ষেত্রে শিল্প-বিপ্লব। শুরু হয় বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সমাজে এক নতুন শ্রেণী জন্মলাভ করে। সেই শ্রেণী—শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতী মানুষের নয়া সমাজ। নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হল বটে কিন্তু তা সকল মানুষের জীবনে আশীর্ব্বাদ রূপেই দেখা দিল না; সামান্য সংখ্যক মানুষের লোভে যন্ত্রের ঘূর্ণায়মান চাকায় নিষ্পেষিত হল কোটি কোটি মানুষের প্রাণ। একদিকে মুনাফা শিকারী ধনিক সমাজ ঐশ্বর্যের মণিহর্ম্যে বিলাসী জীবনের অন্তহীন ভোগে হল লিপ্ত, অন্যদিকে মেহনতী মানুষের দল দারিদ্র্যের তীব্রতম জ্বালায় জর্জরিত জীবনের অভিশাপে হল অভিশপ্ত। ইতিহাসের এই মহাসঙ্কট লগ্নে নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনার জগতের দ্বারোৎঘাটন হল। সমাজ সংস্কারকের দল এই সময়েই এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখলেন, যে সমাজে মানুষ মানুষকে নিষ্ঠুর ভাবে শোষণ করে তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয় না; যে সমাজে যন্ত্রায়ন মানুষের জীবনে অভিশাপ

ফরাসী বিপ্লব—১৭৮৯; শিল্প বিপ্লব

সমাজতান্ত্রিক ভাবনার সূচনা

বহন করে না এনে আশীর্বাদরূপেই দেখা দেবে—সেই সমাজ হবে শোষণহীন সুস্থ সমাজ।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সার্থক প্রবক্তা—কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ঘোষণা করলেন—বিশ্বে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য ও অপরিহার্য। তাই তাঁরা কম্যুনিস্ট-বিপ্লব ঘটানোর জন্যে পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিককে সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন। মার্কসীয় আদর্শকে পাথেয় করেই বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-নেতা লেলিন রাশিয়ার শাসন ক্ষমতা অধিকার করে সেখানে সর্ব্বহারাদের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষের সেই জয়ের মহালগ্ন থেকেই রাশিয়া বিশ্বের শোষিত মানুষের কাছে আশা ও আশ্বাসের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

মার্কসীয় চিন্তা ও রাশিয়ার সর্বহারাদের ক্ষমতা দখল

দীর্ঘ দিনের বিদেশী শাসনের অক্টোপাসী বন্ধন মুক্ত স্বাধীন ভারতের সামনেও তাই এই প্রশ্ন দেখা দিল—ভারতের নব গঠন হবে কোন পথে? সমাজতন্ত্রের আদর্শ—সেই জটিল সমস্যার সমাধান হিসাবে স্বীকৃত হল। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করলেন যে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই শোষণ জর্জরিত, নিঃস্ব ভারতকে আবার সম্পদে ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করা সম্ভব। এই মহৎ আদর্শের আলোকেই রচিত হল স্বাধীন ভারতীয় সংবিধান। এই সংবিধানে ভারতীয়ের জন্য কিছু মৌলিক অধিকার প্রদত্ত হল। এই সংবিধানেই 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে' ভারতবর্ষের দ্বিধাহীন প্রত্যয়ের কথা হল ঘোষিত। ভারতের বিশ্বাস: সমাজতন্ত্রই প্রকৃতি প্রগতির পথ এবং গণতান্ত্রিক আদর্শই ভারতের আদর্শ।

সমাজতন্ত্রই—নবভারত গঠনের পথ

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শকে সফল করার উদ্দেশ্যে এবং প্রতিটি ভারতীয়ের নিম্নতম প্রয়োজন, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য স্বাধীন ভারতবর্ষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করল। ভারত এমন এক সমাজতান্ত্রিক ছাঁচের সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনে আগ্রহী, যেখানে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক হবে দারিদ্র্যমুক্ত ও যেখানে জীবন হবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যেই ভারতীয় প্রগতির রথ চলেছে গণতন্ত্রের প্রশস্ত রাজপথে। তিন তিনটি বৃহত্তম সাধারণ নির্বাচনের সফল সম্পূর্ণতার মাধ্যমে ভারত বিশ্বের কাছে গণতন্ত্রে তার অক্ষয় বিশ্বাসের কথাই সোচ্চারে ঘোষণা করেছে। সমাজতন্ত্রের আদর্শলোকে পৌঁছানোর জন্য এবং সংসদীয়

ভারতীয় গণতন্ত্রের জয়যাত্রা; সংসদীয় গণতন্ত্রের সার্থকতা

গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য ভারত জমিদারী প্রথার অবসান ঘটিয়েছে; অন্যদিকে পঞ্চায়েত রাজ, সমবায় কৃষি-পদ্ধতি, সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতি নানা সামাজিক পুনর্গঠন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ভুবনেশ্বরে জাতীয় কংগ্রেসের ঘোষণা

গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পূর্ণ আস্থা রেখেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভুবনেশ্বরের অধিবেশনে ঘোষণা করল: এক, ভারতের বুক থেকে দারিদ্র, রোগ ও অশিক্ষা বিদূরিত হবে; দুই যে কোন ধরণের সম্পদ ও সুযোগের অধিকার হবে সীমিত; তিন, প্রতিটি নাগরিকের থাকবে সমান অধিকার; এবং চার, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত জীবন হবে সমৃদ্ধ।

গণতান্ত্রিক আদর্শ পরীক্ষার সম্মুখীন

কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় গণতন্ত্র নানা সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রহর গুণছে। নেতৃবৃন্দের বিঘোষিত নীতি ও কর্ম সম্পাদনের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য দেখা দেওয়ায় আজ ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজমান। বিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ভারতের বুক থেকে দারিদ্র, অশিক্ষা ও ব্যাধি অবলুপ্ত হয়নি, সম্পদের কেন্দ্রীকরণ হয়েছে আরও তীব্র। এমনি আরও হাজার সমস্যা ভারতীয় জনজীবনকে এমন ভাবে আক্রমণ করেছে যে তার নাভিশ্বাস উঠার উপক্রম ঘটেছে। ফলে ভারতের বহু বিঘোষিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ তার মূল্য হারাতে বসেছে। এবং দ্বিধাগ্রস্থ দুর্বল এবং প্রকৃত আদর্শহীন নেতৃত্ব এই অবস্থাকে আরও সঙ্কটজনক করে তুলেছে। বলিষ্ঠ ও আদর্শ নেতৃত্ব ছাড়া এই সঙ্কটের মহারণ্য থেকে নিষ্ক্রমণ অত্যন্ত দুরূহ। সমস্যাকীর্ণ, সঙ্কটময় ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সার্থক প্রতিষ্ঠার জন্য তাই চাই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব কারণ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রই—ভারতের একমাত্র পথ।

উপসংহার

ভারতের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থার সার্থক প্রতিষ্ঠা ঘটলে ভারতীয় সমাজ হবে—বর্ণহীন, গোত্রহীন, শ্রেণীহীন। এই শ্রেণীহীন সমাজে থাকবে চিন্তার স্বাধীনতা। ভারতের আদর্শ হবে সত্য, ন্যায় ও অহিংসার আদর্শ। বল প্রয়োগের নীতি ভারতীয় চিন্তার পরিপন্থী। স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের যে আদর্শে দীক্ষিত হয়েছে—তা কখনও ব্যর্থ হোতে পারে না।

শুভেচ্ছা মিশন ও ভারত

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- বিদেশে সাংস্কৃতিক মিশন প্রেরণের উপযোগিতা [কি., বি. ৫৮]
- কৃষি ও শিল্পমেলার সার্থকতা
- বাণিজ্যিক প্রতিনিধি বিনিময়ের উপযোগিতা
- বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে শুভেচ্ছা মিশনের ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীতে দু' দুটি মহাযুদ্ধে পৃথিবীতে ক্লান্ত, ভীতত্রস্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কায় বিশ্বের মানুষ দুঃসময়ের প্রহর গুণছে। কিন্তু কেন এই হানাহানি? এই রক্তপাত? এত মৃত্যু? এর কারণ একদিকে পৃথিবীর কয়েকটি দেশের ক্ষমতা-দম্ভ অন্যদিকে অসহায় দুর্বল দেশগুলির আতঙ্ক পৃথিবীর আবহাওয়াকে করেছে কলুষিত। পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি থেকেই সৃষ্ট হচ্ছে নানা বিরোধ। জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে এই বিরোধ-সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে না পারলে এই যুদ্ধ-ক্লান্ত পৃথিবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে না। মানুষের অস্তিত্ব হবে বিপন্ন। বিশ্বশান্তির স্বপ্ন হবে দুঃস্বপ্ন মাত্র।

আধুনিক পৃথিবী শান্তির প্রত্যাশী। শান্তি প্রিয় প্রতিটি মানুষেরই কামনা—এক নয়া দুনিয়া গড়ে উঠুক। তাই প্রতিটি দেশেরই আকাঙ্খা জাতিতে জাতিতে এই ভুল বোঝাবুঝি, ক্ষমতার দম্ভ, অসহায়ের আতঙ্ক অপনোদিত হোক। আর এই আকাঙ্খা চরিতার্থ করতে পারে সাংস্কৃতিক ও শুভেচ্ছা মিশন। এই জাতীয় মিশনই পারে মানুষের অন্তরলোকে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করতে। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস, এক জাতির প্রতি আর এক জাতির বিশ্বাস, এক দেশের প্রতি আরেক দেশের বন্ধুত্ব যদি গড়ে ওঠে তবেই নতুন বিশ্বের প্রতিষ্ঠা হবে; রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হয়ে সার্বিক বিকাশের স্বর্ণযুগের সূচনা হবে।

নানা দেশ নিয়ে এ বিশ্ব নানা জাতিতে অধ্যুষিত। কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ ইংরেজ, কেউ রাশিয়ান—কিন্তু সবার ওপরে তার সত্য পরিচয় সে মানুষ।

বাণিজ্যের লক্ষ্য ও মানুষের কল্যাণ

শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য—সব কিছুরই মূল উদ্দেশ্য এই বিশ্ব মানুষের কল্যাণ। লেনদেনের মাধ্যমেই মানুষ নিজে বাঁচে, অন্যকে বাঁচায়। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ও দেশের অধিবাসীগণ আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। ভৌগালিক পরিবেশ, জলবায়ু, প্রাকৃতিক

সম্পদ, দীর্ঘকালের ঐতিহ্য এই বিশিষ্টতার উৎস। এই বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র নিয়েই আজ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি আপন আপন দৈশিক সীমার মধ্যে আপন আপন শিল্প-শৈলী অনুশীলন করে অভিনব উৎপাদন-কৌশল আয়ত্ত করছে, নানা ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যে ফল পাচ্ছে তা সার্থক ভাবে প্রয়োগ করে শিল্প-বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের জগতে আনছে যুগান্তর। সুস্থ ও প্রগতিশীল মানুষের কামনা—এই যুগান্তরের ফসল যেন সেই একটি দেশের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। মানব সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান যেন একটি জাতি বা একটি দেশেরই অধিকারগত না হয়—তা যেন বিশ্বমানবের আপন সম্পদ হয়ে ওঠে। মানুষের শ্রেষ্ঠ অবদান যদি জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণেই না লাগে তবে সব সাধনা হবে ব্যর্থ। বিজ্ঞান-সাধনা, শিল্প-চর্চা, বাণিজ্য-প্রয়াস হবে মূল্য হীন।

সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে

লক্ষ কোটি মানুষের অন্তরের কামনা কি ব্যর্থ হতে পারে? তাই জীবনে জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আধুনিক বিশ্বের বহু দেশ আজ যেন এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারছেন। পারস্পরিক লেনদেন, আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিশ্বমানবের সুখ শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রত্যাশা আজ পূর্ণ হতে চলেছে। বিভেদ ভুলে এমনি ভাবে একটি জাতি অন্য জাতির, এক দেশ অন্য দেশের উষ্ণ সান্নিধ্য লাভ করতে চলেছে, সম্প্রীতি, শুভবুদ্ধি ও বিশ্বমৈত্রীর বন্ধনে তারা আবদ্ধ হতে চলেছে—এটি নিঃসন্দেহে সুলক্ষণ।

বাণিজ্যকে গতিশীল করা দরকার

বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এ সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীর বহু দেশই ব্যবসায় বাণিজ্যের মৌল উদ্দেশ্যটি সফল করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যকে ক্ষুদ্র ভৌগলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখলে বাণিজ্যের মৌল উদ্দেশ্যটিই শুধু ব্যর্থ হয় না, বাণিজ্য হয়ে পড়ে গতিহীন। কিন্তু বাণিজ্যের সমৃদ্ধির চাবিকাঠিটি আছে গতিশীলতারই মধ্যে। ক্ষেত্র যত প্রসারিত হবে—বাণিজ্যের গতিশীলতা ততই বৃদ্ধি পাবে। বাণিজ্য লাভ করবে সমৃদ্ধি। বহু দেশই এই সত্য উপলব্ধি করে নানা প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর ভাঙ্গছে, ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রীতি, মৈত্রী ও শুভবুদ্ধির নবজাগরণ ঘটছে।

বহু দেশের পক্ষে সম্ভব হলেও পৃথিবীর সব দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রীতি, মৈত্রী, শুভবুদ্ধি ও সার্বজনীনতার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করতে পারেনি,

কিংবা পারলেও তার মূল্য দিচ্ছে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই রাজনীতির বিষবাষ্পে আকাশ বাতাস হচ্ছে কলুষিত। এখনও কোন কোন দেশ রাজনীতির ছদ্মবেশে অনুন্নত দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করছে। রাজনীতির অন্ধকূপে বন্দী বাণিজ্য আত্মহত্যার অপেক্ষায় অপেক্ষমান। বাণিজ্য যদি রাজনীতির ভৃত্য হয়ে পড়ে তবে তার স্বাধীনতা যাবে হারিয়ে, সে হবে পরাধীন। পরাধীন বাণিজ্য কখনও সমৃদ্ধির ইতিহাস রচনা করতে পারে না। অথচ এও ঘটছে।

বাণিজ্যের ছদ্মবেশে অন্যদেশের সম্পদ লুণ্ঠন

খুব বেশী দিনের কথা নয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টোলে দেখা যাবে একটি অধ্যায়। শীর্ষনাম ; ফ্যাসিজম। উগ্র জাতীয়তাবোধ যদি একবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তবে তা সৃষ্টি করে ঘৃণা, বিদ্বেষ আর অবিশ্বাস। এবং শেষ পর্যন্ত তা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণতি লাভ করে। সমস্ত বন্ধন যায় ছিন্ন হয়ে। জাতি হয়ে পড়ে দুর্দান্ত জিঘাংসার দুরন্ত নেশায় উন্মত্ত। বিশ্বভ্রাতৃত্ব হয় পদদলিত। বিংশশতাব্দীর মানুষ অদূর অতীতের এই বীভৎসার সাক্ষী। দুটি মহাযুদ্ধের রক্তস্নানে বিশ্ব এই বীভৎসতার হাত থেকে হয়েছে মুক্ত। কিন্তু বিশ্ব আজ দুই শিবিরে বিভক্ত। একটি ধনতান্ত্রিক শিবির অন্যটি সাম্যবাদী শিবির। পরস্পর বিরোধী এই দুই শিবিরের দ্বন্দ্বের আবর্তে পড়ে আধুনিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আজ বিপর্যস্ত। মানবতা বিরোধী রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ার হয়ে পড়ছে বাণিজ্য। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা কখনও স্বেচ্ছায় কখনও বা অনিচ্ছায় রাষ্ট্রনায়কদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছেন। আবার কখনও কখনও তাঁরা নিজেরাই রাষ্ট্রনায়কদের প্রভাবিত করে মানুষকে শোষণ করার অবাধ অধিকারের ছাড়পত্রটি আদায় করে নিচ্ছেন। এখনও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এই দুই বিবদমান শিবিরের সীমানার মধ্যে বন্দী। এখনও বন্দী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মুক্তির শুভ-লগ্নের জন্য প্রতীক্ষমান।

রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে বাণিজ্য

শিল্প-বিপ্লব ইউরোপকে করেছে সমৃদ্ধ আর সেই সমৃদ্ধির সম্পদ জুগিয়েছে আফ্রিকা আর এশিয়া—এটা ঐতিহাসিক সত্য। শুধু সম্পদই যোগায়নি—পরাধীনতা বরণ করতেও হয়েছে বাধ্য। তাই ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্পোৎপাদন সমস্ত দিক থেকেই এই সব দেশ থেকে গেছে অনগ্রসর। একদিন ক্ষমতার গর্বে গর্বিত ইউরোপ এই দুটি মহাদেশকে শোষণ করে নিঃস্ব, রিক্ত, দরিদ্র করে তুলেছে, কোনদিনই তাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়নি ; কিন্তু

উন্নত ও অনুন্নত দেশের সম্পর্ক ; শুভেচ্ছা মিশনের ভূমিকা

ইতিহাস কখনও ক্ষমা করে না। তাই পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধের ইন্ধন জোগাতে গিয়ে অতীতের ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ ইউরোপ আজ নিজেই একেবারে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। ইতিহাসের চাকা আজ উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করেছে। অন্ধকার আফ্রিকার পূর্বদিগন্ত আজ স্বাধীন সূর্যালোকে প্লাবিত। আজ এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে দেখা দিয়েছে স্বাধীনতার লাভের প্রাণমাতানো উৎসব। এ উৎসবে তাই সবার আমন্ত্রণ। এ উৎসব ক্ষেত্র হচ্ছে অনুন্নত ও উন্নত দেশগুলির মিলনক্ষেত্র। এই সব নবজাত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি উন্নত দেশগুলির সহযোগিতার ওপরই নির্ভরশীল। এই প্রয়োজনেই আজ উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে রাষ্ট্রদূত, কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞান-বাণিজ্য প্রতিনিধি বিনিময় একান্ত প্রয়োজন। স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বনির্ভর সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে বাঁচতে হলে অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির বন্ধন অপরিহার্য। শুভেচ্ছা মিশন উন্নত ও অনুন্নত দেশের তিক্ত সম্বন্ধের অবসান ঘটিয়ে শুভবুদ্ধির জয় ঘোষণা করবে।

আজ তাই শুভেচ্ছা মিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণই নয়—তাৎপর্যপূর্ণও বটে। শুভেচ্ছা মিশন শুধু বৈষম্যের কলঙ্ক চিহ্নকেই নয়, অনেক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আতঙ্ককেও অপনোদিত করে। দুর্বলের সঙ্গে শক্তিমানের, ঐশ্বর্যবানের সঙ্গে ঐশ্বর্যহীনের মিতালি রচনায় শুভেচ্ছা মিশনের উপযোগিতা আজ অনস্বীকার্য। ভাগ্যচক্রের নিষ্ঠুর পরিহাসে অতীতের সমৃদ্ধ ভারত আজ অনগ্রসরদেশ বলেই পৃথিবীর কাছে পরিচিত। এমন একদিন ছিল যখন ভারত দূরবর্তী গ্রীস, পারস্য, চীন, মিশর, জাভা, সুমাত্রা, নিকটবর্তী তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্য মিশন প্রেরণ করে সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধির ইতিহাস রচনা করেছে। ভারতের শান্তিদূতগণ এবং ভিন্নদেশের শান্তিদূতগণ ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার বার্তা বহন করে দেশে-দেশান্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। ভারতীয় পণ্য বহন করে ভারতীয় জাহাজ বিদেশের ঘাটে গিয়ে নোঙর করেছে। এমনিভাবে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য নয়, ভারতের দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতির চিন্তাধারাও পৌঁছেছে অন্যদেশে। কিন্তু তারপর কালের বিবর্তনে মধ্যযুগে এসে ভারতের আকাশ হল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দুশো বছরের ব্রিটিশ পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে ভারত আবার স্বাধীন হয়েছে। একদিন ভারত জগৎ সভায় যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, দীর্ঘ অমানিশার অন্ধকার পেরিয়ে দুঃখজয়ী

অতীত ভারতের বাণিজ্য মিশন

ভারত আবার সেই আসন অধিকার করবে। নবভারত এই আশায় আজ উন্মুখ।

সম্প্রীতি, বিশ্বমৈত্রী ও সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী স্বাধীন ভারত আদর্শকে সম্মুখে রেখেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। আজ অনেক দেশ এই বন্ধনে বাঁধা পড়েছে ভারতের সঙ্গে। আমেরিকা, রাশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য-মিশন বিনিময়ের ফলে পশ্চিম জার্মানী কতকগুলো ভারতীয় পণ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, জার্মান প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই সঙ্গে ব্রহ্মদেশ, ইরাণ, মেক্সিকো, রুমানিয়ার নামও উল্লেখযোগ্য। ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাত্র কয়েক বছর হল মরক্কো, টিউনিসিয়া, জর্ডান, মিশর প্রভৃতি মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে। আফগানিস্তান, ইতালি, গ্রীস প্রভৃতি দেশও বাণিজ্য চুক্তির দ্বারা ভারতের সঙ্গে গভীর সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। প্রতিবেশী রাজ্য নেপাল আজ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়েছে। কিন্তু আর দুই প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে ভারত সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বার বার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। পাকিস্তান ও চীন এই দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের বন্ধুত্বের অমর্যাদা ঘটিয়ে নির্লজ্জভাবে ভারতের সীমান্ত আক্রমণ করেছে। পঞ্চশীল নীতিতে বিশ্বাসী ভারত আকস্মিক ভাবে আক্রান্ত হওয়ায় মর্মাহত, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে ভারত এই দুটি রাষ্ট্রের সঙ্গে এখনও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। কিন্তু বেদনার কথা এই যে এই দুটি রাষ্ট্র বন্ধুত্বের মূল্য দিতে, মৈত্রী ও শুভেচ্ছার বন্ধনে আবদ্ধ হতে অনাগ্রহী। অতি সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, জর্ডান ও সুদানের বাণিজ্য-প্রতিনিধিদল ভারত পরিদর্শন করেছে। আবার ভারতের স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ভারতীয় বাণিজ্য-প্রতিনিধিদল চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি পরিভ্রমণ করে এসেছেন। এমনি ভাবে বাণিজ্য মিশন বিনিময়ের মাধ্যমে মৈত্রী, প্রীতি ও শান্তির পথ সম্প্রসারিত হচ্ছে।

আধুনিক ভারতীয় বাণিজ্য মিশন ও বাণিজ্য-চুক্তি ; চীন ও পাকিস্তানের বৈরী মনোভাব

শুধু মাত্র বাণিজ্য মিশনই একটি দেশের পণ্য সম্পূর্ণভাবে অন্য দেশে পরিচিত করে তুলতে পারে না বা তার উৎকর্ষের প্রতি অন্যদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে.

না ; এর জন্য পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হয়। এই জাতীয় পণ্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে একটী দেশের উৎপাদিত বিশেষ বিশেষ পণ্যের উপযোগিতা অন্যদেশ উপলব্ধি করে এবং চাহিদা বৃদ্ধি ঘটে। ভারতের প্রদর্শনী অধিকর্তা বিদেশে ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। ভারত ১৯৬৩ সালে মস্কোতে যে ভারতীয় পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল, তাতে সোভিয়েত রাশিয়ার অধিবাসীরা ভারতীয় পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে নিউইয়র্ক-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব মেলায় ভারত অংশ গ্রহণ করে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৬৭ সালে কানাডায় ভারত এমনি এক বাণিজ্য প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে। ভারতীয় বাণিজ্য-প্রতিনিধিদল যে সমস্ত সুপারিশ করেছেন, সেই পথ অনুসরণ করে ভারতীয় বাণিজ্য আজ দ্রুত বিকাশের পথে সফল পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। একাজে সহায়তার জন্যে ভারত সরকার রপ্তানি উন্নয়ন অধিকার ও বৈদেশিক বাণিজ্য বোর্ড নামে দুটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক বাজারের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেই অনুসারে ভারতীয় বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করার দায়িত্ব এই সংস্থাগুলির ওপর ন্যস্ত।

পণ্য-প্রদর্শনীর সার্থকতা

রাজনীতির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা আজ অর্থহীন। সমস্ত রকম সংকীর্ণতার প্রাচীর ভেঙ্গে বদ্ধ অচলায়তনে আনতে হবে সূর্যের উদার আলো। বিশ্বমৈত্রীর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারলে, এত হানাহানি, বিদ্বেষ যাবে নির্মূল হয়ে। পৃথিবী তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কায় প্রহর গুণবে না। সম্প্রীতি, সদ্ভাব, সহবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন অন্যান্য দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক বন্ধনে আবদ্ধ হবে—তখনই বিশ্ব শান্তির প্রত্যাশা হবে পূর্ণ। বিশ্ব-শান্তি-প্রত্যাশী ভারত নিজের দুয়ারটি খুলে দিয়ে সবাইকে আজ সেই আহ্বানই জানাচ্ছে।

উপসংহার

বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক জীবন ও উৎসব

এই প্রবন্ধের অনুসরণে
● উৎসবে অর্থনীতির ভূমিকা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা উৎসবের আয়োজন করে থাকে, কারণ উৎসব মানুষের সমষ্টিগত সামাজিক জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এ উৎসব ধর্মীয়, সামাজিক, লৌকিক প্রভৃতি নানা ধরণের হতে পারে। উপলক্ষ্য যাই হোক না কেন, উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের কাছে অনাবিল আনন্দ প্রাপ্তির মূল্যই চরম।

প্রারম্ভ

বাংলা দেশ উৎসবের দেশ ; বাঙ্গালী জাতি উৎসব প্রিয় জাতি। বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনে আছে অভাব, আছে অনটন। দুঃসহ দুঃখ ও অপরিসীম দারিদ্রে বাঙ্গালী জীবন জর্জরিত ; কিন্তু সংসার জীবনের এই অক্টোপাসী আক্রমণে কিংবা প্রাত্যহিক প্রয়োজনের নির্মম তাড়নায় বাঙ্গালী জাতি তার স্বভাব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ম্রিয়মান, মুহ্যমান হয়ে পড়েনি। অভাব আর দারিদ্র, মহামারি আর মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে সে এখনও নিজের স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছে। তাই ঋতুতে ঋতুতে যখন প্রকৃতির বুকে চলে অন্তহীন লীলাখেলার সমারোহ, তখন বাঙ্গালীও আয়োজন করে উৎসবের। এই উৎসব-সমারোহের মাধ্যমে বাঙ্গালী দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণাকে, নানান বঞ্চনা ও বেদনাকে সহ্য করে নেয়।

বাঙ্গালীর উৎসব

'শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি'র হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন করে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা লাভের আকাঙ্খায় যেন বাঙ্গালী এমনি নানা উৎসবের আয়োজন করে থাকে। বাঙ্গালীর ঘরে তাই 'বারো মাসে তেরো পার্বণ।' এত উৎসব সমারোহ বোধহয় ভারতের আর কোন প্রদেশে নেই। বাঙ্গালীর এই উৎসবে সমারোহ ছিল গৌণ, ভাবেরই ছিল প্রাধান্য। বহু লোকের আন্তরিক সহযোগের ওপর ছিল এই উৎসবায়োজনের সার্থক প্রতিষ্ঠা। নিজের আনন্দ সুখ অনেকের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে সমবেতভাবে-উপভোগ করার কল্যাণী ইচ্ছা ও শুভ কামনাই ছিল এই সব উৎসবের মূল প্রেরণা।

উৎসবের অতীত স্বরূপ

বাঙ্গালীর উৎসবে অন্তরেরই প্রথম প্রতিষ্ঠা, প্রকৃত পক্ষে মানুষে মানুষে প্রীতি ও ভালবাসা, মমতা ও মৈত্রীর সম্বন্ধের মধ্যেই উৎসবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত। মানুষ উন্নত ও সমাজবদ্ধ জীব। আত্মকেন্দ্রিকতার সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠের মধ্যে তাঁর প্রাণ-প্রসারণ সম্ভব নয়। তাই মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে বাঁচতে চায় না; নিজের আনন্দ, নিজের শুভ আরও দশজনের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েই চলে তার প্রাণের স্বচ্ছন্দ লীলা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "ঈশ্বরের শক্তি বিকাশকে আমরা প্রভাতের জ্যোতি-রুন্মেষের মধ্যে দেখিয়াছি, ফাল্গুনের পুষ্প পর্যাপ্তির মধ্যে দেখিয়াছি, মহাসমুদ্রের নীলাম্বু নৃত্যের মধ্যে দেখিয়াছি, কিন্তু সমগ্র মানবের মধ্যে, যেদিন তাহার বিরাট বিকাশ দেখিতে সমাগত হই, সেইদিন আমাদের মহামহোৎসব।" আসল কথা সমাজ-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হল উৎসব। এই উৎসবের মধ্যে মানুষ একাত্ম হয়ে ওঠে, আবদ্ধ হয় আন্তরিক প্রীতির অদৃশ্য বন্ধনে।

উৎসবের মধ্যে মানুষ হয় একাত্ম

অতীত কালে বাঙ্গালীর উৎসবে আর্থিক সম্পর্ক ছিল, কিন্তু প্রাধান্য ছিল হৃদয়ের, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পর বর্তমানের বাঙ্গালী উৎসব-গুলোর মধ্যে দেনা-পাওনা ও হিসেব-নিকেশের প্রাধান্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, ঠিক সেই পরিমাণে কমেছে আনন্দের ভাগ। বণিক ইংরেজের অনুগ্রহে আমাদের উৎসব অনেক খানি যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে, বাদ পড়েছে হৃদয়ের সম্পর্ক। অর্থ এতই অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করেছে যে হৃদ্যতা বা অন্তরে অন্তরে যে আকর্ষণ তা যেন অনেকখানি বাহুল্য ও অসঙ্গত বলে মনে হয়েছে।

উৎসবের রূপ বিবর্তন

কিন্তু তা সত্ত্বেও উৎসবের অর্থনৈতিক দিকটি উপেক্ষা করা যায় না। আয়োজিত উৎসবের অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে সমাজের সকল স্তরের সকল জীবিকার মানুষ একত্রিত হয় এবং নিজের নিজের পণ্যসমগ্রী নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই সেখানে চলে পণ্য সম্ভারের কেনা-বেচা, চলে আদান-প্রদান। যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানই যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের অপেক্ষা রাখে; অর্থাৎ প্রতি উৎসবেই বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয় এবং এই অর্থব্যয় যে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

উৎসবের অর্থনৈতিক দিক

উৎসব উপলক্ষ্যে সমাজে পণ্যসামগ্রীর হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে অর্থও দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই অর্থ দেশের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হলে অধিকতর

উৎপাদন এবং অর্থ-সংস্থানের সুযোগ সুবিধা ও অনুকূল অবস্থা সৃষ্ট হয়। সুতরাং দেশের উৎসবানুষ্ঠান যে দেশের আর্থনীতিক জীবনকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করে তা সন্দেহাতীত। উৎসব উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেরণা যোগায়, চাহিদা আর যোগান সর্বসময়ের জন্য তেজী থাকে।

অর্থবিনিয়োগের সুফল

চলমানতা জীবনের লক্ষণ, অর্থনীতি সম্পর্কেও একথা সত্য। বাঙ্গালী নানা অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই গতি সৃষ্টি করেছে। এই গতি সঞ্চারিত হয়েছে প্রতিটি বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক জীবনে। বাঙ্গালীর যে কোন উৎসবে ব্রাহ্মণ, স্বর্ণকার, তাঁতী, কর্মকার, নাপিত, ময়রা, মালাকার, গোয়ালা প্রভৃতির যে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতেই প্রমাণ করে যে প্রতিটি উৎসব কেমনভাবে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর জীবিকার ওপর সুপ্রসারিত ও কি পরিমাণ নির্ভরশীল। আধুনিক নাগরিক জীবনে উৎসবের রূপ পরিবর্তন ঘটলেও মূল বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক প্রভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

সমাজের নানান জীবিকাবলম্বী মানুষের সমাবেশ

জীবনে গতি সৃষ্টির জন্য এবং সমাজকে সজীব ও প্রাণবন্ত করার উদ্দেশ্যেই একদিন প্রচলিত হয়েছিল উৎসবের; কিন্তু সামাজিক জীবনের উত্থান-পতনে ভারত তথা বাংলা দেশের সেই উৎসবের ধারা নানা ভাবে বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে নীরস প্রাণহীন আচার সর্বস্বতায় উপনীত হয়েছে। আনন্দের অনাবিল ধারা গেছে শুকিয়ে। প্রাণহীন উৎসবগুলো তাই এখনও গতানুগতিক ছাঁচে সমাজের বুকে বজায় আছে। কিন্তু বর্তমানে যেটি সবচাইতে বেশী স্পষ্টভাবে আমাদের চোখে পড়ে তা হল উৎসব-প্রিয়তার তাগিদে সাধ্যাতীত অর্থব্যয়।

নিষ্প্রাণ উৎসব ও সাধ্যাতীত ব্যয়

বহু পরিবার নিজেদের পূর্ব পুরুষদের দ্বারা প্রচলিত কোন প্রাচীন উৎসবকে বাঁচিয়ে রাখতে, কিংবা বংশের সুনাম ও কৌলীন্য বজায় রাখতে অনেক সময় প্রচুর অর্থব্যয় করে থাকে, যা তাদের সাধ্যাতীত। ফলে বাংলা দেশের বহু প্রাচীন পরিবার শুধুমাত্র সংস্কার বশতঃ সাধ্যাতীত ব্যয় করে ডেকে এনেছে দুঃসহ অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও সঙ্কট।

উৎসব ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা

এরপর এসেছে ইতিহাসের পালা বদল। দীর্ঘ দুশো বছরেরর পরাধীনতার ফলে যে অর্থনৈতিক কাঠামো জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, স্বাধীনতা লাভের মূল্য স্বরূপ

প্রাপ্ত দেশবিভাগ সেই জীর্ণ কাঠামোর ওপর হানল চরমতম আঘাত। ফলে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবন হয়ে পড়ল পঙ্গু। কিন্তু চরম মূল্য দিতে হল বাংলা দেশকে। বাংলা দেশ হল বিভক্ত। তাই আজ বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক জীবন সংখ্যাহীন সমস্যায় জর্জরিত। লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু আজ পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এসে পৌছেছে পশ্চিম বাংলায় আহার আর আশ্রয়ের আশায়; জমির ওপর পড়েছে অসহ্য চাপ; ফলে কৃষক কুল বিপর্যস্ত, কুটির শিল্পীগণ বিলুপ্তির পথে, মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের সংগ্রাম হয়েছে সাতগুণ তীব্রতর। এমনি এক সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশে উৎসবের জন্য কিছু সংখ্যক পরিবারের সাধ্যাতীত ব্যয় শুধু দৃষ্টিকটুই নয়, সমর্থনযোগ্য নয় বলেই মনে হয়। কিন্তু জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত উৎসাহ লাভের জন্য এই উৎসবের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য।

বিপর্যস্ত বাঙ্গালী জীবনে উৎসবের সার্থকতা কি?

কিন্তু তাই বলে কি ঋণের টাকায় উৎসবায়োজন সমর্থনীয়? বাংলা দেশের বহু পরিবারকে, স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে উৎসব অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়। বহু কৃষক পরিবার সামাজিক উৎসবকে সার্থক ও আনন্দোজ্জল করতে গিয়ে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এতে তারা ঋণগ্রস্তই হয়ে পড়ে না, সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যত বংশধরদের কাঁধে ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদের নিরানন্দ জীবনের বোঝা বহন করতে বাধ্য করে। অর্থনীতির সূত্রানুপাতে বলা যায়: একজনের অর্থ ব্যয় অন্যকে উৎপাদনে প্রেরণা যোগায়। সমাজে অর্থব্যয়ের অভাবের অর্থ দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের অভাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা সত্য যে সমাজে ঋণের টাকায় উৎসব অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে, তা হবে সামগ্রিক সমাজ-কল্যাণ বিরোধী এবং তাতে দেশের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে বাধ্য।

উৎসবের জন্য ঋণ করে অর্থব্যয় সর্থমনীয় নয়

এখন প্রশ্ন হল: উৎসব আয়োজিত হওয়া এবং তার জন্য প্রচুর পরিমাণ ব্যয় সমর্থনীয় কিনা? উত্তরে আর্থনীতিক সাধারণ সূত্রের উল্লেখ করে বলা চলে: যে কোন সমাজে বা দেশে ব্যয়হীন সঞ্চয় যেমন অর্থনীতির দিক দিয়ে সমর্থন-যোগ্য নয় তেমনি অন্যদিকে ঋণের টাকায় সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় অপব্যয়েরই নামান্তর মাত্র। দুদিকে লক্ষ্য রেখে যদি উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যয়কে নিয়ন্ত্রিত করা যায় তবে উৎসব সমারোহ দেশে ও দেশবাসীর পক্ষে অমঙ্গলজনক না হয়ে, হয়ে উঠবে কল্যাণকর। এবং এই জাতীয় ব্যয় দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু না করে, করে তুলবে সজীব ও সচল।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

পশ্চিম বঙ্গের পাটশিল্প

● পাট ও পাটশিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ [ক, বি, '৫৭]

● পাটচাষ ও পাট ব্যবসায় [ক, বি, '৬১]

পাটশিল্পের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি, প্রাচীন বাঙলায় পাটশিল্পজাত 'পট্টবস্ত্র' ছিল পুজারীর দেবার্চনার উপযুক্ত শুচি পোষাক, 'পট্টবস্ত্র' ও 'পাছড়া' ছিল বিলাসী নাগরিকদের অঙ্গসজ্জা, আর দরিদ্ররা ব্যবহার

প্রারম্ভ

করত খোসলা। কবিকঙ্কণ মুকুন্দদাস লিখেছেন, 'পট্টবস্ত্র অলংকার দিয়া করে ব্যবহার কেহ নাহি করয়ে রন্ধন', কৃত্তিবাসের রামায়ণে পাই, 'পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে', আর কবিকঙ্কণচণ্ডীর ফুল্লরার বারমাস্যা অংশে খোসলার এই উল্লেখও বহুল পরিচিত : 'হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা। উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধুলা'।

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ইংরেজ শাসন বাঙলায় প্রতিষ্ঠিত হল, 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে,' তখন ইংরেজ বণিকেরা বিপুল লাভের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে অতীতে যে পাটশিল্প ছিল ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পে সীমাবদ্ধ, আধুনিক বৃহৎ শিল্প-

পাটশিল্পের পূর্ব ইতিহাস

প্রয়াসের মাধ্যমে তার বিরাট প্রসার ঘটায়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের নিকটস্থ রিষড়ায় জর্জ অকল্যাণ্ড প্রথম পাটশিল্প প্রতিষ্ঠা করেন, সেই থেকেই বিদেশী মূলধন ও ব্যবস্থাপনায় এই শিল্পের কর্মচঞ্চল যাত্রারম্ভ। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের তুলনায় সমস্ত দিক থেকে বাঙলাদেশের অবস্থাই সর্বাপেক্ষা পাটচাষের ও পাটশিল্পের উপযোগী। এখানকার পলিমাটি বা দো-আঁশ মাটি এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও স্থলভ, পরিশ্রমী শ্রমিকের সংখ্যাপ্রাচুর্য পাটচাষের অনুকুল। সেদিন হুগলী নদীর নাব্যতাও বাঙলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাঁচা মাল আনয়নে ও পাটজাত পণ্যদ্রব্য রপ্তানিকে বিপুল পরিমাণে সহায়তা করেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শ্রমিকেরা এসে এই শিল্পের জন্ম সুলভে শ্রমদান করেছে। বিদেশী বণিকেরা মূলধন, পাটের ও সুলভ শ্রমিকের অবাধ সরবরাহ, মাল চলাচলের সুযোগসুবিধা, বিশ্বের বাজারে বিরাট চাহিদা ও প্রায় একচেটিয়া ব্যবসায় প্রভৃতির সমবায়ে কলকাতা বন্দরের আশপাশে, ভাগীরথীর দুই কূল অজস্র পাটকলে ছেয়ে গেছে। স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত থেকে পাটশিল্পে বিদেশী মূলধনের পাশাপাশি স্বদেশী মূলধনকেও প্রবাহিত হতে দেখা

গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন চাহিদার সুযোগে পাটশিল্প বিপুলভাবে ও দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তার সমৃদ্ধির সীমা রইল না।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই এদেশের পটশিল্পের ওপর সংকটের কৃষ্ণচ্ছায়া বিস্তৃত হল। ১৯০৫ সালে বাঙ্গালি জাতির ঐক্যবদ্ধ বজ্রকঠিন প্রতিবাদে বাঙ্গালার হৃদ্‌পিণ্ডকে ছিন্ন করতে উদ্যত লর্ড কার্জনের কুটিল, হিংস্র চক্রান্তের ছুরিকা নিরস্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস ১৯৪৭ সালে পুর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অবিভক্ত বাঙলা দেশের পাটের প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র ছিল পুর্ববঙ্গ, এখানকার পাটও অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। দেশ বিভাগের ফলে এই অংশ, অর্থাৎ পাটের জমির শতকরা ৮০ ভাগই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলোর কাঁচামালের চাহিদা এখানকার ২০ ভাগ জমির পাট উৎপাদনে পুরণ হচ্ছে না। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের জমির প্রকৃতি, জলবায়ু ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পাট অপেক্ষা ধান চাষেরই অধিকতর উপযোগী; বর্তমানে ধানের দরও লোভনীয়। এ সমস্ত কারণেই এখানকার কৃষকেরা ধানচাষেই বেশী উৎসাহী।

দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের পাটশিল্পের সংকট

ভারতবর্ষে পাটশিল্পের জন্য বাৎসরিক প্রায় ৭৫ লক্ষ বেল কাঁচা পাটের প্রয়োজন, অথচ এখানে তার উৎপাদনের পরিমাণ ৪০ লক্ষ বেল। ভারত যখন পাকিস্তান থেকে পাট আমদানি করত, তখন তার পরনির্ভরতার সুযোগে পাকিস্তান তার জন্য অতি উচ্চ মূল্য আদায় করে নিত। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের ফলে কাঁচাপাট সরবরাহের এই উৎসটিও রুদ্ধ হয়ে গেছে। এই সংঘর্ষ না বাধলেও বৈরীমনোভাবাপন্ন পাকিস্তানের ওপর পাটের জন্য নির্ভর করা সম্ভব হত না। পাকিস্তানে চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনায় আধুনিকতম যন্ত্রপাতিসংবলিত পাটকল স্থাপিত হয়েছে, উৎকৃষ্ট পাট ও সুলভ শ্রমিকদের সাহায্য তারা বিশ্বের পাটের বাজারে ভারতবর্ষকে কোণঠাসা করে ফেলতে উদ্যত হয়েছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না। পশ্চিমঙ্গের পাট শিল্পের প্রধান পরিবহণ পথ গঙ্গার নাব্যতা শোচনীয় ভাবে হ্রাস পেয়ে মাল চলাচলের পক্ষে ক্রমাগত অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। সেই তুলনায় পাকিস্তানের জলপথের পরিবহনযোগ্যতা অনেক বেশী এবং তার ফলে সেখানকার পরিবহণ ব্যয় অপেক্ষাকৃত স্বল্প। শুধু পাকিস্তানেই নয়, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল, ফিলিপাইন, জাপান প্রভৃতি দেশেও আধুনিক যন্ত্রপাতি-সংবলিত পাটশিল্প প্রতিষ্ঠিত

পাট শিল্পের অন্যান্য অসুবিধা

হয়েছে, তাদের উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের কঠিন প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের পাট শিল্পের সংকট তীব্রতর হয়েছে। পাটজাত বস্তা, থলে ইত্যাদির সহজ ও সুলভ পরিবর্ত বা বিকল্প (substitute) হিসাবে কাগজ, তুলা, প্লাষ্টিক ও পলিথিন ইত্যাদির মত রাসায়নিক বস্তুজাত (synthetic substitute) বস্তা, থলে, বিশ্বের বাজারকে অধিকার করে নিচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অষ্ট্রেলিয়া তার পশম প্রেরণের জন্য চটের থলে ব্যবহার করত, তার সঙ্গে চটের আঁশ প্রায়ই মিশে যেত। এখন সেখানে জাপানের তৈরী পলিথিনের থলে ব্যবহৃত হচ্ছে, এগুলো অনেক হাল্কা এবং ঐ ধরনের মিশ্রণের সম্ভাবনামুক্ত। এ সমস্ত কারণে পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পের আজ পঙ্গুদশা, ভাগীরথীর দুই তীরের অনেক পাটকলের যন্ত্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্তব্ধ, শ্রমিকেরা কর্মহীন, তাদের নির্ধূম চিম্‌নিগুলো অতীতের সমৃদ্ধি ও কর্মচাঞ্চল্যের মূক সাক্ষীর মত দণ্ডায়মান।

পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পের এই ক্ষয়িষ্ণু, সংকট জর্জরিত অবস্থা শুধু এই প্রদেশের পক্ষেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় অর্থনীতির পক্ষেই অত্যন্ত অশুভ। সমগ্র দেশের ১১২টি পাটকলের মধ্যে ১০১টিই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। বিহারে পূর্ণিয়া ও ভাগলপুর জেলায়, আসামের ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকাস্থিত গোয়ালপাড়া জেলায়, উত্তর প্রদেশের নৈনিতাল, মাদ্রাজ ও কেরালায়ও পাটের চাষ হয় বটে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেই সর্বাধিক পরিমাণে পাট চাষ হয়, পাট চাষের দিক থেকে চব্বিশ পরগণা, হুগলী, হাওড়া ও বর্ধমান জেলা খ্যাত। যে শিল্প ছিল একদা উজ্জল সম্ভাবনাময়, স্বর্ণপ্রসূ, একের পর এক সমস্যার আঘাতে তা বিপর্যস্ত, এমন কি তার অস্তিত্বও বিপন্ন। কেন্দ্রীয় সরকারও তা উপলব্ধি করে এই শিল্পের সংকট নিরাকরণে সচেষ্ট হয়েছেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোতে পাট উৎপাদনকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। পাট উৎপাদনের সংখ্যাতাত্ত্বিক তালিকাটি এই বিষয়ে আলোকসম্পাত করে :

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

পাট (লক্ষ গাঁইট)	লক্ষ্য	প্রকৃত উৎপাদন
১৯৫০-৫১	৩৩	৩৩
১৯৫৫-৫৬	৪০	৪২
১৯৬০-৬১	৫০	৪০
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা		
১৯৬৫-৬৬	৬২	৪৫

এই তালিকা পর্যালোচনা করলেই উৎপাদন যে আশানুরূপ হয়নি তা বোঝা যায়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে পাটের উৎপাদন প্রায় ৫০ লক্ষ গাঁইটের মত হ্রাস পায়। পাট-শিল্পে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারের জন্য ১৯৫৪ সালে শ্রী কে. আর. পি. আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে যে পাট-শিল্প অনুসন্ধানী কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল, তার প্রধান সুপারিশগুলো এই: প্রথম পাট-শিল্পের উন্নতির জন্য একটি উন্নয়ন পর্ষদ গঠন; দ্বিতীয়, বর্তমান শিল্প-সংস্থাগুলোর উৎপাদন শক্তি পূর্ণভাবে নিয়োজিত না হওয়া পর্যন্ত নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি দান অনুচিত; তৃতীয়, পাট-উৎপাদনের পূর্ণ স্বনির্ভরতা অপেক্ষা পাকিস্তান থেকে পাট আমদানি বাঞ্ছনীয়; চতুর্থ, পাট-শিল্পের যন্ত্রপাতির পূর্ণ আধুনিকীকরণ; পঞ্চম, আঞ্চলিক বণ্টন নীতি ও পাটের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ এবং ষষ্ঠ, পাট-শিল্পের নিরাপত্তার জন্য শুল্ক থেকে অব্যাহতি দান। কমিশনের তৃতীয় সুপারিশটি যে কোনও দিক থেকেই গ্রহণযোগ্য নয় তা অত্যন্ত স্পষ্ট, পাট-শিল্পের প্রয়োজনীয় সামান্যতম কাঁচামালের জন্য পাকিস্তানের ওপর নির্ভর করা চলে না। সরকার কমিশনের কয়েকটি সুপারিশকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। বর্তমান ক্ষমতার পূর্ণ নিয়োগের প্রতি লক্ষ্য রেখে নতুন পাটকল স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। ১৯৫৫ সালে জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন (National Industrial Development Corporation) পাট-শিল্পকে আধুনিকীকরণে সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের জন্য ১৯৬০ সালে ২২টি পাটকলকে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ দেন। যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য পাটকলগুলোকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দানের ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে। এবং এই সমস্ত যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্যও সরকার উদ্যোগী হয়েছেন। তাছাড়া পাট-শিল্পের সুসংবদ্ধ সংস্কার সাধনের (Rationalisation) প্রতিও সরকার লক্ষ্য রেখেছেন।

পাট-শিল্পের সংকট দূরীকরণের বিভিন্ন প্রচেষ্টা

পাট-শিল্পকে সরকারের আর্থিক সাহায্য

পাটজাত দ্রব্যের বাজারসংগঠন এবং সম্প্রসারণও উপেক্ষিত থাকেনি। ১৯৫৯ সালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যসংস্থা রাশিয়া, চীন, বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড ও যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে কাঁচাপাট রপ্তানির চুক্তি করেছিল। ১৯৪৯ সালে ভারতীয় চটকল সমিতি আমেরিকায় ভারেতর পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের জন্য একটি বাণিজ্য মিশন প্রেরণ করেছিল। বিদেশের বাজারে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পাটজাত দ্রব্য যাতে পাল্লা দিতে পারে তার

জন্যে রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করে দেওয়া হয়। শুধু চট ও থলে উৎপাদনে সীমাবদ্ধ না থেকে পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলো মিশ্র সুতা-নির্মিত বস্ত্র, ইন্‌সোলেশান বা টেলিগ্রাফ তারের আচ্ছাদন, কার্পেট, কম্বল, ত্রিপল ইত্যাদি নির্মাণ করে আভ্যন্তরীণ ও বিদেশের বাজারকে আকৃষ্ট করতে উদ্যোগী হয়েছে।

পাটশিল্পের বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের প্রয়াস এবং তার উন্নতি, অবনতির বিভিন্ন পর্যায়

সম্প্রতি ভারতীয় পাটশিল্প গবেষণা পরিষদ (Indian Jute Industries Research Association) নানা রাসায়নিক দ্রব্য ও উৎকৃষ্টতর পাটের আঁশের সংমিশ্রণে এমন থলে প্রস্তুত করেছেন যা পশম পরিবহনের বিশেষ উপযোগী হবে এবং জাপানের পলিথিন ব্যাগের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে পারবে। এই নবজাত দ্রব্যের সাহায্যে অষ্ট্রেলিয়ার বিরাট বাজার ধরে রাখা সম্ভবপর হবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু পাটচাষ এবং সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের ওপর নির্ভরশীলতার জন্য এ দেশের পাটশিল্প সুষম ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারছে না। কখনও সমৃদ্ধি, কখনও দুঃস্থতা—এই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে বার বার তাকে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে হচ্ছে। ১৯৫৬ সালের প্রথম দিকে পাটশিল্প প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে, কিন্তু তার শেষ ভাগে এবং ১৯৫৭ সালে আবার সংকট দেখা দেয়, পাটজাত পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা কমে যায়। পরবর্তী দু' বৎসরে এদেশের পাটশিল্প প্রচুর মুনাফা লাভ করে এবং বয়নবিভাগের আধুনিকীকরণও বেশ ভাল ভাবে অগ্রসর হয়। কিন্তু ১৯৬১ সালে পাটের উৎপাদন হ্রাস এবং সে সুযোগ ফড়ে দালালদের ফাটকাবাজির ফলস্বরূপ পাটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে এই শিল্পটি সঙ্কটের কবলে পড়ে, তার ফলে বহুসংখ্যক তাঁত বন্ধ রাখতে হয়। ১৯৬১-৬২ সালে আবার পাটশিল্পের সুদিন ফিরে আসে, কিন্তু ১৯৬২-৬৩ সালে তার উৎপাদন পুনরায় ব্যাহত হয়।

এই অনিশ্চয়তার রাহুগ্রাস থেকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের পাটশিল্পকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে তাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে অগ্রণী হতে হবে। কাঁচাপাট উৎপাদনের স্বয়ংনির্ভরতা অর্জনের প্রয়াসই হল এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য প্রাথমিক দায়িত্ব। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ৯০ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপাদন, অর্থাৎ এর উৎপাদন শতকরা ৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবে এরকম হিসেব করা হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় পাটশিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন লক্ষ্য ১৭ লক্ষ টন এর মধ্যে রপ্তানি করা হবে ১১ লক্ষ টন এবং ৬০০,০০০ টন আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পূরণ করবে। ১৯৬৬ সালে ভারতীয় মুদ্রার মূল্যহ্রাসের ফলে রপ্তানির

পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। পাটশিল্পের বর্তমান ইউনিটগুলো সম্প্রসারিত করেই এই লক্ষ্যের বাস্তব রূপায়ণে অগ্রসর হতে হবে। চতুর্থ পরিকল্পনার প্রস্তাবিত কর্মসূচী হল বৈদেশিক মুদ্রা অধিকতর পরিমাণে অর্জনের জন্য পাটজাত পণ্যদ্রব্যের রপ্তানিবৃদ্ধির চেষ্টা; কয়েকটি বিশেষ নির্বাচিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারের পাট উন্নয়নের পরিকল্পনাকে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার তহবিল থেকে সাহায্যদান; অধিকতর পরিমাণে সার ও উন্নত ধরনের বীজ ব্যবহার এবং পাটের চারা সংরক্ষণ, আগাছা নিয়ন্ত্রণ, সারিবদ্ধ বপন ও উন্নত ধরনের চাষের ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ; পশ্চিমবঙ্গের গভীর নলকূপসংবলিত অঞ্চলগুলোতে পাটচাষ প্রবর্তন (কোশি এবং হীরাকুঁদ প্রকল্পের অধীনস্থ যে সমস্ত অঞ্চল সম্প্রতি সেচের সুযোগসুবিধা লাভ করেছে, তারাও এই কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত হবে); সেচের সুযোগপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলোতে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ফসল হিসেবে ধান ও আলুর পর পাটচাষ এবং বর্তমান পাটবীজের পরিবর্তে উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা বিশিষ্ট ও রাসায়নিক সারের উপযুক্ত বীজের প্রবর্তন এবং পাটের আঁশের গুণগত উৎকর্ষসাধনে রাজ্য সরকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

চতুর্থপরিকল্পনার পাটশিল্প ও পাটচাষের উন্নয়নের কর্মসূচী

যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ, ও বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন এবং পাটচাষের উন্নয়ন, এই দ্বিমুখী প্রচেষ্টার ওপরই পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। এই প্রচেষ্টায় সরকার, পাটশিল্পের মালিক এবং পাটচাষীদের উদ্যোগ ত্রিবেণীসঙ্গমের মত মিলিত হওয়া প্রয়োজন। ১৯৬৭ সালে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাতের জন্য পাটের ফলনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এবৎসর পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৬০ লক্ষ টন গাঁইট পাট উৎপন্ন হবার আশা আছে। ভারতবর্ষে সাধারণত প্রায় ৭০ লক্ষ টন পাট উৎপন্ন হয়। সমগ্র দেশের পাটফলনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে হয় শতকরা ৫০ ভাগ। পাট উৎপাদন অন্যান্য প্রদেশগুলিতে—উড়িষ্যা, বিহার, ত্রিপুরা ও আসামেও এবৎসর পাটের উৎপাদন আশানুরূপ। মনে হয় ১৯৬৭ সালে পাটের সমগ্র ফলনের পরিমাণ হবে ৯৫ লক্ষ বা ১ কোটি গাঁইট, আর ভারতবর্ষের বাৎসরিক চাহিদা ৮৪ লক্ষ গাঁইট। সুতরাং এই বৎসরেই দেশকে প্রথম কাঁচা পাট আমদানি করতে হবে না। কিন্তু এতে আত্মতুষ্টির কোনও কারণ নেই। আকাশের দেবতা কখন যে খরারুদ্র আর কখন যে বৃষ্টিপ্রসন্ন হন তার কোনও স্থিরতা নেই। পাটচাষের উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস অত্যাবশ্যক। উন্মুক্ত আকাশতলে খররৌদ্রে ও মুষলধারা

পাটচাষের উন্নয়নের প্রয়োজনীয় দিক সমূহ

বর্ষণের মাঝখানে যারা বুকের রক্তজল করে একদা golden fibre নামে অভিহিত অর্থপ্রসূ এই পাট ফলায়, সেই মৃত্তিকাসন্তান দরিদ্র পাটচাষীরা যেন শোষণমুক্ত হয়ে লাভের ন্যায্য অংশ পায় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। সমবায়পদ্ধতিতে পাটচাষের মত সমবায় সংস্থার মাধ্যমে তার বিপণনের (marketing) ব্যবস্থাও গৃহীত হলে তারা ফড়ে—দালাল—মহাজন এবং পাটকলগুলির মালিকদের শোষণ থেকে মুক্ত হতে পারবে। নিবিড় চাষের (intensive farming) মাধ্যমে পাটের পরিমাণ ও গুণগত উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য পাটচাষীদের উন্নত বীজ, সার, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ঋণ সরবরাহ, জলসেচের সুযোগসুবিধাদান, গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থার দায়িত্ব সরকার ও পাটশিল্পকে গ্রহণ করতে হবে।

পাটচাষের উন্নয়নে পাটশিল্পের কোনও আগ্রহই এতাবৎকাল দেখা যায়নি, এটা সত্যি ক্ষোভের বিষয়। বদলি শ্রমিকপ্রথার জন্য জীবিকার অনিশ্চয়তা, একদিকে মুনাফার ন্যায্য অংশ ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করে রাখা, অন্যদিকে তাতে একটু ঘাটতি পড়লেই ছাঁটাই ও বাধ্যতামূলক কর্মবিরতি—এ সমস্ত কারণে চটকলের শোষিত শ্রমিকদের মধ্যে যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে, তার দূরীকরণে সরকারকেই নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। নির্লজ্জ শোষণ ও লুণ্ঠনের পরিবর্তে সদিচ্ছামূলক সহযোগিতাই যে ভারতের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয়,—সে সম্বন্ধে পাটশিল্পের মালিকদের সচেতন করে তোলার দায়িত্ব সরকারেরই।

উপসংহার

ভারতের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক মন্দা

এই প্রবন্ধের অনুসরণে
অর্থনৈতিক মন্দা ও তার প্রতিক্রিয়া

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পথ কুসুমাস্তৃত নয়, কণ্টকাকীর্ণ। সেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে নানা অনিশ্চয়তা, সংশয় সন্দেহের পিছু টান, ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি বিচ্যুতিতে পদস্খলনের ও নানা সংকটের সম্ভাবনা। এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষা, নতুন সমাজ সৃষ্টির যন্ত্রণা জাতিকে বহন না করলে চলে না। ভারতবর্ষও বর্তমানে সেই অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষভাগে ও চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম পর্বে সমগ্র দেশে যে অর্থনৈতিক সংকটের কৃষ্ণচ্ছায়া বিস্তৃত হয়েছে—ব্যাপকতায় ও তীব্রতায় তা সত্যি অসাধারণ ও অনন্য। চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় পরিকল্পনা কমিশন এই সময়কে 'অস্বাভাবিক বৎসর' (abnormal years) বলে চিহ্নিত করেছেন। ভারতের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিটি মহলই বর্তমান সংকটজনক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

প্রারম্ভ

ভারতের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটের প্রধান লক্ষণগুলো হল, প্রথমত, অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য দ্রব্যের, বিশেষত খাদ্যশস্যের অনটন ও ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ে ও চতুর্থ পরিকল্পনার প্রারম্ভে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির হার শতকরা ২২ ভাগ। ১৯৬৫-৬৬ সালে পণ্যদ্রব্যের পাইকারি মূল্য সূচক ছিল ১৬৫'১, ১৯৬৬-৬৭ সালে অর্থাৎ চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে তা ১৯১'০-তে বৃদ্ধি পায়। প্রথম পরিকল্পনা প্রবর্তিত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত আর কখনও এত মূল্য বৃদ্ধি ঘটেনি। ঐ সময়ে খাদ্যশস্যের মূল্যই প্রায় শতকরা ৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের দুর্গতির বোঝা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়তঃ, কয়েকটি শিল্পে, বিশেষত কৃষিভিত্তিক শিল্পে ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে ব্যাপক মন্দা দেখা দিয়েছে, ছাঁটাই, লে-অফ, ঘেরাও আন্দোলন, লক-আউট প্রাত্যহিক ঘটনা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এবং শিল্পক্ষেত্রের এই বিশৃঙ্খলা অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভারসাম্যকে গুরুতর ভাবে বিচলিত করেছে। অর্থনৈতিক মন্দার তৃতীয় লক্ষণ হল, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলোর অর্থনৈতিক সঙ্গতি গুরুতরভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং ঘাটতি বাজেটের ভারবহন কঠিন সমস্যা হয়ে উঠেছে। চতুর্থত, কৃষি

সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক মন্দার বিভিন্ন লক্ষণ

ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাসের ফলে সমগ্র অর্থনৈতিক অবস্থায়ই নিশ্চলতা দেখা দিয়েছে। পঞ্চমত, ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় ভারসাম্যের অভাব আত্মপ্রকাশ করেছে, তার জন্য অনিশ্চয়তার অন্ধকারে চতুর্থ পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ হয়ে পড়েছে আচ্ছন্ন।

ভারতের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যবিহীনতাকে কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ সংকট (recession) আখ্যা দিয়েছেন, কেউ বা তাকে মন্দা (slump) রূপে চিহ্নিত করেছেন। মন্দা সংকটেরই চরম রূপ। বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাকে সামগ্রিক ভাবে পরীক্ষা করে দেখলে তার মধ্যে মন্দার লক্ষণই পরিস্ফুট বলে মনে হয়। এই মন্দার অন্যতম প্রধান কারণ হল, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষির শোচনীয় ব্যর্থতা। ১৯৬৪-৬৫ সালের স্তর থেকে কৃষি উৎপাদন শতকরা ১৪ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। তার ফলে একদিকে যেমন খাদ্যশস্যের অনটন ও তৎজনিত মূল্যবৃদ্ধির সংকট দেখা দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি পাটশিল্পের মত কৃষি-ভিত্তিক শিল্পগুলোর উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। আভ্যন্তরীণ অভাব পূরণের জন্য খাদ্যশস্য কাঁচামাল অধিক পরিমাণে আমদানি করতে হয়েছে বলে ১৯৬৭ সালে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ১৫ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার হ্রাস পায়, পূর্ববর্তী বৎসরে এই হ্রাসের পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। ১৯৬৪-৬৫ ও ১৯৬৫-৬৬ এই পর পর দু বৎসরে অস্বাভাবিক খরা কৃষির এই উৎপাদন হ্রাসের কারণ স্বরূপ সরকারি মহলে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু পরিকল্পনা সংক্রান্ত কৃষিউন্নয়ন কর্মসূচীর ব্যর্থতাও তার জন্য কম দায়ী নয়।

অর্থনৈতিক মন্দার অন্যতম কারণ: কৃষি উৎপাদনে ব্যর্থতা

একদিকে যেমন কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মুদ্রার সরবরাহে ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটেছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে চীন ও পাকিস্তানের আক্রমণের ফলে একই সঙ্গে দেশরক্ষা ও উন্নয়নের গুরুভার দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে সরকার ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। শুধু প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা ও উন্নয়নের জন্যই নয়, খাদ্য ও সার বাবদ অর্থসাহায্য, খাদ্যশস্যের আমদানি, খরা, দুর্ভিক্ষ ও বন্যাক্লিষ্ট অঞ্চলে ত্রাণকার্য প্রভৃতির জন্যও সরকারের ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে। বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলোর ব্যাঙ্ক থেকে যে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করেছেন তার ফলেই মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৩৫৯ কোটি টাকা, অর্থাৎ শতকরা ৯'৪ ভাগ, ১৯৬৫-৬৬ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪২৯ কোটি টাকায়, অর্থাৎ শতকরা ১০'৩

ভাগে। ১৯৬৬-৬৭ সালেও অর্থ সম্প্রসারণের হার প্রকৃত উৎপাদনবৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশী ছিল, এই সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০৭ কোটি টাকায়, অর্থাৎ শতকরা ৯৬ ভাগে। এর ফলেই সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে বৈষম্য গুরুতর ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি তারই প্রতিফলন। জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের ব্যয়বৃদ্ধির দরুণ মজুরী ও বেতন বৃদ্ধি করতে হয়েছে এবং রাজ্যসরকারগুলোর বাজেটের ওপর তার চাপ পড়েছে।

ঘাটতি ব্যয় ও মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি

সমগ্র তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিনিয়োগের প্রয়োজনের তুলনায় আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় তথা মূলধন গঠনের হার নিতান্ত নৈরাশ্যজনক। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারের মূলধন নির্মাণে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৯৭, ১,০১০ ও ২,০৬৬ কোটি টাকা। কিন্তু এই তিনটি পরিকল্পনায় মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৩৬, ২১৮ ও ১,৩৬৫ কোটি টাকা। ১৯৬৬-৬৭ সালে অর্থাৎ চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে মূলধন বাজারের কাজকর্মের অবস্থা আশাপ্রদ হয়নি। পণ্যদ্রব্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি এবং বিপুলপরিমাণ বিনিয়োগের ফলে মুষ্টিমেয় যে সকল শ্রেণীর হাতে অর্থ সঞ্চিত হয়েছে তাদের জমি, মূল্যবান ধাতু ইত্যাদিতে, অনুৎপাদক বিনিয়োগ ও ভোগবিলাসে অনুৎপাদক ব্যয়ের জন্য মূলধন বাজারে অর্থের সরবরাহ হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ভারতীয় মুদ্রার মূল্যহ্রাসের ফলে পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোর মূলধনী ব্যয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও মূলধন নির্মাণজনিত ব্যয়ের ভিতরকার এই ক্রমবর্ধমান ব্যবধানও মন্দার জন্য দায়ী।

আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও মূলধনী ব্যয়ের ব্যবধান

অসাধু ব্যবসায়ীদের খাদ্যশস্যের ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যের মজুতদারি, ফাটকাবাজি ও চোরাকারবারও বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটকে তীব্রতর করে তুলেছে। আয়কর ফাঁকি দেওয়া প্রচুর কালোটাকা এদের হাতে জমেছে এবং তা ফাটকাবাজিতে নিয়োজিত হচ্ছে। এই অসাধু ব্যবসায় দেশের অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ১৯৬৬ সালে আমদানি সহ মোট খাদ্যশস্যের সরবরাহ শতকরা ১২ ভাগ হ্রাস পায়, কিন্তু তার মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল শতকরা ২৫ ভাগের বেশী। ১৯৬৭ সালে খাদ্যশস্যের মূল্য শতকরা ৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এই সালের সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যেকার বৈষম্য যেখানে প্রায়

অসাধু ব্যবসায়িদের খাদ্যশস্যের মজুতদারি ও ফাটকাবাজি

৬০ লক্ষ টন, বা শতকরা ৭ ভাগ, সেক্ষেত্রে ঐ অসমানুপাতিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য জোতদার, বড় চাষী ও ব্যবসায়ীদের খাদ্যশস্যের মজুতদারি বহুলাংশে দায়ী। চাহিদা ও সরবরাহের প্রকৃত সম্পর্কের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিহীন এই মূল্যবৃদ্ধিকে অর্থনীতিবিদেরা ফাটকাবাজিমূলক মুদ্রাস্ফীতি (speculative inflation) আখ্যা দিয়েছেন।

সরকার সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক মন্দার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সচেতন; তাঁরা এই সংকটের প্রতিরোধে কতকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছেন। প্রথমত, চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষিউৎপাদনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সরকার ঘাটতি ব্যয় পরিহারে দৃঢ়সংকল্প। বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ভার যাতে বৃদ্ধি না পায় তার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে রাজ্যসরকারগুলোর অতিরিক্ত আগাম (over draft) নেওয়া বন্ধ করেছেন। তৃতীয়ত, পণ্যদ্রব্যের আভ্যন্তরীণ ভোগ হ্রাস করে রপ্তানির বৃদ্ধি সাধন, অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনরত শিল্পবাণিজ্যের ওপর করস্থাপন এবং সামাজিক দিক থেকে বিলাসপণ্য জাতীয় বা বিত্তবানদের ব্যবহৃত যে সকল দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি অবাঞ্ছিত নয় তাদের ওপর কর আরোপ এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে কর থেকে আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। চতুর্থত, মুদ্রাস্ফীতি দমন ও অর্থনৈতিক স্থিতিবিধানের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তর একটি বহুমুখী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সাহায্য ভাতার একাংশের পরিশোধ স্থগিত রাখা (এ প্রস্তাব কর্মচারীদের আপত্তির ফলে পরিত্যক্ত হয়েছে), বকেয়াকর আদায়, কর ফাঁকি বন্ধ, কালো টাকা খুঁজে বার করা, শহরাঞ্চলে জমি ক্রয়-বিক্রয়ে ফাটকাবাজি দমন ইত্যাদি ব্যবস্থা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। পঞ্চমত, সরকার পরিকল্পনামূলক উন্নয়নের অংশ হিসেবে নতুন রপ্তানিশিল্প গঠনের প্রস্তাব করেছেন।

অর্থনৈতিক সংকট প্রতিরোধে সরকারের প্রয়াস

বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট প্রতিরোধে এই সমস্ত ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয় বলেই অনেক অর্থনীতিবিদের ধারণা। তাঁদের মত সরকারকে আরও কঠোর ও ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা এই কর্মসূচীগুলোর প্রস্তাব উত্থাপিত করেছেন: এক, খাদ্যশস্যের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিপনণ এবং সমবায় সংস্থার মাধ্যমে তাদের সুষ্ঠু বণ্টন; দুই, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর জাতীয়করণ, কারণ এদের ঋণ সরবরাহের ওপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ সর্বাংশে সফল হয়নি; তিন, অধ্যাপক নিকোলাস

ক্যাল্ডরের করসম্পর্কিত সুপারিশগুলোর বাস্তব রূপায়ণ ; চার, উন্নয়ন ব্যতীত অন্যান্য খাতে ব্যয়বৃদ্ধি নিরোধ এবং উন্নয়ন মূলক ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় নিবারণ ; পাঁচ, যাতে জীবনযাত্রার মান ও কাজকর্মে উৎসাহ রক্ষা করা যায় এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্যের স্থিতিবিধানে সহায়ক হতে পারে সেভাবে একটি সুপরিকল্পিত আয়নীতির প্রবর্তন ; ছয়, রপ্তানিবৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রয়াস ; সাত, বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের সদ্ব্যবহার ; আট, চতুর্থ পরিকল্পনাকে সাধ্যায়ত্ত রেখে তার লক্ষ্যগুলোর সুষ্ঠু রূপায়ণ এবং নয়, কালোটাকা উদ্ধারের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, এমনকি, প্রয়োজনমত ডিমনিটাইজেশন, অর্থাৎ প্রচলিত একশত বা হাজার টাকার নোটগুলোকে বিহিত মুদ্রা (legal tender) থেকে বাতিল করার জন্যও সরকারকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

অর্থনৈতিক মন্দা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ

সংকট যতই তীব্র হোক, তা অনতিক্রমনীয় নয় একথা আমাদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে। ভারতবর্ষ বর্তমানে যেমন এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন, তেমনি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মত শক্তিও তার আছে। মন্দীভূত অর্থনৈতিক অগ্রগতির হারকে গতিশীল করার জন্য সরকারি প্রচেষ্টার সঙ্গে জনসাধারণকে হাত মেলাতে হবে। এখন একান্ত প্রয়োজন বলিষ্ঠ জাতীয় নেতৃত্বের। তার পতাকাতলে সকল শক্তিকে সংঘবদ্ধ ও সংহত করতে পারলেই আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে নদী মন্দীভূত হয়ে এসেছে, তার শুষ্কখাতে জলোচ্ছ্বাস দেখা দেবে, তার যাত্রা পথে ধ্বনিত হবে নবজীবন-সমুদ্রের কল্লোল।

উপসংহার

বেতন, মজুরী ও মুনাফা বন্ধ রাখার প্রস্তাব

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

ভারতের অর্থনৈতিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে বেতন বন্ধের প্রস্তাব

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগ থেকেই ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে, তীব্রতা ও ব্যাপকতায় তার তুলনা সম্ভবত গত বৎসরগুলোতে পাওয়া যাবে না। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি এই সংকটের প্রধানতম দিক। সাম্প্রতিককালের পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির হার সত্যিই উদ্বেগজনক। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূত্রপাত থেকে পণ্যদ্রব্যের যে মূল্যবৃদ্ধি আরম্ভ হয়, তা ১৯৬৩-৬৪ ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত এইতিন বৎসরে কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬৬ সালে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল প্রায় শতকরা ৩৭ ভাগ। ১৯৬৭-৬৮ সালের প্রথমভাগে পণ্যদ্রব্যের পাইকারি মূল্যের সাধারণ সূচক ২০৯-এর কাছাকাছি ছিল, জুলাই মাসে তা ২১৮·৭-তে বৃদ্ধি পায়, এই ঊর্ধ্বগামিতা রুদ্ধ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাচ্ছে না। অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য, বিশেষত খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস এবং সরকারি অংশের ব্যয়বৃদ্ধিই এই সংকটের মূল কারণ।

প্রারম্ভ

চীন ও পাকিস্তানের আক্রমণের জন্য দেশরক্ষাব্যয়বৃদ্ধি, উন্নয়নসংক্রান্ত ব্যয়েরও পরিমাণ বৃদ্ধি, খরা, দুর্ভিক্ষ ও বন্যাক্লিষ্ট অঞ্চলে ত্রাণকার্য, ন্যায্যমূল্যে খাদ্যশস্য ও সার সরবরাহের জন্য আর্থিক সাহায্য, সরকারি শিল্পগুলোর লগ্নীর তুলনায় লাভের স্বল্পতা প্রভৃতির দায়দায়িত্ব বহন করতে গিয়ে সরকার যে ঘাটতিব্যয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, প্রকৃত উৎপাদনের তুলনায় তার মাত্রাধিক্য এই মুদ্রাস্ফীতির সংকট সৃষ্টি করেছে। মুদ্রাস্ফীতির এই পরিবেশে সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির দাবী প্রবল হয়ে ওঠে, সরকারকে অন্তত কিছুটা পরিমাণেও তা পূরণ করতে হয়, কিন্তু সেই বৃদ্ধি আবার মূল্যবৃদ্ধি ঘটায়। এই দুষ্টচক্রের আবর্তনে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাগত ক্ষয় ঘটতে থাকে। ভারতের বর্তমান অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির এই অশুভ চক্রাবর্তনই আমরা লক্ষ্য করছি। এর ফলে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থায় ভয়াবহ বিশৃংখলা সৃষ্ট হয়েছে।

মহার্ঘভাতা ও মূল্যবৃদ্ধির চক্রাবর্তন

কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা সম্পর্কিত সমস্যা বিচার বিবেচনা করার জন্য যে গজেন্দ্রগড়কর কমিশন নিয়োগ করেছিলেন তাঁরা মূল্যবৃদ্ধি জনিত আতঙ্কজনক পরিস্থিতির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, মূল্যবৃদ্ধির সমস্যাকে কার্যকরী ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে দেশের অর্থনীতির গুরুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। কোনও কোনও অর্থনীতিবিদের মতে, পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, মজুরীবৃদ্ধি ও মুনাফাবৃদ্ধি (wages and dividends freeze) একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ রাখা এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পন্থা। কিছুদিন পূর্বে ব্রিটেনে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা নিয়ন্ত্রণে শ্রমিক সরকার মূল্য ও মজুরী বৃদ্ধির সাময়িক বন্ধের যে নির্দেশ জারী করেছিলেন, তাতে বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি ও বৈদেশিক লেনদেনের উন্নতি, শিল্পোৎপাদন ও জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার উন্নতি প্রভৃতি সুফল পাওয়া গেছে।

ব্রিটেনে মূল্য ও মজুরী বৃদ্ধি বন্ধের ব্যবস্থা

ব্রিটেনের এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী আমাদের দেশেও মুদ্রাস্ফীতির সংকট নিরোধের জন্য বেতন ও মজুরী বৃদ্ধি বন্ধের প্রস্তাব বিভিন্ন মহলে উত্থাপিত হয়েছে। ভারতের বর্তমান অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এই প্রস্তাবের সমর্থক। এই প্রস্তাবের প্রবক্তাদের মতে, মজুরী ও পণ্যদ্রব্যের মূল্য যে ভাবে চক্রাকারে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তার নিয়ন্ত্রণে মূল্য, মজুরী ও মুনাফা এই তিনটিকে বর্তমানের স্তরে অপরিবর্তিত অর্থাৎ তাদের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি স্থগিত রাখার নীতিই গ্রহণ করা উচিত। শ্রীমোরারজী দেশাইও এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ভারতের অর্থনীতিকে যদি স্থিতিশীল করতে হয়, তবে অবিলম্বেই বেতনবৃদ্ধি বন্ধ করতে হবে।

ভারতে বেতন ও মজুরী বৃদ্ধি বন্ধের প্রস্তাব

মুদ্রাস্ফীতিদমন ও অর্থনৈতিক স্থিতিবিধানের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তর সম্প্রতি যে বহুমুখী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন, তাতে বেতনবৃদ্ধি বন্ধকে অন্যতম প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনানুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতার একাংশের পরিশোধ স্থগিত রেখে তা জাতীয় সঞ্চয়পত্র, প্রতিরক্ষাবণ্ড ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করা হবে। সরকারি শিল্পোদ্যোগে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতনের ওপরও অনুরূপ বিধিনিষেধ আরোপিত হবে, তাঁরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের ওপর বেতন বা ভাতা নগদ টাকায় নিতে পারবেন না; অবশিষ্ট টাকা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড অথবা অন্য কোনও সঞ্চয় প্রকল্পে জমা দিতে হবে। কোম্পানিগুলোর উচ্চপদস্থ

কেন্দ্রীয় সরকারের বহুমুখী পরিকল্পনা

কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নগদে দেয় বেতনের সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে মাসিক ৫,০০০ টাকা। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হলেও তা অন্যান্য ক্ষেত্রেও গৃহীত হবে অনুমান করা যায়।

বেতন ও মজুরীবৃদ্ধি বন্ধের অন্যতম শর্ত হল মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ, তা না হলে এই ব্যবস্থা দরিদ্র জনসাধারণের কাছে একটা মর্মান্তিক, নিষ্ঠুর পরিহাস হয়ে উঠবে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য এই যে, এ পর্যন্ত মূল্যের উর্ধ্বগতিকে রোধ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় যে অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করেছিলেন, তাতে স্পষ্টতই আভ্যন্তরীণ পণ্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা স্বীকার করা হয়। এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে, মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ এবং খাদ্যের সমবণ্টন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা ও শক্তিশালী করে তোলাই জরুরী সমস্যা। কিন্তু পণ্যের সরবরাহ এমন গুরুতর ভাবে সীমাবদ্ধ যে ঐকান্তিক প্রয়াস সত্ত্বেও মূল্যস্তর স্থিতিশীল করা সম্ভব হবে না। এই পরিস্থিতিতে মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিন্যাস কার্যকরী করা যাবে না। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্যস্ফীতি রোধ না করে দুঃস্থ, দরিদ্র জনসাধারণের ওপর মজুরী ও বেতনবৃদ্ধি বন্ধের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া কোনও মতেই উচিত হবে না।

বেতন ও মজুরীবৃদ্ধি বন্ধের প্রাক্-শর্ত মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ

দ্বিতীয় অপরিহার্য শর্ত, মুনাফাবৃদ্ধি বন্ধ। কয়েক বৎসর ধরে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা যে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে আসছেন, তা নিঃসন্দেহে মূল্যস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ। সরকার এই মুনাফালুণ্ঠনকে রোধ করতে সক্ষম হননি। আর এদেশের অতি মুনাফাশিকারী ব্যবসায়ীরা স্বেচ্ছায় মুনাফাবৃদ্ধি বন্ধকে মেনে নেবেন এ আশা আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সরকার আজ পর্যন্ত আয়করবিহীন কালো টাকার কোনও উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধার করতে পারেননি। ব্যবসায়ীদের মুনাফা সংগ্রহ অব্যাহত থাকবে, আর দরিদ্র কর্মচারী ও শ্রমিকদের বেতন ও মজুরীবৃদ্ধি বন্ধ হবে, এই অবস্থায় তাদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ নানাদিক থেকেই জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ১৯৬৬ সালে যখন প্রথম এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তখন তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী বলেছিলেন, যদি একই সঙ্গে দ্রব্যমূল্য ও মুনাফাবৃদ্ধি বন্ধ না করা যায় তবে বেতনবৃদ্ধি বন্ধ করে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না।

বেতন ও মজুরি বৃদ্ধি বন্ধের আর একটি শর্ত : মুনাফা বৃদ্ধি বন্ধ

যে সকল পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের মজুরীবৃদ্ধির বন্ধের ব্যবস্থা সুফলপ্রসূ হয়েছে

তার প্রত্যেকটি আমাদের দেশে অনুপস্থিত। ব্রিটেনে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের ওপর সরকারের যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত, আমাদের দেশে তার কোনও সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। সেখানে বেতন, মজুরী এবং জীবনযাত্রার মান এমন একটি উচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যার সঙ্গে আমাদের কোনও তুলনাই চলতে পারে না। উন্নতির সেই পর্যায়ে উপস্থিত হতে আমাদের এখনও অনেক দেরী। ব্রিটেনে বেতন ও মজুরীবৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের সুযোগসুবিধা যতটা লাভ করা গেছে, শ্রমিক ও সাধারণ চাকুরিজীবিদের অসন্তোষের কারণ ততটা ঘটে নি।

ভারতের পরিবেশ বেতন ও মজুরিবৃদ্ধি বন্ধের অনুকূল নয়

বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার পটভূমিতে বিচার করলে বেতন ও মজুরীবৃদ্ধি বন্ধের প্রস্তাবকে অসম্ভব বলেই মনে হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় মজুরী ও বেতন নীতি সম্পর্কে ঘোষণায় পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন, সংসার খরচ বৃদ্ধির ক্ষতি পুরোপুরি পুরণ করা অসম্ভব, এমন কি অবাঞ্ছিত। এ প্রসঙ্গে ডাঃ গ্যাডগিল বলেছেন, 'এর অর্থ শুধু এই হতে পারে যে পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের জন্য আয়, এমন কি স্বল্প বেতনভোগী সরকারী কর্মচারীদেরও জীবনযাত্রার মান হ্রাস করা প্রয়োজন। এই নীতির দ্বারা এটাই স্পষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে যে পরিকল্পনাগুলো এমনভাবে রূপায়িত করা হয়েছে যাতে দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার নিরবিচ্ছিন্ন ক্রমাবনতির প্রয়োজন হয়।'

সরকারকে অবশ্য মূল্য ও মজুরীবৃদ্ধির চক্রাবর্ত থেকে দেশের অর্থনীতিকে উদ্ধার করার জন্য সচেষ্ট হতেই হবে। কিন্তু এই আর্থিক দায়িত্ব পালনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যদি নোট ছাপিয়ে ঘাটতি ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করেন, তবে দেশের মুদ্রাস্ফীতির সংকট সত্যি ভয়াবহ হয়ে উঠবে। বেতন ও মজুরীবৃদ্ধি হলে তাই মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়। বেতনবৃদ্ধি বন্ধ না করে কি ভাবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সরকারকে সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে। খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও সমবায় সমিতির মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য আবশ্যক ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের সুষ্ঠু বণ্টন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয়সংকোচ, সরকারি সংস্থার অধীনে অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ইত্যাদি ব্যবস্থার সাহায্যে সরকারকে পণ্যদ্রব্যের মূল্যের উর্দ্ধগতিকে রোধ করার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পণ্যদ্রব্যের মহার্ঘতা যদি হ্রাস পায়, তবে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির দাবিও প্রবল হয়ে উঠবে না, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধা অপসারিত হবার ফলে তাতে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হবে।

উপসংহার

ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারসমূহের সম্পর্ক

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কের গুরুত্ব

১৯৪৬ সালে দেশবিভাগের ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর থেকে দীর্ঘ কুড়ি বৎসরকাল পর্যন্ত কংগ্রেস দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কেন্দ্রে ও রাজ্যে দেশশাসনের দায়িত্ব পালন করে এসেছে। তার ওপর ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর বিশাল ব্যক্তিত্ব নানা সংশয়, মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মাঝখানে ধ্রুবতারকার মত দেশবাসীদের পথ নির্দেশ করে এসেছে। ভারতবর্ষ বিভিন্ন ভাষা ভাষী, ধর্মামতাবলম্বী জাতির দেশ, তার সেই বৈচিত্র্যের এবং সকল বিভিন্নতার মধ্যেই ঐক্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রেখেই ফেডারেল বা

প্রারম্ভ

যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচে তার শাসনতন্ত্র গড়ে তোলা হয়েছে এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচয়িতারা তদনুযায়ী প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতার পরিধিগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছেন। কেন্দ্র ও রাজ্যে একই রাজনৈতিক দল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য এতদিন পর্যন্ত কোনও কোনও ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিলেও তা কখনও সংঘাতের রূপ নেয় নি।

কিন্তু ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতবর্ষের এই রাজনৈতিক

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতের রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তন

পটভূমি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। এই নির্বাচনের পর কেন্দ্রে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে শাসনাধিকার লাভ করলেও কয়েকটি রাজ্যে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য বিভিন্ন দল জোটবন্দী হয়ে অকংগ্রেসী সরকার গঠন করেছে। এই রাজ্যগুলো হল, কেরল, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যা। আর মাদ্রাজে ডি. এম. কে দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। বিভিন্ন মতাদর্শ অনুসরণকারী দল এই সব রাজ্যের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমগ্র জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যাগুলোর পর্যালোচনার প্রয়োজন।

রাজনৈতিক মতাদর্শের বিভিন্নতার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধের সূচনা ও সম্ভাবনা এরই মধ্যে পরিস্ফুট। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বামপন্থী দল এই প্রদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ, বৈরিতামূলক মনোভাব, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাবার প্রয়াস ইত্যাদি অভিযোগ উত্থাপিত করেছেন। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকেও পশ্চিমবঙ্গে আইন ও শৃংখলা গুরুতরভাবে বিপন্ন, এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। এই ধরনের বাদানুবাদ ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়। সরকারি কাজকর্মের ভাষারূপে হিন্দীকে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে, বিশেষত মাদ্রাজে প্রবল মনোভাব বিদ্যমান, সেটাও যে কোনও মুহূর্তে গুরুতর সমস্যার রূপ ধারণ করতে পারে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলোর মতবিরোধ সমস্যাকে জটিল করে তুলছে। পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলোর মধ্যে বোঝাপড়া ও পূর্ণ সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। এতাবৎকাল রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকার একই রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল বলে পরিকল্পনা কমিশন সকল রাজ্যের জন্য পরিকল্পনার একটি ছক বা কাঠামো নির্দিষ্ট করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনোত্তর পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তা যে সম্ভব হবে না তার লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছে। যে সকল বিষয় রাজ্যসরকারের ক্ষমতার পরিধিভুক্ত, সে সমস্ত ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ পূর্বের মত গৃহীত না হবার সম্ভাবনাই অধিক। আর রাজ্যসরকারগুলোর চাপে এবং তাদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থের টানা পোড়েনে পরিকল্পনা যদি বিকেন্দ্রীকৃত হয়, তবে তা হয়ত দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে।

পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের সম্পর্কের সমস্যা

রাজস্ব, আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি বিষয়ে ইতোমধ্যেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। বর্তমানে সমগ্রদেশে ঘাটতি ব্যয়প্রসূত মুদ্রাস্ফীতির ফলে যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রতিরোধে উদ্যোগী হয়ে ঘোষণা করেছেন, রাজ্যসরকারগুলো আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে অতিরিক্ত আগাম (overdraft) নিতে পারবেন

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে রাজ্যসরকারগুলোর ওভারড্রাফট্ গ্রহণ বন্ধ

না। কয়েকটি রাজ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে অতিরিক্ত আগাম গ্রহণ করার জন্য ১৯৬৭ সালের মার্চ পর্যন্ত হিসাবের বৎসরটিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যগুলোকে মোট ১০৮ কোটি টাকা দিতে হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একাধিকবার বলেছেন, বাজেটের ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলোর ঋণ গ্রহণ মুদ্রার সরবরাহের পরিমাণকে বৃদ্ধি করেছে এবং তা বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের জন্য বহুলাংশে দায়ী। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত ঋণ ও সুদ পরিশোধ করে দেবার জন্যও রাজ্যসরকারগুলোর ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছে।

কয়েকটি রাজ্যে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য রাজ্যসরকারের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সমতুল্য হারে মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে, তার ফলে রাজ্যগুলোর বাজেটের ব্যয় ভার বৃদ্ধি পেয়েছে। তদুপরি কয়েকটি রাজ্যের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকে রদ করা হয়েছে, এতেও তাদের ঘাটতির পরিমাণ বেড়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ভূমিরাজস্ব রহিত করার জন্য উড়িষ্যা সরকারের চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ১৫ কোটি টাকার মত রাজস্বের ক্ষতি হবে। প্রায় প্রতিটি রাজ্যসরকারের ১৯৬৭ সালের বাজেটে বিপুল পরিমাণ ঘাটতি দেখানো হয়েছে। প্রধানত বেসরকারি স্কুলকলেজ সমেত সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি এবং খরা ও বন্যাক্লিষ্ট অঞ্চলগুলোয় ত্রাণ কার্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘাটতির পরিমাণ ৩৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাজেটের এই ঘাটতি পূরণের জন্য রাজ্যসরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ দিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত এই যে, পূর্বাহ্নেই নিজেদের আর্থিক সীমার মধ্যে ব্যয়বরাদ্দকে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য রাজ্যসরকারগুলোকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। কয়েকটি রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা খাদ্যশস্যের সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে, কেন্দ্র তার ব্যয়বহনে অনিচ্ছুক। রাজ্যসরকারগুলোর বক্তব্য এই যে, বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি ও তজ্জনিত মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটতি ব্যয়ই দায়ী। দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী রাজ্যসরকারসমূহ যে বে-হিসেবী ব্যয় করেছেন, তার সকল দায়িত্বের বোঝা বর্তমান সরকারদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। তৃতীয়ত, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পূর্ববর্তী সরকারদের আমলেই তাদের চতুর্থ পরিকল্পনার কাঠামো রচিত হয়েছিল, এখন কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রাজ্য-সরকারগুলো তার অন্তর্ভুক্ত জনকল্যাণ কর্মসূচীগুলো বাতিল করে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন না।

বাজেটের ঘাটতি সম্পর্কে মতবিরোধ

খাদ্যশস্যের সরবরাহকে কেন্দ্র করেও কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলোর মধ্যে মতবিরোধের তিক্ততা আত্মপ্রকাশ করেছে। কেরল, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের মত ঘাটতি, উদ্বাস্তু ও বেকার সমস্যা এবং শিল্প-বাণিজ্যের বর্তমান মন্দা প্রভৃতিতে বিপর্যস্ত প্রদেশে কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথভাবে খাদ্যশস্য সরবরাহ করেননি,' এই অভিযোগ বার বার উচ্চারিত হয়েছে। পূর্বে খাদ্যশস্যের সরবরাহের দাবীতে পশ্চিম-বঙ্গের কয়েকজন মন্ত্রীর দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনের নিকট ধর্না বা অবস্থান ধর্মঘটের অভিনব সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমগ্র দেশে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, সেটা আর কার্যকরী করা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের তীব্র খাদ্য সংকটের জন্য প্রাদেশিক সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহের অক্ষমতা দায়ী বলে ঘোষণা করেছেন।

খাদ্যশস্যের সরবরাহ সম্পর্কে মতবিরোধ

রাজস্বের অংশ ও কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য সম্পর্কেও রাজ্যসরকারগুলোর অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলোর মধ্যে রাজস্ব বণ্টন, কেন্দ্রের অর্থ সাহায্যের নীতি ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে সুপারিশ করবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর একটি করে ফিনান্স কমিশন গঠন করতে হয়। ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ বাধ্যতামূলক না হলেও তা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে থাকে। প্রথম ফিনান্স কমিশনের গঠনের কাল থেকে (১৯৫১) চতুর্থ ফিনান্স কমিশন গঠন পর্যন্ত (১৯৬৪-৬৫) পর পর চারটি কমিশন কেন্দ্রীয় রাজস্বে রাজ্যগুলোর অংশ, বিধিবদ্ধ অনুদান (statutory grants) ও ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করেছেন; প্রথম, পরিকল্পনাকালে এ সমস্তের মোট পরিমাণ ছিল ১,৪২৩ কোটি টাকা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় যথাক্রমে ২,৮৬৯ ও ৫,৪৭৮ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপায়ণে স্বেচ্ছায়ই তাঁদের রাজস্বের অংশ ছেড়ে দিয়েছেন এবং অনুদান ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছেন।

চারটি ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় রাজস্বে রাজ্যের অংশ বৃদ্ধি

অন্যদিকে রাজ্যসরকারদের পক্ষ থেকে একথা বলা যায় যে, কেন্দ্রের ঘাটতি-ব্যয়ের জন্য এই পরিমাণ বৃদ্ধিতে বাস্তবক্ষেত্রে রাজ্যগুলো বিশেষ উপকৃত হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর ব্যয় সংযম পালন করতে রাজ্যসরকারদের উপদেশ দিচ্ছেন, কিন্তু তাঁরা নিজেরাই 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়'

রাজ্যগুলোর বক্তব্য: কেন্দ্রীয় সরকার আয় ও ব্যয়ের সমতাবিধানে উদ্যোগী হয়নি

এই নীতি কখনও অনুসরণ করেননি। ১৯৬৭ সালের শেষভাগের এক অডিট রিপোর্টে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় সরকার তৃতীয় পরিকল্পনাকালে যেখানে অতিরিক্ত কর হিসেবে ২,৪৯৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিলেন, সেখানে প্রতিরক্ষা ছাড়াই উন্নয়ন বহির্ভূত ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ হয়েছে ১,০৭৫ কোটি টাকা, অথচ উন্নয়নখাতে অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৩৩ কোটি টাকা। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতাবিধানের জন্য এতাবৎকাল কেন্দ্রীয় সরকার যে সচেষ্ট হননি, এই হিসেবই তার প্রমাণ। একদিকে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস ও তার মন্থর গতি, অন্যদিকে তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যবিহীন বিপুল পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়ের জন্য সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, তার দায় ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারেরই বহন করা উচিত।

ফিনান্স কমিশনের রাজস্ব বণ্টনের নীতিসম্পর্কেও রাজ্যসরকারসমূহ অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। ১৯৬৫ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর চতুর্থ ফিনান্স কমিশনের যে সুপারিশ উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, আয়কর বণ্টনের ক্ষেত্রে রাজ্যের মোট অংশের শতকরা ৮০ ভাগ রাজ্যগুলোর জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ তাদের আয়কর সংগ্রহের ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য অংশ শতকরা ১২·০৯ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ১০·৯১ ভাগে দাঁড়িয়েছে। চতুর্থ ফিনান্স কমিশন পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, বিহার, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের জন্য কেন্দ্রের সাহায্যস্বরূপ অনুদানের কোনও ব্যবস্থা রাখেননি এবং রাজ্যসরকারের কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির ব্যয় সংকুলানের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও মহীশূর মাত্র এই তিনটি রাজ্যের জন্য কেন্দ্রের অতিরিক্ত অনুদানের সুপারিশ করেছেন। ভারতের প্রধান আয়কর সংগ্রহকারী রাজ্যগুলোর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম এবং এই প্রদেশটি নানা সমস্যায় জর্জরিত, তার আয়করের অংশ হ্রাস করে তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

চতুর্থ ফিনান্স কমিশনের রাজস্ব বণ্টনের নীতি সম্পর্কে অভিযোগ

পরিকল্পনা কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করেছেন, ১৯৬৭ সালে বিভিন্ন রাজ্যকে কেন্দ্রের সাহায্য হিসেবে ৫৯০ কোটি টাকা বণ্টন করা হবে, তার ৭০ শতাংশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং ৩০ শতাংশ বিশেষ প্রয়োজনের পটভূমিতে বণ্টিত হবে। কেন্দ্রীয় সাহায্যের ৭০ শতাংশ অর্থাৎ ৪১৩ কোটি টাকা জনসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টিত হলে পশ্চিমবঙ্গের অংশের পরিমাণ ৩৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, অবশিষ্ট ৩০

শতাংশ অর্থাৎ ১৭৭ কোটি টাকার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জন্য মাত্র ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী এই বরাদ্দকে অত্যন্ত বৈষম্যমূলক বলে অভিহিত করে বলেছেন, 'পরিকল্পনা কমিশন কি ভাবে মনে করলেন যে পশ্চিমবঙ্গের কোন বিশেষ সমস্যা নেই এবং সে বিশেষ প্রয়োজনের ভিত্তিতে ১৭৭ কোটি টাকার মধ্যে ১ কোটি টাকার বেশী পাবার অধিকারী নয়?' পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রীর ১৯৬৭ সালের বাজেট বক্তৃতায় কেন্দ্র ও রাজ্যের আর্থিক সম্পর্কের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কোনও কোনও রাজ্যে আর্থিক ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারের অংশ বৃদ্ধি করার জন্য সাংবিধানিক পরিবর্তনের কথাও উচ্চারিত হচ্ছে।

কেন্দ্রের অর্থ সাহায্য সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য

রাজ্যগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কে এবং একই রাজ্যের সরকারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলগুলির মতবিরোধেও নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের ভবিষ্যতকে অনিশ্চয়তা ও সংশয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলছে। মাদক বর্জন নীতি সম্পর্কে কেরলের যুক্তফ্রন্ট সরকার ও মাদ্রাজের ডি. এম. কে সরকার সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি ঘোষণা করেছেন। ভাষা সম্পর্কেও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মতবিরোধের সম্ভাবনা আছে। যে সকল রাজ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জোটবন্দীর ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে, তাদের মতবিরোধ ও পরস্পর সম্পর্কে অসহযোগিতামূলক মনোভাব সেই রাজ্যগুলোর পরিবেশকে অসুস্থ, বিশৃঙ্খল, ও উদ্বেগজনক করে তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্ব এই অন্তর্কলহের ফলে বিলুপ্ত হয়েছে। সেই মতবিরোধের অস্থিরতা ও উত্তেজনা রাজ্যের সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে।

রাজ্যগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর সম্পর্কের সমস্যা

কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই প্রতিটি জাতিকে বিপদ, অনিশ্চয়তা, সংশয় দুর্যোগের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, ভারতের জাতীয় জীবনেও সেই পরীক্ষার মুহূর্তটি উপস্থিত। আমাদের পথ যতই অন্ধকারে দুর্নিরীক্ষ্য, বিপদসংকুল হয়ে উঠুক, মাথায় ঝড়ের বজ্রবিদ্যুৎ ভেঙে পড়ুক, আমাদের বিচলিত হলে চলবে না, জাতীয় সংহতির মন্ত্র উচ্চারণ করে দৃঢ় বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে। মতাদর্শের পার্থক্য যতই থাকুক, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থবোধের প্রেরণায় বিভিন্ন মতের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপন কঠিন হবে না, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে, সর্ববিধ স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করেই ঐক্যসন্ধানই ত ভারতের জীবনধর্ম, তার সকল সাধনার লক্ষ্য।

উপসংহার

ভারতের ভাষা সমস্যা

এই প্রবন্ধের অনুসরণে
- ভারতের ভাষা সমস্যা ও জাতীয় সংহতি
- ত্রিভাষা-সূত্র

প্রারম্ভ

বিশাল ভারতের বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। প্রায় পঞ্চাশ কোটি মানুষের দেশ ভারতের বুকে জীবনাধারণ-পদ্ধতি ও ভাষা-রীতিও বিভিন্ন। প্রচলিত ধারণাই শুধু নয়, একথা তথ্যগত সত্য যে ভারতের প্রতি বার মাইলে কথ্য ভাষার রূপ-পরিবর্তন ঘটে। গত ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে যে সর্বশেষ আদমসুমারি হয়, তাতে দেখা যায় যে, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা এবং আসাম থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতে ১২০০-র ও বেশী কথ্য ভাষা প্রচলিত আছে। বলাবাহুল্য, প্রচলিত সব কথ্য ভাষাই সমান শক্তিশালী ও উন্নত নয়, তা হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে, এই সব উপভাষা কতকগুলো মূল ভাষারই বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা মাত্র। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই ভারতীয় সংবিধান চোদ্দটি মূল আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকৃতি দান করেছে। এই চোদ্দটি ভাষা ভারতের 'জাতীয় ভাষার' গৌরব অর্জন করেছে। আর এই সঙ্গে আছে দীর্ঘ দুশো বছর ধরে চর্চিত ইংরাজী ভাষা যা ব্রিটিশ-শাসনের দান।

শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার মাধ্যম হিসেবে ইংরাজী ভাষা;

রাজনৈতিক ঐক্যের মাধ্যম ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রেরণা

বণিক ইংরেজ এদেশের শাসক হয়ে বসে শাসন পরিচালনার ভাষা হিসেবে ইংরাজী ভাষাকেই স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করেছিল; কেননা এই বহু ভাষাভাষী দেশ ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একই শাসন ব্যবস্থাকে কায়েমী করতে হলে এই পথ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এই ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার ফলে ভারতে ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা শুরু হয়ে যায়। প্রয়োগও হয়। কিন্তু এর দ্বারা অন্যান্য উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়েছিল। সমগ্র ভারতে এই ভাষাটি চালু হওয়ার ফলে দূর-দূরান্তে বসবাসকারী ভারতীয়রা পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পেরেছিল। ফলে এই ভাষার মাধ্যমেই এই বিরাট উপমহাদেশে গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক ঐক্য। ইংরাজী ভাষাই ভারতীয়দের কাছে পশ্চিমী রাজনৈতিক চিন্তা রাজ্যের বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল; ফলে ভারতীয়রা লাভ করেছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রেরণা।

ভারতের জাতীয়-মুক্তি-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ইংরাজী ভাষার নানান উপযোগিতার কথা স্বীকার করেও কিন্তু এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইংরাজী ভারতের জাতীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করতে পারে না।' ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী যে ভাষা বোঝে একমাত্র সেই ভাষাই ভারতের জাতীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করতে পারে। বিদেশী ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করতে যে প্রচণ্ড পরিমাণ মানসিক শক্তি ক্ষয় হয়ে থাকে এ সম্পর্কেও তাঁরা ছিলেন সচেতন। মহাত্মা গান্ধী ইংরাজী ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছিলেন : এই ভাষা আমাদের দেশের শিশুদের স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং তাদের মৌলিক চিন্তাধারার শক্তিকে করে ব্যাহত। এই ভাষা প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের শিশুদের নিজের দেশেই পরদেশী করে তোলে। "The foreign medium has caused brain fag, put an undue strain upon the nerves of our children, made them crammers and imitators, unfitted them for original work and thought, and disabled them for filtrating their learning to the family or the masses. The foreign medium has made our children practically foreigners in their own land." এই মন্তব্যের সত্যতা অনস্বীকার্য।

ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করতে মানসিক শক্তি ক্ষয়; জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া যায় না।

তাই দীর্ঘ দুশো বছর ধরে পরাধীনতা ভোগের পর স্বাধীনতা লাভ করে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এবং ভারতীয় সংবিধান রচয়িতাগণ ভারতের সবকটি প্রধান ভাষাকে জাতীয় ভাষার (national language) মর্যাদা দানের সিদ্ধান্ত নিলেন। এবং হিন্দী ভারতের অধিবাসীদের একটি বিরাট অংশ অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ শতাংশের ভাষা হওয়ায় এই ভাষাকে তাঁরা সরকারী ভাষা হিসেবে গ্রহণ করলেন। বলা বাহুল্য, সকলেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। ভারতের অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলি থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি পরিসংখ্যানের ত্রুটির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, হিন্দী ভারতের চল্লিশ শতাংশের ভাষা নয়, মাত্র পঁচিশ শতাংশের ভাষা। সুতরাং হিন্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার পেছনে কোন বলিষ্ঠ সমর্থন নেই।

হিন্দী সরকারী ভাষা; অনেকের বিরুদ্ধতা

কিন্তু বিরুদ্ধতা ও মত বিরোধ সত্ত্বেও ভারতের বিভিন্ন ভাষার মর্যাদা সম্পর্কে সংবিধানে যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু তখন থেকেই জাতীয় ঐক্য-বোধে

কাচল দেখা দেয়। এবং সমগ্র ভারতবর্ষে প্রদেশিক মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। ফলে সৃষ্ট হয় —ভাষা বিরোধ। এই সময় ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবী প্রবল হয়ে ওঠে। যাঁরা এই আন্দোলনের সমর্থক তাঁরা বললেন ভারতের প্রতিটি রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কৃত্রিম উপায়ে নির্দ্ধারিত রাজ্য-সীমানা ভেঙ্গে ভাষার ভিত্তিতে তা পুনর্গঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এবং এক ভাষাভাষী ব্যক্তিদের একই শাসন-ব্যবস্থার অধীনে আনা অপরিহার্য।

প্রাদেশিক মনোভাব : ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী

সমগ্র ভারতে এই দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠায় ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে এই বিষয়টি 'দার কমিটি'র (Dar Committee) কাছে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করে কিন্তু এই কমিটি এই দাবীকে ভারতের ঐক্য হানিকর বলে বাতিল করে দেন। কিন্তু এতে আন্দোলনের প্রবল জোয়ারে ভাঁটা পড়েনি। বরং আরও তীব্র গতি লাভ করে। এই সময় তেলুগু ভাষীদের পৃথক রাজ্যের দাবী নিয়ে শ্রীপট্টি শ্রীরামলু অনশন করে মৃত্যু বরণ করলে, ভারত সরকার ভাষার ভিত্তিতে প্রথম অন্ধ্র-রাজ্য গঠন করেন। আন্দোলন সাফল্য লাভ করে।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের দাবী ভারতীয় ঐক্য বিরোধী ; অন্ধ্র রাজ্য গঠন

সাফল্যের স্বর্ণমুকুট পরে এই আন্দোলন এমনই প্রবল হয়ে ওঠে যে ভারত-সরকার ১৯৫৩ সালে সমগ্র বিষয়টি ভাবাবেগহীন ভাবে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিবেচনার জন্য রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের (State Reorganization Commission) গঠন করেন। এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেই ১৯৫৬ সালে সালে রাজ্যপুনর্গঠন আইন বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু তাতেও সমস্যার মুলোৎপাটন হয়নি। এই সময় গুজরাটী ও মারাঠী ভাষা-ভাষী ব্যক্তিরা বোম্বাইকে দ্বিখণ্ডিত করার দাবী নিয়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু করেন এবং এরই পরিণতিতে বোম্বাই দ্বিখণ্ডিত হয়ে পৃথক গুজরাট রাজ্যের জন্ম ঘটে। ক্রমে পাঞ্জাব, আসাম, বিহার প্রভৃতি রাজ্যেও এই আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন ; গুজরাট রাজ্যের জন্মলাভ

এই সময় হিন্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা ছাড়াও সংবিধানের ৩৪৩ ধারায় ঘোষণা করা হয় যে, আগামী ১৫ বছর হিন্দীর পাশাপাশি

ইংরাজী ভাষার ব্যবহার চলতে থাকবে এবং রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন তবে ইংরাজী ভাষা ব্যবহারের সময় কাল তিনি আরও সম্প্রসারিত করে দিতে পারবেন। সংবিধানের ৩৪৩ ধারায় এই সিদ্ধান্ত সংযোজিত হওয়ায় ১৯৬৫ সালে এ সম্পর্কে পুনর্বিচার করার দায়িত্ব এসে পড়ে রাষ্ট্রপতির ওপর।

হিন্দী ও ইংরাজীর পাশাপাশি ব্যবহার; ১৯৬৫-তে পুনর্বিচার

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও হিন্দীকে ব্যাপক ভাবে জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব হয়নি দেখে এবং ভারতীয় ঐক্য-হানির আশঙ্কায় স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ১৯৬৩ সালে লোকসভায় সরকারী ভাষা আইন পাশ করে হিন্দী বিরোধী উগ্র মনোভাবকে প্রশমিত করেন। এই আইনে ইংরাজী ভাষাকে হিন্দী ভাষার সহযোগি ভাষা (associate language) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই সঙ্গে শ্রীনেহেরু অহিন্দী ভাষীদের এই আশ্বাস দেন যে তাঁদের মত ব্যতীত ইংরাজী ভাষাকে লোপ করা হবে না।

১৯৬৩ সালের সরকারী ভাষা আইন

কিন্তু ১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে এসম্পর্কে অতীতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাষা সম্পর্কে যে সরকারী মত প্রচার করা হয়, তা বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। এই সময় নতুন দিল্লীতে অন্ধ হিন্দী প্রেমিকের দল হিন্দী ভাষার ব্যবহার সম্পর্কিত যে প্রচারপত্র বিলি করে তা অহিন্দী ভাষীদের মনে সন্দেহের বিষ সঞ্চার করে এবং সন্দেহের বিষবাষ্প সমস্ত দেশ জুড়ে এমন ভাবে বিস্তৃতি লাভ করে যে দেশের আত্মা কম্পিত হয়ে ওঠে। বহু প্রাণ বিসর্জিত হয়, অনেক সম্পদ হয় বিনষ্ট।

দক্ষিণ ভারতে বিক্ষোভ

বিস্মিত ও আহত নেতৃবৃন্দ আতঙ্কিত হয়েই পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য দ্রুত দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতি ও সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সময়েই স্বর্গত নেহেরুর আশ্বাস বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হতে থাকে। এমন প্রশ্নও ওঠে যে স্বর্গত প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসকে আইনের মর্যাদা দেওয়া চলে কিনা? দেশের প্রতিটি কোণ থেকে এবিষয়ে মন্তব্য ও পাল্টা মন্তব্য প্রকাশিত হয়ে নানান বক্তব্যের এক মহারণ্য সৃষ্টি হয়ে ওঠে। কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছানর আশা হয় সুদূর পরাহত।

বক্তব্যের মহারণ্য

রাজধানী নতুন দিল্লীতে কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির সভা আহুত হয় এবং একই

সময়ে প্রধানমন্ত্রী সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন আহ্বান করেন। দুই সম্মেলন থেকেই এই সিদ্ধান্ত প্রচারিত হয় যে অহিন্দীভাষীদের মনে সঞ্চারিত সন্দেহ অপনোদনের জন্য—স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর আশ্বাস বাণীকে আইনে পরিণত করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কিন্তু এই সভা ও সম্মেলনেই এমন আরও ছটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যার মধ্যে বিভেদের বীজ নিহিত থেকে যায়।

নেহেরু-আশ্বাসকে আইনে পরিণত করতে হবে

এই সময়ে ভারতের শিক্ষার মাধ্যম কি হবে—সে প্রশ্ন যখন অনিবার্য ভাবে উত্থাপিত হয় তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ত্রিগুণা সেন ভারতের বিভিন্ন স্তরের চিন্তাবিদদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যে সূত্র নির্দেশ করেন বর্তমান ভারতে তাই ত্রিভাষা সূত্র নামে পরিচিত। ১৯৬৭ সালের ১৫ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রী দিল্লীর লাল কেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে ত্রি-ভাষা সূত্রের সমর্থন করে বলেন, ভারতীয় ছাত্রদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও মানসিক বিকাশের জন্য তাদের তিনটি ভাষা শিক্ষা করতে হবে। একটি আঞ্চলিক ভাষা (Regional language) দ্বিতীয়টি জাতীয় ভাষা (National language) এবং তৃতীয়টি আন্তর্জাতিক ভাষা (International language)। কিন্তু ভাষা সমস্যার কোন সুষ্ঠু ও সর্বজন গ্রাহ্য সমাধান আজও পাওয়া যায়নি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচারিত হচ্ছে। এমনকি এই ভাষার প্রশ্নেই কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী এম. সি. চাগলা মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। সুতরাং ভবিষ্যত ভারতে ভাষা সমস্যার প্রকৃতি কোন রূপ ধারণ করবে একমাত্র ইতিহাসই তার জবাব দিতে সক্ষম।

ত্রি-ভাষা সূত্র

ভাষা সমস্যা সম্পর্কে শেষকথা কিছু বলা অবাস্তব। কারণ সমস্ত ভারত ব্যাপী এই সমস্যার যে সর্পিল রূপ ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করছে তাতে ভারতের ভবিষ্যত হবে শঙ্কাতুর—এ আশঙ্কা অমূলক নয়। সমস্ত পরিস্থিতির দিক লক্ষ্য করলে মনে হয় আমরা ভারতীয়রা জাতীয় ভিত্তিতে আত্মপ্রবঞ্চনার পালা শুরু করেছি। নেতৃবর্গ যদি নিজেদের ব্যক্তি মর্য্যাদা ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নটিকে বড় করে দেখতে থাকেন এবং বিশেষত হিন্দী ভাষী নেতারা যদি তাঁদের অন্যায় জিদ বজায় রাখতে আগ্রহী হন তবে ভারতের বুকে যে বিধ্বংসী অগ্নি প্রজ্বলিত হবে তাতে ভারতের জাতীয় সংহতি ও জাতীয় উন্নয়নের পরিকল্পনা হবে ভস্মীভূত। নিঃসন্দেহে তা হবে জাতীয় অপমৃত্যু।

উপসংহার

স্বাধীন ভারতে ইংরাজীর স্থান

এই প্রবন্ধের অনুসরণে
জাতীয় সংহতি রক্ষায় ইংরাজী ভাষার ভূমিকা
ইংরাজী ভাষা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী নয়

ইংরাজী ভাষা শুধু মাত্র ইংলণ্ডের অধিবাসীদেরই ভাষা নয়, ইংরাজী বিশ্ব-ভাষা (Universal language)। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ এই ভাষার মাধ্যমেই নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের সেতু-বন্ধন রচনা করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাই

প্রারম্ভ

সমৃদ্ধ ইংরাজী ভাষার ভূমিকা দ্বিতীয়রহিত বললে অত্যুক্তি হয় না। এই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শুনি স্বর্গত প্রধান-জওহর লাল নেহেরুর লেখায়: "English language with its great literary heritage has to play a vastly constructive role in the great task of the build up of free India. It is no longer a language of a particular people or country; English can aptly be called a global Lingua Franca. We must get ourselves rightly benefitted by this Universal language, which is a medium for the establishment of an international mutual contact among the nations all the world over." স্বর্গত প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঐতিহাসিক সত্য রূপেই স্বীকার্য।

বণিক ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসেবে দীর্ঘ দু শতক ভারতের বুকে চরম বঞ্চনা-নীতির মাধ্যমে এই সম্পদশালী দেশের ভবিষ্যতকে করে তুলেছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। "ব্রিটিশ শাসন ও ব্রিটিশ নীতির প্রত্যক্ষ পরিণামে ভারত পেয়েছে জমিদার-গোষ্ঠী, সংখ্যালঘু সমস্যা,...শিল্পে অনগ্রসরতা, কৃষিতে ঔদাসীন্য, সমাজ

ব্রিটিশ শাসনের পরিণাম ও প্রতিক্রিয়া

সেবায় চরম পশ্চাদ্‌বর্তিতা এবং সর্বোপরি জনগণের বেদনাবহ দারিদ্র্য।" তাই স্বাধীনতা লাভের পরই কিছু সংখ্যক ভারতবাসী দাবী জানালেন: ইংরেজ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী ভাষারও অবলুপ্তি ঘটুক। তাঁদের যুক্তি হল: স্বাধীনতা লাভ করার পরও যদি ইংরাজী ভাষা প্রচলিত থাকে তবে তা ভারতবাসীর মনে পুনরায় দাসমনোবৃত্তি জাগ্রত করবে। তাঁরাই ভারতে ইংরাজী ভাষার পরিত্যক্ত সিংহাসনে 'হিন্দী' ভাষার অভিষেকের আয়োজনে আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

এই জাতীয় উগ্র মতবাদ—সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদেরই পরিচায়ক। শ্রদ্ধেয় নেহেরুর উক্তির পুনরাবৃত্তি করে বলা চলে: ইংরাজী ভাষা কোন একটি দেশের ভাষা নয়, তা বিশ্বজনীন ভাষার গৌরবে গৌরবমণ্ডিত। বিশ্বের সমগ্র লোক সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী মানুষ অর্থাৎ পৃথিবীর বারটি দেশের ৭০ কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। এবং পৃথিবীর ১৩০ কোটি মানুষ এই ভাষায় পড়তে পারে বা লিখতে পারে বা বুঝতে পারে। ক্রমেই এই ভাষা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আপন অধিকার সম্প্রসারিত করে চলেছে।

ইংরাজী—বিশ্ব-ভাষা

ভারতের বুকে সাম্রাজ্যবাদী শোষক ইংরেজের বহু অপকীর্তির ইতিহাস রচিত হলেও, এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই শাসক ইংরেজের ভাষার বাতায়ন পথেই পশ্চিমী সভ্যতার সূর্যালোক আমাদের সংস্কার জর্জরিত, মোহাচ্ছন্ন মানস-গুহার অন্ধকার দূর করেছে। আমাদের নিদ্রিত মন জাগ্রত হয়েছে। একদিকে যেমন ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই বিশ্বের বিজ্ঞান-সাধনা-নির্ভর অগ্রগতির ইতিকথা আমরা জানতে পেরেছি, বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের অধিকার অর্জন করেছি, অন্যদিকে তেমনি এই ভাষাই বহু ভাষাভাষী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসীদের সংযোগের একমাত্র হেতু হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র বর্তমান কালেই নয়, অতীতে এই ভাষার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়েই স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বের দরবারে ভারতের গৌরব ঘোষণা করতে পেরেছিলেন। ভারতীয় কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ এই ভাষায় অসাধারণ নৈপুণ্যের বলেই সাম্রাজ্যলোভী শাসক ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই বিরাট উপমহাদেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমকে এই ভাষাই এক সূত্রে আবদ্ধ করতে পেরেছে। এই ভাষাই হিন্দী ও অহিন্দী ভাষীদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন গড়ে তুলেছে। "It is the greatest unifying link between the Hindi-speaking and non-Hindi speaking people of India."

অতীত ভারতে ইংরাজী ভাষার ভূমিকা

ইংরাজী ভাষাতেই রচিত হয়েছে বিশ্বের সমৃদ্ধতম সাহিত্য-সম্পদ। বিশ্ব এই সাহিত্য সম্পদের অধিকারী হয়ে ধন্য। একদিন রবীন্দ্রনাথ গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন: যে ইংরেজ শোষণ করে তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা নেই, এমনকি ইংরাজী সভ্যতার বাইরের চাকচিক্যের প্রতিও তাঁর কোন আকর্ষণ নেই, কারণ তা মরীচিকা মাত্র; কিন্তু তিনি পশ্চিমের যদি কোন কিছুকে ভালবেসে থাকেন তবে সে ভালবাসা

ইংরাজী ভাষা এবং ইংরাজী সাহিত্যের অসংখ্য প্রতিভাবান স্রষ্টার প্রাপ্য। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের ওপর ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব অসাধারণ। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যই শুধু সমৃদ্ধ নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায়ও ইংরেজ জাতি প্রাগ্রসর। এবং শক্তিশালী ইংরাজীভাষাই সেই অগ্রগতির সার্থক বাহক। সুতরাং উন্নতিকামী স্বাধীন ভারতবর্ষে বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করতে হলে ইংরাজী ভাষার যোগ্য জ্ঞান অর্জন করতেই হবে—দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। এই প্রসঙ্গে আর একটি দিকের কথাও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জগতেরও প্রধান অবলম্বন—এই শক্তিশালী ইংরাজী ভাষা।

সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সার্থক বাহক—ইংরাজী ভাষা

ভারতীয় সংবিধানে ভারতের চোদ্দটি আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু সেই সঙ্গে ইংরাজী ভাষাকে চিরতরে বিদায় দেওয়া হয়নি। স্বাধীন ভারতে ইংরাজীর প্রচলন থাকলে হিন্দী ভাষার সমৃদ্ধি লাভের পথে তা হবে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, যাঁরা এই জাতীয় ভয়ে ভীত তাঁদের আশঙ্কা অমূলক। ইংরাজী ভাষায় পাশাপাশি অবস্থানের মাধ্যমে ক্ষতির পরিবর্তে হিন্দী ভাষা হয়ে উঠবে সমৃদ্ধ ও সম্পদশালিনী। উগ্র হিন্দী সমর্থকদের দল এই সত্যের প্রতি অন্ধ হওয়ায় ভারতের জাতীয় সংহতির স্বপ্ন আজ বিলীন হতে বসেছে। হিন্দী ভাষা ভারতে গরিষ্ঠের ভাষা হলেও সকলের ভাষা নয়। তা সত্ত্বেও হিন্দীকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ইংরাজীকে আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা দিয়ে আমাদের তা গ্রহণ করতেই হবে। আধুনিক বিশ্বে কোন দেশই অন্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন ভাবে বাঁচতে অসমর্থ। মানব-সভ্যতার যোগ্য অংশীদার হতে তাই আমাদের এই বিরাট বিশ্বের সঙ্গে চিরকালীন বন্ধন রচনা করতে হবে এবং একমাত্র ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই তা সম্ভব। আমাদের জীবন-দৃষ্টি ও জীবনাদর্শ শুধুমাত্র সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধেই উদ্দীপ্ত হলে হবে না, বিশ্ব-জনীন প্রেরণায় তাকে হতে হবে প্রাণিত।

ইংরাজী বনাম হিন্দী

পরাধীন ভারতের দুঃসহ দারিদ্র্য ও শোষণের-স্মৃতি আজও ভারতবাসীর মনে দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করে, তাই ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত কিছুর প্রতি আমাদের বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আজও ভারতবাসী সেই তিক্ত অভিজ্ঞতাকে বিস্মৃত হতে পারেনি। যাঁদের স্মৃতি পট থেকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের নির্মম

অত্যাচার ও অন্যায় অবিচারের স্মৃতি মুছে যায়নি, তাঁদেরই অনেকে ইংরাজী ভাষা অপসারণে ব্যগ্র। তাঁরাই এই ভাষার বিরুদ্ধে আন্দোলনের আয়োজন করেছেন। কিন্তু এ আন্দোলন অযৌক্তিকই নয়—অন্যায়ও। ইংরাজী ভাষার সঙ্গে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্য স্থান লাভ করতে হলে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা প্রয়োজনীয়ই নয়, তা অপরিহার্য। আবার স্বাধীন ভারতের উন্নতির জন্য একান্ত ভাবে আবশ্যক জাতীয় সংহতির রক্ষার অন্যতম প্রধান উপায়—ইংরাজী ভাষার 'সেতু-বন্ধন'। প্রবীণ ও বিজ্ঞ শ্রীরাজাগোপাল আচারী তাই বলেন: ইংরাজীকে ছেঁটে ফেললে আমাদের জাতীয় সংহতিও ভেঙ্গে পড়বে।"

ইংরাজ-সাম্রাজ্যবাদ ও ইংরাজী ভাষা সম্পর্কহীন

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাতারাতি ইংরাজী ভাষাকে বিদায় দেওয়ার যে-প্রবণতা দেখা দিয়েছে ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে তা নিঃসন্দেহে দুর্লক্ষণ। এই প্রবণতার মধ্যে উগ্র বিদ্বেষকেই প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। এবং এ ব্যাপারে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নন, ভূমিকা নিচ্ছেন হিন্দীভাষী রাজনীতিকেরা। এ আচরণ কাণ্ডজ্ঞানহীনতারই পরিচায়ক। ভবিষ্যত ভারতের স্বার্থেই তাই ভারতের উন্নতিশীল আঞ্চলিক ভাষার পাশাপাশি সমৃদ্ধ ইংরাজী ভাষার যোগ্য মর্যাদাসম্পন্ন আসনটি সুচিহ্নিত করে দিতে হবে। উচ্চতর শিক্ষা ও জাতীয় সংহতির সার্থক রূপায়নের প্রয়োজনেই আমরা ইংরাজী ভাষাকে বিদায় দিতে পারি না।

উপসংহার

সংহতি— আমাদের মৌল প্রয়োজন

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

● ভারতের জাতি সমস্যা ও জাতীয় সংহতি

[ক. বি. '৬৪]

স্বাধীন ভারতের ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। ভারতীয় জাতীয় জীবন আছ অসংহতির রাহু-কবলিত। স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ কুড়ি বছর কেটে গেছে—তবুও আজ ভারতের কোটি কোটি মানুষ দুঃস্বপ্নের রাত্রির আশঙ্কায় আতঙ্কিত। ঘনীভূত অন্ধকারে জাতীয় জীবনাদর্শ আজ লক্ষ্য ভ্রষ্ট। প্রতি মুহূর্তে জমে উঠছে সমস্যা ও সঙ্কীর্ণতার পুঞ্জীভূত স্তূপ। নানা ষড়যন্ত্রের কুটিল ঘূর্ণীপাকে পড়ে ভারতের নেতৃবৃন্দ তথা সাধারণ ভারতবাসী আজ দিশাহারা। দীর্ঘ-দুশো বছর পরাধীনতার প্রতিকারহীন যন্ত্রণা ভোগের পর বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতা লাভ করে যখন আমরা আগামীকালের স্বপ্নের ভারত গড়ার কাজে মন দিয়েছি, ঠিক সেই সময় আমাদের মন জাতীয় সংহতি-সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিব্রত এবং বিচলিত। কিন্তু কেন? এতদিন যে সর্বভারতীয় জাতীয়-চেতনা ছিল গ্রানাইট পাথরের মত কঠিন, আজ সেই জাতীয় চেতনায় কেন দেখা দিয়েছে ফাটল? সমগ্র ভারত আজ তারই কারণ অনুসন্ধান রত। ভারতকে এ প্রশ্নের উত্তর পেতেই হবে; নইলে ভারতের অপমৃত্যু অনিবার্য।

প্রারম্ভ

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার দেশ—ভারতবর্ষ। এই বিরাট উপমহাদেশে বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু ভাষার পাশাপাশি অবস্থান। এই সব ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিভিন্ন মুখী বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যেই নিহিত ছিল এক মূলগত ঐক্য। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ ভারতের নানা বিপরীতমুখী ভাবের মে মৌল ঐক্যের রূপটিকে আবিষ্কার করে মন্তব্য করেছেন: 'India offers unity in diversity'। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় ভারতের কোথাও ঐক্যের চিহ্ন মাত্র নেই। বত্রিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ব্যাপ্ত ভারতের প্রাকৃতিক গঠনে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। ভারতের একদিকে বিরাট হিমালয়ের সুমহান অবস্থিতি অন্যদিকে অন্তহীন সমুদ্রের অপূর্ব

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

বিস্তার। একদিকে পাবর্ত্য প্রদেশের প্রচণ্ড তীব্র শৈত্য অন্যদিকে কঙ্কন ও করমণ্ডল উপকূলের প্রচণ্ড উত্তাপ। একদিকে চেরাপুঞ্জির প্রবল বর্ষণ, অন্যদিকে রাজপুতানার মরুভূমির আগ্রাসী আক্রমণ। ভারতের প্রকৃতির তাই বৈচিত্র্যের অন্ত নেই।

আবার বিশাল ভারতের লোক সংখ্যাও যেমন বিপুল, তেমনি তাদের পার্থক্যও সুদূর প্রসারী। এই বিরাট সংখ্যক মানুষের জাতিগত বৈচিত্র্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। নৃতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, ভারতবর্ষ একটি ethnological museum। দৈহিক গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কথা বিচার করলে দেখা যায় বিশ্বের প্রায় সব রকমের মনুষ্যের শারীরিক গঠন ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে পাওয়া সম্ভব। এদের ভাষাও বহু বিচিত্র। ভারতের সংবিধানে মোট চোদ্দটি প্রধান ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই চোদ্দটি ভাষার শাখাপ্রশাখা হিসেব করলে দেখা যায় ভারতে মোট ভাষার সংখ্যা দুশোরও বেশী।

জাতিগত বৈচিত্র্য ; ভাষাগত বৈচিত্র্য।

ধর্মের দিক দিয়েও ভারতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। এদেশের অধিবাসীদের নানান ধর্ম, কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ জৈন, কেউ খৃষ্টান। এছাড়া আরও নানান ধর্মের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় এই ভারতেরই বুকে। এমনকি একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না যে পৃথিবীর সব ধর্মাবলম্বী লোকই ভারতবর্ষে বসবাস করে। এই সব বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা তাদের নিজেদের আচার-ব্যবহার, উপাসনা পদ্ধতি প্রভৃতি নিয়ে পৃথক পৃথক সমাজ গড়ে নিয়ে এদেশে বসবাস করছে। ভারতের ঐক্যের পথে এটা বাধা স্বরূপ। কিন্তু নানা বাধা অতিক্রম করেই ভারত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছে। কবির ভাষায় 'এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে' হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শক, হুন, মোগল, পাঠান সব একাত্ম হয়ে উঠেছে। সহস্র সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে একটি বাণী: 'এক জাতি এক প্রাণ, একতা'। আসাম থেকে আফগানিস্তানের সীমান্ত আর কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে সুপ্রাচীন বৈদিক সভ্যতার সুমহান ধারা। গঙ্গা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী কৃষ্ণা-কাবেরীর ধারা-স্নাত ভারত ভূমিতে মহামিলনের মন্ত্রই উচ্চারিত হয়েছে বারবার। কবির কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়েছে:

ধর্মগত বৈচিত্র্য

এক জাতি এক প্রাণ একতা

"নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।"

ইউরোপের সঙ্গে ভারতের, ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার এইখানেই পার্থক্য। ইউরোপ যে ভাবে জাতি গঠন করেছে তাতে ঐক্যের চেয়ে বিভেদই সৃষ্টি হয়েছে বেশী। কারণ একই ভূভাগ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে একই সঙ্গে বহু বিবদমান জাতি জন্মলাভ করেছে, যারা দীর্ঘ সময় ধরে পরস্পরে হানাহানি ও রক্ত পাতেই ছিল উন্মত্ত। কিন্তু ভারত তার সম্পূর্ণ বিপরীত পথের পথিক। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও ব্যবধান অপসারিত করে ভারতের বহু ভাষাভাষী বহু ধর্মাবলম্বী মানুষের দল পরস্পর পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছে। এটি ঐতিহাসিক সত্য।

ইউরোপ ও ভারতের মূলগত পার্থক্য

একথা সত্য যে ভারতের বিভিন্ন ধর্ম-কেন্দ্রিক সমাজগুলি ঐক্যের পথে কিছুটা বাধা স্বরূপ, তেমনি প্রাকৃতিক বাধাও কম নয়, তবুও এই নানান অনৈক্যের মধ্যেও ঐক্যের স্রোত ফল্গুধারায় চিরকাল প্রবাহিত হয়ে এসেছে, কারণ প্রাকৃতিক সম্পদ যে কোন দেশেরই মহামূল্যবান সম্পদ। তা কখনও বাধা বলে বিবেচিত হতে পারে না; তাছাড়া ভারতের আছে অখণ্ড ভৌগলিক সীমানা। দ্বিতীয়ত, অনৈক্যের মূলে ধর্ম ও জাতি থাকলেও ইতিহাস চিরকালই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পথে।

ঐক্যের ফল্গুধারা প্রবাহিত

অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় এই সুবিশাল ভারতের ছিল একটি সামগ্রিক রূপ। রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে হিমালয়ের দক্ষিণে এবং ভারত মহাসাগরের উত্তরের ভূখণ্ডকে ভারতবর্ষ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে ঐ সব গ্রন্থে এদেশকে ভরত রাজার দেশ বা ভারতবর্ষ এই আখ্যায় আভহিত করা হয়েছে। বহু ভাষা থাকা সত্ত্বেও বেশীর ভাগ ভাষাই মূল সংস্কৃত ভাষার দ্বারা কিছু না কিছু প্রভাবিত হয়েছে। এবং এই ভাষার আশ্রয়েই ভারতের বুকে গড়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক ঐক্য। ধর্মের দিক দিয়ে দেখা যায় বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি ধর্ম শেষ পর্যন্ত হিন্দু ধর্মের মধ্যেই তাদের স্বাতন্ত্র হারিয়েছে। এই ইতিহাসগত সত্যকে প্রতিধ্বনিত করে কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "ভারতবর্ষের একমাত্র চেষ্টা প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা। বহুর মধ্যে এককে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা। পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই।"

অতীত ভারতের সামগ্রিক রূপ; সাংস্কৃতিক ঐক্য

একথা ঐতিহাসিক সত্য যে ভারতবর্ষে কোন দিন রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে

ওঠেনি। মৌর্য বা মোগল সম্রাটেরা ভারতবর্ষে সুবিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন কিন্তু তাঁরাও সমগ্র ভারতের শাসনাধিকার লাভ করেননি। এর পর ইংরেজরা প্রায় সমগ্র ভারতের শাসনভার অধিকার করে যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল তা কৃত্রিম। পরাধীন ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক সাধারণ স্বার্থে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে সমবেত করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল একই স্বর্ণসূত্রে সহস্র জীবনকে বেঁধে দেওয়া। দীর্ঘ দুশো বছরের ব্রিটিশ শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলতে হলে যে সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেতৃবৃন্দ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁরা তাই দেশবাসীকে সেই মন্ত্রেই দীক্ষিত করে তুলেছিলেন। সেই স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করেছিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি ভারতবাসী। লর্ড কার্জন যখন ১৯০৫ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষাক্ত বাতাস ছড়িয়ে দিয়ে বঙ্গমাতাকে দ্বিখণ্ডিত করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন তখন বাংলা মায়ের প্রতিটি সন্তান তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল, ব্যর্থ করে দিয়েছিল বিদেশী শাসকের স্বপ্ন সাধকে। কিন্তু তারপর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। ভারতের পূর্বাকাশে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়েছে বটে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট, কিন্তু সে সূর্য দেশমাতার রক্ত-স্নাত। লর্ড কার্জন যে কাজ অসমাপ্ত রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন তাই সফল করে গেছেন। দেশের মানুষের মনে ভেদবুদ্ধির বিষাক্ত হাওয়া লাগল। দেশের চারদিকে নানা ধরণের বিভ্রান্তিকর ও হিংস্র উত্তেজনা দেখা দিল।

ভারতের জাতীয় ঐক্য; স্বাধীন ভারতের ভেদনীতির প্রাধান্য

দ্বিখণ্ডিত ভারতে এল স্বাধীনতা। জন্ম লাভ করল প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান। কিন্তু এই ঐস্লামিক রাষ্ট্রের জন্ম মুহূর্তে দেশে দেখা দিয়েছিল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। এরপর একের পর এক নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে ভারতকে। আসামে বাঙাল খেদা আন্দোলন ও জঘন্য অত্যাচার এবং এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দল গুলির ঘৃণ্য ভূমিকা, প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ মনোভাব একটু একটু করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করল। বিশেষতঃ হিন্দী প্রেমিকদের ভাষার ব্যাপারে অযৌক্তিক জবরদস্তি দক্ষিণ ভারতে হিন্দী বিরোধী রক্তাক্ত সংগ্রামের জন্ম দিল। এই সব ঘটনা ভারতের প্রতিটি সৎবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে করে তুলল আতঙ্কিত। নেতৃবৃন্দ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ মনোভাব; ভাষাগতবিরোধ

বিভেদের শঙ্কায় শঙ্কিত নেতৃবৃন্দ ১৯৬১ সালে নতুন দিল্লীতে জাতীয় সংহতি সম্মেলন আহ্বান করলেন। দেশের সমস্ত রাজ্যের বহু নেতা, জ্ঞানী, বিদ্বান, পণ্ডিত

ব্যক্তি যখন দিল্লীতে সমবেত হয়ে দেশের সংহতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে নানা বক্তৃতায় ব্যস্ত, যখন নেতৃবৃন্দ জাতীয় সংহতির উপায় নিয়ে নানা বিচার বিবেচনা ও পন্থা-নির্দ্ধারণে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে সমস্ত সম্মেলনকে বিদ্রূপ করেই যেন আলীগড়ে দেখা দিল সাম্প্রদায়িক সংকট—যার পরিণতি হল রক্তাক্ত। ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন যে ভারতবর্ষের বুক থেকে বোধহয় ভেদবুদ্ধির ও ধর্মান্ধতার বিষ-নিঃশ্বাস নিঃশেষিত হল ; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সে ভাবনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রমাণিত হল দ্বিখণ্ডীকরণ প্রকারান্তরে সাম্প্রদায়িকতারই স্বীকৃতি মাত্র।

১৯৬১ সালের জাতীয় সংহতি সম্মেলন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

ধর্মের ছদ্মবেশে সাম্প্রদায়িকতা

বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে পৃথিবীর বুক থেকে যখন ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ হতে বসেছে, তখন ভারতের বুকে দেখা দিয়েছে ধর্মের ছদ্মবেশে মধ্যযুগীয় বর্বরতা। যারা এই জাতীয় সাম্প্রদায়িকতার জিগীর তোলে, তারা দেশের চরম শত্রু। এদের মুখোশ খুলে নিয়ে জনগণের কাছে এদের প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে দিতে হবে। ভারতের দেহ থেকে সাম্প্রদায়িকতার দূষিত রক্ত-মোক্ষন না করতে পারলে ভারতের জাতীয় সংহতির স্বপ্ন হবে—দিবা স্বপ্ন মাত্র।

সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে প্রাদেশিকতা যুক্ত হওয়ায় সমস্যা আরও জটিল রূপ ধারণ করেছে। আজ রাজ্যে-রাজ্যে স্বার্থের সংঘাত ও পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের পুঞ্জীভূত মেঘ ভারতের আকাশকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে, আকাশের কোণে কোণে দেখা দিয়েছে দারুণ ঝড়ের লক্ষণ। এই মহা ধ্বংশকারী ঝড়ের উন্মত্ত তাণ্ডবের গতিরোধ করতে না পারলে ভারতের জাতীয় সংহতি হবে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। এর জন্য চাই কেন্দ্রীয় সরকারের দূরদর্শিতা, সঙ্গত বিবেচনা শক্তি ও সংস্কারমুক্ত-মন। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভিন্ন রাজ্যের নানা সমস্যার সুষম সমাধানের জন্যে অগ্রসর হতে হবে। রাজ্য সরকারগুলিকেও এ ব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের। তবে নেতৃত্ব দিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকেই। ভারত সরকার যেন এমন কোন পক্ষপাতমূলক আচরণ না করেন যা বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের ভাবাবেগকে আহত করতে পারে। পক্ষপাতমূলক আচরণ প্রাদেশিকতার অগ্নিকে এমন ভাবে লেলিহান করে তুলবে যাতে জাতীয় সংহতি হবে ভস্মীভূত।

স্বার্থের সংঘাত ও অবিশ্বাসের মেঘ ঘনীভূত

স্বাধীন ভারত আজ অর্থনৈতিক পুণর্গঠনের কাজে ব্রতী। এই সময়ে বহু পরিকল্পনার মাধ্যমে অনুন্নত ভারত উন্নতির পথে যাত্রা করেছে। উন্নতির সফল-লক্ষ্যে পৌছতে হলে চাই ভারতবাসীর সম্মিলিত ত্যাগ স্বীকার ও শ্রম-স্বীকার। কিন্তু আমরা দেখছি বর্তমান ভারতে তার পরিবর্তে দেখা দিয়েছে স্বার্থ সংঘাত ও ঘৃণ্য দলাদলি। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় যে ভারতের জাতীয় সংহতি বৈষয়িক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন সেই সম্পর্কটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেনি। কমিশন যদিও একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার চেতনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং ভারতীয় গণতন্ত্রকে তারই ওপর প্রতিষ্ঠিত করার কথা উল্লেখ করেছে, তবুও একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়নের ক্ষেত্রে একটি সর্বভারতীয় সংহতি রক্ষার চেষ্টা না থাকলে ভারতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প হবে ব্যর্থ।

বৈষয়িক উন্নয়ন ও জাতীয় সংহতি চিন্তা

সমস্ত দিক থেকে যদিও ভারতে আজও আদর্শ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি, তবুও একথা সত্য যে ভারত সাংবিধানিক পদ্ধতিতে সংসদীয় গণতন্ত্র (Parliamentary democracy) প্রতিষ্ঠা করেছে। গণতান্ত্রিক ভারতে তাই সমস্ত রাজনৈতিক দলই পেয়েছে স্বীকৃতি। রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় চেতনার স্ফুরণ ঘটাবে—এটিই কাম্য, কিন্তু বেদনার বিষয় এই যে ভারতে বিভিন্ন ছোট বড় রাজনৈতিক দল জাতীয় চেতনার প্রসারের অনুকূল কর্মপদ্ধতি না গ্রহণ করে এমন সমস্ত পন্থা অবলম্বন করছে যাতে দলীয় স্বার্থই হচ্ছে পুষ্ট। জাতীয় চেতনা তাতে শুধু অবহেলিতই হচ্ছে না, তা দুর্বলও হয়ে পড়ছে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের কাছে বৃহত্তর জাতীয় চেতনা ও জাতীয় সংহতির চিন্তা হচ্ছে পরাজিত। এটি নিঃসন্দেহে দুঃখের এবং ক্ষোভের কারণ। বর্তমানে এমন অনেকগুলি রাজনৈতিক দল ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সক্রিয় যাদের ভিত্তি হল ধর্মীয়। ধর্মকেন্দ্রিক এই রাজনীতিক দলগুলো ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সুযোগ নিয়ে এমন সব মত প্রচারে নেমে পড়েছে যা ভারতের সংহতি বোধের মূলে করছে কুঠারাঘাত। জাতীয় নেতৃবৃন্দকে এখনই এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে; নইলে ভারতের প্রচেষ্টা হবে 'দূর অস্ত্'।

রাজনৈতিকদলগুলির দলীয় স্বার্থই জয়ী; জাতীয় চেতনা ব্যর্থ।

প্রাসঙ্গিক ভাবেই ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ভাষা সমস্যার কথা এসে পড়ে। শিক্ষা—সভ্যতার বাহন। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে নানা কুসংস্কার, বুদ্ধি ও চেতনার

জড়ত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে পৌছে দেয় এমন জগতে যেখানে মানুষের মন হয় সংস্কার মুক্ত, উদার ও উন্নত। যেখানে মানুষ পরম প্রীতি ও ভালবাসায় অন্য সকলকে আত্মীয় ও স্বজন রূপে টেনে নিতে পারে বুকে, কিন্তু ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রের চিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও এতখানি উদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় থেকে গেছে এমন সব ত্রুটি-বিচ্যুতি যাতে দেশের ছাত্র-সমাজ প্রকৃত শিক্ষার কল্যাণাশীর্বাদ থেকে হচ্ছে বঞ্চিত। শিক্ষার লক্ষ্য হবে এমন যার ফলে সমস্ত শিক্ষিত মানুষ একই ঐতিহ্য চেতনার উত্তরাধিকারী হবে ; কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদের সেই উত্তরাধিকারিত্ব দিতে অক্ষম। এবিষয়ে সচেতন না হলে সংহতির ভাবনা হবে অলস কল্পনা।

শিক্ষাক্ষেত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি

ভারত বহু ভাষা-ভাষীর দেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে ছিল ঐক্য। কারণ রূপের দিক থেকে ভারতীয় ভাষাগুলো স্বতন্ত্র হলেও এরা মূলত আর্য-ভাষারই প্রকার ভেদ মাত্র। দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত দ্রাবিড় ভাষা থেকে উদ্ভূত তামিল, তেলুগু, মালায়লম, বা কানাড়া আর্য-ভাষা থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই সব ভাষাভাষী মানুষদের জীবনাচরণ ভারতের অন্যান্য অংশের মানুষের জীবনাচরণের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। তাই ভারতে জাতীয় ঐক্য রচিত হওয়ার পক্ষে কোন দিনই বাধা দেখা দেয় নি। বিশেষতঃ ইংরেজ শাসনকালে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে এই জাতীয় চেতনা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ শাসকের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মানুষ ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে 'আংরেজী হটাও' আন্দোলনে নেমে পড়ে। সেই সুযোগে হিন্দীভাষা এসে আসরে প্রবেশ করে এবং ইংরাজী ভাষার স্থান দখল করে। কিন্তু হিন্দী ভাষার আসন্ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বুকে ভাষা সমস্যার বীজ হল রোপিত। ভারতের অনেক ভাষার মত হিন্দী একটি আঞ্চলিক ভাষা মাত্র। সুতরাং সেই ভাষার রাষ্ট্র-ভাষার গৌরব লাভও দেশের অহিন্দী ভাষাভাষীদের কাছে যেমন গ্রহণীয় নয়, তেমনি হিন্দী ভাষীদের পক্ষে সেই স্বীকৃতিই পরম গৌরবের। এই গৌরব একদল হিন্দী ভাষীকে এমনই উগ্র করে তুলেছে যে তাঁরা ভারতে হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় যেন উন্মুখ। এর ফলে বর্তমান ভারতে দেখা দিয়েছে তীব্রতম ভাষাগত বিভেদ যা আমাদের সংহতির সামগ্রিক চেতনাকে করেছে বিপর্যস্ত। বহু ভাষা-ভাষীদেশে একটি মাত্র আঞ্চলিক ভাষাকে শ্রেষ্ঠত্ব ও রাষ্ট্রভাষার গৌরব দানের সঙ্গে যে ভয়াবহ পরিণাম জড়িত

ভাষা-ও জাতীয় সংহতির প্রশ্ন

নেতৃবৃন্দ যদি এখনই সে সম্পর্কে সচেতন না হন তবে তাদা আন্দোলনের প্রবল স্রোতে জাতীয় সংহতি চেতনা যাবে ভেসে। ভারতের ভবিষ্যৎ হবে বিপন্ন।

উপসংহার

স্বাধীন ভারত যখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে বহুদিনের বিদেশী শাসনে জর্জরিত, অনুন্নত ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক—এককথায় সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, তখন সবচাইতে জরুরি প্রয়োজন হল—জাতীয় সংহতি বোধের। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই যে ঠিক সেই সময়েই ভারতের বুকে বিভেদের বীভৎস রূপ নখদন্ত বিস্তার করছে। এখনই যদি দেশের নেতৃবৃন্দ এবং কোটি কোটি সাধারণ মানুষ সংঘবদ্ধ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই ভেদবুদ্ধির বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করতে না পারে তবে বিশাল ভারতের ভবিষ্যৎ হবে মসীলিপ্ত। দুর্ভাগ্যের চরমতম অভিশাপ আসবে নেমে। কোটি কোটি ভারতবাসী যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই যাবে থেকে। ভারতবাসীকে 'শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি'ই বহন করতে হবে। এমনকি ভারতের স্বাধীনতা হবে বিপন্ন।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলন
- পশ্চিমবঙ্গের শ্রম সমস্যা
- পশ্চিমবঙ্গের শ্রমকল্যাণ
- পশ্চিমবঙ্গের শ্রমক্ষেত্রে ঘেরাও আন্দোলন
- ধনিক শ্রমিক বিরোধ সমস্যা [ক. বি. '৬২]

প্রারম্ভ

পৃথিবীর বক্ষঃসুধা ফসলে পরিণত হয়ে মানুষের ক্ষুধা দূর করে, আর তার জীবনকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে সমৃদ্ধ করে তুলবার আয়োজনে ধরিত্রীর বক্ষনিহিত অন্যান্য সম্পদকে ব্যবহার করে মনুষ্য-সৃজিত যন্ত্র। উভয়ের মূলেই আছে শ্রমিকদের বিপুল শ্রম, তাদের ঘর্মাক্ত দুই সচল বাহু। কিন্তু মুষ্টিমেয় বিত্তবান শিল্পপতিদের মুনাফার স্ফীত অংক, ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাসের বিপুল সমারোহ এবং আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রার সুগমতার পশ্চাতে জীবনযজ্ঞে সমিধসংগ্রহকারী এই শ্রমিকদের যে কী স্বেদাক্ত অক্লান্ত পরিশ্রম, নির্মম উৎপীড়ন ও বঞ্চনার আঘাত, কত রক্ত, অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে আছে আমরা তার হিসেব রাখিনা।

শ্রমিক-মালিক অশুভ সম্পর্ক

আজ এই শোষিত সর্বহারার দল জাগ্রত, তারা সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে মালিকদের লোভী, অনিচ্ছুক ও কৃপণ মুষ্টি থেকে নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে প্রস্তুত। আর অধিকাংশ মালিকদেরই মনোভাব মহাভারতের দুর্যোধনের মত, 'বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি নাহি ছাড়ি দিব'। তার ফলে শ্রমিক-মালিকদের মধ্যে অবাঞ্ছিত, অশুভ সংঘর্ষ বার বার দেখা দিচ্ছে এবং আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মোদ্যোগে গুরুতর বাধার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র গঠনের কর্মযজ্ঞে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ শিল্পোন্নয়ন কর্মসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণে শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সরকারি ও বেসরকারি মহলে বার বার উল্লিখিত হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায়ও পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন, স্বাধীনতালাভের পর থেকে

শিল্পোন্নয়ন কর্মসূচী ও শ্রমিকদের ভূমিকা

যে সমস্ত শ্রম-আইন প্রণীত এবং শ্রমিক, মালিক এবং সরকারপক্ষীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তাদের ভিত্তি হল দুটি মৌলিক প্রত্যয়: Firstly, the relationship between workers and employers is one of

partnership in the maintenance of production and the building up of the national economy. Secondly, the community as a whole as well as individual employers are under obligation to protect the well-being of workers and to secure to them their due share in the gains of economic development. কিন্তু উৎপাদনে ও জাতীয় অর্থনীতি গঠনে শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব এবং মালিক পক্ষ কর্তৃক তাদের কল্যাণবিধান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লাভের যথাযোগ্য অংশদান—এই দুই নীতি বাস্তবক্ষেত্রে কতটা অনুসৃত হয়েছে তা সত্যি সন্দেহের বিষয়।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক মালিক সম্পর্কের সমস্যা অপেক্ষাকৃত জটিল ও গুরুতর। এই প্রদেশটিতেই শিল্পসমাবেশ সর্বাধিক।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য ও তৎসঞ্জাত শ্রমিক সমস্যা

ভারতবর্ষের পাটশিল্পের শতকরা ৯৫ ভাগ, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ৩০ ভাগ, চা শিল্পের ২৮ ভাগ, কাগজ শিল্পের ৫০ ভাগ, এনামেল শিল্পের ৫০ ভাগ, হোসিয়ারী শিল্পের ২৮ ভাগ এখানেই অবস্থিত। সমগ্র দেশের শিল্প শ্রমিকের প্রায় শত করা ৩০ ভাগ পশ্চিমবঙ্গে নিযুক্ত কিন্তু প্রদেশটির শিল্প-মালিকানার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশই ইউরোপীয় ও অবাঙালি ব্যবসায়ীদের করায়ত্ত। শ্রমিকদের একটি বিরাট অংশও বহিরাগত। বৃটিশ শাসনকালে বিদেশী শিল্প-মালিকদের শিল্প পরিচালনার একমাত্র লক্ষ্য ছিল যথেচ্ছ মুনাফা লুণ্ঠন, শ্রমকল্যাণের জন্য তাদের কোনও উৎকণ্ঠা ছিল না। স্বাধীনোত্তর কালেও এখানকার অবাঙালি ব্যবসায়ীরাও যে সেই একই মনোভাবে আচ্ছন্ন, গভীর বেদনার সঙ্গেই তা স্বীকার্য; ফলে এই প্রদেশের শ্রমিক স্বার্থ নির্মম ভাবে অবহেলিত হয়েছে। অন্যদিকে, ভিন্ন প্রদেশবাসী শ্রমিকেরাও এই প্রদেশকে শুধু তাদের জীবিকার্জনের ক্ষেত্র হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত, সুখে দুঃখে, জীবন ও জীবিকার একই সমস্যায়, সংগ্রামের পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পথে তারা এদেশীয় শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারেনি, শ্রম-আন্দোলনের ক্ষেত্রে সমষ্টিগত স্বার্থচেতনার সূত্রে সহস্রটি মন বাঁধা পড়েনি। এই বিভেদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা সহজেই নানা রাজনৈতিক খেলার শিকার হতে পারে।

সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্কের শোচনীয় অবনতি ঘটেছে, একের পর এক গুরুতর সংঘর্ষে তা বিষাক্ত এবং তা কেবল এই প্রদেশের পক্ষেই নয়, সমগ্র দেশের পক্ষেই উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। চীন ও পাকিস্তানী

আক্রমণের ফলে বিপুল পরিমাণে প্রতিরক্ষা ব্যয়বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান খাদ্যসংকট এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামগ্রিক ব্যর্থতার ফলে গত দুই তিন বৎসর ধরে ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সংস্থাগুলো গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে: ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, খনিশিল্প, পাটশিল্প,- এই প্রদেশের এমন কোনও শিল্প নেই যা এই সংকটের দ্বারা আক্রান্ত নয়। একটি সাধারণ হিসাবেই এই সংকটের চিত্রটি পরিস্ফুট হবে: ১৯৬৬ সালের মার্চ থেকে মে—এই তিন মাসে ৯৩৬ জন ছাঁটাই ও ১৯টি লক আউট হয়েছিল, ১৯৬৭ সালে ঐ একই সময়ে ছাঁটাইয়ের সংখ্যা ১,২৩৩ আর লক-আউটের সংখ্যা ২৯। এ ছাড়া বাধ্যতামূলক কর্মবিরতির (lay-off) সংখ্যাও অনেক। পশ্চিমবঙ্গের অজস্র শ্রমিকদের সম্মুখে ছাঁটাইয়ের খড়্গ আজ উদ্যত হয়ে রয়েছে। এই অর্থনৈতিক দুর্গতি এখানকার শ্রমিকদের ব্যাপক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। অনেক সরকারি ও বেসরকারি শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছে, এটাও শ্রমিকদের সম্মুখে কর্মচ্যুতির বিভীষিকা নিয়ে এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্কটজনক শিল্প পরিস্থিতি

এই অসহনীয় অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকসাধারণ ও তাদের সংগঠনগুলো নিজেদের 'অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে অভিনব পন্থা গ্রহণ করেছে, তা সমগ্র ভারতবর্ষে বাদপ্রতিবাদ, অভিযোগ ও প্রত্যুত্তরের তীব্র উত্তেজনাকে জাগিয়ে তুলেছে; এর নাম হল ঘেরাও। শ্রমিকেরা তাদের দাবী পূরণের জন্য শিল্পসংস্থানের উচ্চাপদস্থ কর্মচারীদের আটক করে রাখে, এই হল ঘেরাও আন্দোলনের রূপ ও পদ্ধতি। ধর্মঘট বা অন্যজাতীয় বিক্ষোভ প্রদর্শন অপেক্ষা ঘেরাও আন্দোলনে মালিকদের ওপর আঘাত প্রত্যক্ষ ভাবে এসে পড়ে। অতীতেও ঘেরাও আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে অকংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ঘেরাও-এর সংখ্যাবৃদ্ধি কেবল শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের দিক থেকেও একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ঘেরাও-এর বিরুদ্ধে বলা হয়েছে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা একটি পবিত্র সাংবিধানিক অধিকার, সেই অধিকার বিঘ্নিত হলে উৎপীড়িত নাগরিক পুলিসী সাহায্য দাবী করতে পারেন। ঘেরাও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পমালিক ও শ্রমিকদের

'ঘেরাও'—আন্দোলনের অভিনব পদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গের ঘেরাও আন্দোলন ও সে সম্পর্কে মালিকপক্ষের বক্তব্য

সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈরাজ্য, অর্থাৎ চরম অরাজকতা সৃষ্টি করেছে, এর ফলে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং সরকারের প্রশ্রয় পেলে এই প্রদেশে মূলধন বিনিয়োগে আর কেউ উৎসাহী হবেন না, বরং এখান থেকে মূলধন অপসারিত করা হবে, এবং এর ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা ভয়াবহভাবে বিপর্যস্ত হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথমে ঘোষণা করেছিলেন, ঘেরাও হলে অবরুদ্ধ কর্মচারীদের উদ্ধার করার জন্য পুলিসী সাহায্য প্রেরণ তথা ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনে সরকারের হস্তক্ষেপ যুক্তিযুক্ত হবে কিনা তা শ্রমদপ্তরই নির্ধারণ করবে। পরে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহৃত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ সম্ভব নয়। শিল্পমালিকদের বিভিন্ন সংস্থা থেকে শ্রমিকদের ঘেরাও আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং সরকারের নীতি সম্পর্কে এই বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের অপসারিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমমন্ত্রী বলেছিলেন, যে সকল কারণে শ্রমিকেরা ঘেরাও-আন্দোলনে বাধ্য হয়, তাদের মূলোচ্ছেদ করাই এই সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায়। ১৯৬৭ সালের জুনমাসে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হবার পর থেকে যে তিন শতাধিক ঘেরাও-এর ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে ২৫% কর্মবিরতি ও ছাঁটাই-সম্পর্কিত, ২৭% ভাগের মূলে আছে মালিকপক্ষ কর্তৃক ট্রাইবুনালের রোয়েদাদ (awards) অগ্রাহ্য করা এবং শ্রম-আইন লঙ্ঘন, ১৫% ভাগের কারণ দীর্ঘকাল ধরে অমীমাংসিত শিল্পবিরোধ এবং কতকগুলোর জন্য শ্রমিকদের সংঘকে স্বীকৃতিদানে মালিকপক্ষের অসম্মতি দায়ী। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক সংঘগুলির মধ্যে প্রায় পুরোপুরি ১% ভাগও মালিকদের দ্বারা স্বীকৃত নয় এবং স্বীকৃত সংঘগুলিও তাদের শিল্পসংস্থানের শ্রমিকদের মাত্র ২৫% ভাগের প্রতিনিধিত্ব করে। অনেক শিল্পমালিক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রাইবুনালের রোয়েদাদ কিংবা ওয়েজ-বোর্ডের সুপারিশকে গ্রহণ করেননি। বেতন প্রদান আইন (Payment of Wages Act 1936), নিম্নতম বেতন আইন (Minimum Wages Act 1959) শিল্পবিরোধ আইন (Industrial Disputes Act) ইত্যাদি আইনগুলো শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণে সকল সময়েই যে কার্যকরী হয়েছে, তা বলা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক বিক্ষোভের পটভূমিকা

এছাড়া পাট ও অন্যান্য শিল্পে বদলি শ্রমিক (casual labourers) নিয়োগের যে প্রথা আছে, সে সম্বন্ধেও শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছে। চাকরির নিম্নতম সুযোগ-সুবিধা লাভ

বদলি শ্রমিক প্রয়োগ প্রথা

করা ত দূরের কথা, বদলি শ্রমিকদের জীবিকার কোনও নিরাপত্তাই নেই। কৃষি-শ্রমিক (agricultural labourers) এবং ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলোর শ্রমিক, যারা ট্রেড-ইউনিয়ান আন্দোলনে সংগঠিত নয়, সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন শ্রমিকদের দুর্গতিও বিবেচ্য।

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিককালে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে, সন্দেহ-অবিশ্বাসে শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক যেভাবে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে তা সমস্ত দিক থেকেই অবাঞ্ছিত ও অশুভ। উভয়পক্ষের একটা নিম্নতম, উভয়েরই নিকট মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বোঝাপড়ার ওপরই সমগ্র প্রদেশটির অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। মালিকপক্ষকে কেবল মুনাফা সংগ্রহের মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হলে চলবে না। অর্থনৈতিক মন্দার দায়ভাগ কেবল শ্রমিকেরাই বহন করবে, মালিকেরা তার কোনও অংশ গ্রহণ করবেন না, এ ধরণের মনোভাব যেমন জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর, তেমনি তা পরিণামে তাঁদের স্বার্থের পক্ষেও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে বাধ্য। মনে রাখতে হবে, মালিকপক্ষের সমস্যা মুনাফা-হ্রাসের, আর শ্রমিকদের সমস্যা অস্তিত্ব রক্ষার। অন্যদিকে ট্রেড-ইউনিয়ান আন্দোলন বৈধ গণতান্ত্রিকতার সীমা অতিক্রম করে হিংসাত্মক কার্যকলাপে বিপথগামী না হয়, সেদিকেও শ্রমিকদের দৃষ্টি রাখতে হবে। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজ্য-সরকারের মধ্যস্থের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দর কষাকষির (bargaining) ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা দুর্বল পক্ষ, এ বিষয়ে যেমন, তেমনি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্বার্থ সম্পর্কেও রাজ্য-সরকারকে অবহিত হতে হবে। শ্রমিক-মালিকের বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য সরকারের সালিশী ব্যবস্থা-গুলোকে আরও কার্যকরী করে তোলা প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রম-সমস্যার সমাধানে মালিক, শ্রমিক ও রাজ্যসরকারের ভূমিকা

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে কৃষি-শ্রমিকসহ তেরটি শিল্পে শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা অবলম্বিত এবং ইউনিয়ান নিবন্ধীকরণ (registration) ও মীমাংসার প্রক্রিয়াগুলিকে যথাসম্ভব ত্বরান্বিত করার জন্য শ্রম দপ্তরের কর্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাজ্যকর্মচারী বীমা সংগঠনকে নতুন ভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে; রাজ্য-সরকার ঔষধ বিতরণের ভার নিজেই গ্রহণ করবেন। সদিচ্ছা ও জাতীয় স্বার্থবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে কঠিনতম সমস্যার সমাধানও সম্ভব। আশা করা যায়, সরকার, মালিক ও শ্রমিকদের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের জটিল সমস্যার গ্রন্থিমোচন হবে, প্রদেশের শিল্পক্ষেত্র সুস্থ, স্বাভাবিক এবং উন্নয়নের কর্মোদ্যোগে মুখর হয়ে উঠবে

উপসংহার

অটোমেশন : আশীর্বাদ না অভিশাপ

এই প্রবন্ধের অনুসরণে
- বেকারত্ব ও অটোমেশন
- কর্মনিয়োগের প্রশ্ন ও অটোমেশন

আরব্য উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত এক গল্পে আছে, আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের ঘর্ষণ মাত্রই এক দৈত্য আবির্ভূত হয়ে তার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করত। আধুনিক যুগে আমরা বিজ্ঞানের দৌলতে সেই আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্যের অসম্ভব কার্যকলাপকে বাস্তবে পরিণত হতে দেখছি। বিজ্ঞানের নিত্য নূতন ক্ষমতার বিকাশ আরব্য উপন্যাস বর্ণিত দৈত্যের থেকে অনেক বেশি চমকপ্রদ। আমরা তার দান নানা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি বলেই তাদের অভিনবত্ব আর বিশেষ করে আমাদের চোখে পড়ে না। মানুষ যে আণবিক শক্তির অধিকারী হবে, কিংবা সুদূর মহাকাশে পাড়ি দেবে তা কি আমরা কিছুদিন আগেও ভাবতে পেরেছিলাম! অথচ এখন তাদের সহজ ও স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। আধুনিক যুগে সেই বিজ্ঞানের একটি বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ অবদান হল অটোমেশন।

প্রারম্ভ

নানা ধরনের গণনা, হিসাবপত্র তৈরী করা ইত্যাদি যে সমস্ত কাজ মানুষের সাহায্যে করা হয়, স্বয়ংক্রিয় কম্প্যুটার প্রভৃতি ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে তা সম্পন্ন করার ব্যবস্থার নামই 'অটোমেশন'। আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে আরম্ভ করে কলকারখানা, অফিস ইত্যাদির কাজকর্মে অটোমেশন বহুদিন পূর্বেই প্রবর্তিত হয়েছে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে ইয়োরোপে যে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল, তাতে আধুনিক শিল্পপ্রধান সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আর বর্তমানে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমরা দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব প্রত্যক্ষ করছি; প্রথমটির তুলনায় এই শিল্পবিপ্লব আরও ব্যাপক, সুদূর-প্রসারী এবং বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ। দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের ভিত্তি হল প্রযুক্তি-বিজ্ঞান (technology), অটোমেশন তারই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বলা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের কাল থেকে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের শ্রমের ভার লাঘব করে তার জীবনযাত্রাকে সুগম, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে তোলার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, অটোমেশন তারই ক্রমবিবর্তনের একটি পর্যায়।

অটোমেশনের তাৎপর্য

অধ্যাপক Seigfried Balke-এর ভাষায় বলা যায়—Automation is not a revolutionary, but an evolutionary process. As often in History, mankind is in a situation in which it can improve tools it is already using, and can make more rational use of manpower.

ভারতবর্ষে জীবনবীমা কর্পোরেশন, রেলওয়ে, কয়েকটি বিদেশী পেট্রোলিয়াম কোম্পানী প্রভৃতি সংস্থাগুলোতে অফিসের কাজকর্ম নির্বাহের জন্য কম্প্যুটার ও অন্যান্য আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র যথা অটোমেশন প্রবর্তিত হয়েছে। কলকাতা ও অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ও পরীক্ষাসংক্রান্ত দলিলপত্র প্রস্তুত করার জন্য বর্তমানে কম্প্যুটার ব্যবহার করছেন। অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ভাবে অটোমেশন প্রবর্তিত হবার সম্ভাবনা আছে। অফিসের কাজকর্মে কেরানীর পরিবর্তে কম্প্যুটার ব্যবহারের বিরুদ্ধে শ্রমিকসংঘগুলো প্রতিবাদমুখর হয়েছে। এই আন্দোলনের মুখপাত্রদের বক্তব্য, ভারতবর্ষের মত দরিদ্র ও অনুন্নত দেশ এমনিতেই বেকারসমস্যায় জর্জরিত, তার ওপর অটোমেশন প্রবর্তিত হলে সেই সমস্যা তীব্রতর হবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পাবে। অটোমেশনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে বর্তমানে বিতর্কের ঝড় চলছে।

ভারতবর্ষে অটোমেশন প্রবর্তন

ভারতবর্ষে অটোমেশন প্রবর্তনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় পরিচালনা বিভাগে অধ্যাপক জন ডীয়ারডেন যে মত প্রকাশ করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, কম্প্যুটারের এমন কতকগুলো ব্যবহার আছে যা মানুষের সাধ্যাতীত। আমেরিকায় কম্প্যুটার ব্যবহার অপচয় নিবারণ করে ব্যবসায়কে সুশৃঙ্খল ও অধিকতর কার্যক্ষম করে তুলতে সাহায্য করেছে। বিশেষ কোনও একটি ব্যবসায়িক সংস্থা বা সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম্প্যুটার প্রবর্তনের উপযুক্ত সময় নির্ধারণই প্রকৃত বিবেচ্য বিষয়। একদিকে কম্প্যুটারের মূল্য হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে অধিকাংশ ব্যবসায়িক সংস্থা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের আয়তন ও জটিলতা ক্রমবর্ধমান হওয়ার ফলে তাদের নথিপত্র প্রস্তুতির ব্যয়ও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে এমন একটি সময় উপস্থিত হবে যখন হস্তলিখিত নথিপত্র প্রস্তুতির ব্যয় কম্প্যুটার সংক্রান্ত ব্যয়কে অতিক্রম করে যাবে, সেটাই হবে কম্প্যুটার প্রবর্তনের মাহেন্দ্রক্ষণ। এই উপযুক্ত সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও অটোমেশনকে স্থগিত রাখা

অটোমেশন প্রবর্তন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শ্রী জন ডীয়ারডেনের বক্তব্য

অযৌক্তিক। আধুনিককালের উপযোগী নথিপত্র প্রস্তুত করার জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করে যেতে হলে, তারপর যখন অটোমেশন অপরিহার্য হয়ে উঠবে তখন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা দেখা দেবে।

কম্প্যুটার যন্ত্র ব্যবহারের ফলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষে অটোমেশন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা প্রধান যুক্তি। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য স্মরণ করা যেতে পারে। আমেরিকায় জীবনবীমা কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, সরকারি কর আদায় বিভাগ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হল নথিপত্র রক্ষা ও প্রস্তুতি, সেখানেই সর্বপ্রথম কম্প্যুটার প্রবর্তিত হয়েছে, অথচ কর্মচারীর সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পায়নি। অধ্যাপক ডীয়ারডেন উল্লিখিত এর কারণ হল, প্রথমত, এমন কতকগুলো ক্ষেত্রে কম্প্যুটার ব্যবহৃত হয়েছে যেখানে মানুষের শ্রম ব্যবহার করা যেত না; দ্বিতীয়, এই সমস্ত সংস্থার কাজকর্মের প্রসার এমন দ্রুত হয়েছে যে কর্মচ্যুতির আশংকা ছিল এমন কর্মচারীরও চাকুরিতে নিযুক্ত রয়েছেন, তৃতীয়ত, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে সদ্যোত্তীর্ণ কুমারী মেয়েরাই আমেরিকায় সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় করণিকের বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তাতে নিযুক্ত থাকেন। অটোমেশন প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও কর্মসংস্থানে স্থিতাবস্থা বজায় থাকার শেষোক্ত দুটি কারণ প্রযোজ্য নয়। তৎসত্ত্বেও ভারতবর্ষে অটোমেশন প্রবর্তনের পক্ষে অধ্যাপক ডীয়ারডেন বলেছেন, এই দেশের অর্থনীতির সম্প্রসারণের বিভিন্ন স্তরে এক একটি ব্যবসায়িক সংস্থা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে কম্প্যুটার গ্রহণের উপযুক্ত সময় আসবে এবং অটোমেশন প্রবর্তন একটি ধীর, দীর্ঘকালবিস্তৃত প্রক্রিয়া হবে বলে উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের নিয়োগের সমস্যা সুশৃংখলভাবে সমাধান করা যাবে।

অটোমেশন ও কর্মসংস্থান

শুধু অফিসের কাজকর্মেই নয়, শিল্পক্ষেত্রেও অটোমেশনের প্রয়োজনীয়তাও অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ভারতের শিল্পগুলোকে যদি আধুনিক যুগের তীব্র শিল্প প্রতিযোগিতার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়, তবে অটোমেশন গ্রহণ না করে উপায় নেই। ভারতের মত উন্নয়নশীলদেশে নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলো যদি প্রথম থেকেই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে সজ্জিত হয়, তবে পরবর্তীকালের অনেক বাধা বিঘ্নকে পরিহার করা সম্ভব হবে। আমাদের রপ্তানি উপযোগী অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে শ্রম-প্রগাঢ় শিল্পের ওপর নির্ভর করলে চলবে না, তাদের আধুনিকীকরণে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের বিশ্বের অন্যান্য দেশের অটোমেশন সংবলিত উন্নততর শিল্পোৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে তাল রেখে চলা দরকার।

শিল্পক্ষেত্রে অটোমেশন

কিন্তু কর্মসংস্থানে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ছাড়াও ভারতবর্ষে অটোমেশন প্রবর্তনে কতকগুলো সীমাবদ্ধতা স্মরণে রাখা উচিত। প্রথমত, অটোমেশনের প্রারম্ভিক ব্যয় অত্যন্ত বেশী, আর ভারতে মূলধন গঠনের পরিমাণ. স্বল্প। এদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় অটোমেশন-এর ব্যয় ভার বহণ কতটা যুক্তিযুক্ত হবে তা সন্দেহজনক। দ্বিতীয়ত, অটোমেশনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে ভারতবর্ষে এমন বৃহদায়তন শিল্পসংস্থার সংখ্যা বেশী নয়। এখানে এই জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৫১, তাদের মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী টাটা ইস্পাত কারখানার মোট সঙ্গতির পরিমাণ ১৬১ কোটি টাকা। আমেরিকার সর্ববৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান জেনারেল মটরস্-এর মোট সঙ্গতির পরিমাণ ৮১,২৪৫,২৯৯,০০০ ডলার; আর সেই তুলনায় টাটার ইস্পাত কারখানার সঙ্গতির পরিমাণ হবে মাত্র ৩২২ মিলিয়ন ডলার। আমেরিকার বৃহৎ শিল্পসংস্থার সংখ্যা ৫০০, তাদের মধ্যে যেটি ক্ষুদ্রতম, তার সঙ্গতির পরিমাণই হবে ৩৩৪,৪০৬,০০০ ডলার। এই হিসেব থেকেই আমাদের দেশে অটোমেশন প্রবর্তনের সুযোগ যে কত সীমিত তা সুস্পষ্ট। তৃতীয়ত, ব্যবসায় পরিচালনার দক্ষতার উন্নয়নে অন্যান্য যান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ণমাত্রায় নিয়োগের পরই অটোমেশন প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়, ভারত সেই পর্যায়ে এখনও উপনীত হয়নি। চতুর্থত, ভারতবর্ষ যখন তীব্র বৈদেশিক মুদ্রার অভাবজনিত সংকটের সম্মুখীন, তখন কেবল আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির ওপর নির্ভর করে অটোমেশন প্রর্বতন উচিত নয়। পঞ্চমত, এদেশে অটোমেশন সম্পর্কে অভিজ্ঞ, শিক্ষাপ্রাপ্ত যন্ত্রবিদ ও কর্মীর অভাবও অটোমেশন প্রবর্তনের পথে প্রতিবন্ধক।

ভারতবর্ষে অটোমেশন প্রবর্তনের বিভিন্ন অসুবিধা

অটোমেশনের সপক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তিসমূহ পর্যালোচনার পর দেখা যায় যে অটোমেশনের কার্যকারিতা সম্পর্কে কোনও মতভেদ নেই, ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় এই যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তন যুক্তিযুক্ত হবে কিনা, সেই প্রশ্নই বিভিন্ন মহলে উচ্চারিত হচ্ছে। সরকার পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, জীবনবীমা কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংস্থায় অটোমেশন প্রব তত হলেও কেউ কর্ম ্যুত হবেন না। কর্মপরিসংঘগুলো এতে আশ্বস্ত হতে পারেনি, তারা অটোমেশন প্রবর্তন নিরোধে দৃঢ়সঙ্কল্প। ভারতবর্ষকে [illegible] কদিন অটোমেশন গ্রহণ করতেই হবে, গভীর সতর্কতার সঙ্গেই তার পটভূমি সৃজনের প্রয়োজন। ভারতের দুঃসহ বেকারসমস্যা যাতে বৃদ্ধি না পায় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। পরিকল্পনা রচয়িতা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও শিল্পপতি এবং শ্রমিকসংঘের প্রতিনিধিদের ত্রিপক্ষীয় আলাপ-আলোচনায় অটোমেশন সম্পর্কিত কর্মসংস্থান ও অন্যান্য সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করে তার পরিবেশ রচনার উপায় ও পথসমূহ নির্ণয় করতে হবে। তবেই অটোমেশন—আমাদের জীবনে অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হয়ে উঠবে।

উপসংহার

পরিবার পরিকল্পনার উপায়ঃ জনশিক্ষা

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- ভারতের জনবৃদ্ধি সমস্যা [ক. বি. '৬১]
- লোকবৃদ্ধি সমস্যা [ক. বি. '৬৩]
- বর্তমান ভারতের সমস্যা সমাধানে জন্মশাসন
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা ও পরিকল্পনা

কোটি কোটি ভারতীয়ের জীবনকে অশিক্ষা, ব্যাধি ও দারিদ্রমুক্ত করার মহৎ সঙ্কল্প নিয়েই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী স্বাধীন ভারত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করেছে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমেই ভারতের প্রগতি হবে বাধাহীন। স্বাধীন ভারত তাই ১৯৫০ সালেই এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পথে করে প্রথম পদক্ষেপ।

প্রারম্ভ

তারপর তিনতিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাপ্তি হওয়া সত্ত্বেও ভারত তার কাম্য লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। অর্জন করতে পারেনি প্রত্যাশিত সাফল্য। ফলে হতাশা ও ব্যর্থতার গ্লানি আজ জাতির জীবনকে করে তুলেছে সংক্ষুব্ধ। কিন্তু কেন এমন হল? এই সঙ্কটজনক অবস্থার অনেকগুলি কারণ থাকলেও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল: দ্রুতহারে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভারতের উন্নয়নের হারকে বারবার অতিক্রম করে যাচ্ছে বলেই—ভারত আজ তীব্র সমস্যার সম্মুখীন হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অজানা আশঙ্কায় আতঙ্কিত।

অসংখ্য সমস্যা ও সঙ্কটের মহারণ্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে হলে অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে ভারতকে যোগ্য উপায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জটিল সমস্যার সমাধান খুঁজতেই হবে। এ কথা অবশ্য সত্য যে, যে সমস্যা সমগ্র পৃথিবীর এবং বিশেষ ভাবে প্রত্যেকটি অধোন্নত দেশের, স্পষ্টতই

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা

সেই সমস্যার সমাধান একদিনে সম্ভব নয়। কারণ এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত আছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার মৌলিক প্রশ্নগুলি। জনসাধারণের শিক্ষার মান যতদিন উন্নত না হচ্ছে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর যতদিন না আমূল পরিবর্তন ঘটছে, ততদিন এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। আসল কথা এই, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি ছাড়াও কয়েকটি অনুন্নত দেশ সামাজিক চেতনায় এই বিপ্লব আনার জন্য প্রয়াসী হয়েছে। ভারতও সেই প্রয়াসের অংশীদার।

বর্তমান ভারতে দ্রুত ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা শুধু অত্যন্ত জরুরীই নয়—তা অপরিহার্যও। ভারতে প্রতি দেড় মিনিটে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করছে, প্রতি ঘণ্টায় ১৩০০টি শিশু জন্মাচ্ছে। প্রতি দিনে জন্মগ্রহণ করছে ৩১,২০০ শিশু। জন্মের এই হার বজায় থাকলে আঠাশ বছরে ভারতের লোকসংখ্যা হবে বর্তমান লোক সংখ্যার দ্বিগুণ। সুতরাং এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভবিষ্যত ভারতের জনজীবনে বহন করে আনবে ভয়াবহ ও চরমতম অভিশাপ।

ভারতে প্রতি দেড় মিনিটে একটি শিশুর জন্ম

অত্যধিক জনসংখ্যার বৃদ্ধির চাপে আজ ভারতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হতে বসেছে। প্রতিদিন খাদ্য, বস্ত্র, শিল্প, স্বাস্থ্য ও জীবিকার সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতম' হয়ে উঠেছে। যে সমস্ত শিশু এখন জন্মগ্রহণ করছে তারা এই মুহূর্তেই দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সহায়তা করতে অক্ষম; বরং তারা এখন পরিবার ও রাষ্ট্রের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আবার অধিকসংখ্যক বালক বালিকা দেশের পূর্ণ বয়স্ক কার্যক্ষম জনসংখ্যাকে দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত করছে। এখনই এদের কার্য সংস্থান করা সম্ভব না হওয়ায় বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিণতিতে যুবসমাজে সঞ্চিত হচ্ছে অন্তহীন হতাশা ও ব্যর্থতা-বোধ। এতে পরিবার ও সমাজের সুখ ও শান্তি হচ্ছে বিঘ্নিত। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা দেশের সম্পদ না হয়ে উঠে পারিবারিক ও সামাজিক সুখ শান্তি-ও অগ্রগতির পথে হয়ে উঠেছে প্রধান প্রতিবন্ধক।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে পরিকল্পনা ব্যর্থ; সমাজে সঞ্চিত হচ্ছে হতাশা

উন্নয়নের পথের প্রধান প্রতিবন্ধক—এই জনসংখ্যার বৃদ্ধি সমস্যার সমাধানের অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে ভারত তাই আজ পরিকল্পনার পথ অবলম্বন করেছে। পরিবার পরিকল্পনা—জনগণের পরিকল্পনা। জনগণের সম্মতি ও বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ ব্যতীত এই পরিকল্পনার সাফল্য ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। সরকার এক্ষেত্রে শুধু তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। জনগণের ওপর এই পরিকল্পনা জোর করে চাপাবার কথা যাঁরা চিন্তা করেন তাঁরা ভ্রান্ত। এই পরিকল্পনাকে সার্থক ভাবে রূপায়িত করতে হলে পারিবারিক জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্যক উপলব্ধি থাকা একান্ত আবশ্যক—তাই জনশিক্ষা এই পরিকল্পনার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মাধ্যম।

সমস্যার সমাধান পরিবার পরিকল্পনা

সন্তান-সন্ততির জন্মদান সম্পর্কে ভারতে নানান সংস্কার বিদ্যমান, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে এইসব সংস্কার ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত। সন্তান ভগবানের

দান নয়, তা পিতামাতার স্বেচ্ছাকৃত সৃষ্টি—এবং এই প্রজনন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণযোগ্য। আধুনিক পিতামাতাকে তাই সন্তানের জন্মদানের পরের কর্তব্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। দায়িত্ব-সচেতন দম্পতিই সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুখী হওয়ার অধিকার অর্জন করে থাকেন।

মানুষের প্রজনন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণযোগ্য

পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনায় সরকার স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দকৃত মোট বাজেটের এক তৃতীয়াংশ ব্যয় করেছেন। এছাড়া এই পরিকল্পনা সম্পর্কে দেশের নাগরিকদের সদা জাগ্রত রাখার এবং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগের জন্য সরকার বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করছেন। বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে মধ্যে মধ্যে গ্রামের অধিবাসীদের জন্য তিনদিনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়। ঐ সব প্রশিক্ষণ শিবিরে গ্রামবাসীদের পরিবার-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও বিভিন্ন মাধ্যম সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা চলে। এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারের জন্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আঞ্চলিক, জেলা বা রাজ্যের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। এঁরা বেতন পান না বটে, তবে বৎসরান্তে সম্মানজনক পারিশ্রমিক লাভ করেন।

গ্রামে প্রশিক্ষণ শিবির

সুখী ও ক্ষুদ্র পরিবার গঠনে জনগণকে উদ্যোগী করার ক্ষেত্রে পোস্টার, ফোলডার, প্রদর্শনী, বেতার বক্তৃতা, তথ্যচিত্র, পরিবার পরিকল্পনা পক্ষ উৎযাপনের মূল্যও অপরিসীম। দেশের অগণিত অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনগণ এই সব প্রচার মাধ্যমগুলির সঙ্গে পরিচিত হলে পরিকল্পনার বিষয়াবলী সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞানলাভ করতে পারেন এবং এগুলি তাঁদের ব্যবহারিক জীবনে হয় যথেষ্ট ফলপ্রদ।

বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম

'পরিবার পরিকল্পনা' কথাটির অর্থ পরিবারের সুখ, শান্তি ও স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টির সার্থক পরিকল্পনা। এই কথাটির অর্থ শুধুমাত্র পরিবার-নিয়ন্ত্রণ নয়। পরিবার নিয়ন্ত্রণ বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর সন্তানের জন্মদান ব্যতীত পরিবার পরিকল্পনার মধ্যে পরিবারের শিশুদের দেহ ও মনের সকল দিক বিকাশের উপযোগী করে গড়ে তোলা, বিবাহ, পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব বহন, বন্ধ্যাত্ব, প্রজনন, বিজ্ঞান, যৌনশিক্ষা, বৈবাহিক পরামর্শ ইত্যাদিও বোঝায়। কোন নারীর বহুবার গর্ভধারণ করতে হলে জননী ও সন্তান উভয়ের স্বাস্থ্যহানির সমূহ আশঙ্কা দেখা দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই নিদারুণ স্বাস্থ্যহানি ঘটে। তাই পরিবার পরিকল্পনার

পরিবার পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়

গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরিকল্পনাটির কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য প্রয়োজন স্বামী ও স্ত্রীর যুগ্ম সহযোগিতা। এই দিক থেকে বিচার করলে পরিবার পরিকল্পনাকে সামগ্রিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্মসূচীর অপরিহার্য অঙ্গ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সহায়ক সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থা বলাই সঙ্গত।

বর্তমান সঙ্কটজনক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিকল্পনার সুদূর প্রসারী ভূমিকা সম্বন্ধে আজ প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের সচেতন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তবে শুধুমাত্র উপলব্ধিতেই পারিবারিক জীবনের উন্নতি ঘটবে না, তার জন্য চাই ব্যক্তিগত জীবনে পরিকল্পনার প্রথাগুলির সার্থক প্রয়োগ। শিক্ষার অর্থ শুধুমাত্র নীতিজ্ঞানই নয়, শিক্ষার একটি ব্যবহারিক দিকও আছে। তাই জনশিক্ষার মাধ্যমে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার প্রসার ও সাফল্য নির্ভর করে মুখ্যত নীতিগুলির যথার্থ প্রয়োগের ওপর।

উপসংহার

শ্রমিক আন্দোলনের নব পর্যায় : 'ঘেরাও'

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- ঘেরাও ও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া
- ঘেরাও এবং শিল্পে আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন

প্রকৃতি-প্রদত্ত সম্পদকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ উৎপাদনের পথটি আবিষ্কার করেছে। অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে বোঝায় উপযোগের সৃষ্টি। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় চারটি উপকরণ: জমি, মূলধন,

প্রারম্ভ

শ্রম ও সংগঠক। বলা চলে, উৎপাদন চতুরঙ্গ কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলির একটিকে বর্জন করলে অন্য তিনটি উপকরণ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে যে বিরাট শ্রমিক সমাজ উৎপাদনের যন্ত্রকে সচল রেখেছে, তারাই বারবার হয়েছে উপেক্ষিত অবহেলিত। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তারা নির্যাতিত হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বিশাল বিশ্ব জুড়ে যে বিপুল কর্মযজ্ঞ চলেছে, সেই কর্মযজ্ঞের অগ্নিকে প্রজ্জলিত রাখতে এই অখ্যাত শ্রমিকের দলই জুগিয়ে চলেছে প্রয়োজনীয় সমিধ। কায়িক শ্রমের বিনিময়ে এরাই প্রকৃতির বুকে লুকিয়ে থাকা সম্পদ আনছে তুলে। শিল্পবিপ্লবোত্তর পৃথিবীতে এরাই শক্ত হাতে যন্ত্রদানবের বিস্ময়কর শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত

শিল্পবিপ্লবোত্তর বিশ্ব ও শ্রমিক

করে উৎপাদনের আয়োজনকে করেছে সার্থক। উৎপন্ন করেছে প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভার। শ্রমিক সমাজের সীমাহীন শক্তি যে অজস্র সম্পদ সৃষ্টি করেছে, শিল্পপতিরা সেই সম্পদে হয়েছে ধনী। দিনে দিনে লোভী পুঁজিপতির লাভের অঙ্ক হয়েছে স্ফীত আর শ্রমিকেরা হয়েছে রিক্ত, নিঃস্ব। ফলে শিল্প বিপ্লবোত্তর বিশ্বে শ্রমিক—মালিক সম্পর্ক ক্রমেই জটিল হয়ে পড়েছে। তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেছে। তাদের অন্ন ও বস্ত্রের অভাব ঘোচেনি, এমনকি জীবিকার নিশ্চিত নিরাপত্তাটুকুও তাদের ভাগ্যে জোটেনি। কিন্তু চিরকালই শ্রমিকেরা শুধু বঞ্চিত ও উপেক্ষিত থাকতে পারে না। শ্রমিকেরা উপলব্ধি করল; একক শক্তিতে শ্রমিকেরা অসহায়, কিন্তু সংঘবদ্ধ শক্তিতে তারা অপরাজেয়। তাই বঞ্চনা ও বেদনার ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটাতে এবং পুঁজিপতি-শ্রেণীর নির্লজ্জ ও নির্মম শোষণের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করেই সূত্রপাত হল শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের।

বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে বিশ্বের শ্রমিক সমাজের যেটুকু উন্নতি সম্ভব হয়েছে, তা এই আন্দোলনেরই অনিবার্য পরিণতি মাত্র। শোষিত শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ শক্তির সম্মুখে নির্মম ধনপতির দল একটু একটু করে নতি-স্বীকারে বাধ্য হয়েছে। একদিনে এ সাফল্য আসেনি। এর জন্য প্রয়োজন হয়েছে যুগ যুগ ধরে সুপরিকল্পিত প্রয়াস ও পরিশ্রম। ভারতের বিপুল শ্রমিক সমাজও এই আন্দোলনের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেনি। বিশ্বের শ্রমিক সমাজের শরিক হিসেবেই ১৮৯০ সালে বোম্বাই-এর শিল্প-শ্রমিকেরা গঠন করে বম্বে মিল হ্যাণ্ডস এসোশিয়েশন। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের এই হল প্রাথমিক প্রচেষ্টা। এর পর জাতীয় স্বার্থেই ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পট-ভূমিতে শ্রমিক সংঘ আন্দোলন গড়ে তোলেন। স্বাধীন ভারতে সেই আন্দোলনের ধারা শুধু অব্যাহতই নেই, তা জোরদারও হয়েছে।

ভারতের শ্রমিক সমাজ

একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রে কিংবা কম্যুনিস্টশাসিত রাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণীকে যন্ত্রেরই অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় বলে, শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার স্বীকৃত হয় না। এই সমস্ত রাষ্ট্রে দাবী আদায়ের মাধ্যম হিসেবে শ্রমিকেরা ধর্মঘট বা অন্যকোন উপায় অবলম্বনের অধিকার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিকেরা আইনানুগ উপায়ে তাদের দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে সক্ষম। শ্রমিকেরা যদি মনে করে যে তাদের ন্যায়সঙ্গত মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বা অস্বীকৃত হচ্ছে তবে তারা যে কোন আইন সঙ্গত পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করতে পারে। তবে কোন চরম ব্যবস্থা গ্রহণের আগে শ্রমিকদের আলাপ-আলোচনার পথটি বেছে নিতে হবে, যদি তাতেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত না হয় তবেই শ্রমিক সমাজ অবস্থান, অনশন, বা ধর্মঘটের আশ্রয় নেবে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শ্রমিক শ্রেণী

পশ্চিমবঙ্গ—ভারতের একটি শিল্প সমৃদ্ধ রাজ্য। এই রাজ্যে ব্রিটিশ শাসনের আমল থেকেই পাট ও বস্ত্র শিল্পের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। এছাড়া কয়লা ও ইস্পাত শিল্পের প্রসারও ঘটেছে প্রায় একই সময়ে। পশ্চিমবঙ্গে তাই অতীতকাল থেকেই গড়ে উঠেছে সংঘবদ্ধ শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন। শ্রমিক শ্রেণী তাদের ন্যায়-সঙ্গত দাবী আদায়ের জন্য বহুবার নানাভাবে নানা আন্দোলনে সামিল হয়েছে। কখনও জয়ের মাল্যে সেই আন্দোলন হয়েছে ভূষিত, কখনও বা বিচারের ভুলে বা ভুল পদক্ষেপের ফলে সেই আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তবুও শ্রমিক

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও শ্রমিক সমাজ

শ্রেণী পরাভব মানেনি। ভবিষ্যত-জয়ের আশায় তারা পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়েছে। এমনি করেই তারা এগিয়ে এসেছে অতীত থেকে বর্তমানে, এগিয়ে চলেছে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে।

বিগত সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস দলের বিপর্যয় ঘটায় পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-সরকারের পতন ঘটে। সেই আসনে প্রতিষ্ঠিত হয় চোদ্দটি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকার। এই সরকার ঘোষণা করেন : তাদের আমলে অবহেলিত শ্রমিক স্বার্থ হবে সুরক্ষিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম-মন্ত্রণালয় এই ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার অনুকূল দুটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন ২৭শে মার্চ, ১৯৬৭ ও ১২ই জুন ১৯৬৭ তারিখে। এই বিজ্ঞপ্তিতে শ্রমিক মালিক বিরোধে শ্রমমন্ত্রীর নির্দেশ ব্যতীত পুলিশকে যেমন হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তেমনি শ্রমিক আন্দোলনের নব-পর্যায় 'ঘেরাও' কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২৭শে মার্চ ও ১২ই জুনের বিজ্ঞপ্তি

'ঘেরাও' পদ্ধতিকে অবস্থান ধর্মঘটের একটি উগ্ররূপ বলা চলে। শ্রমিকেরা তাদের দাবী আদায়ের জন্য যেমন অবস্থান, অনশন বা ধর্মঘটকে উপায় হিসেবে অবলম্বন করেছে, সাম্প্রতিক কালে তারা তাদের সেই সব উপায়ের সঙ্গে এই 'ঘেরাও' পদ্ধতিটি সংযুক্ত করেছে। যখন বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিক ন্যায় সঙ্গত দাবী আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে ঘিরে রেখে তাদের গমনাগমনের এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের স্বাধীনতা হরণ করে, তখন তাকে বলা হয় 'ঘেরাও'। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক কালের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে— 'ঘেরাও' এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

শ্রমিক আন্দোলন ও 'ঘেরাও'

আন্দোলনের নবতম পদ্ধতি হিসেবে শ্রমিক সমাজের কাছে ঘেরাও অত্যন্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে স্বীকৃত হলেও এ সত্য অনস্বীকার্য যে সাম্প্রতিক কালের এই ঘেরাও আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ক্ষেত্রে ডেকে এনেছে চরম বিশৃঙ্খলা ও চরমতম বিপর্যয়। মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় ন'শোরও বেশী 'ঘেরাও' হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ঘেরাও হয়েছে জুলাই মাসে। এর ফলে দেশের শিল্পোৎপাদন যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা শুধুমাত্র অর্থের পরিমাণ দিয়ে মাপা যায় না।

ঘেরাও ও শিল্প ক্ষেত্রে বিপর্যয়

কোটি কোটি টাকার উৎপাদনই শুধু ব্যাহত হয়নি সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ক্ষেত্রেই দেখা দিয়েছে চরম সঙ্কট। একেই পশ্চিমবঙ্গ নানা সমস্যায় জর্জরিত। পশ্চিমবঙ্গেই বেকারের সংখ্যা সবচাইতে বেশী; কিন্তু এই ঘেরাও এর ফলে সেই বেকারের সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘেরাও-এর ফলে প্রত্যক্ষ ভাবে দশহাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে এবং পরোক্ষ ভাবে পঁচিশ হাজারেরও বেশী শ্রমিক কর্মচ্যুতি হয়েছে। কিন্তু বেসরকারী হিসেবে এই সংখ্যা বহুগুণ বেশী। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলনের এই গতি-প্রকৃতি দেখে শিল্পপতিরা হয়েছেন আতঙ্কিত। এই সব শিল্পপতিদের কেউ কেউ তাঁদের কারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন; কেউ কেউ নতুন করে অর্থ বিনিয়োগ বন্ধ রেখেছেন। এমনকি শিল্পপতি-সংস্থা তাঁদের এক সভায় পশ্চিমবঙ্গে ভবিষ্যতে কোন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করবেন না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন; এই মর্মে এক সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

ঘেরাও-এর প্রতিক্রিয়া: বেকারত্ব বৃদ্ধি

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তা নয়, ঘেরাও-এর দাপটে শিল্পক্ষেত্রের আইন-শৃঙ্খলা অনেকখানি পরিমাণে ভেঙ্গে পড়ে। উৎপাদনের হার বজায় রাখার জন্য সুশৃঙ্খল ও অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। কিন্তু দিন দিন ঘেরাও-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অধিক সংখ্যক শ্রমিক ঘেরাও আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে চরমতম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বহু কলকারখানায় লক-আউট ঘোষণা করা হয়। একদিকে মন্দা অন্যদিকে শ্রমিক আন্দোলনে এই নব-পদ্ধতির প্রতিক্রিয়া এমন তীব্রতম রূপ ধারণ করে যে সরকার উদ্বিগ্ন বোধ করতে থাকেন।

শ্রমিকদের আন্দোলনের এই নতুন পদ্ধতি শিল্পপতিদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কয়েকটি প্রখ্যাত শিল্প সংস্থার কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের এই উগ্র আন্দোলনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেশের সর্বোচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়। ঘেরাও সম্পর্কে এই আবেদনের শুনানির জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে গঠিত স্পেশাল বেঞ্চ গত ২৯ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ সালে এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে ঘেরাওকে বেআইনী ও অবৈধ বলে ঘোষণা করে। বিচারপতিগণ মনে করেন যে, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের বর্ণনা মতে ঘেরাও বেআইনী নয়। কিন্তু যেখানে আটক করা, চলাচলে বাধা দেওয়া অথবা দেশের

হাইকোর্টের গুরুত্বপূর্ণ রায়: ঘেরাও বেআইনী

ফৌজদারি আইন মোতাবেক অন্যান্য অপরাধ করা হয় সেখানে তা কোন ট্রেড-ইউনিয়ানের সদস্যরা করলেও এবং তা সমবেত ভাবে দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলেও দেশের আইনের আওতার বাইরে বিশেষ কোন সুবিধা দাবি করতে পারে না। ঘেরাও এর নামে পরিচালন বিভাগের যে কোন লোককে বেআইনী ভাবে বাধা দান অথবা বেআইনী ভাবে আটকের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩৯ ও ৩৪০ ধারা অনুযায়ী সমস্ত কর্মীই অপরাধী। ঐ কাজ দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচ্য। রায়ে আরও বলা হয়, এমন কি যে সমস্ত দেশের শ্রম সংক্রান্ত আইন ভারতের চেয়ে অকিকতর প্রগতিশীল সে সব দেশেও ঘেরাও বেআইনী।

উপসংহার

শ্রমিক শ্রেণী ও মালিক গোষ্ঠীর মধ্যে যদি সম্পর্কের উন্নতি বিধান করে কর্ম ও উৎপাদন ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, যদি মন্দভাগ্য পশ্চিমবাংলার শিল্প ও বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হয়, তবে বিভিন্ন পক্ষপাত দুষ্ট নীতির পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রয়োজন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের পথ ত্যাগ করে শ্রমিক কল্যাণের জন্য প্রকৃত শুভবুদ্ধির, তবেই হবে দেশের সর্বাত্মক মঙ্গল।

ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

● ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ না সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ?

আধুনিক অর্থনীতির অপরিহার্য অঙ্গ—ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক প্রবাহ ও প্রগতির ধারা সঞ্চালনে ব্যাঙ্কের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের উদ্বৃত্ত অর্থকে নানা পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে, সম্পদ-সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিনিয়োগের

প্রারম্ভ

জন্য সেই অর্থ সরবরাহ করা ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির পরিমাপ হয় সেই দেশের মোট উৎপাদন দিয়ে। মূলধন ব্যতীত কোন রকমের উৎপাদনই সম্ভব নয়। ব্যাঙ্ক সেই মূলধনের প্রয়োজন অনেকখানি পরিমাণে মিটিয়ে থাকে। এ ছাড়া ব্যাঙ্ক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুসংহত পথ রচনায় সাহায্য করে। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উন্নতির ওপর তাই দেশের উন্নয়ন ব্যবস্থা অনেকখানি নির্ভরশীল। অনুন্নত দেশগুলোর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা যতই উন্নত হবে, অর্থনৈতিক অগ্রগতিও ততই হবে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল।

অধোন্নত দেশ ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সুউন্নত নয় এবং এদেশের টাকার বাজারও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। পরাধীন ভারতের ন্যায় স্বাধীন ভারতেরও ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা দ্বৈতরূপ লক্ষ্য করা যায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সম্মিলিত একটি আধুনিকরূপ, অন্যটি পোদ্দার, বেনে, শেঠ, নানাবতী, কুঠিয়াল, সাহুকার নিয়ে গঠিত ভারতের টাকার বাজারের অনাধুনিকরূপ। একই সময়ে

ভারতীয় টাকার বাজারের দ্বৈতরূপ

এই দুটি ব্যবস্থা পাশাপাশি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এদের মধ্যে নেই সহযোগিতার দৃঢ় বন্ধন, বরং আছে অসম প্রতিযোগিতা যার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় কখনও কখনও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। সুসংগঠিত নয় বলেই ভারতের টাকার বাজারে এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে। কলিকাতা ও বোম্বাই ছাড়া বিশাল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও টাকার বাজার ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত; তার ফলেও যে সুদের হারের দুস্তর পার্থক্য দেখা দেয় সে সত্যও অনস্বীকার্য।

জাতীয় কংগ্রেস ক্ষমতালাভের পরই ভারত পরিকল্পিত অর্থনীতির ক্ষেত্রে

বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। এই সময় অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য যে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি নিযুক্ত হয় তা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানগুলির রাষ্ট্রীয়করণের সুপারিশ করেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই সুপারিশগুলি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু একদল স্বার্থান্বেষী মানুষের বিরোধিতার ফলেই এই সব সুপারিশ কার্যকরী হয়নি। কিন্তু ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভুবনেশ্বরে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে এই প্রস্তাব আবার নতুন করে আলোচিত হয়। তারপর থেকে ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণের প্রশ্ন নানাভাবে নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে। সেই সব আলোচনার সূত্র ধরেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ভাবনা আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রস্তাব উত্থাপনের পটভূমি

প্রায় ছ'বছর ধরে সারা ভারতের রাজনৈতিক মহলের একাংশ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের জন্য আন্দোলন করছিলেন। দরিদ্র চাষী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে ব্যাঙ্ক ব্যবসা রাষ্ট্রীয়করণের দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে। জাতির অর্থনীতিতে বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলোর একটা গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা আছে। রাষ্ট্রীয়করণের যাঁরা পক্ষে তাঁদের অভিযোগ হল: বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলো দরিদ্র চাষী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে বড় বড় শিল্প, ব্যবসায়ী, জোতদার ও জমিদারদের স্বার্থরক্ষায় অতি তৎপর। এই সব ব্যাঙ্কের দাদননীতির সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, এই সব ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুসৃত দাদননীতিকে এক কথায় 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া বলে অভিহিত করা চলে, কেননা এই দাদননীতির দ্বারা বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসাই উপকৃত হয়েছে, দুর্বলেরা হয়েছে বঞ্চিত। লক্ষ্য করা গেছে যে, ব্যাঙ্কের পরিচালক মণ্ডলীর অনেক সদস্যই বিভিন্ন ব্যবসা ও কারবারের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত, সুতরাং তাঁরা প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের ব্যবসার জন্য ব্যাঙ্কের দাদন আদায় করে থাকেন। তাই ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণ না হলে দেশের অর্থনীতির ভিত্তি দুর্বলই থেকে যাবে।

বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ

উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই গত ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৬৭ সালে সংসদে ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রনের যে পরিকল্পনা পেশ করেছেন তাতে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে একটি আপোষ রচনার চেষ্টা সুস্পষ্ট। শ্রীদেশাই এই পরিকল্পনা পেশ করতে গিয়ে একদিকে বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলো এখনই রাষ্ট্রীয়করণ করার

পথের বিপুল বাধা ও অসংখ্য অসুবিধার কথা উল্লেখ করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সুবিধের প্রতি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তাঁর প্রস্তাবটির স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেন: এই মুহূর্তে ব্যাঙ্কগুলোকে আরও বেশি করে সরকারী আওতায় আনলে সরকারের প্রশাসনিক সামর্থ্যের ওপর তার চাপ সৃষ্টি হবে এবং মৌল প্রশ্নগুলোই হবে অবহেলিত। তাই তিনি ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণ প্রস্তাবের বিরোধী।

শ্রীমোরারজী দেশাই উত্থাপিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবের কারণ

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও অর্থমন্ত্রী পরিবর্ত হিসেবে ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে এই প্রস্তাবের সার্থকতার চিত্রটি সুস্পষ্ট করে তোলেন। বাস্তব সত্যের নগ্ন চিত্রটি তুলে ধরে উপপ্রধানমন্ত্রী বলেন: সরকার এ পর্যন্ত যত শিল্পই রাষ্ট্রায়ত্ত করেছেন, তার মধ্যে গুটিকয়েক ছাড়া বাকী সবগুলোতেই সরকারকে লোকসানের বোঝা বহন করতে হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হল: সরকারের ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও দক্ষ পরিচালকের অভাব। সুতরাং অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে অর্থমন্ত্রী ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবটি বাস্তবোচিত বলেই মনে করেন। এর দ্বারা একদিকে যেমন জনগণ এবং সামগ্রিকভাবে দেশ ব্যাঙ্কগুলো থেকে প্রকৃত সুযোগ সুবিধা লাভ করে উপকৃত হবে, তেমনি অন্যদিকে শিল্পপতি ও ধনিক শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার থেকে মুক্ত হয়ে ব্যাঙ্কগুলো সমাজ প্রতিনিধিদেরই আয়ত্তাধীন হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ও বাণিজ্যের ব্যর্থতার চিত্র

অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই তাঁর প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন: সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিলে ব্যাঙ্কগুলোরই শুধু ঋণদাই নীতিরই নয়, পরিচালন ব্যবস্থারও সুদূরপ্রসারীও আমূল পরিবর্তন-সাধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। শ্রীদেশাই ঘোষণা করেন: এই বিলে ব্যাঙ্কের পরিচালক মণ্ডলীর (Directors Board) পুনর্গঠনের ব্যবস্থা থাকবে এবং যে সব সংস্থার সঙ্গে ব্যাঙ্ক পরিচাকদের স্বার্থজড়িত, তাদের আগাম ও গ্যারান্টি দেওয়া নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়া বার্ষিক ভিত্তিতে সামগ্রিক ঋণদান নীতি নির্ধারণের জন্য একটি জাতীয় ঋণ পরিষদ গঠন করা হবে—অর্থমন্ত্রী ঐ জাতীয় পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিলের কয়েকটি প্রস্তাব

এই সব প্রস্তাব ছাড়াও এই বিলে কতকগুলি স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থার কথাও উল্লিখিত

হয়েছে, যেমন : এক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ক্ষমতা সম্প্রসারণ ; দুই, সঠিক পথে ব্যাঙ্ক শিল্পের উন্নতিতে যা বাধা সৃষ্টি করে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ ; তিন, ব্যাঙ্কের পদস্থ পরিচালকদের জন্য একটি শিক্ষণ-সংস্থা (Training centre) স্থাপন।

স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থাবলী

ঋণদাননীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উপপ্রধানমন্ত্রী জানান, জাতীয় ঋণ পরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণদান ও আর্থিক নীতি নিধারণ করবে। এমন ভাবে ঋণদান নীতি নির্ধারিত হবে যাতে কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, রপ্তানিপ্রধান শিল্প প্রভৃতির ন্যায় সকল অগ্রাধিকারী ক্ষেত্রের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়। এই জাতীয় পরিষদের সভাপতি পদে থাকবেন অর্থমন্ত্রী স্বয়ং, সহসভাপতি হবেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর। এ ছাড়া সদস্য হিসেবে থাকবেন ক্ষুদ্র-মাঝারি বৃহৎ সকল শ্রেণীর শিল্প, সমবায়, ব্যবসা, কৃষি, প্রভৃতি বিভিন্ন উৎপাদনী ক্ষেত্রের প্রতিনিধিবৃন্দ, ব্যাঙ্কার, অর্থনীতিবিদ, প্রভৃতি বৃত্তিধারী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধিবৃন্দ।

ঋণদান নীতি ও ঋণদান পরিষদ

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার কাঠামো সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করে শ্রীদেশাই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পরিচালনায় বড় রকমের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেন। এই সব ব্যাঙ্কে শিল্পপতির পরিবর্তে বৃত্তিগত ভাবে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অভিপ্রেত না হলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মনোনীত প্রার্থীকে অপসারিত করে সে স্থানে নিজের মনোনীত প্রার্থীকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চেয়ারম্যান নিযুক্ত করার সম্পূর্ণ অধিকারী। এই প্রসঙ্গে বিদেশী ব্যাঙ্ক সম্পর্কে নীতি বিশ্লেষণ করতে বসে উপপ্রধানমন্ত্রী জানান : বিদেশে সমিতিবদ্ধ ব্যাঙ্কগুলিকে ভারতীয়দের নিয়ে উপদেষ্টা (Advisory Board) গঠনের নির্দেশ দেওয়া হবে। ঋণদান নীতি ও রীতির ব্যাপারে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি সম্পর্কে যে ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে—বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকেও তা মানতে হবে। বিলটির প্রস্তাবের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এও বলা হয় যে, এমন কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক দাদন দেবে না যার পরিচালক মণ্ডলীতে বা অন্য কোন ভাবে ঐ ব্যাঙ্কের কোন পরিচালকের স্বার্থ বিজড়িত।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্তন

জাতীয়করণের পরিবর্তে ভারতের বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলোর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কার্যকরী হলে উন্নতিকামী

ভারতের অসংগঠিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ওপর সরকারী প্রভাব যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে তা সন্দেহাতীত। এর ফলে কিছু সুফল প্রত্যাশা করা অসম্ভব নয়। যথাযথ ভাবে প্রযুক্ত হলে ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার ফলে দেশের কৃষিজীবিরা উপযুক্ত ঋণ পাবেন যাতে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সম্পর্কে ও এই মত প্রকাশ করা অসমীচীন নয়।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সুফল

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নীতি সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যের উদ্ধৃতি প্রশ্ন দিয়ে এই প্রবন্ধের উপসংহার টানা অযৌক্তিক নয়। "ব্যাঙ্কের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যদি সত্যিই সামাজিক বা সমাজের হয়, তবে কিছু মঙ্গল অবশ্যই হইবে। কিন্তু পরিচালক নিজের ব্যবসায়ে ব্যাঙ্কের দাদন সংগ্রহে অক্ষম হইয়া যদি স্বীয় প্রভাব খাটাইয়া অন্য ব্যাঙ্ক হইতে দাদন আদায় করেন, তবে তাঁহাকে বাধা দিবার কোন অস্ত্র সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার আছে কি?" এবং "স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পাল্লায় পড়িয়া সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গতি একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে না তো?"

উপসংহার

পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস ও ভারত

এই প্রবন্ধের অনুসরণে

- ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যে পাউণ্ডের অবমূল্যায়নের প্রতিক্রিয়া

প্রারম্ভ

মহাসমুদ্রের বিস্তারের মতই একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল বিশ্বব্যাপী। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য উপনিবেশ সৃষ্টি করে ব্রিটিশ শক্তি অন্যদেশকে শোষণ করে নিজের দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। নির্মাণ করেছে অন্তহীন ঐশ্বর্যের মণিহর্ম। ব্রিটিশ জাতি সদম্ভ ঘোষণা করেছে ব্রিটেনের গৌরব সূর্য কোন দিন অস্ত যাবে না—কিন্তু ইতিহাস সেই সদম্ভ উক্তিতে কর্ণপাত করেনি। তাই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পৌছতে না পৌছতেই আজ ব্রিটেনের গৌরবদীপ্ত সূর্য অস্তাচলগামী। পৃথিবী জুড়ে জাগরণের পালা শুরু হওয়ায় ব্রিটিশ সিংহকে ক্রমেই থাবা গুটিয়ে নিজের কোটরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হচ্ছে। ক্রমেই ক্ষুদ্র ব্রিটেনের দুর্বল, ক্ষয়িষ্ণু রূপটি প্রকট হয়ে উঠেছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সংকট

পৃথিবীর সর্বত্রই পুঁজিবাদী অর্থনীতির বনিয়াদ ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে। পুঁজিবাদী দেশগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে নানা কারণে অর্থনৈতিক সংকটের কৃষ্ণছায়া আত্মপ্রকাশ করছে। মুদ্রার ভারসাম্যের অভাবে অর্থনৈতিক কাঠামোটি মাঝে মাঝেই ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম ঘটছে। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী ও রপ্তানির চেয়ে আমদানি বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংকট হয়ে উঠছে তীব্র। ব্রিটেনেও এই সংকট কিছুকাল ধরে ব্রিটিশ অর্থনীতির মূলে কুঠারাঘাত করছে বিশ্বের বাজারে ব্রিটেন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

শ্রমিক সরকারের জরুরী নীতির ব্যর্থতা

বর্তমানে ক্ষমতাসীন ব্রিটেনের শ্রমিক সরকার গত ১৯৬৩ সালের গ্রীষ্মকালে এই অর্থনৈতিক সংকটের বেড়াজাল থেকে ব্রিটিশ অর্থনীতিকে রক্ষার জন্য কতকগুলো সুস্পষ্ট ব্যবস্থা ও জরুরী নীতি গ্রহণ করেন; কিন্তু শ্রমিকদলের মধ্যে দক্ষিণ পন্থীরা সরকারের সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতা না করায় এবং ব্রিটেনের একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা (monopolists) তাদের মুনাফা ত্যাগ না করায় এই জরুরী নীতি-নিয়মগুলো শুধুমাত্র কাগজে পত্রে সত্য হয়েই থেকেছে। এ ছাড়া সাময়িক

খাতে ব্যয়ও সংকুচিত করা যায়নি। ফলে ব্রিটিশ অর্থনীতিকে অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার সরকারী প্রচেষ্টা হয়েছে ব্যর্থ।

আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রিটেন তাই ক্রমেই কোণ ঠাসা হয়ে পড়তে থাকে। ১৯৬৭ সালের মে মাস থেকেই ব্রিটেনের স্টার্লিং-এর আন্তর্জাতিক মূল্য হ্রাস পেতে শুরু করেছিল; এবং নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি এই চাপ বৃদ্ধি পেয়ে তীব্র আকার ধারণ করে। ব্রিটেনের অর্থনীতির নাভিশ্বাস ওঠে। শ্রমিক সরকার এই অসুস্থ অর্থনীতির প্রাণরক্ষার জন্যে মুদ্রা সংকোচের কড়া ব্যবস্থার পরিবর্তে গত ১৯শে নভেম্বর ১৯৬৭ সালে মুদ্রা মূল্য হ্রাসের নীতিই ঘোষণা করেন। ব্রিটেন পাউণ্ডের সঙ্গে স্টারলিং-এর বিনিময় মূল্য ১৪·৩ শতাংশ হ্রাস করেছে। এর ফলে এখন এক পাউণ্ড স্টারলিং-এর মূল্য দাঁড়াল ২·৪০ মার্কিন ডলার এবং ভারতীয় মুদ্রায় ২১ টাকার পরিবর্তে ১৮ টাকা। যাঁরা এতদিন ধরে মুদ্রা সংকোচের দাবি তুলেছিলেন, তাঁরা এখন পাউণ্ড উদ্ধারে মনোনিবেশ করবেন। পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের পর ব্রিটেনকে সম্ভবত ৩০০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়া হবে। প্রচণ্ড মুদ্রা সংকোচ এবং মুদ্রামূল্য হ্রাসের দোটানায় পড়ে শ্রমিক সরকার শেষ পর্যন্ত যেটি কম ক্ষতিকর তাই বেছে নিয়েছেন। যেসব দেশ ব্রিটেনের মত আমদানির ওপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল সে সব দেশের পক্ষে শেষোক্ত পন্থাই কম ক্ষতিকর।

মুদ্রা সংকোচ নয়, মুক্তির পথ—মুদ্রামূল্য হ্রাস

মুদ্রামূল্য হ্রাস যখন একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক অর্থ-নীতি, তখন একটি দেশ ঐ নীতি অনুসরণ করলে অন্যান্য দেশগুলোর ওপর তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। ভারতবর্ষ গত বছর তার টাকার মূল্যহ্রাস করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি নির্ধারণ করে উঠতে না উঠতেই, ব্রিটেন এ বছর তার পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস করায় ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যে তার প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক কারণেই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। কারণ ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের ২০% এবং আমদানি বাণিজ্যের প্রায় ৯% ব্রিটেনের সঙ্গে। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং মনে করেন যে, পাউণ্ডের অবমূল্যায়নের ফলে ভারতের সঙ্গে ব্রিটেন বা অন্যান্য দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেবে না।

মুদ্রামূল্যহ্রাস—আন্তর্জাতিক অর্থনীতির অঙ্গ

পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস পেয়ে ২১ টাকার জায়গায় ১৮ টাকা হওয়ায় ভারত কম মূল্যে ব্রিটিশদ্রব্য কিনতে পারবে, আর ব্রিটেনকে ভারতীয় দ্রব্য কিনতে হবে বেশী দামে—এতে ভারতের কিছু সুবিধে লাভ করার অবকাশ ঘটল, কেননা এখন ব্রিটেন

থেকে জিনিষপত্র আমদানি করার ব্যয় কম পড়বে বলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচা মাল প্রভৃতি অন্য দেশ থেকে না এনে ব্রিটেন থেকে ক্রয় করাই ভারতের পক্ষে সুবিধা জনক। এর ফলে ভারতীয় বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাবে; অপর পক্ষে ব্রিটেনেরও লাভ এই যে, তার মুদ্রামূল হ্রাসের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য— রপ্তানি বৃদ্ধির পথ সুগম করা।

পাউণ্ডের মূল্যহ্রাসে ভারতের সুবিধে

কিন্তু ব্রিটেনে ভারতীয় দ্রব্যাদির রপ্তানি হ্রাস পাওয়ায় বাধা অমূলক নয়, কেননা ভারত তার টাকার মূল্য হ্রাস করার পর ব্রিটেনের কাছে ভারতীয় পণ্য যত সস্তা হয়ে উঠেছিল, পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস করার ফলে সেই ভারতীয় পণ্য আর তত বেশী সস্তা থাকল না। এছাড়া ব্রিটেন তার পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার জন্য অন্যান্য অনেক আনুষঙ্গিক নীতি অবলম্বন করে নিজেদের আমদানি হ্রাস করার চেষ্টায় ব্রতী হবে। ইতিমধ্যেই ব্রিটেন তার ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি করেছে। ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্যবসায়ীগণ সহজে ব্যাঙ্ক ঋণ গ্রহণ করে বিদেশী দ্রব্য আমদানি করতে উদ্যোগী হবে না। তবে ব্রিটেনে ভারতীয় দ্রব্যের রপ্তানির ব্যাপারে অনেকে এই আশা পোষণ করেন যে, সূতা বস্ত্রের জন্য যখন নির্দিষ্ট পরিমাণ কোটার ব্যবস্থা আছে, আর চা এবং পাটের চাহিদা যখন দ্রুত পরিবর্তনশীল নয়, তখন ভারতীয় রপ্তানির পরিমাণ আকস্মিক ভাবে হ্রাস নাও পেতে পারে। কেউ কেউ আশাবাদী হয়ে বলেন—বরং ভারত আরও বেশী পরিমাণ পাউণ্ড অর্জনের সুযোগ লাভ করতে সমর্থ হল।

মূল্যহ্রাসের আনুসঙ্গিক নীতি ও ব্যবস্থাদি গ্রহণ

এই আশা ও প্রত্যাশা কতখানি সফল হবে, তা নির্ভর করে ভারতের দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র—পাকিস্তান ও সিংহলের নীতির ওপর। এর কারণ, চা ও পাটের ব্যাপারে সিংহল ও পাকিস্তানই ভারতের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী। ব্রিটেন পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের কথা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই আয়ারল্যাণ্ড, ইসরাইল এবং ডেনমার্ক তাদের মুদ্রা মূল্যহ্রাসের কথা ঘোষণা করেছে। এর পরই ২২শে নভেম্বর ১৯৬৭ সালে সিংহল তার টাকার মূল্য শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস করেছে। এতে এখন ১ পাউণ্ডের বিনিময়ে ১৩·৩৩ টাকার স্থলে ১৪·২৯ সিংহলী টাকা পাওয়া যাবে। এর ফলে স্বভাবতই ব্রিটেন বেশী পরিমাণে সিংহলী দ্রব্য আয় করবে। রপ্তানির ক্ষেত্রে আগের তুলনায় ভারতীয় চা সিংহলী চায়ের সঙ্গে আরও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়ে উঠল। তবে ভারত তার রপ্তানি শুল্ক কমিয়ে ব্রিটেনে তার ব্যয়ের বাজার অব্যাহত রাখতে পারে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নীতির উপর ভারতীয় নীতির সাফল্য নির্ভরশীল

আর একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান যদিও তার মুদ্রামূল্য হ্রাস করেনি, তবুও পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে পাট ও তুলার ওপর রপ্তানি শুল্ক ১০% হ্রাস করেছে। এর ফলে ভারতীয় রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে পড়েছে। কারণ পাট রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান যদি ব্রিটেনকে রপ্তানি শুল্ক কমিয়ে কম মূল্যে পাট সরবরাহ করে, তবে ব্রিটেন ভারতের বাজার অপেক্ষা পাকিস্তানী বাজারের প্রতিই আকৃষ্ট হবে—এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং ভারতের পক্ষে পাটের রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

পাকিস্তানের রপ্তানি শুল্ক হ্রাস, ভারতেরও সেই পথ গ্রহণ করতে হবে

এছাড়া অন্যান্য দেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্রিটেন পাউণ্ডের মূল্যহ্রাসের মাধ্যমে তার দ্রব্য সস্তা করে দিয়ে এখন ভারতবর্ষের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। এই কারণে যেহেতু আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে বিলাতী দ্রব্য কিছু সস্তা হয়ে গেল, সেই হেতু বিশেষ করে হাল্কা ধরণের ছোট খাটো ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যর মূল্য যদি ভারতবর্ষ না হ্রাস করতে পারে, তাহলে এই সব দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতকে ব্রিটেনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হতে হবে।

ভারতের ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের মূল্য কামন প্রয়োজন

পাউণ্ডের অবমূল্যায়নের ফলে সঞ্চিত স্টারলিং-এর মূল্য হ্রাস পাওয়ায় দরিদ্র দেশগুলির অসুবিধা দেখা দেবে এবং তার ফলে তাদের মুদ্রানীতির কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। অবশ্য বর্তমানে ভারতবর্ষেরও স্টারলিং সঞ্চয়ের পরিমাণ অপেক্ষা স্টারলিং ঋণের পরিমাণই বেশী। সুতরাং যদিও এতে ভারতের স্টারলিং সঞ্চয়ের পরিমাণ শতকরা ১৪·৩ ভাগ হ্রাস পাবে, কিন্তু আমাদের স্টারলিং ঋণের বোঝাও ঐ হারে হ্রাস পাওয়ার দরুণ ভারত বৈদেশিক ঋণের হাত থেকে কিছুটা অব্যাহতি লাভ করবে।

বৈদেশিক ঋণের হাত থেকে কিছুটা অব্যাহতি

ভারত পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের বহু পূর্বেই টাকার মূল্য হ্রাস করায় ব্রিটেনের মুদ্রা মূল্যহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের টাকার মান পুনরায় হ্রাস না করেও ব্রিটেনের বাজারে ভারত রপ্তানির সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে সফল হচ্ছে। তবে এর জন্য ভারত সরকারের উচিৎ রপ্তানি দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধনে ও অন্যান্য দ্রব্যগুলির রপ্তানি প্রসারের ব্যবস্থাগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণে উদ্যোগী হওয়া। সর্বোপরি প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলির অর্থনীতির কথা স্মরণে রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমদানি ও রপ্তানি নীতিগুলোর সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধন করে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুফল লাভে তৎপর হয়ে ওঠা। সাফল্য লাভের এই হল একমাত্র পথ।

উপসংহার

বাণিজ্যিকা

বাণিজ্যিক পত্র রচনা

Commercial Correspondence - 20 Marks

One letter to be drafted on one of the following subjects

1. Application for a situation ;
2. Recommendation and credit ;
3. Status enquiries ;
4. Circular letters ;
5. Offers, Quotations and orders ;
6. Confirmation, Execution, Refusal and Cancellation ;
7. Collection, Claims, Complaints and Adjustments ;
8. Agency ;
9. Banking & Insurance ; Export and Import ;
10. Publicity and Public Relations ;
11. Company Secretary.

বাণিজ্যিকা

বাণিজ্যিক পত্র রচনা

ভূমিকা

॥ ১ ॥

সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ—'পত্র সাহিত্য'। যে কোন রচনা-শিল্পের মত পত্র রচনাও শিল্পকর্ম বলে স্বীকৃত। এই পত্র-সাহিত্য মূলতঃ ব্যক্তিগত অনুভূতি, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার বাহক। ফলে এই জাতীয় রচনা প্রয়োজন ভিত্তিক রচনা নয়; কিন্তু এই পত্র রচনাই যখন প্রয়োজন ভিত্তিক হয়ে ওঠে, তখন সেই সব পত্র রচনাকে আমরা বৈষয়িক বা বাণিজ্যিক পত্র রচনা বলে চিহ্নিত করে থাকি। অনেকের ধারণা পত্র রচনার আগে 'বাণিজ্যিক' বা 'বৈষয়িক' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় এই জাতীয় রচনা শিল্পশ্রী বর্জিত রচনা মাত্র, কিন্তু ধারণাটি অমূলক কেননা বাণিজ্যিক পত্রের নিজস্ব শিল্পশ্রী বর্তমান। তবে একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, ব্যক্তিগত পত্রের শিল্পশৈলী ও বাণিজ্যিক পত্রের শিল্পশৈলী এক নয়।

আধুনিক কালে বাণিজ্যও একপ্রকার শিল্পকর্ম বলে পরিগণিত, সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য জগতের সঙ্গে অন্বিত যে পত্র রচনা তাও শিল্পকর্ম বলেই স্বীকৃত। অনেকে এ মত পোষণ করেন না, তাঁদের ধারণা বাণিজ্যিক পত্র ব্যক্তিগত অনুভূতির স্পর্শবিহীন হওয়ায় তার কোন শৈল্পিক রূপ থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এঁরা বাণিজ্যিক পত্র রচনার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম নন।

বাণিজ্যে পত্র বিনিময়ের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পারস্পরিক দেয়া-নেয়ার ওপর নির্ভরশীল বাণিজ্যের সহায়ক রূপেই দেখা দিয়েছে বাণিজ্যিক পত্র। অতীতের প্রত্যক্ষ বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পাদিত বাণিজ্যের চেহারা আধুনিক কালে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আজকের জীবন যেমন জটিল হয়ে পড়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যও তেমনি ক্রমাগত জটিল হয়ে পড়ছে। সেই জটিলতাকে সহজ ও স্বচ্ছন্দ করে তোলার আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে আধুনিক 'বাণিজ্যিক পত্র'। এই বাণিজ্যিক পত্রকে আধুনিক ব্যবসা জগতে অনেকাংশে 'চুক্তি-পত্র' বলেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাই বাণিজ্যিক পত্র গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে শুধু মূল্যবান নয়, তা অপরিহার্যও।

কোন বিশেষ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার জন্যই যখন বাণিজ্যিক পত্র রচনার প্রয়োজন তখন লক্ষ্য রাখতে হবে, পত্র রচনা যেন উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হয়। সুতরাং বক্তব্যটি কোন প্রকারে অন্যের গোচরীভূত করাই সব নয়; এই রচনার নেপথ্যে থাকবে আরও একটি লক্ষ্য, তা হল পত্র-প্রাপকের মনটিকে স্পর্শ করা, প্রভাবিত করা। এই লক্ষ্যে পৌছতে না পারলে বাণিজ্যিক পত্র-রচনার সামগ্রিক উদ্দেশ্য হবে ব্যর্থ। সুতরাং এই জাতীয় পত্র যেমন একদিকে অনলঙ্কৃত টেলিগ্রাফিক ভাষায় রচিত হবে না, তেমনি অলঙ্কার বহুল ভাষাতেও লিখিত হবে না।

আধুনিক কালের বাণিজ্যকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি: এক, ঘরোয়া বাণিজ্য; দুই, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। যে বাণিজ্য আমাদের দেশের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাকেই আমরা বলি 'ঘরোয়া বাণিজ্য' আর যখন সেই বাণিজ্য দেশের সীমা অতিক্রম করে বিদেশে পৌছায় তখন সেই ক্রমসম্প্রসারণশীল বাণিজ্য তার ঘরোয়া রূপ বর্জন করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রূপ পায়। ঠিক এইভাবেই বাণিজ্যিক পত্রের আমরা দুটো রূপ দেখি। একটা ঘরোয়া রূপ আর একটা আন্তর্জাতিক রূপ।

এখন প্রশ্ন হল: ছাত্রছাত্রীরা পত্র রচনার সময় কোন রূপাঙ্গিক গ্রহণ করবে? চিঠিপত্রের বাংলা রূপকেই বলা হয়ে থাকে ঘরোয়া রূপ আর পাশ্চাত্য রূপাঙ্গিকে রচিত পত্রকে বলা হয়ে থাকে আন্তর্জাতিক রূপ। আংশিক সংস্কৃত, আংশিক ফার্সী ও আংশিক বাংলা ভাষা নিয়ে গড়ে উঠেছিল বাণিজ্যিক পত্রের ঘরোয়া রূপ আর মূলতঃ ইংরাজী আদর্শে রচিত পত্রই হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক পত্রের দৃষ্টান্ত। বর্তমান কালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক পত্রের পাশ্চাত্য রীতিই স্বীকৃতি পেয়েছে বলেই বাণিজ্যিক পত্র রচনার সময় পাশ্চাত্য রীতিই অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমরা গোঁড়ামি ত্যাগ করে যদি মুক্তদৃষ্টি নিয়ে বিচার বিবেচনা করি তাহলে লক্ষ্য করব আধুনিক কালে পাশ্চাত্য রীতি হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন। সুতরাং আমাদের দেশের ঐতিহ্যপূর্ণ ঘরোয়া রূপ যখন নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে, যখন হয়ে পড়েছে অনাধুনিক, তখন কোন রকম সংস্কার না রেখে আধুনিক নীতিকে বরণ করাই শ্রেয়। পাশ্চাত্যরীতি শুধুমাত্র আধুনিকই নয়, তা বিজ্ঞানসম্মতও বটে। তাই বলে অত্যাধুনিকতাকে গ্রহণ করারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। সুতরাং অতি প্রাচীন ও অতি আধুনিক রীতির মধ্যবর্তী প্রগতিশীল রচনারীতিই হবে বাণিজ্যিক পত্র রচনার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের বাংলা দেশের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বাংলা ভাষায় বাণিজ্যিক পত্র রচনার প্রয়োজনীয়তার দিকটি ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না। গত

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর সময় থেকে বাংলা ভাষা পশ্চিম বাংলার স্বীকৃত সরকারী ভাষা। অদূর ভবিষ্যতে বাংলা ভাষার মাধ্যমেই সরকারী কাজকর্ম সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হবে বলে আশা করা যায়। দ্বিতীয়ত, সরকারী কাজকর্ম বাংলা ভাষায় সম্পাদিত হতে শুরু করলে, ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে স্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই; সুতরাং বাংলা ভাষায় বাণিজ্যিক পত্র রচনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

॥ ২ ॥

বাণিজ্যিক পত্র রচনার কাঠামো

বাণিজ্যিক পত্র রচনার একটি বিশিষ্ট ও মূল্যবান অংশ হল—কাঠামো। (বিশেষত পরীক্ষার দিক থেকে বিচার করলে; কেননা নির্ভুল কাঠামোটি পরীক্ষাপত্রে উপস্থিত করতে পারলে ছাত্রছাত্রীরা কিছু নম্বর পেয়ে থাকে।) পারম্পর্য অনুসারে বাণিজ্যিক পত্র রচনাকে কয়েকটি অংশে বিন্যস্ত করা হয়। যথা:

এক—শিরোনামা (Letter Head)

দুই—অন্তর্বর্তী ঠিকানা (Inner address)

তিন—পূর্বসূত্র বা সূচক সংখ্যা (Reference)

চার—সম্ভাষণ (Address)

পাঁচ—বিষয় বিন্যাস (Body of the Letter or Matter)

ছয়—অন্ত্য-সৌজন্য (Complementary close)

সাত—স্বাক্ষর (Signature)

আট—ক্রোড়পত্র (Enclosure).

বলা বাহুল্য, এই অংশগুলির প্রত্যেকটিই বাণিজ্যিক পত্র রচনার সময় প্রযুক্ত হয় না। কোন কোন পত্রে এই সব অংশগুলির এক বা একাধিক অংশ ব্যবহারের প্রয়োজনই থাকে না।

বাণিজ্যিক পত্র রচনার শিরোনামার গুরুত্ব অনেক। পত্রের শীর্ষদেশে পত্র প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও স্বরূপ, সাধারণ ঠিকানা ও টেলিগ্রাফ ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, কোড নম্বর, লাইসেন্স নম্বর, আমদানি ও রপ্তানি লাইসেন্স নম্বর (যদি আমদানি ও রপ্তানির ব্যাপার থাকে), সূচক সংখ্যা ও বিষয়—এই কয়েকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ আবশ্যিক।

শিরোনামাই পত্র লেখকের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বহনকারী, সুতরাং শিরোনামার

প্রসঙ্গগুলি যথা নির্দিষ্ট স্থানে এবং যথাযথ ভাবে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিরোনামার এই সমস্ত অংশগুলি বিন্যাসেরও একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে এবং পত্র রচনার সময় এই পদ্ধতি স্মরণে রাখা প্রয়োজন। পত্রের কাগজের শিরোদেশের ঠিক মধ্যস্থলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিক তার নীচেই প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক-পরিচয় লিখিত থাকবে। তার নিচে ডানদিকে লেখা থাকবে ঠিকানা এবং তার নীচে তারিখ। ঠিকানার সমান উঁচুতে বাঁদিকে থাকবে, টেলিগ্রাম, টেলিফোন নং, কোড নং প্রভৃতি। তার নীচে একটু ফাঁক দিয়ে থাকবে সূচক সংখ্যা এবং তার নীচে একটু ফাঁক দিয়ে ঠিক মাঝখানে থাকবে বিষয়। নীচে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল:

শিরোনামা

আলফা পাবলিশিং কোং

[প্রখ্যাত পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা]

৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা

টেলিগ্রাফ : আলফা

টেলিফোন নং : ৩৪-৩৮৩৮ ১৮ই নভেম্বর, ১৯৬৬

কোড নং……

আমদানি লাইসেন্স নং
অথবা
রপ্তানি লাইসেন্স নং } প্রয়োজনের ক্ষেত্রে

সূচক সংখ্যা………ক/৩১/৬৬

বিষয় : অর্ডার গ্রহণ

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সব সময়েই শিরোনামা ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিন্তু চাকুরীর জন্য আবেদন পত্রে শিরোনামা ব্যবহার রীতি বিরুদ্ধ। সাধারণতঃ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান-গুলির পত্র রচনার জন্য ছাপানো প্যাডে 'শিরোনামা' অংশটি মুদ্রিতই থাকে। তবে তারিখ দেওয়ার জায়গাটি এই ভাবে ফাঁকা থাকে তাং……১৯৬ …..তারিখের ক্ষেত্রে বাংলা সাল তারিখ বর্জনীয়, কেননা বর্তমান কালের ব্যবসা-বাণিজ্য ইংরেজি সাল তারিখ অনুসারেই পরিচালিত হয়ে থাকে।

শিরোনামার পরের অংশ—অন্তর্বর্তী ঠিকানা। এই অংশটি শিরোনামার নীচে বাঁদিকে লিখিত হওয়া আবশ্যক। এই অন্তর্বর্তী ঠিকানার গুরুত্ব অনেক। এক, এই অংশে পত্র-প্রাপকের নাম উল্লিখিত হয়। দুই, খামে ঠিকানা লেখার ব্যাপারে

কোন রকম ভুল যাতে না হয় তারই জন্য এই রীতি। তিন, শ্রম-সংক্ষেপের দিক থেকেও নিয়মটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা সহজেই Window envelope ব্যবহার করা চলে। চার, যাঁকে পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে তাঁর নাম ঠিকানার উল্লেখ থাকা একান্তই আবশ্যক। অন্তর্বর্তী ঠিকানা লেখার রীতিটি সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক পত্র রচনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছে পত্র লিখতে হলে তাঁর নামের আগে 'শ্রী' বা 'শ্রীমতী' ব্যবহার করা শিষ্টাচারসম্মত। আর কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে পত্র প্রেরণ করতে হলে অন্তর্বর্তী ঠিকানাটি অবস্থানুযায়ী দুভাবে লেখা বিধেয়, যেমন : সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠানের কাছে লিখতে হলে ঐ প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করলেই চলে ; কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কোন বিভাগীয় কর্মকর্তা বা পদাধিকারী ব্যক্তির কাছে পত্র লিখতে হলে প্রতিষ্ঠানের নামের ওপরে সেই পদের উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। নীচে উদাহরণ দেওয়া হল :

অন্তর্বর্তী ঠিকানা

এক। ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে : শ্রীশিবপ্রসাদ সিংহ এম, এস, সি, এল, এল, বি,
এ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট,
কলিকাতা।

দুই। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে : মর্ডান ষ্টোরস্,
২২, অশোক পথ
পাটনা

তিন। প্রতিষ্ঠানের পদাধিকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে : কর্মাধ্যক্ষ,
জয় ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি
১৬, প্রিন্স আনোয়ার সা রোড
টালিগঞ্জ, কলিকাতা -৩৩।

অন্তর্বর্তী ঠিকানার পর পূর্বসূত্র বা সূচক সংখ্যা হলেও আমরা শিরোনামা আলোচনার সময় সূচক সংখ্যার উল্লেখ করেছি। বাণিজ্যিক পত্র রচনার সময় এই অংশটিরও উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে গঠিত কোন বিরাট প্রতিষ্ঠান যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে চিঠিপত্র লেখে, তখন যে বিভাগ থেকে পত্র পাঠানো হয় সেই বিভাগের সূচক সংখ্যার উল্লেখ পত্রের মধ্যে থাকে। ঐ পত্রের উত্তর দেওয়ার সময় প্রাপকের কর্তব্য হল সেই সূচক সংখ্যার উল্লেখ করা। প্রাপক যদি তাঁর উত্তরে এই সূচক সংখ্যার উল্লেখ না করেন, তবে ঐ বৃহৎ প্রেরক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে খুঁজে বের করা মুস্কিল হবে যে, কোন্ বিভাগ থেকে

পূর্বসূত্র
এবং
সূচক সংখ্যা

কোন্ সময়ে মূল পত্রটি লেখা হয়েছিল। এর ফলে, উভয় পক্ষ থেকেই কার্যটি বিলম্বিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে—যা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রেরকের পক্ষ থেকে পত্রতে যখন ঐ স্মারক সংখ্যার উল্লেখ করা হয়, তখন তাকে সূচক সংখ্যা বলা হবে এবং প্রাপকের পক্ষ থেকে যখন পত্রে ঐ সূচক সংখ্যার উল্লেখ করা হয় তখন তাকে পূর্বসূত্র বলা হবে। নীচে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :

সূচক সংখ্যা : এজেন্সি /৬০৩২/৬৬

পূর্বসূত্র : এজেন্সি /৬০৩২/৬৬ প্রথমটি পত্র প্রেরকের, দ্বিতীয়টি পত্র প্রাপকের দ্বারা উল্লিখিত।

সম্ভাষণ

এরপর সম্ভাষণ। বাংলায় সম্ভাষণের অনেক রকমের রীতি আছে। যেমন, মান্যবর, মহামহিম, শ্রদ্ধাস্পদেষু, মহাশয়, সবিনয়ে নিবেদন ইত্যাদি। এই গুলোর মধ্যে প্রথম তিনটি অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ; এগুলি ব্যবহার করার রীতি বর্তমানে পরিত্যক্ত। আজকাল ব্যক্তি-বিশেষের কাছে পত্র লিখবার সময় 'মহাশয়' এবং সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'সবিনয়ে নিবেদন' প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে সামাজিক কাঠামোর দিকে লক্ষ্য রেখে নিয়োগকারীর কাছে পত্র লেখার সময়ে 'মাননীয় মহাশয়' লেখা হয়ে থাকে।

অন্তর্বর্তী ঠিকানার ঠিক নীচেই এই সম্ভাষণ অংশটুকুর স্থান।

বিষয় বিন্যাস

সম্ভাষণের পর পত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ—বিষয় বিন্যাস। পত্র প্রেরকের উদ্দেশ্য সিদ্ধি নির্ভর করে বিসয়বস্তুর উপস্থাপনা-রীতির ওপর। অন্য যা কিছু তা সবই আনুষঙ্গিক মাত্র। কাজেই বিষয়বিন্যাস অংশটি সুলিখিত, সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হওয়া প্রয়োজন। তাই বলে তা নিতান্ত সাদামাঠা ভাষায় প্রকাশ করলে চলবে না। প্রসঙ্গক্রমে ভাষার দিকটি আলোচনা করা প্রয়োজন। যদিও বাংলা ভাষায় লিখিত ভাষা হিসাবে সাধু ও চলিত উভয়েরই স্থান আছে, তবুও বাণিজ্যিক পত্র রচনার ব্যাপারে সাধু ভাষারই আশ্রয় অবলম্বন করা বিধেয়। সাধু ভাষার মাধ্যমে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ ভঙ্গিতে মূল প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হবে। বিষয়বস্তুর কাঠামোগত গুরুত্ব অনুসারে তাকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন। এই অংশের সার্থকতার ওপর চিঠির সাফল্য, এবং ব্যর্থতার উপর চিঠির ব্যর্থতা নির্ভরশীল। বিষয়-বিন্যাসে ভাষা সুন্দর হওয়া উচিত কিন্তু দুর্বোধ্য নয়।

বিষয়-বিন্যাসের পর অন্ত্য-সৌজন্য। কোন ব্যক্তির সঙ্গে মৌখিক আলাপ-আলোচনার পর বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন যেমন শিষ্টাচারসম্মত, বাণিজ্যিক পত্রেও তেমনি

শিষ্টাচার রক্ষা করা প্রয়োজন। এই শিষ্টাচারসম্মত প্রথাকেই 'অন্ত্য-সৌজন্য' বা 'বিদায় সম্ভাষণ' বলে। এই অন্ত্য-সৌজন্যের স্থানে সাধারণতঃ এইগুলোর যে কোন একটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে,—'বিনীত,' 'নিবেদক,' 'বিনীত নিবেদক,' 'ভবদীয়,' 'বিশ্বস্ত,' 'একান্তভাবে বিশ্বস্ত' ইত্যাদি। বিষয় বস্তুর ঠিক নীচেই ডানদিকে বিদায় সম্ভাষণ লিখতে হয়।

অন্ত্যসৌজন্য

বিদায়-সম্ভাষণের ঠিক নীচে স্বাক্ষরের স্থান। এই অংশে থাকবে স্বাক্ষর এবং প্রতিষ্ঠানের নাম। এই স্থানে পত্র প্রেরক তাঁর নাম নিজের হাতে লিখে থাকেন। প্রেরক যদি কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তি বিশেষ হন, তাহলে তাঁর নামের নীচে সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক-বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিষ্ঠানের শীলমোহর যুক্ত নামোল্লেখ থাকা প্রয়োজন। অনেক সময় পত্র লেখকের পদ-মর্যাদা ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম মুদ্রলেখ যন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রিত করে দেওয়া হয়। তাতে আভিজাত্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অনেক ক্ষেত্রে স্বাক্ষর শীলমোহর দিয়ে সেরে দেওয়া হয়। কিন্তু তা উচিত নয়। কারণ পত্র আইনের চোখে দলিলের মত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লেনদেন, চুক্তি বা আলোচনা পত্রের বৈধতার দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে কাজেই শীলমোহর নয়—স্বহস্তে নিজের নাম লেখা উচিত। নীচে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :

স্বাক্ষর

১। ব্যক্তির ক্ষেত্রে : শ্রীপরিতোষ পাল

২। (ক) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে : শ্রীজগদীশ বিশ্বাস
স্বত্বাধিকারী, আগ্রা হোটেল
মথুরা।

শ্রীঅনাদিপ্রসাদ দত্ত
ম্যানেজার, কমলালয় ষ্টোর্স
কলিকাতা।

চক্রবর্তী এণ্ড লাহিড়া কোং-পক্ষে
আমমোক্তার-নামা-প্রাপ্ত
প্রতিনিধি
শ্রীদীনবন্ধু সান্যাল

স্বাক্ষরবিহীন পত্র অর্থহীন ও মূল্যহীন এবং তা বাতিল বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

সর্বশেষ অংশ ক্রোড়পত্র। বাণিজ্যিক পত্রাদি রচনার ব্যাপারে অনেক সময়ে পত্র লেখককে বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রাপকের কাছে দাখিল করতে হয়। মূল পত্রের অন্তর্ভুক্ত করে ঐ সমস্ত কাগজপত্র বা দলিলপত্র পাঠানো হয় বলে

ওদের বলা হয় ক্রোড়পত্র। অনেক সময়েই মূল পত্রের সঙ্গে অভিজ্ঞানপত্র, প্রশংসাপত্র, সুপারিশপত্র বা গুরুত্বপূর্ণ অন্যকোন দলিল ইত্যাদির অনুলিপি (True Copy) প্রেরিত হয়ে থাকে। পত্রের নীচে বাঁদিকে তার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, সেই সঙ্গে সংখ্যার উল্লেখও আবশ্যক। নীচে উদাহরণ দেওয়া হল :

ক্রোড়পত্র

(১) স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার অভিজ্ঞানপত্রের প্রত্যয়িত অনুলিপি।

(২) প্রশংসাপত্রের প্রত্যয়িত অনুলিপি।

এই অংশগুলো ছাড়া কখনও কখনও আরও দুইটি অংশের উল্লেখ করা যায়। যেমন, (১) পুনশ্চ। পত্র শেষ করার পর যদি নতুন কিছু লেখবার প্রয়োজন হয় অথবা মূল বক্তব্যের কোন অংশ বাদ পড়ে যায়, তবে তা পত্রের শেষে বাঁ দিকে 'পুনশ্চ' লিখে সংযোজন করতে হয়। এই অংশের শেষেও পত্র লেখকের পুনঃ স্বাক্ষর থাকা উচিত। তা না হলে ; ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরবর্তী কালে মতবিরোধ ঘটলে এই 'পুনশ্চ' অংশের বক্তব্যের কোন মূল্য থাকে না।

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানের কাছে পত্রের নকল প্রেরণ।

॥ ৩ ॥

বাণিজ্যিক-পত্র রচনার বৈশিষ্ট্য

বাণিজ্যিক পত্র আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। ব্যক্তিগত পত্রের সঙ্গে রূপগত ও গুণগত দিক থেকে বাণিজ্যিক পত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা এই অংশে স্বাতন্ত্রের লক্ষণ বিচারে ব্রতী হব।

বাণিজ্যিক পত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে তার সংক্ষিপ্ততায়। কোন কারণেই বাণিজ্যিক পত্র দীর্ঘ হওয়া উচিত নয়। দীর্ঘতা বাণিজ্যিক পত্রের পক্ষে অবাঞ্ছিতই নয়, তা সর্বদা পরিহার্য। বর্তমান যুগ ব্যস্ততার যুগ। বিশেষতঃ বাণিজ্যিক ব্যস্ততায় বাণিজ্যিক পত্রের সংক্ষিপ্ততা একান্তই কাম্য। দীর্ঘাকারের বাণিজ্যিক পত্র রচনার অর্থই হোল অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা ব্যবহার। এই অপ্রয়োজনীয় কথা বাণিজ্যের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতে, আইনগত জটিলতা সৃষ্টি করতে কিংবা ভবিষ্যত বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

সংক্ষিপ্ততা

ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে এই অংশ লেখার সময় বিশেষ সচেতন হওয়া প্রয়োজন কেননা, এই অংশ রচনার সময় তারা মারাত্মক ধরণের বানান ভুল ও অন্যান্য নানাপ্রকার ভুল

করে থাকে। পত্র দীর্ঘ হলে এই ভুলের মাত্রা বাড়তেই থাকে। বাণিজ্যিক পত্রের সঠিক কোন পরিমাপ নেই, মূল বক্তব্য সুস্পষ্ট করে উপস্থিত করার জন্য যতখানি লেখা প্রয়োজন ততখানিই লিখতে হবে। তার কমও নয়, বেশীও নয়।

ভাষার স্পষ্টতা

এই পত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল ভাষার স্পষ্টতা। যে সব বাক্যের বা শব্দের অর্থ একাধিক বা অস্পষ্ট তা বর্জন করা উচিত। কারণ এই সব ক্ষেত্রে পত্র লেখক লিখলেন এক অর্থে, পত্র প্রাপক বুঝলেন অন্য অর্থ—তাতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায়। ফলে যে উদ্দেশ্যে পত্র রচিত হল তা হয়ে পড়ল সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বাণিজ্যিক-স্বার্থবিরোধী কিংবা সংশয় উদ্রেক-কারী কোন শব্দ বাণিজ্যিক পত্রে ব্যবহৃত হওয়া সমীচীন নয়।

ভাষার সারল্য

ভাষার সারল্য—বাণিজ্যিক পত্রের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সহজ সরল ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করা খুব সহজ কথা নয়। একে এক ধরণের আর্ট বললেও অত্যুক্তি হয় না। কাব্যিক বর্ণনা-নৈপুণ্য অথবা ভাষার জৌলুষ দেখানোর উপযুক্ত জায়গা বাণিজ্যিক পত্র নয়। আবার একেবারে সাদাসিধে ভাষাতেও বাণিজ্যিক পত্র রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ তাতে বাণিজ্যিক পত্রের গুরুত্ব হ্রাস পায়। অর্থবহ, উপযুক্ত শব্দের বিন্যাসের দ্বারা একটা সহজ, সরল, সাবলীল, ঋজু পত্র-রচনা ভঙ্গি সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই জাতীয় পত্রের বাচনভঙ্গি হবে শাণিত। দীর্ঘচর্চার ফলেই সুন্দর ও সার্থক বাণিজ্যিক পত্র রচনার ষ্টাইল আয়ত্বাধীন হতে পারে।

বাক্য-বিন্যাস

বাণিজ্যিক পত্রের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল—বাক্যবিন্যাস। শুধুমাত্র শব্দ যোজনা বা বাক্যযোজনা করলেই উৎকৃষ্ট বাণিজ্যিক পত্র লেখা শেষ হয় না। বাক্যগুলোর পারস্পরিক পারম্পর্য রক্ষা পেয়েছে কিনা তা লক্ষ্যও করা প্রয়োজন। বাক্যবিন্যাস শিথিলবদ্ধ হলে তা পত্রকে দুর্বল করে ফেলে। অনেক সময় সংক্ষিপ্ততার সৃষ্টি করতে গিয়ে বাক্য-রচনা অসংলগ্ন হয়ে পড়ে। তাতে পত্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। সুতরাং ভাল ভাবে পারম্পর্য বজায় রেখে সুপরিকল্পিত ভাবে ও যুক্তিসহকারে বক্তব্য উপস্থিত করাই বাণিজ্যিক পত্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সৌজন্য-বোধ

এই জাতীয় পত্রের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য—সৌজন্যবোধ। ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি অতি বাস্তব ও অতি প্রকট অংশ হল বাণিজ্যিক দেনা-পাওনা। এই অতি প্রকট দিকটা ঢাকা পড়ে সৌজন্যবোধের আড়ালে। বাণিজ্যিক পত্র এই আড়াল সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সৌজন্যবোধ ও সদিচ্ছাই ব্যবসায়িক মূলধন। সৌজন্যবিহীন পত্রালাপ সম্পর্কের অবনতির ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং বাণিজ্যিক পত্রে সৌজন্যবোধের পরিচয় থাকা একান্ত আবশ্যক।

সর্বশেষে পরিচ্ছন্নতার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। পরিচ্ছন্নতা শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের সুনামই বহন করে না পত্র লেখকের চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতার ও সুরুচির স্বাক্ষর বহন করে। মুদ্রলেখ যন্ত্রে লিখিত হলে অপরিচ্ছন্নতার অবকাশ থাকে না। কিন্তু হস্তলিখিত বাণিজ্যিক পত্রে এই অবকাশ থাকে প্রচুর।

পরিচ্ছন্নতা

পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীনীদের পক্ষে পরিচ্ছন্নতা একটি বিশেষ গুণ।

চাকরির আবেদন পত্র

Application For A Situation

যে কোন আবেদন-পত্র—বাণিজ্যিক পত্রের অংশ, কিন্তু অন্যান্য বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামো থেকে আবেদন-পত্রের কাঠামো কিছুটা স্বতন্ত্র। কারণ আবেদন-পত্রের কাঠামো, বক্তব্যের পারম্পর্য ও পরিচ্ছন্নতা এবং ভাষার শুদ্ধতার মধ্যে প্রতিফলিত হয় আবেদনকারীর চরিত্র। আবেদনপত্র রচনার কালে তাই নিম্নলিখিত রীতি পালন করা কর্তব্য :

এক : আবেদন-পত্রের উপরের দিকে দক্ষিণ কোণে আবেদনকারীর পূর্ণ ঠিকানা ও তারিখ লেখা আবশ্যক। এরই নাম শিরোলিপি।

দুই : আবেদনপত্রের বাঁদিকে লিখতে হবে অন্তর্বর্তী ঠিকানা অর্থাৎ কর্মদাতা কর্তৃপক্ষের নাম এবং ঠিকানা। অনেক সময় কর্তৃপক্ষের নাম উল্লেখ থাকে না, তখন বিজ্ঞাপন দাতার দেওয়া বক্স নং উল্লেখ করতে হয়।

তিন : তারপর পত্রের শুরু সম্ভাষণের মাধ্যমে। যেমন, 'সবিনয় নিবেদন'।

চার : আবেদন সূত্র। "যেমন, গত ১১ই আগষ্ট তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপন হইতে অবগত হইলাম যে," ইত্যাদি। আবার অনেক সময় বিজ্ঞাপন ছাড়াও অন্য সূত্র থেকে চাকরির সন্ধান পাওয়া যায়, তখন লেখা হয় 'বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম যে' ইত্যাদি।

পাঁচ : প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতাবলী।

ছয় : কোন বিশেষ যোগ্যতা।

সাত : অভিজ্ঞতা।

আট : কর্ম-বিনিময় (Employment Exchange) কেন্দ্রের নিবন্ধকরণ সংখ্যা। সব কর্মপ্রার্থীরই এই সংখ্যা থাকে তা নয়, তবে যাদের আছে তাদের পক্ষে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

নয় : বর্তমান বয়স ও স্বাস্থ্য।

দশ : যদি কোন কাজে ইতোমধ্যেই নিযুক্ত হয়ে থাকে তবে কর্মপ্রার্থী কেন অন্যত্র কর্মানুসন্ধান করছে তার কারণ।

এগারো : প্রত্যাশিত ন্যূনতম বেতন।

বারো : প্রশংসাপত্রাদির উল্লেখ।

তেরো : সাক্ষাৎকারের অনুমতি প্রার্থনা।

চোদ্দ : উপসংহার।

পনেরো : স্বাক্ষর।

ষোল : ক্রোড়পত্র।

সতেরো : বহিস্থ ঠিকানা।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলিকে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে আবেদনপত্র রচনা করতে হবে। এই আবেদন-পত্র দুটো রীতিতে রচিত হতে পারে : (ক) গতানুগতিক রীতি ও (খ) আধুনিক রীতি।

এখানে আবেদন-পত্রের দুটি রীতিই প্রদত্ত হলো।

প্রশ্ন ।। ১ ।। তুমি বি-কম পাশ করিয়াছ। তোমার বিশেষ যোগ্যতা উল্লেখ করিয়া ও সেই যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মে নিযুক্ত করিবার প্রার্থনা করিয়া কোন সওদাগরী অফিসে দরখাস্ত কর।

আদর্শপত্র-১

মডার্ন ট্রেডিং কোম্পানী
৬, ডালহৌসী স্কোয়ার.ইষ্ট
কলিকাতা-১

৯৩/৬ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬
১২ই জুলাই, ১৯৬৬।

সবিনয়ে নিবেদন,

গত ১০ই জুলাই তারিখের দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারিলাম যে, আপনাদের প্রতিষ্ঠানে একজন অভিজ্ঞ মুখ্য গাণনিক প্রয়োজন। তদনুযায়ী প্রার্থীরূপে আমি আমার আবেদন পত্র প্রেরণ করিতেছি।

আমি ১৯৫১ সালে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। তারপর ১৯৫৪ সালে স্নাতক শ্রেণীর বাণিজ্য (সাম্মানিক) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিগত পরীক্ষায় আমার ঐচ্ছিক বিষয় ছিল উচ্চতর হিসাব-শাস্ত্র ও হিসাব-পরীক্ষা।

গত ১৯৫৫ সাল হইতেই আমি ৭৫, এজরা ষ্ট্রীটস্থিত ইষ্টার্ন ইলেট্রিক্যাল কোম্পানীর মুখ্য হিসাব রক্ষকের পদে নিযুক্ত আছি। এই পদে আমি একাদিক্রমে বার বৎসরের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি। আমি কর্তৃপক্ষের প্রীতিভাজন হইতেও সমর্থ হইয়াছি।

আমি এই বিশ্বাস রাখি যে অন্য প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিকটও আমি অনুরূপ প্রীতিভাজন হইব। এই প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুদ্র হওয়ায় ভবিষ্যতে উন্নতির সুযোগ নিতান্তই সীমাবদ্ধ। তজ্জন্যই আমার বর্তমান নিয়োগকারীর অনুমতিক্রমেই আমি আপনাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মপ্রার্থী।

আমার বর্তমান বয়স ৩১ বৎসর ২ মাস। আমি অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী বলিয়া পরিশ্রমে অভ্যস্ত। আমার উৎসাহও অমিত।

এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ভাতা সহ তিনশত টাকা পাই। মাসিক চারশত পঞ্চাশ টাকা করিয়া পাইলে আমি আপনার প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে পারি।

এই আবেদন পত্রের সহিত কয়েকখানি প্রশংসাপত্রের অনুলিপি পাঠাইলাম। ইহা ব্যতীত বর্তমান নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিকট অনুসন্ধান করিলেও আমার কর্মদক্ষতা ও সততা সম্পর্কে সঠিক সংবাদ জানিতে পারিবেন।

অনুগ্রহপূর্বক সাক্ষাৎকারের অনুমতি প্রদান করিলে আমি আপনার অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইতে পারিব।

আশা করি, আপনার সহৃদয় নির্দেশ লাভে বঞ্চিত হইব না।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীকালিদাস বসু

ক্রোড়পত্র-৪

শ্রীকালিদাস বসু ১৩/৬, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬	মডার্ন ট্রেডিং কোম্পানী ৬, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট কলিকাতা-১

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ কোন প্রতিষ্ঠানে [বক্স্ নং ৩১৭, যুগান্তর পত্রিকা কলিকাতা] একজন সুদক্ষ হিসাব রক্ষকের প্রয়োজন। যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়স ও ন্যূনতম বেতন ইত্যাদি জানাইয়া একখানি আবেদন পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র-২

পৃষ্ঠা-১

১২, ক্রীক লেন
কলিকাতা-১৪
৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬

বিজ্ঞাপন দাতা
বক্স্ নং ৩১৭
যুগান্তর পত্রিকা
কলিকতা-৪

সবিনয়ে নিবেদন,

গত ৩রা সেপ্টেম্বরের 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে জানিতে পারিলাম যে, আপনার প্রতিষ্ঠানে একজন সুদক্ষ হিসাব-রক্ষকের প্রয়োজন। তদনুসারে উক্ত বিজ্ঞাপিত পদের প্রার্থী হইয়া আমি আমার আবেদন পত্র প্রেরণ করিতেছি।

আপনাদের অবগতি ও অনুকূল বিচার বিবেচনার জন্য আমার যোগ্যতাদির বিস্তৃত বিবরণ পরের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আপনার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের সেবায় আত্মনিযোগ করিবার সুযোগ পাইলে কৃতার্থ হইব। ধন্যবাদান্তে। ইতি—

বিনীত
শ্রীসুব্রত মৈত্র

পৃষ্ঠা-২

(১) আবেদন কারীর নাম : শ্রীসুব্রত মৈত্র

(২) পিতার নাম : শ্রীঅতুলেন্দ্র নাথ মৈত্র

(৩) ঠিকানা— স্থায়ী : ১২, ক্রীক লেন, কলিকাতা-১৪
ও বর্তমান : ঐ

(৪) শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্কুল ফাইন্যাল, প্রথম বিভাগ (১৯৫৩), আই. এস, সি প্রথম বিভাগ (১৯৫৫), বি. কম (ঐচ্ছিক বিষয় উচ্চতর হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা শাস্ত্র সহ) প্রথম শ্রেণী (১৯৫৭)।

(৫) বিশেষ যোগ্যতা : মুদ্রলেখন শিক্ষা (type writing) ইংরাজীতে মিনিটে ৪৫ শব্দ।
বাংলায় মিনিটে অন্যূন ২৮টি শব্দ।

(৬) অভিজ্ঞতা : ২৬।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটের বেঙ্গল পাবলিশিং কোম্পানীতে ১৯৫৮ সাল হইতে হিসাব রক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত।

(৭) বর্তমান বয়স : ২৮ বৎসর ৩ মাস।

(৮) অন্যত্র কর্ম-অনুসন্ধানের

কারণ : বর্তমান প্রতিষ্ঠানের অংশীদার গণের মধ্যে মনোমালিন্যের ফলে ভবিষ্যত অগ্রগতির অনিশ্চয়তা।

(৯) প্রত্যাশিত বেতন : মাসিক সাড়ে তিন শত টাকা (ভাতা সহ)।

(১০) প্রশংসা পত্রাদির অনুলিপি : মোট তিন খানা :

(১) স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সার্টিফিকেট।

(২) বি. কম পরীক্ষার সার্টিফিকেট।

(৩) বেঙ্গল পাব্লিশিং কোম্পানীর প্রশংসা পত্র।

(১১) স্বাক্ষর ও তারিখ : শ্রীসুব্রত মৈত্র, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন অনুসার কোন ব্যাঙ্কের হিসাব রক্ষক পদের জন্য আবেদন কর। [ব. বি. ৬১]

আদর্শ পত্র—৩

ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৩৫, নেতাজী সুভাষ রোড
ক্লাইভ বিল্ডিং
কলিকাতা-১

৬৬।৩ রসা রোড ইস্ট
কলিকাতা-৩৩
১৫ই জুন, ১৯৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

গত ১৪ই জুনের 'আনন্দবাজার' পত্রিকার বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারিলাম যে, আপনাদের প্রতিষ্ঠানে জনৈক সুদক্ষ হিসাব রক্ষক প্রয়োজন। তদনুযায়ী উক্ত পদের প্রার্থী রূপে আমি আমার আবেদন পত্র প্রেরণ করিতেছি।

গত ১৯৫৫ সালে আমি উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্য শাখায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই। তারপর ১৯৫৯ সালের স্নাতক শ্রেণীর বাণিজ্য (সাম্মানিক) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছি।

গত ১৯৬২ সালের ১০ই আগস্ট হইতে আমি ২৩৫, বিবেকানন্দ রোডস্থিত বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা ফরোয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানির মুখ্য হিসাব রক্ষকের পদে নিযুক্ত আছি। ঐ কার্যে আমি একাদিক্রমে ছয় বৎসরের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া কর্তৃপক্ষের প্রীতিভাজন হইয়াছি। আমি বিশ্বাস করি, যে কোন

প্রতিষ্ঠানে হিসাব রক্ষকের কার্যে আমি নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করিতে পারিব এবং অনুরূপ ভাবে কর্তৃপক্ষের প্রীতিভাজন হইতে পারিব। এই প্রতিষ্ঠানে ভবিষ্যতে উন্নতির সুযোগ একেবারেই সীমাবদ্ধ বলিয়াই কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মপ্রার্থী হইতেছি।

আমার বর্তমান বয়স ২৭ বৎসর। আমি অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত। আমার উৎসাহও অমিত।

এখানে বর্তমানে দুর্মূল্য ভাতা, বাড়ী ভাড়া ভাতা সহ আমি দুই শত পঁচাত্তর টাকা পাই। মাসিক তিনশত পঁচিশ টাকা করিয়া পাইলে আমি আপনার প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে পারি।

এই আবেদন পত্রের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, কম পরীক্ষার অভিজ্ঞান-পত্রের অনুলিপি ও এই সঙ্গে বর্তমান কর্তৃপক্ষের দেওয়া একখানি প্রশংসা পত্রের অনুলিপি প্রেরণ করিলাম। ইহা ব্যতীত এই প্রতিষ্ঠানে অনুসন্ধান করিলেও আমার সততা ও কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ জানিতে পারিবেন।

অনুগ্রহপূর্বক আমাকে সাক্ষাতের অনুমতি দিলে আপনার অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমস্ত জানাইতে পারিব। আমি এই আশ্বাস দিতে পারি, আমাকে বহাল করা হইলে আমি আমার সাধ্যমত বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতা দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব।

আশা করি আমার আবেদনপত্রটি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন। ইতি—

বিনীত
শ্রীদিলীপ চৌধুরী

ক্রোড়পত্র ঃ-

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, কম পরীক্ষার অভিজ্ঞান পত্রের অনুলিপি।
২। ফরোয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানির কর্তৃপক্ষের দেওয়া প্রশংশা পত্রের অনুলিপি।

কার্যকরী পরিচালক
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
ক্লাইভ বিল্ডিং
৩৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-

শ্রীদিলীপ চৌধুরী
৬৬।৩ রসা রোড ইষ্ট
কলিকাতা-৩৩

অনুশীলনী

১। দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন অনুসারে কোনও ব্যাঙ্কের হিসাব রক্ষক পদের জন্য আবেদন কর।

২। কোনও ব্যাঙ্কের কলিকাতাস্থ শাখার ম্যানেজার পদের জন্য দরখাস্ত কর।
ব্রি, বি, '৬৪

দ্র. এই পদটির জন্য কোন যোগ্যতার উল্লেখ করা হয় নাই। আবেদনকারীকে নিজেই যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। যোগ্যতাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকা বাঞ্ছনীয়ঃ

(১) শিক্ষাপ্রাপ্ত বিষয়গুলির মধ্যে ব্যাঙ্কিং ছিল কিনা ও

(২) ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে অন্যান্য বিষয়ের সহিত শাসনতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা।

৩। তুমি বি. কম পাশ করিয়াছ। তোমার বিশেষ যোগ্যতা উল্লেখ করিয়া ও সেই যোগ্যতা অনুযায়ী নিযুক্ত করিবার প্রার্থনা করিয়া কোন সওদাগরী আপিসে দরখাস্ত কর।

৪। একটি আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে একজন মুখ্য করণিক (Head Clerk) প্রয়োজন। শিক্ষা, যোগ্যতা, বয়স ও প্রত্যাশিত বেতন জানাইয়া একখানি আবেদন পত্র রচনা কর।

৫। কলিকাতার নিকটবর্তী শহরতলীর বহু পুরাতন একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন আপ্ত কারণিকের প্রয়োজন। তোমার যোগ্যতাবলী জানাইয়া আবেদন কর।

৬। একটি কেমিক্যাল কোম্পানীর উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য কয়েকজন সেলস্‌ম্যান দরকার। শর্তাদির উল্লেখ করিয়া একখানি আবেদন পত্র রচনা কর। বক্স নং ২৩১২, দৈনিক বসুমতী, কলিকাতা-১২।

৭। একটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য মুদ্রলেখনে ও সঙ্কেত লিখনে অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন। প্রার্থীর পক্ষে অবশ্যই প্রবেশিকা বা তৎ সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। যোগ্যতা ও প্রত্যাশিত বেতন ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া ১০/১২/৬৬ মধ্যে আবেদন কর। [বক্স নং ৪৪০৪, হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড। ২/১২/৬৬]

সুপারিশ ও প্রত্যয় পত্র

দ্বিতীয় স্তর

Letter of Recommendation and Credit

॥ সুপারিশ পত্র ॥

সুপারিশ পত্র দ্বিবিধ। (১) চাকরির ব্যাপারে কোন পরিচিত কর্মপ্রার্থীকে সাহায্য করতে অথবা চাকরি লাভের পথটিকে সুগম করিতে কোন পদস্থ এবং প্রভাবশালী পরিচিত ব্যক্তির কাছে সুপারিশ পত্র লিখিত হতে পারে। তবে চাকরির ব্যাপারে সুপারিশ পত্র বর্তমান কালে বে-আইনী এবং সরকারী অফিসের বহু বিজ্ঞাপনে সুপারিশ করার বিরুদ্ধে নিষেধবাণী লেখা থাকে। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে অনেকেই আজকাল সুপারিশপত্র লিখতে রাজী হন না; কারণ একটা নৈতিক বাধা দেখা দেয়। তবুও কেউ কেউ কর্মপ্রার্থীর আনুকুল্যে এক ধরণের সুপারিশ পত্র লিখে থাকেন। তবে এই জাতীয় পত্রকে সুপারিশ পত্র না বলে সাধারণ প্রশংসা পত্র বলাই সঙ্গত। সাধারণতঃ এই প্রশংসা পত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বা অন্য কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লিখে থাকেন। এই ধরণের সুপারিশ পত্র বি. কম পরীক্ষার পাঠ্যসূচী বহির্ভূত। সুতরাং এই জাতীয় সুপারিশ পত্রের কোন রূপ এখানে গ্রহণ করা হল না।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপারিশ পত্রকে বলা চলে বাণিজ্য সংক্রান্ত সুপারিশ পত্র। আদর্শ-পত্র রচনায় এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপারিশ পত্রই নির্বাচন করা হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন সুপরিচিত ব্যবসায়ীকে সাহায্য করার জন্যে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রতিপত্তিশালী এবং পরিচিত ব্যবসায়ীর কাছে সুপারিশ পত্র রচিত হয়।

বাণিজ্যিক সুপারিশ পত্রে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আছে:

এক: যে ব্যবসায়ীর স্বার্থে এই পত্র লেখা হচ্ছে, তাঁর প্রতি আন্তরিকতার প্রকাশ যেন পত্রের মধ্যে থাকে।

দুই: যে প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর কাছে এই পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে, তিনি সুপারিশকারীর সুপরিচিত।

তিন: যাঁর স্বার্থে পত্র লেখক পত্র লিখছেন, তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে পত্র মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করবেন।

চার: নৈতিকভাবে পত্র-লেখক সুপারিশ প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য পত্র-প্রাপকের কাছে দায়ী।

পাঁচ: কোন স্বার্থসিদ্ধি নয়—উপচিকীর্ষাই সুপারিশকারীর একান্ত কাম্য।

আধুনিক ব্যবসা ক্ষেত্রে সুপারিশ পত্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা চলে না। পারস্পরিক সহযোগিতা, ও সৌজন্যবোধই ব্যবসায়ীদের অগ্রসর করে দেয়। এবং এইগুলিই সুপারিশ পত্রের ভিত্তি।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ তোমার পরিচিত কোনও প্রভাবশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর কাছে তোমার পরিচিত অন্য আর এক ব্যবসায়ীকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে একখানি সুপারিশ পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৪

আল্‌ফা পাবলিশিং কনসার্ণ
[পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা]

টেলিগ্রাম: আল্‌ফা
টেলিফোন: ৩৪-২০১৮

১২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা
২১শে নভেম্বর, ১৯৬৬

স্ট্যানস্ ইঞ্জিনীয়ারিং ফিরমা (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, এ, টি, রোড,
গৌহাটি,
আসাম।

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

পত্রবাহক শ্রীস্বপন রায় কলিকাতায় বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী হিন্দ্‌ গ্যালভানাইজিং কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেডে'র কর্মাধ্যক্ষ। ইনি আমাদের বিশেষ পরিচিত ও বন্ধুস্থানীয়। তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় ছাড়াও তাঁহার প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও খ্যাতি ইঞ্জিনীয়ারিং সংক্রান্ত কার্যক্ষেত্রে যে যথেষ্ট আছে তাহা বোধহয় আপনার অজানা নাই।

উক্ত প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি একটি নূতন ধরণের মেশিন নির্মাণ করিয়াছেন। এই মেসিনের দ্বারা অতি সহজে ইলেকট্রো প্লেটিং-এর কাজ সম্পন্ন হয়। কলিকাতার বাজারে ইতিমধ্যেই এই মেসিনটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। এই মেশিনের

সর্বাপেক্ষা সুবিধা হইল এই যে, মেশিনটি আকারে ছোট ও হাল্কা হওয়ায়—ইহা অতি সহজে বসান যায় চালান, যায় এবং প্রয়োজন হইলে অতি সহজে স্থানান্তরিত করা যায়। বিদ্যুতচালিত এই মেশিনটিতে বিদ্যুৎ-খরচও হয় অতি অল্প।

আগামী সপ্তাহে শ্রী রায় তাঁহাদের কোম্পানী-উৎপাদিত মেশিনটির চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ও মেশিনটিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে গৌহাটি যাইবেন। আপনারা গৌহাটির ইঞ্জিনীয়ারিং মহলের বিশেষ প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। অনুগ্রহপূর্বক শ্রী রায়কে গৌহাটির ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য ব্যবসায়ীদের নাম ও ঠিকানা এবং সম্ভব হইলে কোন কোন ব্যবসায়ীর সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় করাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব। ইঁহারা মেশিনটির উপর যে হারে কমিশন দেন তাহা আকর্ষণীয় এবং ইহা ব্যতীত লেনদেনে সুবিধা দানের জন্যও ইঁহারা প্রস্তুত। আশা করি, আপনার সাহায্য পাইলে শ্রী রায়ের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

শ্রী রায়কে আপনারা যে সাহায্য করিবেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতিষ্ঠানকেই করিতেছেন মনে করিবেন এবং ভবিষ্যতে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য অনুরূপ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতেছি। আপনাদের প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীহারাধন বসাক
(আল্‌ফা পাবলিশিং
কনসার্ণের পক্ষে)

॥ প্রত্যয় পত্র ॥

যে কোন প্রতিষ্ঠানের নিজের স্বার্থেই প্রত্যয় পত্র লিখিত হয়। কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যখন প্রচারের উদ্দেশ্যে বা মাল বিক্রীর জন্যে কিংবা অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাপারে নিজেদের কোন প্রতিনিধিকে বিদেশ পাঠায়, তখন বিদেশের কোন পরিচিত ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীর (যার সঙ্গে পূর্ব থেকে লেনদেন আছে) কাছে বা প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রত্যয় পত্র লেখা চলে। এই জাতীয় প্রত্যয় পত্রে উক্ত প্রতিনিধিকে দু'ধরণের সাহায্য দেওয়ার অনুরোধ থাকে। (১) ব্যবসায়িক পরামর্শ দানের অনুরোধ (২) টাকা কড়ি ধার দেওয়ার অনুরোধ। অর্থের অনাদায়ে কিংবা আদায়ের মেয়াদ খেলাপ হেতু এই পত্রের ভিত্তিতে মামলাও চলতে পারে। এই সব কারণেই প্রত্যয় পত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই ধরণের পত্র রচনায় তাই সতর্কতা

অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। এই পত্রের ভাষা হবে সুস্পষ্ট ও সহজ। এই জাতীয় পত্রে নিচের বিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে লেখা থাকা প্রয়োজন :

এক : কত পরিমাণ টাকা দেওয়ার অনুরোধ জানান হচ্ছে,

দুই : এই পত্রের ভিত্তিতে কোন্ তারিখ পর্যন্ত টাকা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে,

তিন : কোন্ তারিখের মধ্যে এবং কিভাবে টাকা শোধ দেওয়া হবে, এবং

চার : যাঁর জন্যে সুপারিশ করা হলো তাঁর স্বাক্ষরের নমুনা।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ তোমার প্রতিষ্ঠানের কোন বিশেষ ব্যবসায় প্রতিনিধিকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিবার অনুরোধ করিয়া বিদেশের কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট একখানি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৫

সায়েন্টিফিক এ্যাপারেটাস এণ্ড কেমিক্যাল কোম্পানী

টেলিগ্রাফ : সায়েন্টিফিক ৬ বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৮

টেলিফোন : ৩৩-৮৯৭২ ২৮শে নভেম্বর, ১৯৬৬

ন্যাশনাল রাবার ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী,
১৩১/২ পার্লামেণ্ট ষ্ট্রীট,
নয়া দিল্লী।

সবিনয় নিবেদন,

প্রথমেই আমাদের প্রীতি-নমস্কার ও শুভ কামনা গ্রহণ করুন। আগামী কয়েক-দিনের মধ্যেই আমাদের বিশেষ ব্যবসায় প্রতিনিধি শ্রীরজত বরণ মৌলিক দিল্লী যাত্রা করিতেছেন। দিল্লীতে আমাদের উৎপন্ন সায়েন্টিফিক এ্যাপারেটাস ও কেমিক্যাল্সের চাহিদা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবার জন্য আমরা তাঁহাকে পাঠাইতেছি। দিল্লীকে কেন্দ্র করিয়া তিনি উত্তর ভারতের অনেকখানি অঞ্চল ঘোরাঘুরি করিবেন। মাসাধিককাল তাঁহাকে ঐ অঞ্চলে থাকিতে হইতে পারে।

শ্রী মৌলিক ইতিপূর্বে দিল্লী গিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ গুরু দায়িত্ব লইয়া যান নাই এবং দিল্লী তাঁহার খুব পরিচিত জায়গাও নহে। ফলে শ্রী মৌলিকের পক্ষে আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ ব্যতীত এই গুরুদায়িত্ব পালন করা অসম্ভব। আপনাদের উপদেশই হইবে তাঁহার পাথেয়। দিল্লীতে অবস্থানকালে শ্রী মৌলিকের

কিছু অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে। সেইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাকে অনুগ্রহপূর্বক দুই কিস্তিতে সর্বমোট ১০০০৲ (এক হাজার টাকা মাত্র) সাহায্য করিলে বাধিত হইব। প্রতি কিস্তিতে টাকা দিবার সময় শ্রী মৌলিকের স্বাক্ষরযুক্ত দুইখানি রসিদ লইবেন। তন্মধ্যে একখানি আমাদের নিকট পাঠাইবেন ও বাকী রসিদটি আপনাদের নিকট রাখিয়া দিবেন।

আগামী ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই পত্রের মেয়াদ কার্যকরী থাকিবে। আনুসঙ্গিক ব্যয় সমেত আপনার প্রদত্ত অর্থের পরিশোধের জন্য আমার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আমি সম্পূর্ণ দায়ী থাকিব।

এই পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর প্রদত্ত অর্থের জন্য যে আমাদের কোন প্রকার দায়িত্ব থাকিবে না, তাহাও উল্লেখযোগ্য।

আপনাদের এইরূপ সহযোগিতার জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকিবার এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ সাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

শ্রী মৌলিকের স্বাক্ষরের নমুনা পাঠাইতেছি। টাকা দিবার সময় অনুগ্রহপূর্বক মিলাইয়া লইবেন।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়
[সায়েন্টিফিক এ্যাপারেটাস
ও কেমিক্যাল্ কোম্পানীর
পক্ষে]

শ্রীরজত বরণ মৌলিকের স্বাক্ষরের
নমুনা :
শ্রীরজত বরণ মৌলিক

অনুশীলনী

১। তোমার এক ব্যবসায়ী-আত্মীয় ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য লইয়া কটক যাইতেছেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কটকস্থিত এক ব্যবসায়ী বন্ধুর নিকট একখানি সুপারিশ পত্র রচনা কর।

২। পাটনাস্থিত তোমার কোন পরিচিত ব্যবসায়ী কলিকাতাস্থিত কোন ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যবসা সম্পর্ক স্থাপনে ইচ্ছুক। উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যবসায়ী-বন্ধুর আর্থিক সামর্থ, ব্যবসায়িক সুনাম ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া একখানি সুপারিশ পত্র রচনা কর।

৩। তোমার এক বিশেষ পরিচিত ব্যবসায়ী তাঁহার ব্যবসায়ের শাখা স্থাপনের

জন্য বোম্বাই যাইতেছেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য বোম্বাইস্থিত এক পরিচিত ব্যবসায়ীর নিকট একটি পত্র রচনা কর।

৪। তোমার পণ্যের বাজার সৃষ্টি করিবার জন্য এক বিশেষ বাণিজ্যিক প্রতিনিধিকে উত্তরবঙ্গে প্রেরণ করিতেছ। তাঁহাকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া শিলিগুড়িস্থিত এক ব্যবসারী বন্ধুকে একখানি প্রত্যয় পত্র রচনা কর।

৫। তোমার এক বিশেষ পরিচিত ব্যবসায়ী বন্ধু বাণিজ্য-ব্যপদেশে মালদহে গিয়া অর্থ কষ্টে পড়িয়াছেন। তাঁহাকে কিছু পরিমাণ অর্থ ঋণ দানের জন্য মালদহস্থিত তোমার এক পরিচিত ব্যবসায়ীর নিকট একখানি প্রত্যয় পত্র রচনা কর।

তৃতীয় স্তর

যোগ্যতা অনুসন্ধান পত্র
Letter of Status Enquiries

যোগ্যতা অনুসন্ধান পত্র দ্বিবিধ : (১) কর্মপ্রার্থীর যোগ্যতা অনুসন্ধান। কর্মপ্রার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত ও কর্মগত যোগ্যতা, চারিত্রিক সততা ও বিশ্বস্ততা ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে।

(২) বাণিজ্যিক লেনদেন করতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীর অবস্থা-অনুসন্ধান। এই ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে আর্থিক সংগতি, বাণিজ্যিক সততা ও সুনাম ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই পত্র প্রাপকের তথ্যাদি সম্বলিত উত্তর প্রদানের কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা থাকে না, তবু উত্তর দান করা হয়ে থাকে, কেননা প্রত্যেক ব্যবসায়ীরই সাধারণ শিষ্টাচার, নৈতিক দায়িত্ব ও বাণিজ্যিক সৌজন্যবোধ আছে।

বাণিজ্যিক অনুসন্ধান পত্রের ছটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় :

এক : উভয় ক্ষেত্রেই পত্র লেখকের পত্রে যোগ্যতা অথবা অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামের উল্লেখ প্রয়োজন।

দুই : পত্র প্রেরণের কারণ উল্লেখ করতে হয়।

তিন : জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতে হয়।

চার : পত্রের উত্তরে প্রাপ্ত তথ্যাদি গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। সে জন্য পত্রের ওপরে বাঁ দিকে **ব্যক্তিগত ও সংগুপ্ত** (Personal and Confidential) লেখা থাকা দরকার।

পাঁচ : পত্র প্রাপককে ভবিষ্যতে অনুরূপ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়।

ছয় : কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয়।

এই ধরণের পত্রের বৈশিষ্ট্যই হল : শিষ্ট ভাষা ও অকপট সৌজন্যবোধ। এই জাতীয় পত্রের উত্তর দানের সময় সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। উত্তরগুলি যাতে স্পষ্ট ও জ্ঞানবুদ্ধি মতে সত্য হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। ভাল বা খারাপ কোন দিক থেকেই অতিরঞ্জন করা অনুচিত। যোগ্যতা অনুসন্ধান পত্রের উত্তর তিন ধরণের হতে পারে। যথা : (১) অনুকূল (২) প্রতিকূল (৩) নেতিবাচক।

। কর্মপ্রার্থীর যোগ্যতা ।।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ তোমার প্রতিষ্ঠানে কোন আবেদনকারী কর্মপ্রার্থী তাঁহার আবেদন পত্রে তাঁহার সম্পর্কে সকল জ্ঞাতব্য তথ্যাদি জানিবার জন্য এক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানাইবার অনুরোধ করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানে একখানি পত্র লিখ।

আদর্শ পত্র—৬

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেপার এণ্ড পাল্প কোং
(সর্বপ্রকার কাগজ উৎপাদক)

ব্যক্তিগত ও সংগুপ্ত

টেলিগ্রাম : পাল্প
টেলিফোন : ৫৬-৩১৯০
পত্র সংখ্যা—খ/২২০/৬৬

২০৬, বি. টি. রোড
কলিকাতা-৩৫
২৯শে নভেম্বর, ১৯৬৬

এম. এস. সাহানী এণ্ড কোং
২২, এজরা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৩

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের বর্তমান মুখ্য-গাণনিক শ্রীশ্যামল রায়চৌধুরী আমাদের প্রতিষ্ঠানে হিসাব রক্ষকের পদের জন্য প্রার্থী হইয়া আবেদন করিয়াছেন। তাঁহার আবেদন পত্রে আবেদন-সূত্র হিসাবে তিনি আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সেই অনুসারে তাঁহার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য জানাইবার জন্য আপনাদের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি। আশা করি, উপযুক্ত উত্তর দানে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিবেন।

এক : শ্রী রায়চৌধুরী কতদিন যাবৎ আপনাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ?

দুই : তাঁহার কর্মদক্ষতা, সততা ও চরিত্র সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি ?

তিন : তাঁহার বিশ্বস্ততা নির্ভরযোগ্য কিনা ?

চার : বর্তমানে তিনি মাসিক কত বেতন পান ?

পাঁচ : তিনি কি কোনদিন আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন ? যদি হইয়া থাকেন তবে তাঁহার সম্পর্কে আদালতের রায় কি ?

ছয় : বর্তমান কর্ম ত্যাগ করিবার কারণ কি ?—এই প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

আপনাদের নিকট আমরা অপরিচিত কারণ আমাদের মধ্যে ব্যবসায়গত কোন যোগাযোগ নাই। তবুও ভবিষ্যতে আপনাদের অনুরূপ উপকার করিবার সুযোগ পাইলে কৃতার্থ হইব

এই প্রসঙ্গে আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি, আপনাদের প্রদত্ত সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন করা হইবে।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীমনোজ সান্যাল
(ইস্ট ইণ্ডিয়া পেপার এণ্ড পাল্প কোং পক্ষে)

॥ যোগ্যতা অনুসন্ধান পত্রের অনুকূল উত্তর ॥

আদর্শ পত্র—৭

ব্যক্তিগত ও সংগুপ্ত

এম, এস, সাহানী এণ্ড কোং
[সর্ব প্রকার গরম কাপড় বিক্রেতা]

টেলিগ্রাম : সাহানী — ২২, এজরা ষ্ট্রীট
টেলিফোন : ২২-২৪১৩ — কলিকাতা : ৩
পত্রসংখ্যা ক/১২১/৬৬ — ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৬৬

ইস্ট ইণ্ডিয়া পেপার এণ্ড পাল্প কোং
২০৬, বি, টি, রোড
কলিকাতা : ৩৫

পূর্ব-সূত্র : খ/২২০/৬৬

সবিনয়ে নিবেদন,

প্রথমেই আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন।

আপনাদের ২৯শে নভেম্বর লিখিত পত্রের উত্তরে আমরা ধারাবাহিকভাবে নিম্নলিখিত তথ্যাদি জানাইতেছি।

এক : শ্রী রায়চৌধুরী ১৯৫৬ সালে আমাদের প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন।

দুই : তাঁহার কর্মদক্ষতা, স্বতন্তা ও চরিত্র সম্পর্কে আমাদের বিরূপ কোন অভিমত নাই।

তিন : তাঁহার বিশ্বস্ততা নির্ভরযোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি।

চার : বর্তমানে তিনি সর্বসাকুল্যে ৩৪০টাকা বেতন পান।

পাঁচ : তিনি কোন দিন আদালতে অভিযুক্ত হন নাই বলিয়াই জানি।

ছয় : আমাদের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে তাঁহার মত উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির উন্নতির সম্ভাবনা কম বলিয়াই সম্ভবত তিনি অন্যত্র কর্মপ্রার্থী হইয়াছেন।

শ্রীরায় চৌধুরী প্রতিশ্রুতিময় যুবক। তাঁহার জীবনের উন্নতি কামনা করি।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীজগদীশ সাহাণী
সত্বাধিকারী
(এম, এস, সহানী এণ্ড কোং)

॥ প্রতিকূল উত্তর ॥

আদর্শ পত্র—৮

গোপণীয়

এম, এস, সাহানী এণ্ড কোং
[সর্বপ্রকার গরম কাপড় বিক্রেতা]

টেলিগ্রাম : সাহাণী — ২২, এজরা ষ্ট্রীট,
টেলিফোন : ২২-২৪১৩ — কলিকাতা : ৩
পত্র সংখ্যা ক/১২১/৬১ — ৩ রা ডিসেম্বর, ১৯৬৬

ইস্ট ইণ্ডিয়া পেপার এণ্ড পাল্প কোং
২০৬ বি, টি রোড
কলিকাতা : ৩৫

পূর্ব সূত্র খ/২২০/৬৬

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

গত ২৯শে নভেম্বর আপনাদের লিখিত পত্রে আপনারা যে ব্যক্তির সম্বন্ধে অনু-

সন্ধান করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহার সম্পর্কে আমরা কোন সুসংবাদ দিতে পারিতেছি না।

উক্ত ভদ্রলোক মাত্র ৪ মাস কাল যাবৎ আমাদের প্রতিষ্ঠানে মুখ্য-গাণনিক পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিয়াছি এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নিয়মিত-ভাবে কার্যে উপস্থিত হন নাই। ইহা ব্যতীত মুখ্য-গাণনিকের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি দুই একটি ক্ষেত্রে এমন গুরুতর ভুল-ত্রুটি করিয়াছেন যাহাতে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। এ সম্পর্কে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াও যখন আমরা দেখিলাম যে তিনি সংশোধনের অতীত তখন তাঁহাকে কর্মচ্যুতির নোটিশ দিয়াছি।

তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে আমাদের কিছু বলিবার নাই।

আশা করি, এই পত্রখানি বিশেষ ভাবে গোপন রাখিয়া আমাদের বাধিত করিবেন।

।ন্তে। ইতি—

নিবেদক

শ্রীজগদীশ সাহানী

(এম, এস, সাহানী এণ্ড কোং পক্ষে)

যোগ্যতানুসন্ধান-পত্রের উত্তরটি যখন প্রতিকূল হয়, তখন পত্রে অনুসন্ধেয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

॥ নেতিবাচক উত্তর ॥

আদর্শ পত্র—৯

ব্যক্তিগত ও গোপনীয়

এম. এস সাহানী এণ্ড কোং

[সর্বপ্রকার গরম কাপড় বিক্রেতা]

টেলিগ্রাম : সাহানী — ২২, এজরা ষ্ট্রীট

টেলিফোন : ২২-২৪১৩ — কলিকাতা-৩

পত্র সংখ্যা ক/১২১/৬৬ — ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৬৬

ইস্ট ইণ্ডিয়া পেপার এণ্ড পাল্প কোং

২০৬, বি. টি. রোড

কলিকাতা-৩৫

পূর্ব-সূত্র খ /২২০/৬৬

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের ২৯. ১১. ৬৬ তারিখে লিখিত খ /২২০/৬৬-সংখ্যক পত্রে যাহা জানিতে চাহিয়াছেন, তাহার উত্তরে অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এ বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু জানাইতে সক্ষম নই। কারণ, শ্রী রায়চৌধুরী মাত্র ১লা নভেম্বর ১৯৬৬ তারিখ হইতে আমাদের স্থায়ী মুখ্য-গাণনিকের অসুস্থতা বশতঃ অবকাশ গ্রহণ উপলক্ষে তাঁহার বদলী হিসাবে অস্থায়ীভাবে কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। এবং আমাদের স্থায়ী কর্মচারী সুস্থ হইয়া কর্মে যোগদান করিলেই তিনি অবসর গ্রহণে বাধ্য হইবেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন কর্মচারীর, কর্মদক্ষতা সততা, বিশ্বস্ততা, চরিত্র ও আনুগত্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত গড়িয়া তোলা সম্ভব নয় বলিয়া শ্রীরায়চৌধুরী সম্পর্কে বিশেষ কিছুই তথ্য জানাইতে পারিতেছি না। তবে যে অল্প কয়দিন তিনি এখানে কাজ করিতেছেন তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই পর্যন্ত জানাইতে পারি যে, তাঁহার বিরুদ্ধে বলিবার মত আমরা কিছুই খুঁজিয়া পাই নাই।

আমাদের প্রতিষ্ঠানে তাঁহার কর্মের অস্থায়ীত্বই সম্ভবত তাঁহাকে অন্যত্র কর্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করিয়াছে।

আপনাদের অনুসন্ধানের উত্তরে যথাযথ তথ্য সরবরাহ করিতে পারিলাম না বলিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীজগদীশ সাহানী
[এম. এস. সাহানী এণ্ড কোং এর পক্ষে]

॥ বাণিজ্যিক লেনদেনে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীর অবস্থানুসন্ধান ॥

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তোমার প্রতিষ্ঠানের সহিত বাণিজ্যিক লেনদেন করিতে আগ্রহী। তাঁহার পত্রে অনুসন্ধান সূত্ররূপে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে তাঁহার অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া একখানি পত্র লিখ।

আদর্শ পত্র—১০

ব্যক্তিগত ও সংগুপ্ত

বসনালয় (প্রাঃ) লিমিটেড
(প্রসিদ্ধ বস্ত্র বিক্রেতা)

টেলিগ্রাম : বসন
টেলিফোন : ৩৪-৭৮০৩
পত্র সংখ্যা ছ/৩২১/৬৬

৩২/১ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
২৩শে নভেম্বর, ১৯৬৬

মডার্ণ ট্রেডার্স
২৯/৩ রাসবিহারী এভিন্যু
কলিকাতা-২৯

সবিনয়ে নিবেদন,

প্রথমেই আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন।

খড়্গপুর গোল মার্কেটে অবস্থিত 'পদ্মা স্টোরস্' নামক প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি আমাদের প্রতিষ্ঠানের সহিত বাণিজ্যিক লেনদেনের আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পত্রালাপ শুরু করিয়াছেন। তাঁহারা পরিচয় সূত্র হিসাবে আপনাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

আপনাদের সহিত আমাদের কোনরূপ পরিচয় নাই। কিন্তু আমরা ব্যবসা-জগতে পরস্পরের অপরিচিত নহি। তাই উক্ত প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সেই সঙ্গে আপনাদের মূল্যবান মতামত পত্রোত্তরে জানাইতে অনুরোধ করিতেছি।

এক : উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত আপনাদের বাণিজ্যিক লেনদেন আছে কিনা থাকিলে তাহা কতদিনের ?

দুই : উক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সঙ্গতি কতখানি ?

তিন : বাজারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুনাম আছে কিনা ?

চার : বাণিজ্যিক লেনদেনের ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত কিনা ?

পাঁচ : প্রতিষ্ঠানটিকে একত্রে ১৫০০৲ টাকার বস্ত্রাদি সরবরাহ করা নিরাপদ কিনা ?

ইহা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, আপনাদের প্রেরিত তথ্যাদি এবং আপনাদের অভিমত সম্পূর্ণভাবে সংগুপ্ত রাখা হইবে এবং ভবিষ্যতে আপনাদের পক্ষ হইতে অনুরূপ অনুরোধ আসিলে আমরা তাহা রক্ষা করিব—এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

এ সম্পর্কে আপনাদের মতামত না জানা পর্যন্ত কোন রূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে

পারিতেছি না বলিয়া আপনাদের উত্তরের আশায় উদ্বিগ্ন রহিলাম। আশা করি, উত্তর দানে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিবেন।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি। ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক

শ্রীপঞ্চানন বসু

[বসনালয় (প্রাঃ) লিমিটেডের পক্ষে]

॥ অনুকূল উত্তর ॥

আদর্শ পত্র—১১

মডার্ন ট্রেডার্স

[অভিজাত বস্ত্রবিক্রেতা]

টেলিগ্রাম : মর্ণ
টেলিফোন : ৪৫-২৩৮৫
পত্রসংখ্যা প/৩০০২/৬৬

১৯৩ রাসবিহারী এভিন্যু
কলিকাতা : ২৯
২৮শে নভেম্বর, ১৯৬৬

বসনালয় (প্রাঃ) লিমিটেড
৩২/১ কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা : ১২

পূর্ব-সূত্র চ/৩২১/৬৬

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের ২৩শে নভেম্বর '৬৬ তারিখের চ। ৩২১।৬৬ সংখ্যক পত্র আমরা নির্দ্ধারিত সময়ে পাইয়াছি। এই বিষয়ে আপনাদের সানন্দে নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য জানাইতেছি।

এক—উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দীর্ঘ নয় বৎসরের। এই সম্পর্ক উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হইতেছে।

দুই—উক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল। এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা দিন দিন সম্প্রসারিত হইতেছে।

তিন—অত্যন্ত সুনামের সহিত এই প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসা চালাইতেছে।

চার—বাণিজ্যিক লেনদেনের ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত নিয়মিত।

পাঁচ—ইঁহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল বলিয়া জানি, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠানকে এক সঙ্গে কত টাকার মাল দেওয়া নিরাপদ তাহা আমাদের

পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আপনারা নিজস্ব দায়িত্বে কত খানি দিতে পারেন, তাহা আপনাদের বিবেচ্য।

আপনাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথাসম্ভব প্রেরণ করিলাম। আশা করি, আমাদের প্রেরিত তথ্যাদি আপনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হইবে। আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীরাধিকারমন দত্ত
[মডার্ণ ট্রেডার্সের পক্ষে]

॥ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে লিখিত যোগ্যতানুসন্ধান পত্র ॥

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কে ধার চাহিয়াছেন ও তাঁহার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে পরিচয় জানিবার জন্য তোমার নাম করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক এবিষয়ে তোমার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন। তুমি এবিষয়ে যথোপযুক্ত উত্তর লিখ।

[বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (ত্রৈ-বার্ষিক) '৬২]

আদর্শ পত্র—১২

গ্রাম : ওরিয়েণ্ট ওরিয়েণ্ট এণ্টারপ্রাইজ
ফোন : ৪৪-৩২২২ ৬১এ ওয়েলিংটন স্কয়ার
পত্র সংখ্যা—ও।১২১।৬৬ কলিকাতা : ১২ তারিখ ২৬.১১.৬৬

ক্যালক্যাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
প্রধান কার্যালয়
কলিকাতা : ১

পূর্বসূত্র সি. সি. বি।৬৫৪।৬৬

সবিনয় নিবেদন,

উল্লিখিত পূর্বসূত্র অনুসারে আপনাকে জানাইতেছি যে, আবেদনকারী শ্রীঅপূর্ব কৃষ্ণ মজুমদার আমাদের প্রতিবেশী প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স'এর একমাত্র স্বত্বাধিকারী।

সম্ভবত শ্রীমজুমদার তাঁহার প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের জন্যই আপনাদের ব্যাঙ্ক

হইতে ধার চাহিয়াছেন এবং সেই আবেদনের যৌক্তিকতা হিসাবে আপনাদের নিকট তাঁহার সম্পত্তির মোট মূল্যও দাখিল করিয়াছেন।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্যাদি বাদ দিয়া এসম্পর্কে আমাদের অভিমত হইল এই যে, ব্যক্তিগতভাবে শ্রীমজুমদার এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স'এর বাজারে যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে বলিয়াই জানি। তাহা ব্যতীত দীর্ঘকালের প্রতিবেশী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমাদের এমন কোন অভিজ্ঞতা হয় নাই, যাহাতে বলিতে পারি যে, আর্থিক ব্যাপারে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সহিত জড়িত হইতে হইয়াছে। সুতরাং আপনাদের ব্যাঙ্ক হইতে তাঁহার ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

পরিশেষে, বক্তব্য এই যে শ্রীমজুমদার ও তাঁহার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের প্রেরিত তথ্যাদি গোপন রাখিবেন।

আপনার ব্যাঙ্কের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক

শ্রীসুনীল রঞ্জন ভদ্র

[ওরিয়েণ্ট এণ্টারপ্রাইজের পক্ষে]

অনুশীলনী

১। কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কে ধার চাহিয়াছেন ও তাহার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে পরিচয় জানিবার জন্য তোমার নাম করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক এবিষয়ে তোমার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন। তুমি এই বিষয়ে যথোপযুক্ত উত্তর লিখ।

[ব. বি. ত্রৈ-বার্ষিক '৬২]

২। তোমার প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য আবেদনকারী জনৈক ব্যক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার বর্তমান নিয়োগকর্তার নিকট একখানি পত্র লেখ।

৩। তোমার প্রতিষ্ঠানের জনৈক পূর্বতন কর্মচারীর যোগ্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া অন্য একটি প্রতিষ্ঠান হইতে তোমার নিকট একটি পত্র পৌছিয়াছে। অনুকূল, প্রতিকূল ও নেতিবাচক—এই তিন ধরণের উত্তর দিয়া যথাক্রমে তিনখানি পত্র রচনা কর।

৪। তোমার প্রতিষ্ঠানের সহিত অর্থ-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চুক্তি সম্পাদনে আগ্রহী অন্য একটি প্রতিষ্ঠান যে ব্যাঙ্কের সহিত লেনদেন করে, সেই ব্যাঙ্কের

সহিত তোমার প্রতিষ্ঠান বহুকাল ধরিয়া যুক্ত। আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া তোমার ব্যাঙ্কের নিকট একটি পত্র লেখ।

৫। কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাহার ভাবী ক্রেতাব্যবসায়ী সম্বন্ধে যোগ্যতা অনুসন্ধান করিয়া তোমার প্রতিষ্ঠানে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার উত্তরে একটি প্রতিকূল পত্র রচনা কর।

৬। তোমার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নূতন ব্যবসায়-সম্পর্ক স্থাপনে ইচ্ছুক অন্য একটি প্রতিষ্ঠান ধারে মাল পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছে, কিন্তু পত্রে কোন পরিচয়-সূত্র উল্লিখিত হয় নাই। এইরূপ পত্রের উত্তরে একটি পত্র রচনা কর।

চতুর্থ স্তর

প্রচার পত্র
Circular Letter

প্রচার করার উদ্দেশ্যেই প্রচার পত্র লিখিত হয়, একথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না; কারণ নামকরণের মধ্যেই এই জাতীয় পত্ররচনার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিস্তৃতভাবে বলা চলে—কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কিছু সম্পর্কে বিশেষ পরিচয় ক্রেতা-সাধারণের কাছে বা জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যেই এই প্রচার পত্র লিখিত হয়। প্রচার পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য দুটো :

এক—সংবাদ পরিবেশন ;

দুই—চাহিদা সৃষ্টি ও চাহিদা বৃদ্ধি ;

সংবাদ পরিবেশনের উদ্দেশ্যে রচিত প্রচার পত্র : নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, নতুন শাখা প্রতিষ্ঠা, ব্যবসার স্থান পরিবর্তন, অংশীদার আহ্বান, একাধিক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মিলন, একই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একাধিক ভাগে বিভক্ত, দায়িত্বশীল কর্মচারীর পদাবনতি বা পদচ্যুতি, মূল্যবৃদ্ধি বা মূল্যহ্রাস, ব্যবসা ক্রয় বা বিক্রয়।

চাহিদা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রচিত প্রচার পত্র : নতুন পণ্যের আমদানি বা উৎপাদন, পুরোনো পণ্যের উৎকর্ষ সাধন, প্রচলিত পণ্যের নতুন চাহিদা সৃষ্টি ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, দুটি উদ্দেশ্যের যেটিকে সামনে রেখেই প্রচার পত্র রচিত হোক না কেন, প্রচার পত্রের কয়েকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। যথা :

এক—প্রচার সাধারণভাবে অথবা বিশেষভাবে লিখিত হতে পারে।

দুই—সকল প্রচার পত্রের জন্য চাই বাক-চাতুর্য যা ক্রেতার হৃদয়কে সহজেই প্রভাবিত করে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সক্ষম হবে।

তিন—প্রচার পত্রে কোথাও যেন আত্মম্ভরিতা বা দম্ভপ্রকাশ না পায়, কারণ তাতে অন্যের মনে আঘাত লাগতে পারে।

চার—নিজের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন নয় এমন ক্রেতার সামনে তাঁর স্বার্থ তুলে ধরে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করাও প্রচার পত্রের উদ্দেশ্য। এর জন্য চাই গণমনস্তত্ত্বে (Mass Psychology) নিপুণতা।

পাঁচ—প্রচার পত্রের অন্যতম গুণ হল সৌজন্যবোধ।

ছাপানো বা সাইক্লোস্টাইল করা বক্তব্য পত্রাকারে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের

কাছে পাঠানো হয়ে থাকে। কিংবা 'হ্যাণ্ডবিল'(Handbill) আকারে ছাপিয়েও বিতরণ করা হয়। আবার কখনও কখনও সংবাদ পত্রের মাধ্যমেও তা প্রচার করা হয়।

॥ নতুন শাখা স্থাপন ॥

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ তোমার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একটি নতুন শাখা স্থাপন করিয়াছে। জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণকারী একখানি প্রচার পত্র রচনা কর।

পত্র—১৩

রেমণ্ড উলেন মিল্‌স্ কোং (প্রাঃ) লিঃ

[প্রখ্যাত উল বস্ত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা]

টেলিগ্রাম : রেমণ্ড
টেলিফোন : ২৩-২৯৬৬

১৬, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৮
২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬

সবিনয়ে নিবেদন,

প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া আমাদের মিলে উৎপন্ন উল-বস্ত্রাদি আপনাদের প্রয়োজনই শুধু মিটায় নাই, আপনাদের রুচি সম্মতও হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। দিন দিন আমাদের উৎপন্ন বস্ত্রাদির অত্যধিক জনপ্রিয়তা হেতু উহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা ভিন্ন ইহা সম্ভবপর হইত না। তাই আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি যে, দ্রুত চাহিদাবৃদ্ধির জন্য এখন আর ১৬নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে অবস্থিত আমাদের একমাত্র বিক্রয়কেন্দ্রে সুষ্ঠভাবে ক্রয়-বিক্রয় পরিচালনা করা সম্ভব হইতেছে না বলিয়া আমরা ৪৯নং রসা রোডে একটি নতুন শাখা স্থাপন করিতেছি।

আমাদের নবস্থাপিত শাখাটি টালিগঞ্জ রেল ব্রিজের নিকট অবস্থিত। দক্ষিণ কলিকাতার এই সুসজ্জিত শাখা বিক্রয় কেন্দ্রটি নিঃসন্দেহে দক্ষিণ কলিকাতার ক্রেতা-সাধারণের উপকারে আসিবে। পুরাতন কেন্দ্রে স্থানাভাব হেতু ক্রেতাগণের উপযুক্ত আপ্যায়ন করার ব্যবস্থা ও তাঁহাদের নির্দেশ ও নির্বাচনের পূর্ণ মর্য্যাদা দান করার অবকাশ আমরা পাই নাই, কিন্তু নতুন কেন্দ্রে আমরা সেই সুযোগ লাভ করিব, ইহা আমাদের পরম আনন্দের কারণ। ইহা ব্যতীত, আমাদের নূতন কেন্দ্রটি সুশৃঙ্খল ভাবে সজ্জিত, উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ক্রেতাসাধারণ বিনা পরিশ্রমে আপন ক্রয়পর্ব সমাধা করিতে পারিবেন এবং

তাহাদের সেবা করিবার জন্য আমাদের দক্ষ বিক্রয়কারীরা সর্বদাই প্রস্তুত। আমরা আশা করি, এই নব ব্যবস্থাদির ফলে আমাদের নতুন কেন্দ্রটি ক্রেতা সাধারণের নিকট আকর্ষণীয় হইয়া উঠিবে।

আগামী ২৬শে জানুয়ারী ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীকেশব চন্দ্র বসু মহাশয় এই বিক্রয় কেন্দ্রটির উদ্বোধন করিবেন।

আশা করি, এই সংবাদ আপনাদের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হইবে। অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনারা আমাদের নতুন বিক্রয়কেন্দ্রে শুভাগমন করিয়া বাধিত করিবেন। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে আপনাদের সেবা করিবার ও চিত্তরঞ্জন করিবার সুযোগ পাইলে নিজেদের ধন্য মনে করিব।

নমস্কারান্তে। ইতি—

বিনীত নিবেদক

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

[রেমণ্ড উলেন মিল্‌স্ কোং (প্রাঃ) লিঃ]

[**বি. দ্র.**—হ্যাণ্ডবিল আকারে অথবা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন আকারে প্রচারিত প্রচার পত্র সম্পর্কে জনসাধারণ খুব বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন না বলে ব্যবসায় জগতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পত্রাকারে তা পাঠিয়ে থাকেন। ওপরের আদর্শ পত্রটিকে পত্রাকারে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে, অন্তর্বর্তী ঠিকানা হিসাবে প্রাপক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামটি লিখে দিতে হয়।]

॥ নিয়মিত ক্রেতৃবৃন্দের অবহিতকরণ ॥

প্রশ্ন ।। ১০ ।। তোমার প্রতিষ্ঠানের নবীকৃত মজুত মাল সম্পর্কে নিয়মিত ক্রেতৃবৃন্দের অবহিত-করণের জন্য একটি ক্রমিক পত্র (Follow up Letters) রচনা কর।

আদর্শ পত্র—১৪

মডার্ন ইণ্ডিয়া পাবলিসার্স

[বিদেশী পুস্তকের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান]

গ্রাম : ইণ্ডিপাব

ফোন : ৩১-৩০০১

৫৭সি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

অধ্যাপক শ্রীধনঞ্জয় দস্তরায়

এম. এ., পি. আর. এস.

শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ

মহাশয়,

অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, মাত্র এক সপ্তাহ হইল আমরা বিদেশ হইতে অতি অল্প দিন হইল প্রকাশিত বিভিন্ন ধরণের পুস্তক আমদানি করিয়াছি। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা-সঙ্কটের ফলে পুস্তক আমদানি করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা সীমিত সংখ্যায় কিছু দুর্লভ পুস্তক আনিয়াছি।

আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের সহিত বহুদিন ধরিয়া পরিচিত। এবং আপনি নিয়মিত ক্রেতা বলিয়া এই সকল প্রয়োজনীয় অথচ দুর্লভ পুস্তকগুলি নিঃশেষিত হইবার পূর্বেই আপনাকে অবহিত করা আমাদের কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। এই পত্রের সহিত সদ্য-প্রকাশিত বিদেশী গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা সংযোজিত হইল। মাল নিঃশেষিত হইবার পূর্বেই আপনার প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহ করিবার দ্রুত নির্দেশ পাঠাইলে অনুগৃহীত হইব। ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক

শ্রীকমলাপতি বর্দ্ধন

ম্যানেজার

মডার্ন ইণ্ডিয়া পাবলিসার্স

ক্রোড়পত্র : একটি

।। নূতন অংশীদার গ্রহণ ।।

প্রশ্ন ।। ১১ ।। তোমার কারবারে মূলধন বাড়াইবে। সেই উদ্দেশ্যে নূতন অংশীদার আহ্বান করিয়া একটি প্রচার পত্র রচনা কর।

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (ত্রৈ-বার্ষিক) '৬৪]

আদর্শ পত্র—১৫

স্ট্যাণ্ডার্ড ফারমাসিউটিক্যালস্ কোং

[ঔষধ প্রস্তুতকারক]

গ্রাম : স্ট্যাণ্ডার্ড

ফোন : ২২-৩৮৯৬

৬১, ডালহৌসি স্কয়ার ইষ্ট

কলিকাতা-১

২রা ডিসেম্বর, ১৯৬৬

সবিনয় নিবেদন,

ভারতীয় ঔষধ প্রস্তুতকারক জগতে স্ট্যাণ্ডার্ড ফারমাসিউটিক্যাল্‌স্ একটি বিশিষ্ট নাম। দেশ স্বাধীন হইবার পরে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠান অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে। ক্রমশই এই প্রতিষ্ঠানের ঔষধগুলির চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার বর্তমান পুঁজির পরিমাণ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

যখন এই প্রতিষ্ঠান ঔষধ প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া স্থাপিত হইয়াছিল, তখন পুঁজির পরিমাণ ছিল নিতান্তই সামান্য। এই প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া স্বল্প পুঁজিতে এই প্রতিষ্ঠানের কারবার সুষ্ঠুভাবে চালান সম্ভব হইতেছে না। এই প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের জন্য অতিরিক্ত মূলধন লওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান পাঁচ জন অংশীদার লইয়া গঠিত একটি অংশীদারী কারবার। ইহাতে আরও একজন অংশীদার গ্রহণ করা হইবে। অংশীদারকে ১৫ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। অংশীদারী কারবার আইনের দ্বারা যাবতীয় চুক্তি সম্পাদিত হইবে।

ঔষধ প্রস্তুতকারক এই প্রতিষ্ঠানটিতে অর্থ বিনিয়োগ লাভজনক কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য বিনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক উৎসাহী ব্যক্তিদের আহ্বান করা যাইতেছে। অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে জানিবার জন্য তাঁহাদের এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় অফিসের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীঅমিয়কান্তি দত্ত
শ্রীপরাশর চৌধুরী
শ্রীআদিত্য দেবরায়

॥ অংশীদারের অবসর গ্রহণ ॥

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ তোমার অংশীদারী কারবার হইতে একজন অংশীদার অবসর গ্রহণ করিতেছেন। ইহা জানাইয়া একটি প্রচার পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—১৬

বসু এণ্ড দাস কোং
[প্রসিদ্ধ রং ব্যবসায়ী]

গ্রাম : বসকো
ফোন : ৪৪-৮৮৬১

৬৮এ গণেশ এভিনিউ
কলিকাতা-১৩
১লা জানুয়ারী, ১৯৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ও সুযোগ্য অংশীদার শ্রীভৈরব চন্দ্র বসু মহাশয়ের মৃত্যুর ফলে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ এই ব্যবসায়ের সহিত ভবিষ্যতে যুক্ত থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, আজ ১লা জানুয়ারী হইতে আমি নিম্নস্বাক্ষরকারীই এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র স্বত্বাধিকারী হিসাবে পরিগণিত হইলাম এবং ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় দায়িত্ব আমার উপরেই সম্পূর্ণরূপে বর্তাইল।

এই নূতন ব্যবস্থার ফলে আমাদের এই প্রাচীন কারবারের নীতি, প্রকৃতি, ঠিকানা ইত্যাদির কোন পরিবর্তন হইল না বটে, কিন্তু নামের পরিবর্তন করা হইল। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি **'দাস পেণ্টস্ কোম্পানী'** নামে পরিচিত হইবে।

এতদিন ধরিয়া পুরাতন প্রতিষ্ঠানটি যেরকম বিশ্বাসের সহিত আপনাদের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছে, আশা করি, বর্তমানেও প্রতিষ্ঠানটি সেইরূপভাবেই ক্রেতা-সাধারণের সেবা করিয়া ধন্য হইবে।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীবিজনবিহারী দাস
স্বত্বাধিকারী
(বর্তমান) দাস পেণ্টস্ কোম্পানী

॥ ব্যবসার সংযুক্তিকরণ ॥

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ সমব্যবসায়ী দুইটি প্রতিষ্ঠান একত্র সংযুক্ত হইবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে। সংযুক্তিকরণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ক্রেতাগণের উদ্দেশ্যে একখানি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—১৭

মান্না, লাহা এণ্ড কোং
[হোসিয়ারী দ্রব্য বিক্রেতা]

গ্রাম : মালা
ফোন : ৩৪-৯৬০:

২৭ সি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪
১২ই জানুয়ারী, ১৯৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

মান্না এণ্ড কোং এবং লাহা এণ্ড কোং—এই দুইটি প্রতিষ্ঠান ক্রেতাদিগের নিকট বহুদিন ধরিয়া পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরিয়া এই দুইটি প্রতিষ্ঠান ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় হোসিয়ারী দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। আমরা উভয় প্রতিষ্ঠানই এইজন্য আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭ সাল হইতে উপরোক্ত আমাদের দুইটি প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। এতদিন পর্যন্ত এই দুইটি প্রতিষ্ঠান ছিল একক মালিকানায় পরিচালিত, কিন্তু উক্ত তারিখ হইতে এই দুইটি প্রতিষ্ঠান যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইতেছে। এই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তিত হইয়া হইবে মান্না, লাহা এণ্ড কোং। ইহাতে কারবারের প্রকৃতি, নীতি ও ঠিকানার কোন পরিবর্তন হইবে না।

উপরোক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠান পূর্বে যেভাবে আপনাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা লাভ করিয়াছে, এই যৌথ প্রতিষ্ঠান নিশ্চয়ই তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে না।

আমরা আশা করি, উক্ত তারিখ হইতে আপনাদের যাবতীয় অর্ডার আমাদের যৌথ প্রতিষ্ঠানের নামে প্রেরণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিবেন। নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীসুরজিৎ মান্না
[মান্না এণ্ড কোংএর পক্ষে]
শ্রীকুলদারঞ্জন লাহা
[লাহা এণ্ড কোং এর পক্ষে]

॥ মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব ॥

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ সম্প্রতি মুদ্রামূল্য হ্রাসের জন্য ও কর বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে; পূর্ব মূল্য আর বজায় রাখা সম্ভব হইতেছে না।

স্নতরাং পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ক্রেতাসাধারণের নিকট একখানি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—১৮

রোহিত কটন মিল্‌স্ (প্রাঃ) লিঃ

গ্রাম : রোহিত
ফোন : ২২-৬১১২-৬
(পাঁচটি লাইন)

প্রধান কার্যালয়
৬, ব্রেবোর্ণ রোড
কলিকাতা-১
৫ই জানুয়ারী, ১৯৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

মিল বস্ত্রের বাজারে আমাদের মিলের কাপড়ের স্নুনাম দীর্ঘদিনের। ... আমাদের মিলে প্রস্তুত কাপড়ের বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার অতুলনীয় উৎকর্ষ ও মূল্যের অল্পতা। এতদিন নানা ধরণের অস্নবিধা থাকা সত্ত্বেও আমরা এই উভয় বৈশিষ্ট্যই বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে এই দুই ধরণের বৈশিষ্ট্যই একত্রে বজায় রাখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

আপনারা জানেন, বর্তমান বৎসরে সরকার মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে পরোক্ষ করও বৃদ্ধি করিয়াছেন। পরিকল্পিত অর্থনীতির সফলতার জন্য সরকারকে এই উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে বলিয়াই আমরা ইহার যৌক্তিকতা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু ইহাতে যে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে—তাহাও স্বীকার্য।

অনুরূপ কারণে আমাদের মিলের কাপড়ের উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইতেছে। সূতার মূল্যই শুধু বৃদ্ধি পায় নাই, শ্রমিকদের মজুরির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য ব্যয়ও সমান অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় পূর্ব-মূল্য ও পূর্ব-মান আর আমাদের পক্ষে বজায় রাখা সম্ভব হইতেছে না। এখন আমাদের সম্মুখে দুইটি পথ খোলা আছে—হয় আমাদের কাপড়ের উৎকর্ষতার মান নামাইয়া দিতে হইবে, নয় পূর্বমূল্য বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন ব্যয়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু প্রথম পথটি গ্রহণ করিলে আমাদের বহু ক্রেতার যে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা আমরা প্রতিদিন পাইয়াছি তাহা হারাইতে বাধ্য হইব। অথচ এই শুভেচ্ছা ও সহযোগিতাই আমাদের ব্যবসায়ের মূলধন। স্নতরাং এ পথ আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব।

আপনারাও নিশ্চয়ই কাপড়ের মানের অবনমনে রাজী হইবেন না। তাই আমরা

বাধ্য হইয়াই অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের মিলে প্রস্তুত কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত লইয়াছি। যখন দেশের সমস্ত পণ্যেরই মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন আপনাদের মনে হইবে যে ইহাতে জীবনযাত্রায় সঙ্কট সৃষ্টি হইবে। সেই কথা চিন্তা করিয়াই আমরা সামান্য মাত্র মূল্য বৃদ্ধি করিতেছি।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা আমাদের এই সিদ্ধান্তের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন যাহাতে আপনাদের সেবায় আমরা বঞ্চিত না হই।

বিনীত নিবেদক
শ্রীসুরঞ্জন ঘোষাল
[রোহিত কটন্ মিলস্ (প্রাঃ) লিঃ পক্ষে]

অনুশীলনী

১। তোমার কারবারে মূলধন বাড়াইবে। সেই উদ্দেশ্যে নূতন অংশীদার আহ্বান করিয়া একটি প্রচার পত্র রচনা কর। [ক. বি. ত্রৈ-বার্ষিক '৬৪]

২। আধুনিক জীবনের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তুমি একটি বিশেষ ধরণের পণ্য উৎপাদন করিয়াছ। জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ও তাহাদের সহযোগিতা কামনা করিয়া একটি প্রচার পত্র রচনা কর।

৩। তোমার প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি হেতু ভারতের দুইটি রাজ্যে দুইটি শাখা বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করিবার সংকল্প করিয়াছ। ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একটি প্রচার পত্র রচনা কর।

৪। জায়গার অল্পতার জন্য তুমি তোমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে পূর্বস্থান হইতে একটি প্রশস্ত জায়গায় স্থানান্তরিত করিতে মনস্থ করিয়াছ। ক্রেতাসাধারণকে এই স্থান পরিবর্তনের সংবাদ জানাইয়া একখানি প্রচার পত্র রচনা কর।

৫। বহুদিনের পুরাতন অংশীদারী প্রতিষ্ঠান এখন হইতে পৃথক পৃথক্‌ভাবে ব্যবসা পরিচালনা করিবে। এ বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একখানি প্রচার পত্র রচনা কর।

৬। পরস্পর প্রতিযোগী দুইটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত হইয়া একটি প্রতিষ্ঠান রূপে ব্যবসা পরিচালনার সিদ্ধান্ত লইয়াছে। উক্ত সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারপত্র রচনা কর।

৭। তোমার পুরাতন বিক্রয় কেন্দ্রটির সংস্কার করিয়া আধুনিক সকল সুবিধা-প্রদানের আয়োজন করিয়াছ। ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে এবিষয়ে একখানি প্রচারপত্র রচনা কর।

পঞ্চম স্তর

বিক্রয় প্রস্তাব, মূল্য-জিজ্ঞাসা, মূল্য-জ্ঞাপন ও অর্ডার সংক্রান্ত পত্র

Letters relating to Offers & Quotations

॥ বিক্রয় প্রস্তাব ॥

বিক্রয় প্রস্তাব, মূল্য-জিজ্ঞাসা, মূল্য-জ্ঞাপন ও অর্ডার সংক্রান্ত পত্রগুলি অনেকাংশে প্রচার পত্রের ন্যায়। প্রচার পত্রেরও যে উদ্দেশ্য, এই পত্রগুলিরও অনেকটা সেই উদ্দেশ্যে। এই পত্রগুলির চারটি পর্যায় আছে।

এক—বিক্রেতা বা উৎপাদক বা আমদানীকারক পণ্য বিক্রয়ের [illegible] বিক্রয় প্রস্তাব বিষয়ক প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারেন।

দুই—এই পত্রের উত্তরে ক্রেতাসাধারণ পণ্যের উৎকর্ষে আকৃষ্ট হয়ে পণ্যের মূল্য জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

তিন—প্রশ্নবাহী এই পত্রটি পাওয়ার পর উৎপাদক বা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান এই প্রশ্নের উত্তরে মূল্য জ্ঞাপন করতে পারেন। এবং

চার—ক্রেতা পণ্য ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়ে অর্ডার সংক্রান্ত পত্র প্রেরণ করতে পারেন।

বাজার যখন তেজী থাকে তখন অনেক সময় বিক্রেতাকে এসম্পর্কে মাথা ঘামাতে হয় না। কিন্তু বাজারের অবস্থা যদি মন্দা থাকে, তা হলে, বিক্রেতাই সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে পণ্যের বিক্রয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই ধরণের পত্রে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উল্লেখ থাকে :

(১) বিক্রেয় পণ্যের বিবরণ ;

(২) বিশেষ উপযোগিতা ;

(৩) মূল্য ;

(৪) বাক্সে প্রেরণের ব্যয় ও মাশুল ;

(৫) অন্য কোন সর্ত থাকলে তার উল্লেখ ;

এবং (৬) বিক্রেয় পণ্যের প্রয়োজন মত পরিবর্তন ও মেরামত ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ ব্রিটেনের একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কারবারের উদ্দেশ্যে তোমার অভিপ্রায় ও সামর্থ্য জানাইয়া একটি পত্র লিখ।

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় '৫৭]

মুখার্জী পাবলিশিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

আদর্শ পত্র—১৯

গ্রাম : মুখার্জী

ফোন : ৩৪-৩১০৬

কর্মাধ্যক্ষ

নিউম্যান পাবলিশিং কোং

৩০, রেডফোর্ড স্কয়ার

লণ্ডন

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনারা বোধহয় অবগত আছেন যে, আমরা কলিকাতায় দীর্ঘকাল যাবৎ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রয় ব্যবসায় লিপ্ত আছি। পুস্তক প্রকাশক হিসাবে আমাদের সুনাম শুধু মাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নহে, সমগ্র ভারতে আজ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এতদিন আমরা শুধু আমাদের প্রকাশিত পুস্তকেরই বিক্রয় ব্যবস্থা করিয়াছি। অন্য কোন প্রকাশকের বই আমরা রাখিতাম না। কিন্তু আমাদের বহু ক্রেতার অনুরোধ এই যে বিদেশী পুস্তকাদির বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া আমরা যেন তাঁহাদের বিদেশী বই সংগ্রহের অসুবিধা দূর করি। পুরাতন ক্রেতাদের এই অনুরোধ আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। তাই আমরা স্থির করিয়াছি ব্রিটেন ও আমেরিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুস্তক প্রকাশকদের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিব। ইহাতে আমাদের দেশের বহু ক্রেতা প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা লাভ করিবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য যে, আপনাদের প্রকাশিত অনেকগুলি বই-এর চাহিদা এদেশে অত্যন্ত বেশী থাকায় আপনাদের পুস্তক ব্যবসায়ের ব্যাপক প্রসার ঘটিবে। আমরা আপনাদের প্রতিনিধি রূপে কলিকাতা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে কাজ করিতে ইচ্ছুক।

ব্রিটেনের সহিত ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান আমাদের আছে। গত জানুয়ারী মাসে আমরা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এই মর্মে একটি আদেশ পত্র সংগ্রহ করিয়াছি। এবং কলিকাতায় শাখা আছে, ব্রিটেনের এমন কোন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আমরা টাকাকড়ি লেনদেন করিতেও সক্ষম।

প্রথমোক্তভাবে কারবার করিতে হইলে জামিন হিসাবে কত টাকা আপনাদের নিকট জমা রাখিতে হইবে এবং বিক্রয় বাবদ আপনারা কিরূপ বাটা (কমিশন) দিতে পারেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাঠাইলে অনুগৃহীত হইব। এইরূপ কারবারদাজী বা

বা এজেন্সি দেওয়া না হইলে ব্যবসাদার পাইকারী ক্রেতাদের আপনারা কি দরে বিভিন্ন পুস্তক বেচিয়া থাকেন, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে জানাইবেন। এইসঙ্গে ব্যবসার অন্যান্য সর্তের সহিত ফরমাস (অর্ডার) পাওয়ার পর মাল পাঠাইতে আপনাদের মোটামুটি কতদিন লাগিবে এবং দাম কিভাবে পরিশোধ করিতে হইবে, তাহাও জানাইয়া দিবেন।

আমাদের ব্যবসায়িক সুনাম সম্পর্কে আপনারা ইচ্ছা করিলে কলিকাতা ৫নং নেতাজী সুভাষ রোডস্থিত ন্যাশন্যাল এণ্ড গ্রীনলেজ ব্যাঙ্কের নিকট অনুসন্ধান করিতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে গত দশ বৎসর যাবৎ এই ব্যাঙ্ক আমাদের কারবারের নামে একটি চলতি আমানত চালু আছে। আমাদের কারবারে বর্তমানে ২ লক্ষ টাকার বেশী খাটিতেছে।

আমাদের প্রয়োজন জরুরী, সেইজন্য বিস্তারিত উত্তর আশা করিতেছি।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

মুখার্জী পাবলিশিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ তোমার প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি 'মেঘদূত' মটর সাইকেল উৎপাদন করিতেছে। ইহা গুণে বিদেশ হইতে আমদানী করা মটর সাইকেলের সহিত তুলনীয় অথচ দামে সস্তা। বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধাদানের সর্ত উল্লেখ করিয়া ক্রেতাদের নিকট একখানি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—২০

নিউ ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকর্চাস্ (প্রাঃ) লিঃ

[সাইকেল ও মটর সাইকেল উৎপাদক ও বিক্রেতা]

গ্রাম: নিউইড

ফোন: ২৬-৩৪০২

১৬১, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১৩

২০ ডিসেম্বর, ১৯৬৬

ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেডিং কোং

গোলবাজার

খড়্গাপুর

সবিনয়ে নিবেদন,

প্রথমেই আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন।

একটি শুভ সংবাদ প্রদানের জন্যই আজ এই পত্রের অবতারণা। স্বাধীন ভারত ক্রমেই কৃষি ও শিল্পে অগ্রসর হইতেছে। স্বয়ং সম্পূর্ণতার লক্ষ্যে পৌছান আর তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। দ্রুতগতিতে স্বাধীন ভারত এই পথে চলিতেছে। এই গতির সহিত সংগতি রাখিয়া আমরা 'মেঘদূত' মটর সাইকেল নির্মান করিয়াছি। ইতিমধ্যে আমাদের 'মেঘদূত' মটর সাইকেল ভারতীয় নাগরিকদের প্রয়োজন মিটাইয়া জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। আশা করি এ সংবাদ আপনারাও পাইয়াছেন।

আমরা যে 'মেঘদূত' মটর সাইকেল নির্মাণ করিতেছি, তাহার প্রতিটি অংশই ভারতে প্রস্তুত, ভারতীয় [illegible]ধনে ভারতীয় শ্রমিক, ভারতীয় ইস্পাত দ্বারা ইহা নির্মিত [illegible]রাং ইহা সম্পূর্ণভাবে আমাদের জাতীয় উৎপাদন। ইহাই ইহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য, ইহা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা-সঙ্কট উত্তরণে সহায়তা করিয়াছে।

শহরে যেখানে মানুষের তুলনায় যানবাহন অপর্যাপ্ত এবং গ্রামে যেখানে সুষ্ঠু যানবাহনের প্রকৃত অভাব সেইখানেই আমাদের মটর সাইকেল সচল। স্বাধীনভাবে চলা ফেরার পক্ষে ইহার ন্যায় নির্ভরশীল বাহন খুব কমই আছে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিকটি হইল এই যে ইহার মূল্য মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রয় ক্ষমতার নাগালের মধ্যে। মাত্র ১২০০ শত টাকায় এমন একটি শক্তিমান, গতিসম্পন্ন মটর সাইকেল ক্রয় করা ছিল স্বপ্নের বস্তু। কিন্তু বহুদিনের চেষ্টার ফলে এই স্বপ্নই আজ বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে। দেশবাসীর আর্থিক সংগতির কথা স্মরণে রাখিয়াই আমরা যথাসাধ্য করিয়া এই সর্বনিম্ন মূল্য ধার্য করিয়াছি। পাইকারী ক্ষেত্রে শতকরা সাড়ে বারো টাকা হারে কমিশন দেওয়া হয়। তবে একত্রে দশখানি মটর সাইকেলের অর্ডার দিলে কমিশনের হার বৃদ্ধি করিয়া আমরা শতকরা পনের টাকা দিয়া থাকি। মাল প্রেরণের জন্য অতিরিক্ত কোন খরচ লাগে না।

ইহা ব্যতীত প্রকৃত উৎসাহী ও আগ্রহশীল প্রতিষ্ঠান পাইলে, আমরা আরও কিছু সুবিধাদানের কথা বিবেচনা করিয়া থাকি। যদি আঞ্চলিক এজেন্সি পাইতে ইচ্ছুক থাকেন, তবে পত্রালাপ করুন। এজেন্সি প্রদানের ব্যাপারে আমরা নানা সুবিধা প্রদান করিয়া থাকি। আশা করি, আপনারা এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের অর্থোপার্জনের পথ সুগম করিবেন এবং সেই সঙ্গে জাতীয় পণ্যের প্রসার ঘটাইয়া স্বদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক

শ্রীমুরলীধর দত্তরায়

[নিউ ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স (প্রাঃ) লিঃ]

॥ মূল্য-জিজ্ঞাসা ॥

উৎপাদক বা বিক্রেতাই বিক্রয়-প্রস্তাব পাঠিয়ে থাকেন। কিন্তু মূল্য-জিজ্ঞাসা সংক্রান্ত পত্র লেখেন ক্রেতা। মূল্য-জিজ্ঞাসা পত্রের নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেখযোগ্য :

এক—যে জাতীয় পণ্যের মূল্য-জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তার বিশদ বিবরণ।

দুই—মূল্য অনুকূল বিবেচিত হলে কি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা হবে, যোগান দেবার সময় ও দস্তুরির পরিমাণ কি হবে তার উল্লেখ। (পরিমাণ বেশী হলে বিক্রেতার তরফ থেকে সুলভ মূল্য প্রস্তাবের সম্ভাবনা থাকে।)

তিন—সরবরাহ কালে কোন বিশেষ ধরণের বাক্সবন্দী করার প্রয়োজন আছে কি না ?

চার—পূর্বে কারবার করা হয়নি এমন প্রতিষ্ঠানের কাছে মূল্য-জিজ্ঞাসা কালে পত্র লেখক নগদ মূল্যে কি ধারে মাল পেতে ইচ্ছুক তার উল্লেখ। ধারে মাল প্রেরিত হলে, মূল্য পরিশোধের রীতি ইত্যাদি।

পাঁচ—ক্রেতার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, সংগতি ও সুনামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ছয়—ক্রেতা যদি বিক্রেতার অপরিচিত হন, তবে পরিচয়-সূত্রের উল্লেখ।

এবং সাত—সর্বনিম্ন মূল্য-জ্ঞাপনের অনুরোধ।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ কোন প্রতিষ্ঠান একটি নূতন পণ্য উৎপাদন করিয়াছে। তুমি সেই প্রতিষ্ঠানের সহিত উক্ত পণ্যের কারবার করিবার সংকল্প জানাইয়া একখানি মূল্য-জিজ্ঞাসা পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—২১

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্রেডিং কোং

[সাইকেল, মটর সাইকেল ও যাবতীয় যন্ত্রপাতি বিক্রেতা]

গ্রাম : ওবেট — গোলবাজার

ফোন : খড়্গপুর ৩২ — খড়্গপুর

নিউ ইণ্ডিয়া ম্যান্থফ্যাকচারার্স (প্রাঃ) লিঃ — ২৪শে ডিসেম্বর, '৬৬

১৬১, বেন্টিক্ক ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১৩

পূর্বসূত্র : ২০শে ডিসেম্বরের বিক্রয়-প্রস্তাব পত্র

বিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের ২০শে ডিসেম্বর '৬৬ তারিখের পত্রে জানিতে পারিলাম যে, আপনারা 'মেঘদূত' নামক একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন মটর সাইকেল উৎপাদন করিয়াছেন।

এবিষয়ে আপনারা বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দিয়াছেন। সেই সূত্রে আমাদের নিকট ইতিমধ্যেই কতকগুলি অর্ডার আসিয়াছে। ইহারা অনেকেই আমাদের পুরাতন খরিদ্দার। ইহাদের অর্ডার সরবরাহ করা আমাদের কর্তব্য বলিয়াই আমরা আপনাদের নিকট এই পত্র লিখিতেছি।

আপনাদের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহুদিনের না হইলেও একবারে সামান্য কয়েক দিনেরও নহে। আমরা সাধারণত আপনাদের নিকট হইতে অন্যান্যদের তুলনায় একটু বেশী কমিশনই পাইয়া থাকি। 'মেঘদূত' মটর-সাইকেলের ক্ষেত্রে আপনারা শতকরা সাড়ে বার টাকা হারে কমিশন দিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু এই হারে আমরা আপনাদের এই নবোৎপাদিত মটর সাইকেলটি বাজারে চালাইতে অসুবিধার সম্মুখীন হইব বলিয়া বিশেষ উৎসাহ বোধ করিতেছি না। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে বাজারে নূতন পণ্য চালাইতে গেলে কি পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হয়, এই হার সেই পরিশ্রমের তুলনায় নিতান্তই কম। পত্রোত্তরে আপনারা শতকরা আঠারো টাকা হারে কমিশন দিতে পারিবেন কিনা জানাইয়া বাধিত করিবেন।

মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে আপনারা নূতন কোন সর্ত আরোপ করেন নাই, সুতরাং ইতিপূর্বে মাল সরবরাহ লইবার প্রাক্কালে মোট মূল্যের এক তৃতীয়াংশ দিবার যে প্রথা প্রচলিত আছে তাহাই থাকিবে ধরিয়া লইতেছি। অবশিষ্টাংশ ছয় মাসের

মধ্যে দুই কিস্তিতে পরিশোধ করিবার রীতিও আমরা মানিয়া চলিব। এ সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট জানাইয়া বাধিত করিবেন।

আমরা যদি এই মটর সাইকেলের অর্ডার দিই তাহা হইলে আপনারা কতদিনে তাহা সরবরাহ করিতে পারিবেন তাহা জানাইবেন। আমরা একত্রে ২৫ খানি মটর সাইকেলের অর্ডার দিব। উল্লেখ থাকে যে ইহা সরবরাহের ব্যয় আপনাদের বহন করিতে হইবে। সত্বর পত্রোত্তর দানে বাধিত করিবেন।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীজগদীশ হালদার
[ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্রেডিং কোং পক্ষে]

॥ মূল্য-জ্ঞাপন ॥

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, বিক্রেতা বা উৎপাদক বিক্রয়-প্রস্তাব করে থাকেন এবং মূল্য-জিজ্ঞাসা করেন ক্রেতা। এই ধরণের মূল্য-জিজ্ঞাসা সম্বলিত পত্র এলে তার উত্তরে বিক্রেতা মূল্য-জ্ঞাপক পত্র প্রেরণ করেন। এই জাতীয় পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

এক—যে জাতীয় পণ্যের মূল্য-জ্ঞাপন করা হচ্ছে তার বিশদ বিবরণ;

দুই—ক্রেতার অনুরোধ অনুযায়ী মাল বাক্সবন্দী করতে হলে স্বতন্ত্র খরচ প্রয়োজন কিনা;

তিন—মাল সরবরাহের ব্যাপারে ব্যয় ভার বহনের দায়িত্ব কার;

এবং চার—ক্রেতা ধারে মাল গ্রহণের ইচ্ছুক হলে মূল্য-পরিশোধের সর্ত। এককথায় মূল্য-জিজ্ঞাসা পত্রে যে যে প্রশ্নের অবতারণা করা হবে, মূল্য-জ্ঞাপন পত্রে সেই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হবে। মনে রাখা দরকার, এই পত্রের ভিত্তিতেই পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ ক্রেতার মূল্য-জিজ্ঞাসা পত্রের উত্তরে তোমার প্রতিষ্ঠানের পণ্যের মূল্য-জ্ঞাপন করিয়া একখানি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—২২

নিউ ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স (প্রাঃ) লিঃ
[সাইকেল, মটর সাইকেল উৎপাদক ও বিক্রেতা]

১৬১, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট
গ্রাম : নিউইড কলিকাতা-১৩
ফোন : ২৬-৩৪০২ ২৮শে ডিসেম্বর '৬৬

পূর্বসূত্র : ২৪-১২-৬৬ তারিখের মূল্য-জিজ্ঞাসা পত্র

ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেডিং কোং
গোলবাজার, খড়্গপুর

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের ২৪-১২-৬৬ তারিখের পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আমরা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সংখ্যক মটর সাইকেল উৎপাদন করিয়াছি এবং সেইগুলি বিক্রয়ের জন্য মজুত আছে। আপনাদের অর্ডার পাইলে আমরা পনের দিনের মধ্যেই মাল সরবরাহ করিতে পারিব। এ আশা রাখি। আমরা বর্তমানে দুই প্রকারের 'মেঘদূত' মটর সাইকেল উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করিতেছি। নিম্নে তাহার বিশদ উল্লেখ করিলাম :

এক—৩ অশ্বশক্তি মোটর সম্বলিত মেঘদূত ··· মূল্য ১৫০০৲ টাকা ;
দুই—২ অশ্বশক্তি মোটর সম্বলিত মেঘদূত ··· মূল্য ১২০০৲ টাকা ;
বলা বাহুল্য, স্থানীয় সকলপ্রকার কর ব্যতীতই এই মূল্য স্থির করা হইয়াছে। কর গুলি অতিরিক্ত দেয়।

আমরা সাধারণত শতকরা দশ টাকা হারে কমিশন দিয়া থাকি, কিন্তু 'মেঘদূত' মটর সাইকেলের ক্ষেত্রে খুচরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শতকরা সাড়ে বারো টাকা এবং পাইকারী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আমরা শতকরা পনের টাকা হারে কমিশন দিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছি। কিন্তু আপনি আমাদের পরিচিত এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের সহিত আমরা বেশ কিছু দিন হইল ব্যবসা-সম্পর্কে সম্পর্কিত হইয়াছি। এই কথা স্মরণে রাখিয়াই আমরা আপনার প্রস্তাব বিবেচনা করিয়াছি এবং আপনার প্রস্তাবিত শতকরা আঠারো টাকা কমিশন দিতে প্রস্তুত আছি। বলা বাহুল্য, আপনি একত্রে ২৫ খানি মটর সাইকেল ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই আমরা এই হারে কমিশন দিতে রাজী হইতেছি।

অন্যান্য মাল আমরা যেরূপ আমাদের দায়িত্বে প্রেরণ করিয়া থাকি, মেঘদূতের ক্ষেত্রেও সেইরূপ আমরা আমাদের নিজেদের দায়িত্বেই মাল সরবরাহ করিব। ইহার জন্য যথাযোগ্য বাক্সে যত্নের সহিত আমরা মাল প্রেরণের ব্যবস্থা করিব।

মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে আমরা অপরিচিত প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ সর্ত আরোপ করিয়াছি, কিন্তু আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যবসায়িক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকায় আপনার ক্ষেত্রে এই সর্তাদি আরোপের প্রশ্ন উঠে না। পূর্বরীতি অনুযায়ী মাল সরবরাহের প্রাক্কালে মোট মূল্যের ⅓ অংশ প্রদান করিলেই চলিবে। অবশিষ্টাংশ মাল সরবরাহের ৬ মাসের মধ্যে শোধ করিতে হইবে।

আপনাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানান হইল। আশা করি, আমরা সত্বর আপনাদের মূল্যবান অর্ডার পাইয়া কৃতার্থ হইব।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি একান্ত কাম্য।

নমস্কারান্তে। ইতি—

আপনাদের বিশ্বস্ত
শ্রীমুরলীধর দত্তরায়
[নিউ ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স (প্রাঃ) লিঃ]

॥ অর্ডার সংক্রান্ত পত্র ॥

মূল্য-জিজ্ঞাসা পত্র যেমন ক্রেতা প্রেরণ করেন, তেমনি অর্ডার সংক্রান্ত পত্রও ক্রেতাই পাঠান। মূল্য-জ্ঞাপন পত্র পাওয়ার পর মূল্য ও পণ্যের গুণাগুণ অনুকূল বিবেচিত হলে, তবেই অর্ডার পত্র রচিত হয়। এই ধরণের পত্রকে অনেকে নির্দেশ পত্র বা নির্দেশনামাও বলে থাকেন। এই জাতীয় পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন :

এক—পণ্যের বিবরণ ;

দুই—পণ্যের মূল্য (এবং সেই সঙ্গে কমিশনের হারের উল্লেখ) ;

তিন—নগদ অথবা ধারে ক্রয় এবং পরিশোধের রীতি ;

চার—সরবরাহের নির্দিষ্ট সময় ;

পাঁচ—পরিবহন ব্যবস্থা ;

এবং ছয়—বিশেষ নির্দেশ ;

সাধারণতঃ এই বিষয়গুলি অর্ডার প্রপত্র (Order Form-এ) উল্লিখিত থাকে। কিন্তু পত্রাকারে লেখার সময় কোন বিষয় বাদ দেওয়া চলে না।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ তোমার প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ পণ্য ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে একখানি যথোপযুক্ত অর্ডার পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—২৩

ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেডিং কোং

[সাইকেল মটর সাইকেল ও যাবতীয় যন্ত্রপাতি বিক্রেতা]

গ্রাম : ওবেট — গোলবাজার

ফোন : খড়্গাপুর ৩২ — খড়্গাপুর

নিউ ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স (প্রাঃ) লিঃ — ২রা জানুয়ারী, ১৯৬৭

স্ট্রীট, কলিকাতা-১ — অর্ডার নং ৩বি/২০২-ক/৬৭

পূর্বসূত্র : ২৮শে ডিসেম্বরের মূল্য-জ্ঞাপন পত্র

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৬৬ সালের পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আপনাদের প্রেরিত পত্রে 'মেঘদূত' মটর সাইকেলের দুই প্রকারের মূল্য জানিলাম। নিম্নে অর্ডারের বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইল :

সংখ্যা	পণ্যের বিবরণ	হার	মূল্য
১৫ খানি	২ অশ্বশক্তি সম্বলিত 'মেঘদূত'	১২০০৲	১৮০০০৲
১০ "	৩ " " "	১৫০০৲	১৫০০০৲
২৫ "		মোট মূল্য :	৩৩,০০০ টাকা

আপনাদের পূর্ব পত্রের উল্লেখ অনুযায়ী ১৮% কমিশন বাদ দিয়া চালান প্রস্তুত করিবেন। মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে প্রচলিত রীতিই অনুসৃত হইবে।

আপনারা মাল সরবরাহের দায়িত্ব লইয়া থাকেন সুতরাং উহা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলিবার নাই। তবে উল্লেখ থাকে যে মাল ত্রুটিযুক্ত হইলে কিম্বা প্রেরণে অতিরিক্ত বিলম্ব ঘটিলে মাল গ্রহণে বাধ্য থাকিব না।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীজগদীশ হালদার

[ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেডিং কোং পক্ষে]

অনুশীলনী

১। পুস্তক প্রকাশনের জন্য কাগজ চাহিয়া কাগজ ব্যবসায়ীদের কাছ হইতে টেণ্ডার (tender) আহ্বান করিয়া বিজ্ঞাপন লেখ। [ক. বি. '৬৩]

২। কোন বিদেশী কোম্পানীকে এক লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্রশিল্পের জন্য বিদ্যুৎ চালিত বয়নযন্ত্র সরবরাহের নির্দেশ (order) দিয়া একখানি পত্র লিখ। [ব. বি. '৬৪]

৩। ব্রিটেনের একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কারবারের উদ্দেশ্যে তোমার অভিপ্রায় ও সামর্থ্য জানাইয়া একটি পত্র লিখ। [ক. বি. '৫৭]

৪। তোমার কলেজের ম্যাগাজিন ছাপিবার জন্য ছাপাখানার নিকট মূল্য-জিজ্ঞাসা করিয়া একটি পত্র লিখ।

৫। তোমার প্রতিষ্ঠান একটি যুগোপযোগী দ্রব্য উৎপাদন করিয়া বাজারে বিক্রয়ের মনস্থ করিয়াছে। সেই দ্রব্যের গুণাবলী ও বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধাদির কথা উল্লেখ করিয়া একটি পত্র রচনা কর।

৬। এই বৎসর শীতের পোষাকের চাহিদা অনুমান করিয়া কোন প্রতিষ্ঠান হইতে পশমের পোষাক কিনিতে মনস্থ করিয়াছ। পশমের বিভিন্ন পোষাকের মূল্য, মূল্যশোধের পদ্ধতি, কমিশনের হার এবং যোগান দিবার সময় ইত্যাদি বিষয় জানিতে চাহিয়া একটি পত্র লিখ।

৭। জনৈক ক্রেতার নিকট হইতে পণ্যের মূল্য-জিজ্ঞাসা করিয়া তোমার প্রতিষ্ঠান যে পত্র পাইয়াছে, তাহার উত্তরে একখানি মূল্য-জ্ঞাপন পত্র লিখ।

অর্ডার গ্রহণ, পালন, প্রত্যাখ্যান, ও সংগ্রহ সংক্রান্ত পত্র

Letters relating to Confirmation, Execution, Refusal, Cancellation, and Collection of orders.

অর্ডার গ্রহণ ॥

ক্রেতা কোন এক প্রতি[illegible] পণ্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেই প্রতিষ্ঠানের বা নির্দেশ-পত্র পাঠান। পত্র প্রাপক প্রতিষ্ঠান সেই অর্ডারপত্র পাওয়ার পর প্রাপ্ত অর্ডারের স্বীকৃতি স্বরূপ পত্র প্রেরণ করে। এই ধরণের পত্র রচনার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উল্লেখ প্রয়োজন :

এক—পণ্যের বিশদ বিবরণ ;

দুই—পণ্যের পরিমাণ ;

তিন—পণ্য সরবরাহের সময় ও ব্যবস্থা ;

চার—মূল্য পরিশোধের সর্ত ;

পাঁচ—বিশেষ কোন সর্ত (যদি প্রয়োজন হয়) ;

শুধুমাত্র শিষ্টাচার প্রদর্শনের মধ্যেই এই জাতীয় পত্রের প্রয়োজন সীমাবদ্ধ নয়, ব্যবসায় সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও এই চিঠির গুরুত্ব অনেক। এই জাতীয় পত্র বিলম্বে পাঠান হলে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়ত, এই জাতীয় বিলম্বের ফলে ক্রেতাকে অহেতুক উদ্বেগের মধ্যে ফেলে রাখা হয়। কারণ এই ধরণের পত্র না পাওয়া পর্যন্ত ক্রেতার পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে তার প্রয়োজনীয় মাল সে পাবে কিনা। তখন সে অন্য প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মাল সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে পারে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে যখন বিক্রেতা অর্ডার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মাল সরবরাহ করে, তখন আর এই জাতীয় পত্রের প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ কোন ক্রেতার নিকট হইতে তোমার প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত ২৫ খানি 'মেঘদূত' মটর সাইকেলের অর্ডার আসিয়াছে। সরবরাহ করিবার সময়, ব্যবস্থা ও অন্যান্য সর্তাদির উল্লেখ করিয়া একখানি অর্ডার গ্রহণ পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—২৪

নিউ ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স (প্রাঃ) লিঃ
[সাইকেল ও মটর সাইকেল উৎপাদক ও বিক্রেতা]

গ্রাম : নিউইড — ১৬১, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট
ফোন : ২৬-৩৪০২ — কলিকাতা-১৩
ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেডিং কোং — ৫ই জানুয়ারী '৬৭
গোলবাজার
খড়্গপুর।

পূর্বসূত্র : ২রা জানুয়ারীর অর্ডার পত্র
সূচক সংখ্যা ওবি/২০২-ক/৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের ২.১.৬৭ তারিখের অর্ডার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ২৫ খানি 'মেঘদূত' মটর সাইকেলের মূল্যবান অর্ডার পাইয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত। আপনাদের এই সহযোগিতা আমাদের ব্যবসায় যথেষ্ট সহায়তা করিবে বলিয়া আমরা কৃতজ্ঞ।

আপনাদের সহিত আমাদের কারবার এই প্রথম নহে, সুতরাং আপনারা জানেন যে মাল প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা আমরাই করিয়া থাকি। আমাদের নিজস্ব লরীতেই আমরা মাল প্রেরণ করিব। ইহার জন্য কোনরূপ অতিরিক্ত পরিবহন ব্যয়ের প্রশ্ন নাই।

বর্তমানে আমাদের গুদামে প্রচুর সংখ্যক সাইকেল ও মটর সাইকেল মজুত আছে। তাই আপনাদের মাল সরবরাহ করিতে আমাদের কোনরূপ অসুবিধা নাই। তবে প্যাকিং-এর জন্য আমাদের কয়েকদিন সময় লাগিবে, তবে আগামী ১০ই জানুয়ারী বেলা ৪টার মধ্যে আপনারা মাল সরবরাহ পাইবেন। সঙ্গে প্রয়োজনীয় চালান থাকিবে, দয়া করিয়া চালানে স্বাক্ষর করিয়া মালের প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীমুরালীধর দত্তরায়
[নিউ ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স (প্রাঃ) লিঃ পক্ষে]

॥ পূর্ণ বিবরণ জিজ্ঞাসা ভিত্তিক অর্ডার পত্র গ্রহণ ॥

সাধারণত অর্ডার গ্রহণ পত্র লেখা হয় যখন অর্ডার অনুযায়ী মাল সরবরাহ করতে কোন রকম অসুবিধে নেই। কিন্তু অর্ডার পত্র ত্রুটিপূর্ণ হলে মাল সরবরাহ কালে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তখন তিনি ক্রেতার নিকট এই শ্রেণীর পত্র প্রেরণ করে থাকেন। দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হল :

আদর্শ পত্র—২৫

[শিরোনামা ইত্যাদি পূর্ববৎ]

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও [illegible] গ্রহণ করুন।

আপনাদের ২.১.৬৭ তারিখের অর্ডার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে মূল্যবান অর্ডার পত্র পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আপনাদের প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী পাঠাইবার মত মাল আমাদের মজুত আছে এবং উহা আমরা আগামী ১০ই জানুয়ারী '৬৭ সালের মধ্যে প্রেরণ করিতে সক্ষম। কিন্তু আপনারা যে ২৫ খানি 'মেঘদূত' মটর সাইকেলের অর্ডার দিয়াছেন, তাহার মধ্যে ৩ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট কয়খানি সাইকেল ও ২ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট কয়খানি সাইকেল তাহা উল্লেখ না থাকায় আমরা একটু অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছি। যদি ২৫ খানি মটর সাইকেল এক ধরণেরই হয় তবে তাহা কোন অশ্বশক্তির তাহার উল্লেখ না থাকায় এই অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। তাই এই মুহূর্তে আপনাদের নির্দেশ অনুযায়ী মাল প্রেরণ করিতে পারিতেছি না। ইহা ব্যতীত মটর সাইকেলের রঙেরও কোন উল্লেখ নাই। আমাদের উৎপাদিত মটর সাইকেলের 'কালো' ও 'মেরুন' দুইটি রঙ আছে। এ সম্পর্কে আপনাদের বিশেষ কোন পছন্দ আছে কিনা তাহাও আমাদের জানা প্রয়োজন। অবশ্য আমরা আমাদের পছন্দ মত মাল পাঠাইতে পারিতাম, কিন্তু তাহা আপনাদের অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে আশঙ্কা করিয়া আমরা সেই পথ গ্রহণ করিলাম না। এ সম্পর্কে আপনাদের অভিমত জানিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মাল সরবরাহ করিব।

[পত্রের বাকী অংশ ২২নং আদর্শ পত্রের অনুরূপ]

॥ অতিরিক্ত সময় প্রার্থনা করিয়া অর্ডার পত্র গ্রহণ ॥

অর্ডার পত্রে যদি ক্রেতা প্রয়োজনীয় মালের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে থাকেন এবং সেই অনুযায়ী মাল যদি বিক্রেতার কাছে সেই মুহূর্তে মজুত না থাকে, তাহলে, নির্দেশ

অনুযায়ী মাল প্রেরণের জন্য অতিরিক্ত সময় চেয়ে অর্ডার গ্রহণ পত্র লেখা হয়। দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হল :

আদর্শ পত্র—২৬

[শিরোনাম ইত্যাদি পূর্ববৎ]

আপনাদের ২.১.৬৭ তারিখের অর্ডার পত্র পাইয়া আমরা আনন্দিত এবং এজন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

উক্ত নির্দেশ পত্র অনুসারে আপনাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, আপনারা ৩ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট কালো রঙের যে ২৫ খানি মেঘদূত মটর সাইকেল চাহিয়াছেন, তাহা বর্তমানে আমাদের গুদামে মজুত নাই। এই কারণে আপনাদের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ১০ই জানুয়ারীর মধ্যে মাল প্রেরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। আপনাদের নির্দেশ পত্র প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কারখানায় এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছি, কিন্তু আপনাদের নির্দ্ধারিত তারিখের মধ্যে এই মাল প্রেরণে আমরা সক্ষম হইব না। এমতাবস্থায় সরবরাহ কাল অন্ততঃ তিন সপ্তাহ বাড়াইয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

সুতরাং অনুগ্রহপূর্বক ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে মাল সরবরাহ লইতে যদি স্বীকৃত থাকেন তাহা হইলে সত্বর পত্রের উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

আমরা আপনাদের এই নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারি যে আমরা ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই উক্ত মাল প্রেরণ করিতে সক্ষম হইব। ধন্যবাদান্তে। ইতি—

॥ অর্ডার পালন পত্র ॥

ক্রেতার নির্দেশ পত্র পাওয়ার পর বিক্রেতার তরফ থেকে অর্ডার পালন পত্র লেখা হয়। এই জাতীয় পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকে।

এক—পণ্যের বিবরণ ;

দুই—সরবরাহের পরিমাণ ;

তিন—পরিবহন ব্যবস্থা ;

চার—মূল্য পরিশোধের রীতি

পাঁচ—অর্ডারের জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপন ও পুনরায় অর্ডার প্রদানের অনুরোধ।

যদি কখনও অর্ডার পত্রের নির্দেশ আংশিকভাবে পালন করা হয়, তা হলে নির্দেশ পালন পত্রে সে বিষয়ে উল্লেখ করে বাকি অংশ কবে পালিত হবে, তা বিনীত ভাবে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ অর্ডার অনুযায়ী মাল সরবরাহ করা হইয়াছে, এই মর্মে একখানি অর্ডার পালন পত্র রচনা কর।

॥ সম্পূর্ণভাবে অর্ডার পালন পত্র ॥

আদর্শ পত্র—২৭

নিউ ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স (প্রাঃ) লিঃ
[সাইকেল ও মটর সাইকেল উৎপাদক ও বিক্রেতা]

গ্রাম : নিউইড ১৬১, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট
ফোন : ২৬-৩৪০২ কলিকাতা-১৩

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্রেডিং [illegible] ৭ই জানুয়ারী '৬৭
বাজার, খড়্গাপুর।

পূর্বসূত্র : ২রা জানুয়ারীর অর্ডার পত্র
সূচক সংখ্যা ওবি।২০২-কা।৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন।

আপনাদের প্রেরিত ২রা জানুয়ারী ১৯৬৭ তারিখের অর্ডার অনুসারে দুই ধরণের মটর সাইকেলের মধ্যে ১৫ খানি ২ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ও ১০ খানি ৩ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট 'মেঘদূত' সাইকেল প্রেরণ করা হইল।

আপনাদের ঐ পত্রে উল্লিখিত সর্তেই এই মাল প্রেরণ করা হইল। উহাতে ১৮% হারে কমিশন প্রদত্ত হইয়াছে এবং মূল্য শোধের ব্যাপারে প্রথমে এক তৃতীয়াংশ ও অবশিষ্ট অংশ ছয় মাসের মধ্যে পরিশোধনীয়।

আমাদের অভিজ্ঞ কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে উপযুক্তভাবে প্যাকিং করা হইয়াছে। সঙ্গে চালানী রসিদ (রসিদ সংখ্যা ৬০৩১ তারিখ ৭.১.৬৭) পাঠান হইল। আমরা সযত্নে প্রতিটি সাইকেল পরীক্ষা করিয়াই প্যাকিং করাইয়াছি, তাহা সত্ত্বেও মালের কোন প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিলে আমরা ফেরৎ লইতে বাধ্য থাকিব।

আপনাদের মূল্যবান অর্ডার ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি, ভবিষ্যতেও অনুরূপ সহযোগিতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি। নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীমুরলীধর দত্তরায়
[নিউ ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স (প্রাঃ) লিঃ পক্ষে]

॥ আংশিক অর্ডার পালন পত্র ॥

আদর্শ পত্র—২৮

[শিরোনামা পূর্বব]

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের প্রেরিত ২রা জানুয়ারী ১৯৬৭ তারিখের অর্ডার অনুযায়ী দুই ধরণের মটর সাইকেলের মধ্যে ১০ খানি ৩ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট মেঘদূত ও ১০ খানি ২ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট মেঘদূত সাইকেল প্রেরণ করা হইল।

২ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট মটর সাইকেলের অপ্রত্যাশিত চাহিদা হেতু গত সপ্তাহে আমাদের মজুত 'মেঘদূত' মটর সাইকেল দ্রুত বিক্রয় হওয়ায় আমরা ৫ খানি দুই অশ্বশক্তি বিশিষ্ট 'মেঘদূত' মটর সাইকেল প্রেরণ করিতে পারিলাম না। কারখানায় যথাযথ নির্দেশ দিয়া দিয়াছি; তবে ৩ সপ্তাহের পূর্বে ঐ মাল প্রেরণ করা সম্ভব নহে। সেইজন্য বিলম্বে আপনাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া যে মাল আমাদের গুদামে মজুত ছিল তাহাই পাঠাইলাম। বাকী মাল আমরা ৩ সপ্তাহের মধ্যেই প্রেরণ করিতে পারিব বলিয়া আশা রাখি।

মূল্য বাবদ টাকা দ্বিতীয় দফায় মাল প্রেরণের সময় দিলেই চলিবে। বলা বাহুল্য, যে দ্বিতীয় দফায় মাল প্রেরণ করিবার জন্য পরিবহনের ব্যয় আমরাই বহন করিব।

অর্ডার অনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে মাল প্রেরণ করিতে না পারায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য, আশা করি, অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা করিবেন। ধন্যবাদান্তে। ইতি—

[বিঃ দ্রঃ—এ ধরণের পত্র সাধারণতঃ মালের চালানের সঙ্গে প্রেরিত হয়। পত্রখানি নিঃসন্দেহে সৌজন্যমূলক এবং সেইজন্যই এ পত্রের ভাষা বিনয়াবনত। এ পত্রের মূল্য কোন ভাবে ন্যূন নহে।]

॥ অর্ডার প্রত্যাখ্যান ॥

ব্যবসা ক্ষেত্রে কখনও কখনও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যখন বাধ্য হয়ে বিক্রেতাকে অর্ডার প্রত্যাখ্যান করতে হয়। সাধারণত কয়েকটি কারণে এই ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। যথা:

(ক) আইনঘটিত বাধা;

(খ) ক্রেতার ওপর বিক্রেতার অবিশ্বাস;

(গ) ত্রুটিপূর্ণ নির্দেশ;

(ঘ) ক্রেতার ব্যবহার ;

(ঙ) পূর্ববর্তী অর্ডারের মূল্যশোধের বিলম্ব ইত্যাদি।

অর্ডার প্রত্যাখ্যান পত্রে বিক্রেতাকে অর্ডার প্রত্যাখ্যানের জন্যে সৌজন্যের খাতিরে একটা কারণ দেখাতে হয়। অবশ্য বিক্রেতা যে সব সময় কারণ দেখাবার জন্যে বাধ্য—তা নয়।

তবে আইনঘটিত বাধা ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রেতাকে কখনই বিক্রেতার সরাসরি প্রত্যাখ্যাত করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ তোমার কারবার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অর্ডার প্রত্যাখ্যান করিয়া একখানি [illegible]চনা কর।

আদর্শ পত্র—২৯

জি. কে. এণ্টারপ্রাইজ (প্রাঃ) লিঃ

[বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম উৎপাদক ও বিক্রেতা]

টেলিগ্রাম : জিকে
টেলিফোন : ২২-৬২৬৪

৯, নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা-১
২১ জানুয়ারী, ১৯৬৭

অনুপমা স্টোর্স
ফিডার রোড
বেলঘরিয়া

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৬৭ তারিখের পত্রের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাদের উক্ত পত্রে আপনারা 'পারফেক্ট' ইলেক্ট্রিক স্টোভের অর্ডার দিয়া আমাদের সহিত ব্যবসায় যে সহযোগিতার পরিচয় রাখিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা চিরকাল আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত চার মাস যাবত শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে আমাদের কারখানা বন্ধ থাকায় আমরা সর্বপ্রকার দ্রব্য উৎপাদন বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছি। কাজেই আপনাদের অর্ডার সম্পাদন করিয়া আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে এখন আর সম্ভব হইল না। আমাদের আয়ত্তাধীন নহে, এমন অসুবিধার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা আমাদের উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য আপনাদের মূল্যবান অর্ডার লাভে বঞ্চিত হইব না।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীহরিরঞ্জন নিয়োগী

[জি. কে. এণ্টারপ্রাইজ (প্রাঃ) লিঃ পক্ষে]

॥ অর্ডার বাতিল ॥

ক্রেতা বিক্রেতাকে মাল প্রেরণ করার নির্দেশ দিয়ে পরে অনেক সময় তাকে তা বাতিল করার নির্দেশ দিতে হয়। নির্দিষ্ট মালের বাজার দর অত্যধিক হ্রাস পেলে, বা ক্রেতা যে গ্রাহক বা গ্রাহক সম্প্রদায়ের জন্য পণ্য প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি বা তাঁরা দেউলিয়া হলে বা নির্দেশ বাতিল করলে, অথবা হঠাৎ ক্রেতা অন্য কোন জায়গা থেকে আকস্মিকভাবে অধিকতর সুলভ মূল্যে মাল পেয়ে গেলে এই ধরণের পত্র প্রেরিত হয়। আবার নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে মাল না পেলেও অর্ডার বাতিল করা হয়ে থাকে। অর্ডার বাতিল পত্রে নিচের বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন :

এক—অর্ডার বাতিল করার কারণ ;

দুই—অর্ডার বাতিল জনিত বিক্রেতার সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দান ;

বলা বাহুল্য, নম্র ভাষায় রচিত এই ধরণের পত্র নির্দেশ পালনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই বিক্রেতার কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন। নইলে এর জন্য ক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হাতে সময় অল্প থাকলে অনেক সময় তার যোগে অথবা টেলিফোন যোগে অর্ডার বাতিল করা হয়ে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ তারের সমর্থনে পত্রাকারে অর্ডার বাতিল পত্র প্রেরণ করা আবশ্যক। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে যে কোন কারণেই অর্ডার বাতিল হোক না কেন—কোন রকম অসৌজন্য প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ অর্ডার পত্রে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে অর্ডার সম্পাদিত না হওয়ায় অর্ডার বাতিল করিয়া একখানি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৩০

সাহানা স্টোর্স
[প্রসাধন সামগ্রী বিক্রেতা]

ওরিয়েণ্টাল স্টেশনার্স
৬১, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

পোড়ামাতলা রোড
নবদ্বীপ
নদীয়া
১৭ই জানুয়ারী '৬৭

পূর্বসূত্র : অর্ডার নং ৩৬, তারিখ ২০শে ডিসেম্বর '৬৬

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন।

গত ২০শে ডিসেম্বর ১৯৬৬ তারিখে আমরা ৪ ডজন 'মাতোয়ারা' স্নোর অর্ডার দিয়া আপনাদের নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম। আপনারাও আপনাদের ২৩শে ডিসেম্বরের পত্রে উক্ত অর্ডার প্রাপ্তির কথা স্বীকার করিয়াছিলেন।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত আপনাদের মাল কিংবা এই মর্মে কোন চিঠি আমরা পাই নাই। আমাদের অর্ডার পত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছিল যে, ১০ই জানুয়ারীর '৬৭ তারিখের মধ্যে না পাঠাইয়া, উক্ত তারিখের পরে মাল প্রেরিত হইলে উক্ত মাল গ্রহণে আমরা বাধ্য থাকিব না।

আমাদের পত্রে উল্লেখিত ঐ তারিখের পর এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইয়াছে। তথাপি আপনাদের মাল এখনও আসিয়া পৌছায় নাই। এইরূপ অবস্থায় আমরা আমাদের প্রদত্ত অর্ডার বাতিল করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম। উল্লেখ থাকে যে, অতঃপর আমাদের নিকট ঐ মাল পৌছাইলে আমরা তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিব না। আশা করি, অবস্থাগত অসুবিধার জন্য আমাদের ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। অবশ্য ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলে অনুরূপ অর্ডার দিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর বসু
[সাহানা স্টোর্স]

॥ অর্ডার সংগ্রহ ॥

অর্ডার সংগ্রহ পত্র প্রেরণ করেন বিক্রেতা। বিক্রেতার হাতে প্রচুর পণ্য জমা হলে, তিনি সেই পণ্য নানা সুবিধাজনক সর্তে বিক্রয়ের জন্য ক্রেতাদের কাছে অর্ডার সংগ্রহ পত্র লিখে থাকেন। অর্ডার সংগ্রহ পত্র ও বিক্রয় প্রস্তাবমূলক পত্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান।

প্রশ্ন ॥ ২৩॥ তোমার প্রতিষ্ঠান কিছু দুষ্প্রাপ্য বিদেশী পুস্তক আনিয়াছে। অর্ডার আহ্বান করিয়া কোন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কাছে একখানি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৩১

বেঙ্গল বুক সিণ্ডিকেট
[প্রখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী]

গ্রাম : বুকসিণ্ডি
ফোন: ৩৪-২৬৩০

২০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২
২২শে জানুয়ারী, ১৯৬৭

আসাম বুক স্টল
পানবাজার
গৌহাটি

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের সহিত আমাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। আপনারা দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিয়া আসিতেছেন, তাহার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের জে. উইলিয়মস্ এণ্ড কোং সঙ্গে চুক্তিক্রমে বিশ্ব ইতিহাসের কিছু দুষ্প্রাপ্য বই আমদানী করার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। বইগুলি এতদিন ভারতবর্ষের বাজারে পাওয়া যাইতেছিল না অথচ এই বইগুলির চাহিদা ছিল যথেষ্ট। ক্রেতাদের প্রয়োজনের দিকটি স্মরণে রাখিয়াই আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। আপনাদের সহিত বহুদিনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকায় আপনাদের এই বইগুলি সম্পর্কে জানান বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিতেছি। এই সুযোগ সবার পক্ষে পাওয়া সম্ভব নহে। বইগুলির মূল্যও অধিক নহে, কারণ মুদ্রামূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার

বই এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া এই বইগুলির মূল্য নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে গান রূপ হেরফের ঘটে নাই। আশা করি, আপনাদের অর্ডার ও সহযোগিতা ভ করিব। বলাবাহুল্য, সত্বর অর্ডার না পাইলে বইগুলি সরবরাহ করা হয়ত ব হইবে না।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীদেবব্রত লাহিড়ী

[বেঙ্গল বুক সিণ্ডিকেটের পক্ষে]

অনুশীলনী

১। কোন বিদেশী কোম্পানিকে একলক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্রশিল্পের জন্য বিদ্যুৎ চালিত বয়নযন্ত্র সরবরাহের নির্দেশ দিয়া একখানি পত্র লিখুন।

[ব, বি, (মডি) '৬৪]

২। সেনরায় কোম্পানি তোমার প্রতিষ্ঠানের নিকট তিন হাজার টাকা মূল্যের মালের অর্ডার দিয়াছে। আনুষঙ্গিক সর্তে মাল প্রেরণের সম্মতি জানাইয়া একখানি পত্র রচনা কর।

৩। ধানবাদ হইতে একজন পুস্তক ব্যবসায়ী তোমার পুস্তক প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রকাশিত পাঁচশোখানি পুস্তক চাহিয়া পাঠাইয়াছে। পত্রখানি রচনা কর।

৪। ভ্যারায়িটি স্টোর্স তোমাদের প্রতিষ্ঠানের কিছু মালের অর্ডার দিয়াছিল। অর্ডার অনুযায়ী মালের সহিত একখানি সম্পাদন পত্র রচনা কর।

৫। তোমার প্রতিষ্ঠান কিছু মালের অর্ডার পাইয়াছে; কিন্তু তোমার গুদামে মাল মজুত নাই। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল প্রেরণে অসামর্থ্যের কথা জানাইয়া একখানি পত্র রচনা কর।

৬। বিশেষ কারণে অর্ডারপ্রাপ্ত মাল পাঠান অসম্ভব বলিয়া অতিরিক্ত সময় চাহিয়া অর্ডার প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট একখানি পত্র রচনা কর।

৭। ক্রেতা দেউলিয়া হইয়াছে, সংবাদ পাওয়ায় পূর্ব প্রদত্ত অর্ডার বাতিল করিয়া একখানি পত্র রচনা কর।

সপ্তম স্তর | আদায় বা তাগিদ পত্র
Letters relating to Collections

॥ আদায় পত্র ॥

আধুনিক কালে ব্যবসা-বাণিজ্যের যেমন সম্প্রসারণ ঘটেছে, তেমনি নানা কারণে সেখানে নানা প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিচ্ছে। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যেই তাই এই সব বিষয় নিয়ে পত্রালাপ চলে।

আদায় সংক্রান্ত পত্র ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠান বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান প্রাপ্ত মালের মূল্য শোধ না করলে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান বাধ্য হয়ে এই পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রের আর এক নাম তাগাদা পত্র বা তাগিদ পত্র। এই জাতীয় পত্রের ভাষা অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ ও শালীন হওয়া প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক বার তাগিদ পত্র প্রেরণ করতে হ'তে পারে, সেক্ষেত্রে প্রথম পত্রেই আইনের আশ্রয় নেওয়ার উল্লেখ না থাকাই শ্রেয়। গত্যন্তর না থাকলে তবেই এই জাতীয় বক্তব্যের উল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে মূল্যশোধ হয় নাই। আগামী পক্ষকালের মধ্যে মূল্য শোধ করিবার নির্দেশ দিয়া ক্রেতার নিকট পত্র প্রেরণ কর।

আদর্শ পত্র—৩২

ন্যাশন্যাল ভ্যারাইটি স্টোর্স
[যাবতীয় প্রসাধন বিক্রেতা]

গ্রাম : নাভাস
ফোন : ৩৪-৬০০২

৪৪ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬
১২ই জানুয়ারী '৭১

মলয়া স্টোর্স
স্টেশন রোড
কালনা,

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের প্রেরিত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ সালের অর্ডার [পত্র নং ৩১৪-৯-৬৬] অনুযায়ী আমরা ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে ১০ ডজন 'ফুজি স্নো', ১৬ ডজন জবাকুসুম তেল ও ৫০টি নির্মল বার্ সাবান প্রেরণ করিয়াছি। চুক্তি অনুযায়ী মাল চালান গ্রহণ করিবার সময় আপনারা এক তৃতীয়াংশ মূল্য পরিশোধ করিয়াছেন এবং বাকি অংশ তিন মাসের মধ্যে পরিশোধ করিবেন বলিয়া স্থির ছিল। কিন্তু তাহার পরও দুই মাস অতিক্রান্ত হইয়াছে। সুতরাং এখন মূল্য শোধের ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারিলাম না।

হিসাব মত আপনা[illegible] ৩০০৲ (তিন শত টাকা মাত্র) বাকী। আগামী এক পক্ষকাল অর্থাৎ ২৭শে জানুয়ারীর ১৯৬৭ তারিখের মধ্যে বকেয়া মূল্য শোধ করিয়া আমাদের বাধিত করিবেন।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক

শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ কর্মকার

[ন্যাশন্যাল ভ্যারায়িটি স্টোর্স]

॥ বিক্রয় আকর্ষণযুক্ত তাগিদ পত্র বা আদায় পত্র ॥

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ নূতন মাল আমদনি হইয়াছে—সে সম্পর্কে ক্রেতাকে সংবাদ প্রদান করিয়া পূর্বের বাকী টাকা শোধ করিবার বিষয়টি উল্লেখে একখানি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৩৩

বেনারসী কুঠী

[প্রখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ী]

গ্রাম : কুঠি
ফোন : ৩৪-১২৬৬

৫২/এ কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২
২৬,১,৬৭

বনলতা বস্ত্র বিপনি
পুরাতন বাজার
বসিরহাট

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

পূজার উৎসব আসন্ন। আর মাত্র একমাস বাকি। এই উপলক্ষে আমরা বেনারস হইতে কিছু পরিমাণ বেনারসী শাড়ী আনাইয়াছি, সঙ্গে অন্যান্য স্থানের নানা ধরণের শাড়ীও আমাদের নিকট মজুত আছে। এবারকার সংগৃহীত কাপড়গুলি বুননে ও বর্ণে অসাধারণ। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এই কাপড়গুলি আমাদের ক্রেতাদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে। তবে এই প্রসঙ্গে জানাই যে প্রচুর পরিমাণ মাল আনা সম্ভব হয় নাই, সুতরাং আমদানি কৃত কাপড় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলিয়া সত্বর নির্দেশ দানে বাধিত করিবেন।

প্রসঙ্গত অনুরোধ জানাইতেছি যে, আপনাদের পূর্বের বাকি ৩৭৫৲ (তিন শত পঁচাত্তর টাকা) জন্য একখানি চেক অথবা নগদ পাঠাইয়া নূতন নির্দেশ চলতি হিসাবে সরবরাহ করিতে সহায়তা করিবেন।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীমনোরঞ্জন সুর
[বেনরেসী কুঠী]

ধারাবাহিক তাগিদ পত্র বা আদায় পত্র :

আদর্শ পত্র—৩৪

[প্রথম পর্যায় : প্রথম পত্র]

রাজলক্ষ্মী কেমিক্যাল ওয়ার্কস

গ্রাম : রাজলক্ষ্মী
ফোন : ৪৬-২৩৪৫

২৯/২ সদানন্দ রোড
কলিকাতা-২৬
২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬

মডার্ণ স্টোর্স
বুড়ো শিবতলা
জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন।

আপনাদের নির্দেশ মত আমাদের ২রা ডিসেম্বর ১৯৬৬ তারিখের প্রেরিত পার্সেল আশা করি, যথা সময়ে আপনাদের নিকট পৌছিয়াছে। ঐগুলির প্রাপ্তি সংবাদ

না পাইয়া উদ্বেগ বোধ করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া সত্বর তাহা জানাইয়া আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করিবেন।

আশা করি, এতদিনে আমাদের প্রেরিত চালান ও বিল মিলাইয়া দেখিয়াছেন এবং মাল পুরাপুরি বুঝিয়া পাইয়াছেন। আপনাদের সুবিধানুযায়ী বিলটির ভুক্তান বাবদ মোট ৪৫০৲ (চারি শত পঞ্চাশ টাকা) পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীঅপূর্ব কুমার সাহা
[রাজলক্ষ্মী কেমিক্যাল ওয়ার্কস]

আদর্শ পত্র—৩

[প্রথম পর্যায় : দ্বিতীয় পত্র]

[শিরোনাম ইত্যাদি পূর্ববৎ]

৮ই জানুয়ারী ১৯৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

গত ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৬৬ তারিখে আপনাদিগকে বাকি হিসাব পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানাইয়া একখানি পত্র দিয়াছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাহার কোন উত্তর আমরা পাই নাই। পত্রখানি আপনাদের নিকট ঠিক মত পৌঁছাইয়াছে কিনা বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় হিসাবসহ এই পত্র পাঠাইতেছি। যাহাতে সত্বর টাকা পাইতে পারি সে বিষয়ে অবহিত হইলে অত্যন্ত বাধিত হইব।

বর্তমানে আপনাদের হিসাব বাকি মাত্র ৪৫০৲ [চার শত পঞ্চাশ টাকা]

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীঅপূর্ব কুমার সাহা
[রাজলক্ষ্মী কেমিক্যাল ওয়ার্কস]

আদর্শ পত্র—৩৬

[দ্বিতীয় পর্যায় : প্রথম পত্র]

[শিরোনাম ইত্যাদি পূর্ববৎ]

২৯শে জানুয়ারী, ১৯৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের ২রা ডিসেম্বরের প্রেরিত পার্সেলের সহিত চালান ও বিলখানি প্রায়

দুই মাস হইল আপনাদের নিকট পাঠানো হইয়াছে। আপনাদের ইহা নিশ্চয়ই জানা আছে যে, আপনাদের সহিত নূতন ব্যবসায় সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনেই উক্ত বিলের উপর আমরা শতকরা ১০ টাকা (১০%) হিসাবে কমিশান বাদ দিয়াছি। আপনাদের সহিত লেনদেনের পূর্বে ইহা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, এক পক্ষকালের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করিয়া দেওয়ার সর্তেই আমাদের প্রতিষ্ঠান হইতে ঐরূপ কমিশন দেওয়া হইয়া থাকে। এখন যদিও পক্ষকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে তবুও আপনাদের সহিত নূতন ব্যবসায়িক সম্পর্কে স্থাপনের খাতিরে আমরা এই কমিশনের সুযোগ গ্রহণের সময় বর্ধিত করিয়া দুই মাস পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত আছি।

অতএব দয়া করিয়া যাহাতে ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে বকেয়া পাওনা মিটাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়, সে বিষয়ে একটু অবহিত হইলে আমরা বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক

শ্রীঅপূর্ব কুমার সাহা

[রাজলক্ষ্মী কেমিক্যাল ওয়ার্কস]

আদর্শ পত্র—৩৭

[দ্বিতীয় পর্যায় : দ্বিতীয় পত্র]

[শিরোনাম ইত্যাদি পূর্ববৎ]

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের ২রা ডিসেম্বরের প্রেরিত পার্শেলের পর ২৩/১২/৬৬, ৮/১/৬৭ এবং ২৮/২/৬৭ তারিখের লিখিত পত্র তিনখানি, আশা করি, যথা সময়েই আপনাদের নিকট পৌছাইয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এতদিন হইয়া গেল, তাহা সত্ত্বেও আপনাদের নিকট হইতে আমাদের বিলের বকেয়া ৪৫০৲ (চার শত পঞ্চাশ টাকা) আজও পর্যন্ত বুঝিয়া পাইলাম না। আমাদের পূর্ববর্তী পত্রে (২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭) কমিশনের সুযোগ গ্রহণের সময় বর্ধিত করিয়া যে দুই মাস করা হইয়াছিল, তাহার মেয়াদ ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭ তারিখে শেষ হইয়া গিয়াছে। অতএব আমামের সর্বশেষ

অনুরোধ, আপনি আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আমাদের বিলের টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়া আমাদের পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিতে ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক সম্প্রসারণ করিতে সহায়তা করিবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীঅপূর্ব কুমার সাহা
[রাজলক্ষ্মী কেমিক্যাল ওয়ার্কস]

আদর্শ পত্র—৩৮

[তৃতীয় পর্যায় : প্রথম পত্র]

[শিরোনাম ইত্যাদি পূর্ববৎ]

২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের ১০/২/৬৭ তারিখে লিখিত পত্রের পর শুধু মেয়াদী সময়ই শেষ হয় নাই, অতিরিক্ত কয়েক দিনও অতিক্রান্ত হইয়াছে ; তাই আপনাদের শেষ পর্যন্ত জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, মাত্র ৪৫০৲ (চারশত পঞ্চাশ টাকা) জন্য আমাদের পক্ষে ধৈর্য অবলম্বন করা আর সম্ভব হইতেছে না। যেহেতু আপনারাই আমাদের পারস্পারিক প্রীতির সম্পর্ক স্বেচ্ছায় নষ্ট করিয়াছেন, তাই গত্যন্তর না দেখিয়া বর্তমানে আমরা নিতান্ত অনিচ্ছাবশত বিষয়টি আমাদের আইন বিষয়ক পরামর্শদাতার হাতে দিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছি।

অতঃপর আমাদের বিলে যে কমিশন দেওয়া হইয়াছিল তাহা বাতিল করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম। এবং আপনারা ৪৫০৲ টাকার পরিবর্তে প্রেরিত মালের মোট মূল্য বাবদ ৫১৫ টাকা (পাঁচ শত পনের টাকা) দিতে বাধ্য থাকিবেন। উপরন্তু উক্ত পরিমাণ টাকার জন্য শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ দিতে বাধ্য থাকিবেন। ইতি—

নিবেদক
শ্রীঅপূর্ব কুমার সাহা
(রাজলক্ষ্মী কেমিক্যাল ওয়ার্কস)

॥ সর্বশেষ আদায় পত্র ॥

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ মূল্য পরিশোধের জন্য ক্রেতার নিকট লিখিত পর পর কয়েকটি আদায় বা তাগিদ পত্র ফলদায়ক হয় নাই। এ বিষয়ে আর পত্রালাপ হইবে না, এই মর্মে ক্রেতার নিকট আর একখানি পত্র প্রেরণ কর।

আদর্শ পত্র—৩৯

গ্রন্থ বিপনি
(প্রখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী)

গ্রাম : বিপনি
ফোন : ৩৪-৬৭২২

৩৮/সি বিধান সরণী
কলিকাতা-৬
১৫ই জানুয়ারী, ১৯৬৭

গ্রন্থ ভারতী
স্টেশন রোড
কৃষ্ণনগর

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আপনাদের নিকট বকেয়া মূল্য পরিশোধের অনুরোধ জানাইয়া গত ২৫ নভেম্বর, ৬ই ডিসেম্বর এবং ৩রা জানুয়ারী তারিখে যে পত্রগুলি প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহার কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। আপনাদের সাধ্যানুযায়ী মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়া উত্তর দিলে, আমরা আপনাদের অসুবিধার দিকটি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইতাম। আমরা এখনও মূল্য শোধের ব্যাপারে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছি। আপনাদের নিকট হইতে অনুরূপ সংযোগিতামূলক মনোভাব প্রত্যাশা করি।

এই ব্যাপারে আদালতের দরজায় হাজির হওয়াটা আপনারা বাঞ্ছনীয় মনে করেন কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের একজন বিশিষ্ট ক্রেতার প্রতি অসম্মানকর বলিয়া মনে করি। তৎপূর্বে আপনারা আপনাদের ব্যবসায়িক সুনামের প্রতি সুবিচার করিয়া মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে আমাদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আশা করি।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য শোধ না হইলে, অন্যের পাওনা টাকা আমরা যথা সময়ে পরিশোধ করিতে পারি না। ইহাতে দুই পক্ষই ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আমরা আপনাদের স্বল্পকালীন সুবিধামত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ দিতে প্রস্তুত আছি। এই সুযোগ গ্রহণ করিবেন।

এই পত্রের উত্তর না পাইলে, আমরা ধরিয়া লইব আপনারা মূল্য পরিশোধের

ব্যাপারে আগ্রহী নহেন। সেক্ষেত্রে আমাদের ভিন্ন ভাবে চিন্তা করিতে বাধ্য হইতে হইবে।

নমস্কারান্তে। ইতি—

বিনীত
শ্রীবিমল সেনগুপ্ত
[গ্রন্থ বিপনি]

অনুশীলনী

১। ক্রেতা প্রেরিত মালের সহিত চালান ও বিল পাইয়াও একমাসের মধ্যে টাকা শোধ করেন নাই। একমাসের মধ্যে টাকা শোধ করিলেই ১২½% কমিশান দিবার ব্যবস্থা আছে। সেকথা স্মরণ করাইয়া আর ১৫ দিন সেই সুযোগের মেয়াদ বর্ধিত করিয়া একখানি তাদিগ পত্র রচনা কর। [ব, বি, (মডিফায়েড) '৬৩]

[উত্তর—সঙ্কেত : ৩৬ নং পত্র দ্বিতীয় পর্যায় : প্রথমপত্রের অনুরূপ]

২। তোমার প্রতিষ্ঠানের কোন বিশিষ্ট ক্রেতা প্রতিবারই নির্দ্দিষ্ট সময়ে মূল্য শোধ করেন। এইবার কোন কারণে সময় মত শোধ দিতে পারেন নাই। পূর্ব সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া একখানি আদায় পত্র রচনা কর।

৩। পর পর কয়েকখানি তাগিদ-পত্র প্রেরণ করিবার পর ক্রেতা সমগ্র পাওনার কিছু অংশ শোধ করিয়া একখানি চেক প্রেরণ করিয়াছেন এবং ঋণ শোধের জন্য অনুরোধ জানাইয়া বিক্রেতার নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন। বিক্রেতার উত্তর আদর্শ সম্বলিত পত্র রচনা কর।

৪। শর্ত অনুযায়ী মূল্যশোধের তারিখ অতিক্রান্ত হইয়াছে। আগামী পক্ষকালের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়া ক্রেতার নিকট একখানি পত্র রচনা কর।

৫। মূল্য পরিশোধ করিতে অনিচ্ছুক একজন ক্রেতার নিকট একখানি যথাযোগ্য আদায়পত্র প্রেরণ কর।

অষ্টম স্তর | প্রতিবাদ, দাবী ও মীমাংসা সংক্রান্ত পত্র

Letters relating to Complaints, Claims and Adjustments.

॥ প্রতিবাদ পত্র ॥

ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা কারণে ক্রেতার মনে অসন্তোষ জন্মাতে পারে। বিশেষ ভাবে যে ভুল-ভ্রান্তি ক্রেতার স্বার্থ হানি করে সেই ভুল ভ্রান্তি, ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতিবাদ জানানোর যখন প্রয়োজন দেখা দেয়, তখনই রচিত হয় প্রতিবাদ পত্র। প্রতিবাদ পত্রের মূলে আছে ক্রেতার বিরক্তি জ্ঞাপন ও প্রতিকার প্রত্যাশা। এইরূপ পত্রের মাধ্যমে ক্রেতা বিক্রেতার ভুল-ভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বিক্রেতা তা মনোযোগ সহকারে পাঠ করে প্রতিকার সাধনের জন্য প্রস্তুত হন। সেইজন্য প্রতিবাদ পত্রের কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলো পত্রলেখকের স্মরণে থাকা দরকার।

এক—প্রতিবাদ পত্রের মূলে ক্রেতার বিরক্তি থাকলেও, যেন নগ্ন প্রকাশ না ঘটে;
দুই—কটূক্তি বা প্রত্যক্ষ কটাক্ষ করা অনুচিত ;
তিন—বাক্‌ভঙ্গি তির্যক হতে পারে, কিন্তু অসৌজন্যমূলক যেন না হয় ;
চার—প্রকৃত প্রতিবাদ পত্রের ভাষা হবে সংযত ও জ্বালাবিহীন ;
পাঁচ—যে ঘটনা বা পণ্যকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় অপরিহার্য।

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ তোমার বিদ্যালয় বই-এর অর্ডার দিয়াছে, বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান সেই বই সরবরাহ করিতে বিলম্ব করিতেছে। এই বিলম্বের প্রতিবাদ করিয়া একটি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৪০

ফোন : ৬৬-৫৫৫৩ — কেদারনাথ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
নবগ্রন্থ প্রকাশন — সাঁত্রাগাছি;
৮।২ মদন মিত্র লেন — হাওড়া
কলিকাতা-৬ — ৫ই জানুয়ারী, ১৯৬৭

মহাশয়,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর জন্য আপনাদের প্রকাশিত 'মডার্ণ রিডার' নির্বাচন করিয়াছি। ইহা আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। গত ২৫শে ডিসেম্বর ২০০ খানি 'মডার্ণ রিডার' পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া একখানি অর্ডার পত্র পাঠাইয়াছিলাম। ইহাতে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বইগুলি পাঠাইবার কথা উল্লিখিত ছিল। আপনারা আপনাদের ২৭ শে ডিসেম্বরের পত্রে এই বিষয়ে স্বীকৃতি জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে আপনারা আরও জানাইয়াছিলেন যে বই আপনাদের দোকানে মজুত আছে, সুতরাং দুই একদিনের মধ্যে তাহা পাঠাইতে আপনাদের কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত আপনাদের প্রকাশিত বই আমাদের বিদ্যালয়ে আসিয়া পেঁছায় নাই।

আপনাদের জানান হইয়াছিল যে আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ সমবায় পদ্ধতিতে সুলভ মূল্যে পুস্তক বিক্রয়ের যে দোকান পরিচালনা করেন, তাহার মাধ্যমেই ছাত্রগণ নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকাদি ক্রয় করিয়া থাকে। এখনও পর্যন্ত এই সকল বই আমাদের বিদ্যালয়ে আসিয়া পেঁছায় নাই। ইহাতে ছাত্রদের পড়াশুনার ক্ষতি হইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। আর তিনদিনের মধ্যে আপনাদের প্রকাশিত বইগুলি যদি আমরা না পাই তবে আমরা বইটি পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচন করিবার পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে বাধ্য হইব।

আশা করি, আগামী ৮ই জানুয়ারীর মধ্যে বইগুলি প্রেরণ করিয়া আমাদের নিশ্চিন্ত করিবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
স্বাঃ শ্রীজানকী রঞ্জন দত্ত
প্রধান শিক্ষক
কেদারনাথ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥ তুমি যে মালের অর্ডার দিয়াছিলে তাহা সরবরাহ করা হইলেও তাহা অত্যন্ত নিম্নমানের। এই বিষয়ে অভিযোগ করিয়া এবং ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে নির্দেশ চাহিয়া পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৪১

মহামায়া বস্ত্রালয়
[প্রখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ী]

ইস্ট ইণ্ডিয়া ক্লথ স্টোর্স
২১, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

গোরাবাজার
বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
৮।১।৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আমাদের ৩১শে ডিসেম্বরের প্রেরিত অর্ডার অনুযায়ী যে ৫০ জোড়া তাঁতের ধুতি পাঠাইয়াছেন. তাহা আমরা ৫ই জানুয়ারী তারিখে পাইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাক্ষর করিয়া চালানী রসিদ ফেরৎ পাঠাইবার পর দেখা গেল যে, ১৩ জোড়া ধুতি ছেঁড়া। এই ত্রুটিযুক্ত ধুতিগুলি যে বিক্রয়ের অযোগ্য তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখন পূজার বাজার। এই সময় এই ত্রুটিযুক্ত মালগুলি আসায় আমরা বিক্রয় করিতে না পারিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হইলাম। ইহাতে আমরা আমাদের কিছু অতি পরিচিত ক্রেতার সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইলাম। এই ক্ষতির পরিমাণ আপনারা সহজেই অনুমান করিতে পারেন্।

ত্রুটিযুক্ত মালগুলি এখন আমাদের দোকানে মজুত রহিয়াছে। পত্রের উত্তরে আপনাদের নির্দেশ আসিলে আমরা সেইমত ব্যবস্থা করিব।

আশাকরি, পত্রপাঠ আপনাদের নির্দেশ জানাইয়া বাধিত করিবেন।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীবসন্ত কুমার প্রামাণিক
[মহামায়া বস্ত্রালয়]

প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥ কোন বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের জনৈক কর্মচারী অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করিয়াছে। তাহার প্রতিবাদ করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিকট একখানি যথাযোগ্য পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৪২

মল্লিক লেদার হাউস

গ্রাম : 'মলেস'
ফোন : ২৪-৪৩৫১

৪৬ ধর্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৩
৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭

কানপুর লেদার ওয়ার্কস্
৬৯ডি, ব্রেবোর্ণ রোড
কলিকাতা-১

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী শনিবার আপনাদের প্রতিষ্ঠানের শ্রীতারাপদ গুহ তাগাদার জন্য আমাদের দোকানে আসিয়াছিলেন। শ্রীগুহ আপনাদের প্রতিষ্ঠানের তাগিদপত্র সঙ্গে আনিয়াছিলেন। কিন্তু ১লা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিন ও শনিবার হওয়ায় আমরা সঙ্গে সঙ্গে মূল্য শোধ করিতে পারি নাই। তাগিদপত্রে সপ্তাহ কালের মধ্যে মূল্য শোধের কথা বলা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও শ্রীগুহ তাঁহার নিকট তৎক্ষণাৎ টাকা দিবার দাবী জানাইতে থাকেন। আমরা তাঁহাকে সেই সময়ে মূল্য পরিশোধ করিবার অক্ষমতার কথা জানাই এবং তদনুযায়ী আপনাদের নিকট তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিই।

শ্রীগুহ পত্রখানি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং কয়েকটি আপত্তিজনক শব্দ ব্যবহার করিয়া উষ্মা প্রকাশ করেন। ইহাতে আমাদের এক কর্মচারী তাঁহাকে প্রমশিত করিতে গেলে তিনি মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়া অশোভন উক্তি করেন।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সহিত আমাদের প্রায় দীর্ঘ আট বৎসরের ব্যবসায়িক সম্পর্ক রহিয়াছে। আপনাদের নিকট হইতে আমরা বৎসরে সাত/আট হাজার টাকার মাল ক্রয় করিয়া থাকি। মূল্যশোধের ব্যাপারে আপনাদের নিকট হইতে আমরা কিছু বিশেষ সুবিধাও ভোগ করিয়া থাকি। কাজেই এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে, আপনারা নিশ্চয়ই শ্রীগুহের ব্যবহার সমর্থন করিবেন না। এই ঘটনাটি শুধুমাত্র দুঃখজনকই নহে, অস্বস্তিকর বলিয়া আপনাদের জানাইবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছি। এবং এই পত্র প্রেরণ করিতেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা এই ঘটনাটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে অনুসন্ধান করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে অনুরূপ অবাঞ্ছিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীতারক নাথ মল্লিক
মল্লিক লেদার হাউস

॥ দাবী পত্র ॥

বাণিজ্যিক পত্রের মধ্যে দাবী পত্রের গুরুত্ব অধিক। দাবী প্রতিবাদের পরবর্তী পর্যায় হলেও অনেক সময় একই প্রতিবাদপত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বলা চলে, প্রতিবাদ ও দাবীপত্র পরস্পর নির্ভর।

চালানী মাল চুক্তি অনুযায়ী কখনও প্রেরিত হয় বিক্রেতার দায়িত্বে, কখনও প্রেরিত হয় ক্রেতার দায়িত্বে। প্রেরিত পণ্য অনেক সময় পরিবহন কর্তৃপক্ষের হেপাজাত থেকে চুরি হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা মাল এসে পৌঁছতে অত্যন্ত বিলম্ব হয়। রেল-কর্তৃপক্ষ, ডাক বিভাগ, মোটর পরিবহন কর্তৃপক্ষ বা জাহাজী পরিবহন কর্তৃপক্ষ মাল পরিবহন করার সময় মালের সবরকমের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। কাজেই পরিবহন কালে যদি মাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অপহৃত হয় কিংবা [illegible] পৌঁছায় তবে তাঁরা চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকেন। এই ক্ষতিপূরণের দাবীদার কে? ক্রেতা প্রতিষ্ঠান না বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান? সেইটি ভালভাবে বুঝে পত্র রচনা করতে হয়। অনেক সময় মূল্য নিয়ে কিংবা কমিশান নিয়েও গোলমাল সৃষ্টি হতে পারে এবং ক্রেতাপক্ষ দাবীপত্র প্রেরণ করতে পারেন। দাবীপত্রের বিষয় একান্তভাবে টাকাকড়ি সংক্রান্ত হলেও বাণিজ্যিক পত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য—সৌজন্যবোধ।

সাধারণতঃ মাল গ্রহণ করবার সময় কতকগুলি প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়:

এক—প্যাকিং খোলা অথবা ভাঙ্গা হয়েছে কিনা—দেখা প্রয়োজন;

দুই—যদি মাল চালানের হিসাবের চেয়ে কম থাকে, তবে চালানে স্থানীয় দায়িত্বশীল কর্মচারীর স্বাক্ষর ও গৃহীত মালের পরিমাণ লিখিয়ে নেওয়া প্রয়োজন;

তিন—পরবর্তী কালে এই চালান বা চালানের অনুলিপিসহ দাবিপত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন;

চার—দাবীপত্রে ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করা প্রয়োজন।

অনেক সময় ক্ষতি পূরণ দাবীর জন্য সংস্থার প্রপত্রের (forms) ব্যবস্থা থাকে, সেক্ষেত্রে সেই প্রপত্র পূরণ করে দাবী পেশ করতে হয়।

[দ্রঃ—পরীক্ষার্থীরা এই ধরণের পত্র রচনা করতে গিয়ে ভুল করে। তাদের প্রশ্নের ভাষা থেকে বুঝে নিতে হবে পণ্য কার দায়িত্বে প্রেরিত হয়েছিল—বিক্রেতার না ক্রেতা। তারপর সেই অনুসারে পত্র রচনা করতে হবে।]

প্রশ্ন ॥ ৩০ ॥ রেলে তোমার যে মাল চালান আসিতেছে তাহা ঠিক মত আসে নাই- বলিয়া ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া রেল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে দরখাস্ত রচনা কর। [ক, বি, '৫৮]

আদর্শ পত্র—৪৩

জয়শ্রী টি মার্ট

[প্রখ্যাত চা ব্যবসায়ী]

গ্রাম : 'জয়শ্রী'

ফোন :

৭১, আর জি কর রোড
কলিকাতা-৭
২৮ ই ফেব্রুয়ারী '৬৭

প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা
পূর্ব রেলপথ
৩, কয়লাঘাট ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১

সবিনয়ে নিবেদন,

গত ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৬৭ তারিখের চ/২০৩-ক/ই. আর/৬৭ সংখ্যক রেল রসিদ অনুযায়ী ৫শত কিলোগ্রাম ওজনের চারিটি চা-এর বাক্স রেলযোগে শিলিগুড়ি স্টেশন হইতে আমাদের কলিকাতার ঠিকানায় প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আজও পর্যন্ত সেই চায়ের বাক্সগুলি আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছায় নাই। আশঙ্কা করিতেছি, বাক্সগুলি হারাইয়া গিয়াছে, কেননা শিয়ালদহ স্টেশনে বার বার অনুসন্ধান করিয়াও আমরা আমাদের মালের সন্ধান পাই নাই। তাই এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি।

আপনাকে এই পত্রে আমরা সত্বর উক্ত মালের বিষয়ে তদন্ত করিবার অনুরোধ জানাইতেছি। যদি ঐ মাল পথে হারাইয়া গিয়া থাকে তবে যত শীঘ্র সম্ভব দাবীর প্রপত্র (form) প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

বলা বাহুল্য, চুক্তি অনুযায়ী এই মাল পূর্ব রেলপথ কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে প্রেরণ করা হইয়াছিল, সুতরাং এই ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব উক্ত কর্তৃপক্ষের।

চালানে উল্লেখ আছে, উক্ত মালের মূল্য ২৮০০৲ (দুই হাজার আটশত) টাকা। সেই চালানের একটি অনুলিপি আপনাদের সুবিধার জন্য এই দরখাস্তের সহিত প্রেরিত হইল।

আশা করি, সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রেরিত মালের ক্ষতিপূরণস্বরূপ আমাদের প্রাপ্য অর্থ যথা সম্ভব শীঘ্র প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া বাধিত করিবেন।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীবিজনকান্তি বিশ্বাস
জয়শ্রী টি মার্ট

ক্রোড়পত্র : চালানের অনুলিপি

প্রশ্ন ॥ ৩১ ॥ যে নমুনার ভিত্তিতে মালের অর্ডার প্রদান করা হইয়াছিল, প্রেরিত মাল তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট মানের হওয়ায় যথাসংগত মূল্যহ্রাসের দাবী জানাইয়া একখানি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৪৪

অনুপমা ষ্টোর্স
[যাবতীয় উপহার সামগ্রী বিক্রেতা]

টেলিগ্রাম : অনুপা — ২৫এ ভূপেন বসু এভিনিউ
টেলিফোন : ৫৫-৩২১৩ — কলিকাতা-৪

কেন প্রডাক্টস্ (প্রাঃ) লিঃ
বাঁশদ্রোনী
২৪পরগণা

পূর্বসূত্র : অর্ডার নং ৩৬, তাং ১০ই জানুয়ারী '৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আমাদের ১০ই জানুয়ারী তারিখে প্রেরিত ৩৬ নং অর্ডারপত্রের অর্ডার অনুযায়ী প্রেরিত বেতের চেয়ারগুলি আজ সাতদিন হইল আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, যে নমুনার ভিত্তিতে আমরা অর্ডার দিয়াছিলাম, প্রেরিত মালগুলির মধ্যে ৪ জোড়া তাহার অনুরূপ নয়; উৎকর্ষের বিচারে এইগুলি তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট মানের। এই ধরণের বেতের চেয়ারের ডিজাইন মোটেই আকর্ষণীয় নয়। বাজারে এই ধরণের চেয়ারের চাহিদাও কম। এইগুলি বিক্রয় করিতেও যথেষ্ট সময় লাগে। ইহা আমাদের পক্ষে অলাভজনক, তাহা, আশা করি, আপনাদের বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

অর্ডারের চুক্তি অনুযায়ী এই মাল আমাদের পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। তবুও আপনাদের পরিবহন ব্যয় ইত্যাদির কথা স্মরণে রাখিয়া ইহা রাখিতে মনস্থ করিয়াছি। কিন্তু নমুনা মালের উৎকর্ষের ভিত্তিতে যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, উল্লিখিত ৪ জোড়ার মূল্য তদপেক্ষা কম হিসাবে ধরিতে হইবে। তাহা না হইলে আমাদের পক্ষে এই মাল রাখা অসম্ভব।

উল্লিখিত বেতের চেয়ারগুলির মূল্য জোড়া পিছু চল্লিশ টাকার বেশী কোনমতেই হইতে পারে না। আমাদের প্রস্তাবিত মূল্যে যদি দিতে রাজী না থাকেন, তবে দয়া

করিয়া মালগুলি ফেরৎ লইবার ব্যবস্থা করিবেন। আপনাদের সিদ্ধান্ত ব্যতীত এইগুলির বিক্রয় আমরা বন্ধ রাখিব।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীবিবেক রঞ্জন ভাদুড়ী
অনুপমা স্টোর্স

প্রশ্ন ॥ ৩২ ॥ তোমার বিদেশী মাল আমদানির ব্যবসা আছে। কিছু মাল পথে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উপযুক্ত খেসারত চাহিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে পত্র লিখ। [ক. বি. '৬২]

আদর্শ পত্র—৪৫

দি ওরিয়েণ্টাল ট্রেডার্স
(আমদানিকারক ও অর্ডার সরবরাহকারক)

গ্রাম : 'ওট্রেড'
ফোন : ২৪-৪৩২৬

১০৬/৩ এ সুরেশ ব্যানার্জী রোড,
কলিকাতা-১৪
২রা মার্চ, ১৯৬৭

কার্যাধ্যক্ষ,
প্যাটেল শিপিং এজেন্সি
মেট্রোপলিটন ইনস্যুরেন্স হাউস
দাদাভাই নওরোজি রোড
বোম্বাই—১

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন।

গত ২রা ডিসেম্বর ১৯৬৬ তারিখে জাপানের ইয়াকাহামা বন্দর হইতে ৩২,০০০ টাকা মূল্যের একটি আধুনিক 'প্রিন্টিং মেসিন' আপনাদের জাহাজে আমাদের কলিকাতার ঠিকানায় প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী এই মূল্যবান মেসিন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

মাল সরবরাহ লইবার কালে আমরা দেখি যে ইহার কয়েকটি সূক্ষ্ম অংশ প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, 'সতর্কতার সহিত' কথাগুলি এই মেসিনের উপর লেখা সত্বেও অসাবধানভাবে এই যন্ত্রটি নাড়াচাড়া করার ফলেই এইরূপ ঘটিয়াছে। এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে এবিষয়ে খিদিরপুর ডক্ ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং চালান পত্রে ক্ষতির বিবরণসহ তাঁহার স্বাক্ষর গ্রহণ করি। চালানে বর্ণিত হিসাব অনুযায়ী এই ক্ষতির পরিমাণ ৬,৮০০ টাকা।

চুক্তি অনুযায়ী এই মাল আপনাদের দায়িত্বে প্রেরিত হইয়াছিল। বলাবাহুল্য ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব আপনাদের।

আমরা এই সঙ্গে খিদিরপুর কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও বিবরণসহ মালের চালানপত্র এবং ক্ষতিগ্রস্থ মালের হিসাব প্রেরণ করিলাম।

আশাকরি, সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া যথাশীঘ্র ক্ষতিপূরণ বাবদ আমাদের প্রাপ্য অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া বাধিত করিবেন।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

শ্রীঅশোক রায়চৌধুরী
দি ওরিয়েণ্টাল ট্রেডার্স

ক্রোড়পত্র:

১। ডক্‌কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত দলিল
২। চালানপত্র
৩। ক্ষতিগ্রস্থ মালের তালিকা

॥ মীমাংসা পত্র ॥

অভিযোগ, প্রতিবাদ ও দাবীপত্রের প্রত্যুত্তরে আসে মীমাংসা পত্র। মীমাংসা পত্র-এই পর্যায়ে সর্বশেষ পত্র। পূর্ববর্তী পত্রাদিতে যে সব ভুলত্রুটির উল্লেখ করা হয় এই পত্রে তার ওপর যবনিকাপাত হয়। এই পত্রের মাধ্যমে একটি বাদানুবাদের অবসান ঘটে এবং সদিচ্ছা ও শুভবুদ্ধির পরিবেশ রচিত হয়। সাধারণত প্রতিবাদ পত্র বা দাবী পত্রের মীমাংসার সূত্র উল্লিখিত থাকে। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান যদি তাহা গ্রহণ করেন তবে মীমাংসার কাজ সহজেই সুসম্পন্ন হয়। যদি সম্মত না হয়ে নতুন কোন প্রস্তাব করেন, তবে তাতে ক্রেতা পক্ষের সম্মতির প্রয়োজন হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য যে এই জাতীয় পত্র বিনিময়ের সময় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়পক্ষই যথোচিত সৌজন্য বজায় রাখবেন।

প্রশ্ন ॥ ৩৩ ॥ তুমি যে মালের অর্ডার দিয়াছিলে তাহা সরবরাহ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার মাল ঠিক নাই এবং দরও বাজার অপেক্ষা উচ্চ। তুমি বাজারদরে যথামানের মাল ঐ ব্যবসায়ী ফার্মের নিকট হইতেই এই মালের পরিবর্তে লইতে ইচ্ছুক। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পত্রালাপ কর।

আদর্শ পত্র—৪৬

মল্লিক বিল্ডার্স এণ্ড কোং
(ঠিকাদার ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান)

গ্রাম : মল্লিক
ফোন : ৩৫-৩৫৩৫

৫৬ মানিকতলা মেন রোড,
কলিকাতা—৫৪
২রা ফেব্রুয়ারী '৬৭

দাস অ্যাণ্ড সাপ্লায়িং এজেন্সি
মগরা, হুগলী

পূর্বসূত্র : নির্দেশ পালনপত্র এম. বি/৬০২/৬৭ তাং ১৮।১।৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও [illegible] গ্রহণ করুন।

আপনাদের উপরোক্ত পত্র অনুসারে জানাইতেছি যে, ১৮/১/৬৭ তারিখে আপনারা যে বালি আমাদের নিকট পাইয়াছেন, ঐ ধরণের বালি সরবরাহ করিবার জন্য আমরা নির্দেশ দিই নাই। আপনারা যে নমুনাগুলি পাঠাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে আমরা যে নমুনাটি নির্বাচন করিয়াছিলাম, প্রেরিত বালির দানা তাহা অপেক্ষা অনেক মোটা এবং ইহা আমাদের পক্ষে ব্যবহারের অনুপযোগী।

এইরূপ অবস্থায়, যে মাল আমাদের প্রয়োজনে লাগিবে না তাহা গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই এই মালের চালান ফেরৎ পাঠাইতে হইল। সঙ্গে পুনরায় আমাদের নির্বাচিত নমুনা প্রেরিত হইল।

এই নমুনার বালি যদি আপনাদের বর্তমানে থাকে এবং যদি এক লরি বালি ২২০৲ টাকার চুক্তিতে সম্মত হন, তবে অবিলম্বে আমাদের অর্ডার অনুযায়ী এক লরি বালি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

মাল ফেরৎ পাঠাইতে হইল বলিয়া আমরা দুঃখিত। কিন্তু বাজারের বর্তমান অবস্থায় ইহা ভিন্ন আমাদের অন্য কোন উপায় ছিল না। তবে আমাদের অর্ডারের উল্লেখিত শর্তাবলী সমস্তই কার্যকারী থাকিবে।

আশা করি, ইহাতে আপনাদের সহিত আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কের কোনরূপ অবনতি ঘটিবে না এবং অর্ডার অনুযায়ী মাল পাইতে আমাদের বিলম্ব হইবে না।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন মল্লিক
মল্লিক বিল্ডার্স এণ্ড কোং

প্রশ্ন ॥ ৩৪ ॥ অর্ডার অনুযায়ী মাল প্রেরিত না হইয়া ভুলক্রমে কিছু নিকৃষ্ট মাল চলিয়া যাওয়ায় ক্রেতাপক্ষ উহা মূল্যহ্রাসের দাবী জানাইয়া পত্র দিয়াছে। এই দাবীর ভিত্তিতে একখানি উপযুক্ত মীমাংসা পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৪৭

কেন প্রডাক্টস্ (

(যাবতীয় বেতের দ্রব্য উৎপাদক)

গ্রাম : 'কেনপ্রড' বাঁশদ্রোনী

অনুপমা স্টোর্স ২৪, পরগণা

১৫এ ভুপেন বসু এভিনিউ ফেব্রুয়ারী '৬৭

কলিকাতা-৪

পূর্বসূত্র : অর্ডার নং ৩৬, তাং ১০/১/৬৭

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্র পাইলাম। আমাদের কর্মচারীর অসাবধানতার জন্য আপনাদের যে অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে, তাহার জন্য আমরা অতীব দুঃখিত।

আপনাদের প্রেরিত পত্রে আমাদের ত্রুটির বিষয় অবগত হইয়া আমাদের স্টক মিলাইয়া দেখিলাম যে, আপনাদের উল্লিখিত বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। এই অভিযোগ করিয়া আপনারা আমাদের প্রকারান্তরে সাহায্যই করিয়াছেন। অর্ডার অনুযায়ী প্রেরিত মালের মধ্যে অন্য ধরণের ৪ জোড়া বেতের চেয়ার আমাদের এক নবাগত কর্মচারীর ভুলক্রমে চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এবিষয়ে আঁপনারা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

আপনাদের অর্ডার বহির্ভূত যে চেয়ারগুলি চলিয়া গিয়াছে, সেইগুলি সম্পর্কে আপনাদের প্রস্তাবিত মূল্য আমাদের মূল্য তালিকার লিখিত মূল্য অপেক্ষা সামান্য কম হইলেও পরিবহন প্রভৃতির ব্যয় এবং আপনাদের সহিত দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা চিন্তা করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলাম। চালানী রসিদে সেইমত সংশোধন করিয়া এই সঙ্গে প্রেরণ করিলাম।

নবাগত কর্মীর অসাবধানতা বশতঃ সরবরাহে এই প্রকার ত্রুটির জন্য আপনাদিগকে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহার জন্য ক্ষমা করিবেন। ভবিষ্যতে যাহাতে

এই ধরণের ত্রুটি না ঘটে, তাহার জন্য আমরা সতর্ক থাকিব। আশা করি, ভবিষ্যতে আপনাদের সকলপ্রকার সহযোগিতা লাভে কৃতার্থ হইব।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীগৌরাঙ্গ বসাক
কেন প্রডাক্টস্ (প্রাঃ) লিঃ

ক্রোড়পত্র : চালানী রসিদ

অনুশীলনী

১। রেলে তোমার যে মাল আসিতেছে তাহা ঠিকমত আসে নাই বলিয়া ক্ষতি-পূরণ দাবি করিয়া রেল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে দরখাস্ত রচনা কর। [ক. বি. '৫৮]

২। তোমার চালানি মালের ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে পত্র লিখ। [ক. বি. '৬০]

৩। আসাম হইতে ২০০ কিলোগ্রাম ওজনের দুই বাক্স চা রেল যোগে বর্দ্ধমান স্টেশনে পাঠান হইয়াছিল। উহা হারাইয়া যাওয়ায় প্রাপকের পক্ষ হইতে ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া রেল কর্তৃপক্ষের কাছে একখানি দরখাস্ত কর। [ব. বি. '৬৪]

৪। ক্রেতা প্রেরিত মালের সহিত চালান এবং বিল পাইয়াও একমাসের মধ্যে টাকা শোধ করেন নাই। এক মাসের মধ্যে টাকা শোধ করিলেই ১২½% কমিশন দিবার ব্যবস্থা আছে, সে কথা স্মরণ করাইয়া আর ১৫ দিন সেই সুযোগের মেয়াদ বর্ধিত করিয়া একখানি তাগিদ পত্র রচনা কর। [ব. বি. (নর্ডি) '৬৩]

৫। আপনার বিদেশীমাল আমদানীর ব্যবসায় আছে। কিছু মাল পথে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উপযুক্ত খেসারত চাহিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে পত্র লিখুন। [ক. বি. (পুরাতন) '৬২]

৬। আপনি যে মালের অর্ডার দিয়াছিলেন তাহা সরবরাহ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার মান ঠিক নাই এবং দরও বাজার অপেক্ষা উচ্চ। আপনি বাজার দরে যথা মানের মাল ঐ ব্যবসায়ী ফার্মের নিকট হইতেই এই মালের পরিবর্তে লইতে ইচ্ছুক। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পত্রালাপ করুন। [ক. বি. (পার্ট ওয়ান) '৬২]

৭। অর্ডার অনুযায়ী মাল প্রেরিত না হইয়া কিছু ত্রুটিযুক্ত মাল চলিয়া গিয়াছে। ক্রেতার প্রস্তাবিত উচ্চহারের কমিশন দানের আশ্বাস দিয়া একখানি মীমাংসা পত্র রচনা কর।

নবম স্তর

এজেন্সী বা কারপরদাজী সংক্রান্ত পত্র

Letters releting to Agency

আধুনিক কালে ব্যবসা-বাণিজ্যের জগৎ ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। এখানে তাই অনেক সময়ে উৎপাদক বা বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। এই যোগ স্থাপিত হয় এজেন্ট বা প্রতিনিধি মারফৎ। ব্যবসা-জগতে এই এজেন্টদের ভূমিকা খুব নগণ্য নয়; কারণ এই এজেন্টরা 'খুচরা' ব্যবসায়ীদের কাছে পণ্য বিক্রি করে থাকেন এবং বিনিময়ে তাঁরা কিছু দস্তুরী বা কমিশন পেয়ে থাকেন। এই ব্যবস্থায় উৎপাদকও কিছু সুবিধে পেয়ে থাকেন, কারণ এজেন্ট বেশী পরিমাণে কমিশন পাওয়ার আশাতেই বেশী পরিমাণ পণ্য বিক্রি করে থাকেন।

এজেন্সী সংক্রান্ত পত্র ব্যবসায়ী ও এজেন্ট—দুপক্ষ থেকেই লিখিত হতে পারে। এজেন্ট এজেন্সী প্রার্থনা করে পত্র প্রেরণ করতে পারেন; আবার ব্যবসায়ীর পক্ষ থেকেও তেমনি এজেন্সী প্রদান পত্রও রচিত হতে পারে। কখনও কখনও ভাবী এজেন্টের উল্লিখিত যোগ্যতাবলী আছে কিনা ব্যবসায়ী প্রশ্ন করে পত্র রচনা করতে পারেন। এছাড়া আরও কয়েক ধরণের পত্র রচিত হতে পারে; যথা: ব্যবসায়ীর পক্ষ থেকে বিক্রয় হ্রাসের কারণ অনুসন্ধান; কম দামে পণ্য বিক্রির নির্দেশ; ব্যাপক প্রদর্শনীর নির্দেশ প্রভৃতি বিষয় পত্র রচিত হতে পারে। আবার এজেন্টের পক্ষ থেকে পণ্য-মানের অপকর্ষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ, চাহিদা হ্রাসের ফলে কম দামে বিক্রি অথবা পণ্য ফেরৎ দেওয়ার প্রস্তাব, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার অনুরোধ করে পত্র রচিত হতে পারে।

এজেন্ট তিন শ্রেণীর হতে পারে। যথা:

(১) স্থানীয় এজেন্ট (Local Agent)। এঁরা মাল বিক্রির ওপরে একটি নির্দ্দিষ্ট হারে দস্তুরি (Commission) পেয়ে থাকেন। কখনও কখনও একটি বিশেষ অঞ্চলের জন্য শুধুমাত্র একজনই এজেন্ট নিযুক্ত হয়ে থাকেন। এঁকে বলা হয় একক কারপরদাজ (Sole Agent)।

(২) দালাল (Broker)। এঁরা মালিকের পক্ষে মাল ক্রয়-বিক্রয় করেন এবং সেইজন্য একটা দালালী (Brokerage) পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে ক্রেতা এবং

বিক্রেতার মধ্যে সরাসরি কারবার চলে এবং দালাল দুপক্ষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে দেন।

(৩) ভ্রাম্যমাণ এজেণ্ট বা অভিকর্তা (Travelling Agent)। এঁরা মালিকের কাছ থেকে মাসে মাসে বেতন ও বিক্রির ওপর শতকরা হিসেবে একটা দস্তুরী পেয়ে থাকেন। মালিকের পক্ষ থেকে এঁরা বিভিন্ন জায়গায় অর্ডার সংগ্রহ করে মালিকের কাছে পাঠিয়ে দেন। এরপর ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে কারবার চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ অভিকর্তা মালিকের কাছ থেকে কেবলমাত্র দস্তুরি পেয়ে থাকেন। এই শ্রেণীর এজেণ্টরা সাধারণত একই সঙ্গে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন।

এজেন্সী প্রার্থনা পত্রে কতকগুলি বিষয় উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ; যেমন :

(ক) স্থানীয় বাজারে সংশ্লিষ্ট পণ্যের চাহিদার সম্ভাব্যতা ;
(খ) আর্থিক সংগতির নির্ভরযোগ্যতা ;
(গ) বিক্রয়ে নৈপুণ্য (Art of Salesmanship) ও পূর্ব অভিজ্ঞতা ;
(ঘ) পণ্য প্রচারের সুযোগ সুবিধা ;
(ঙ) দস্তুরির হার ও অন্যান্য সর্তাবলী ;
(চ) পরিচয়সূত্র
(ছ) আশাবাদিতা

এজেণ্টকে ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দেশ দেবার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন. তা না হলে নির্দেশের মধ্যে যদি কোনরকম অস্পষ্টতা থাকে, তা হলে ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

পণ্য বিক্রির নির্দেশ দেবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা দরকার ; যথা : (ক) পণ্যের পরিমাণ ও প্রকার ;
(খ) সর্বোচ্চ মূল্য ;
(গ) পণ্য প্রেরণ ও গুদামজাত করণের ব্যবস্থা ;
(ঘ) বীমার ব্যবস্থা, এবং
(ঙ) মূল্য পরিশোধের শর্ত।

এই প্রসঙ্গে এজেন্সী পত্রে সম্বোধন-রীতির একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখনীয়। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে এজেণ্ট বা কারপরদাজকে 'মহাশয়' বা 'সবিনয় নিবেদন' বলে সম্বোধন করা রীতি। কিন্তু যখনই তিনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন, তখনই তাঁকে প্রতিষ্ঠানের নিজের লোক বলে ধরা হয়। সুতরাং এই অবস্থায় তাঁদের নামোল্লেখ করে অন্তরঙ্গতা সূচক 'বাবু' যোগ করা বাঞ্ছনীয়।

॥ এজেন্সীর আবেদন ॥

প্রশ্ন ॥ ৩৮ ॥ বিশেষ একটি পণ্যের চাহিদা তোমার কারবারী এলাকায় রহিয়াছে, তাহা জানাইয়া এবং তোমার অন্যান্য যোগ্যতাবলীর উল্লেখ করিয়া এজেন্সী লইবার একখানি আবেদন পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৪৮

আদর্শ গ্রন্থালয়
[পুস্তক ব্যবসায়]

ফিডার রোড
বেলঘরিয়া
২৪ পরগণা
১৯শে জানুয়ারী '৬৭

আল্ফা পাবলিশিং কোং
১৪/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা : ১২

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

গত পনেরো বৎসর ধরিয়া এই অঞ্চলে অন্যান্য প্রকাশকগণের বই-এর সহিত আমরা আপনাদের প্রকাশিত স্কুল ও কলেজ পুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া আসিতেছি। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে আমাদের কারবারী এলাকায় আপনাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি বিক্রয়-বৃদ্ধির কৃতিত্ব আমাদেরই। আমরাই আপনাদের পুস্তকাদি এই অঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নির্বাচিত হওয়ার অনুকূলে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি। ইহাতে আপনাদের প্রকাশিত স্কুল পুস্তকের বিক্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি। এই কারণে আমরা আমাদের কারবারী অঞ্চলে আপনাদের প্রকাশিত পুস্তকাদির এজেন্সী প্রার্থনা করিতেছি।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, আমাদের পুস্তক প্রতিষ্ঠান এই অঞ্চলের একটি অভিজাত ও প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। আমাদের কারবারের বর্তমান চলতি মূলধনের পরিমাণ প্রায় ২৫,০০০ টাকা। স্থানীয় অন্যান্য ছোট ছোট পুস্তক বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের উপর আমাদের প্রভাব কম নহে। আমাদের দোকানটি দুইটি রাস্তার সংযোগস্থলে হওয়ায় ইহা বিক্রয় বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। ইহা ব্যতীত আমাদের একটি বিরাট প্রদর্শনী কক্ষও আছে, এইখানে একত্রে তিরিশ জন ক্রেতা পুস্তকাদি ক্রয় করতে পারেন। ইহার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক বিক্রয়কারী উপস্থিত থাকে। সুতরাং আপনাদের পুস্তক

বিক্রয় ও নিয়মিত টাকাকড়ি লেনদেন ব্যাপারে আমরা অভিজ্ঞতা, সংগঠন ও সততার নির্ভরযোগ্য আশ্বাস দান করিতে পারি।

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমরা সাধারণ পাইকার হিসাবে আপনাদের নিকট হইতে শতকরা ১২½ টাকা কমিশন পাইয়া আসিতেছি। এজেন্সীর জন্য আমরা শতকরা ১৮ টাকা কমিশন প্রার্থনা করিতেছি। বলা বাহুল্য, পুস্তক প্রেরণের ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় আপনাদিগকেই বহন করিতে হইবে।

আমাদের পত্রে উল্লিখিত তথ্যাদির সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য এবং আমাদের সম্পর্কে অন্যান্য যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ৫৬ কলেজ রো স্থিত 'মর্ডান পাবলিশার্স' হইতে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

আশা করি, আমাদের এজেন্সী দিয়া আমাদের উভয় পক্ষের ব্যবসায়িক স্বার্থসাধন ও আর্থিক পথ উন্মুক্ত করিবেন। আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীতাপস রঞ্জন চৌধুরী
আদর্শ গ্রন্থাগার

॥ এজেন্সী প্রদান ॥

প্রশ্ন ॥ ৩৬ ॥ জিয়াগঞ্জের কোন প্রতিষ্ঠানকে তোমার পণ্যের এজেন্সী গ্রহণের অনুরোধ করিয়া শর্ত ও সুবিধাদির উল্লেখপূর্বক একখানি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৪৯

রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী
[বিখ্যাত গেঞ্জি, মোজা প্রস্তুতকারক]

গ্রাম: 'রাজলক্ষ্মী' ২৫৬ মাণিকতলা মেন, রোড
ফোন: ৩৫-৫৫৫৫ কলিকাতা-৫৪
২১শে, ফেব্রুয়ারী '৬৭

শ্রীনিরঞ্জন রায়
স্বত্বাধিকারী
অঙ্গসজ্জা
জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

মহাশয়,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

জিয়াগঞ্জের 'রাণী স্টোর্স'-এর মালিক বন্ধুবর শ্রীমাখন ঘোষের নিকট হইতে

আপনার প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সুনাম এবং কার্য্যদক্ষতার বিষয় অবগত হইয়া প্রকারান্তরে তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আপনাকে আমাদের কারখানার প্রস্তুত হোসিয়ারী দ্রব্য সামগ্রী ঐ এলাকায় বিক্রয় করিবার জন্য এজেন্সী দিবার বিষয়ে চিন্তা করিতেছি ও এবিষয়ে আপনার সুচিন্তিত অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের কারখানার নাম আপনি নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন এবং আমাদের এই কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রীর সহিত সম্ভবত আপনার ইতিমধ্যেই পরিচয় ঘটিয়াছে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন বাজারে আমাদের কারখানায় প্রস্তুত মালের নিয়মিত চাহিদা আছে। কিন্তু দূরত্বের জন্য যোগাযোগ রাখিতে না পারায় ঐ জেলায় প্রচুর পরিমাণে মাল যোগান দিয়া উঠিতে পারা সম্ভবপর হইতেছে না। সেইজন্য, আপনার নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে, যদি আপনি উক্ত অঞ্চলে আমাদের কারখানাজাত হোসিয়ারী দ্রব্যাদির বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে, আমাদের উভয়ের পক্ষেই ঐ ব্যবস্থা লাভজনক হইবে বলিয়া আশা করি।

বাজারে আমাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিশেষ পরিচিত বলিয়া এইসব পণ্য বিক্রয় করিতে আপনাদের কোনরকম অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে না। উপরন্তু বিক্রয়ের সুবিধার জন্য আমাদের নিজস্ব ব্যয়ে বিজ্ঞাপনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিব। আপনার বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য এ সম্পর্কে একটি খসড়া পরিকল্পনাও ক্রোড়পত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ থাকে যে, আমরা ১২½% টাকা হিসাবে দস্তুরি দিয়া থাকি এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করি। আশা করি, সহানুভূতির সহিত আমাদের প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আপনার অনুমোদন পাইলে আমরা চুক্তিপত্র প্রেরণ করিব।

আপনাদের সমৃদ্ধি কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক

ক্রোড়পত্র : একটি

শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ দত্ত
রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী

অনুশীলনী

১। ব্রিটেনের একটি পুস্তক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কারবারের উদ্দেশ্যে তোমার অভিপ্রায় ও সামর্থ্য জানাইয়া একটি পত্র রচনা কর। [ক. বি. '৫৭]

২। বিদেশী কারবারের এজেন্সী লইবার উদ্দেশ্যে সেই কারবারের কর্তৃপক্ষকে নিজের ব্যবসায়ের বিবরণ দিয়া পত্র লিখ।

৩। কোন ভোগ্যপণ্যের সরবরাহকারকের নিকট উক্ত পণ্যদ্রব্যের এজেন্সী চাহিয়া তোমার নিজ কারবারের বিস্তৃত পরিচয়সহ একটি পত্র লিখ।

[ক. বি. '৬৩]

৪। মালদহের কোন প্রতিষ্ঠানকে তোমার পণ্যের এজেন্সী গ্রহণের অনুরোধ জানাইয়া সর্ত ও সুবিধাদির উল্লেখপূর্বক একখানি পত্র রচনা কর।

৫। বিক্রয়ের অবনতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এবং ত্রৈমাসিক বিক্রয়-বিবরণী প্রেরণ করিতে অনুরোধ জানাইয়া তোমার এজেন্টের নিকট পত্র লিখ।

৬। এজেন্টের [illegible] প্রচুর পরিমাণ মাল মজুত আছে জানিয়া এবং বিক্রয়ে বিলম্ব হইলে পণ্যের গুণ হ্রাস পাইবে অনুমান করিয়া অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিবার নির্দেশ দিয়া তোমার এজেন্টের নিকট একখানি পত্র লিখ।

৭। নিয়মিত মূল্য পরিশোধ না করায় তোমার ব্যবসায় ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে ও এজেন্সী বাতিল করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ কর।

ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা সংক্রান্ত পত্র

দশম স্তর

Letters relating to Banking and Insurance

॥ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত পত্র ॥

আমানত গ্রহণ ও ঋণদান—মুখ্যত এই দুটি কাজের মধ্যেই ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ, কিন্তু অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই কার্যক্ষেত্র ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। আমানতকারীর পক্ষ থেকে তাঁর নামে অন্য ব্যাঙ্কের চেকে টাকা আদায় করা, তাঁর হুণ্ডি, ড্রাফ্‌ট, বণ্ড ইত্যাদি ভাঙ্গিয়ে [illegible], তাঁর পক্ষ থেকে বীমা কোম্পানি ও অন্যান্যক্ষেত্রে টাকা প্রেরণ করা, মূল্যবান অলঙ্কারাদি ও দলিলপত্র গচ্ছিত রক্ষা, শেয়ার ক্রয়বিক্রয় করা ইত্যাদি বহুবিধ কার্য ব্যাঙ্ক বর্তমানে করে থাকে। ব্যাঙ্কের ওপর অর্পিত এই সমস্ত কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের দিক থেকে কিংবা আমানতকারীর দিক থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটতে পারে এবং সেই ত্রুটিকে কেন্দ্র করেই নানারকম পত্র রচিত হতে পারে। ব্যাঙ্কের সঙ্গে পত্রালাপ করার সময়, ব্যাঙ্কের হিসাব সংখ্যা (Account No.) উল্লেখ করতে হয়। সাধারণতঃ এই ধরণের পত্র নির্দিষ্ট 'ফর্ম' বা প্রপত্র পূরণ করে রচনা করা হয়ে থাকে। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে, অর্থাৎ সাধারণ পত্রও লিখিত হতে পারে।

প্রশ্ন ॥ ৩৭ ॥ তোমার পরিচালিত কুটির শিল্পের প্রসার বাড়াইবার উদ্দেশ্যে যুক্তি দেখাইয়া অতিরিক্ত মূলধনের জন্য ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে পত্র লিখ। [ক. বি. '৬১]

আদর্শ পত্র—৫০

শিল্পাশ্রম

[কুটির শিল্পের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান]

গ্রাম : আশ্রম

৫ডি, গড়িয়াহাট মার্কেট

ফোন : ৪৬-৯৩৬৯

কলিকাতা-২৯

হিসাব সংখ্যা : গ/৩৯৬৬/৬৫

২রা মার্চ, ১৯৬৭

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়া

(গড়িয়াহাট ব্রাঞ্চ)

৮১সি, রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা

বিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

স্বাধীন ভারতে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা যে ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, সে সম্পর্কে আপনাদের নিকট সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই মনে করি। তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের কুটির শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা যে ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে সেই দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি। আমাদের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার ক্রমসম্প্রসারণশীল। ইতিমধ্যেই খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনের মাধ্যমে ও কারু-শিল্প ও তন্তুশিল্প রপ্তানি কর্পোরেশনের মাধ্যমে আমরা প্রায় ১৮ হাজার (আঠারো হাজার) টাকার পণ্য বিদেশে রপ্তানি করিয়াছি। ইহাতে আমরা যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করিয়াছি।

উৎসাহিত হইয়া আমরা আমাদের 'শিল্পাশ্রম'-এর সম্প্রসারণের জন্য মনস্থির করিয়াছি। আমাদের প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের সহিত শুধুমাত্র কয়েকজনের স্বার্থই জড়িত নহে, গ্রামীন ভারতের অর্থনীতি এবং বিশেষভাবে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। এবিষয়ে তাই আপনাদের সহযোগিতা ও সাহায্য আমাদের কাম্য।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের জন্য অন্তত ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকার দরকার। আপনাদের সহিত আমাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক দীর্ঘকালের। এই কথা চিন্তা করিয়াই আপনাদের নিকট এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি উত্থাপন করিতে সাহসী হইতেছি। আমাদের পুঁজি, সংগতি ও সুনামের কথা, আশা করি, পুনরায় বিস্তৃত ভাবে বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। তদুপরি আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের ১০,০০০ টাকা মূল্যের দলিলটি আপনাদের নিকট গচ্ছিত রাখিব স্থির করিয়াছি।

আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রহিলাম। পত্রের উত্তর পাইলে সেই মত অগ্রসর হইব। আশা করি, সহযোগিতার দ্বারা আমাদের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করিতে সাহায্য করিবেন।

আপনাদের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

শ্রীকেশব চন্দ্র মান্না
শিল্পাশ্রমের পক্ষে

প্রশ্ন ।। ৩৮ ।। তোমার পাস বই হাল-নাগাদী (up-to-date) করিতে অনুরোধ করিয়া ব্যাঙ্কের নিকট পত্র লিখ।

আদর্শ পত্র—৫১

আল্‌ফা পাবলিশিং কোং
(প্রখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী)

গ্রাম : আল্‌ফা
ফোন : ৩৪-৪৪০৬

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৩
২৫ শে মার্চ, ১৯৬৭

দি ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
কলেজ ষ্ট্রীট শাখা
৩ডি কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

সবিনয়ে নিবেদন,

আগামী ৩১শে মার্চ আমাদের ব্যবসার বর্ষশেষ। ঐ সময় পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাব-নিকাশ সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমাদের পাস বই হাল-নাগাদী করিয়া লওয়া প্রয়োজন সুতরাং উক্ত তারিখ পর্যন্ত লেনদেনের হিসাব অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমাদের নামে ৩০৭৮ নং চলতি আমানতের পাস বইখানিকে অনুগ্রহপূর্বক হাল-নাগাদী করিয়া ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে আমাদের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

ইহা ব্যতীত, হিসাব পরীক্ষকের নিকট দাখিল করিবার জন্য সেইসঙ্গে একখানি উদ্ধৃত পত্র পাঠাইলে বাধিত হইব।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীনিরঞ্জন বসাক
কার্য্যাধ্যক্ষ
আল্‌ফা পাবলিশিং কোং

ক্রোড়পত্র : একখানি চলতি আমানতের পাস বই।

প্রশ্ন ॥ ৩৯ ॥ তুমি একটি নূতন কারবার শুরু করিবে। ব্যাঙ্কে তোমার হিসাবে যে অর্থ জমা আছে, তাহা যথেষ্ট নয়। জমাতিরিক্ত ঋণের আবেদন করিয়া তোমার ব্যাঙ্কের নিকট একখানি আবেদন পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৫২

প্রগ্রেসিভ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ফোন: ২৪-১২০২ — ৩১ ক্রীক লেন
সূচক সংখ্যা-২৭৭২ — কলিকাতা-১৪
২২শে ফেব্রুয়ারী '৬৭

মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ
শিয়ালদহ শাখা
মহাত্মাগান্ধী রোড,
কলিকাতা

সবিনয়ে নিবেদন,

আপনাদের ব্যাঙ্কে আমার প্রায় ৩২,০০০ (বত্রিশ হাজার) টাকার চলতি আমানত আছে। আপনাদের সহিত আমার ব্যবসায়িক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের।

আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমার ব্যবসা সম্প্রসারিত হইতেছে। ঐ সম্প্রসারণের জন্য কিছু অতিরিক্ত মূলধন প্রয়োজন। অথচ আপনাদের ব্যাঙ্কে বর্তমানে যে পরিমাণ অর্থ জমা রহিয়াছে, প্রয়োজনের তুলনায় তাহা কিছু কম। আপনাদের নিকট সেই অতিরিক্ত অর্থ ঋণ প্রার্থনা করিতেছি।

কিন্তু আপাততঃ জামিনস্বরূপ গচ্ছিত রাখিবার মত শেয়ার বা অনুরূপ সম্পত্তি আমার নিকট নাই। তবে দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া এই আবেদন জানাইতেছি যে আমাদের সুনাম, সততা ও স্থায়িত্বের কথা স্মরণে রাখিয়া এই জমাতিরিক্ত ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের বাধিত করুন।

আমাদের চলতি আমানতের উপর আমরা আর ৬ হাজার (ছয় হাজার) টাকা প্রার্থনা করিতেছি। এই প্রসঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, ঋণদানের তিন মাস সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত ৩,০০০ টাকার সমমূল্যের শেয়ার কিংবা অনুরূপ সম্পত্তি জামিন রাখিব। আশা করি, পত্রের উত্তরে আমাদের এই আবেদনের অনুকূলে আপনাদের অভিমত জানাইয়া বাধিত করিবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

শ্রীসুব্রত দস্তিদার
প্রগ্রেসিভ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

প্রশ্ন ॥ ৪০ ॥ চেকে উল্লিখিত অঙ্কের বেশী টাকা ব্যাঙ্কে জমা থাকা সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক চেক প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাঙ্কের নিকট পত্র প্রেরণ কর।

আদর্শ পত্র—৫৩

ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
কলেজ ষ্ট্রীট শাখা
১, বিধান সরণি
কলিকাতা-১২

তপন কুমার মৈত্র
৯৩।৬ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬
৩রা মার্চ, ১৯৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'মান্না ডেয়ারী'র নামে আমি ২০০৲ (দুশো টাকা) একখানি চেক দিয়াছিলাম, উক্ত চেকের সংখ্যা ছিল বি ডি/২/৬০৭৩২।

আমার পূর্ববর্তী চেকে টাকা দেওয়ার পর ৪৩৬ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। তারপর গত ১লা মার্চ তারিখে ৫৫০ টাকার একখানি চেক আদায়ের জন্য আমি আপনাদের নিকট জমা দিয়াছি। কাজেই গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের চেকখানি ভাঙ্গাইবার পক্ষে উল্লিখিত তারিখ পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমান টাকা আপনাদের কাছে জমা থাকা সত্ত্বেও চেকখানি প্রত্যাখ্যান হওয়ায় বিস্মিত হইলাম। এইভাবে চেক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ইহা যে কেবল আমার ব্যক্তিগত মর্যাদা হানিকর হইয়াছে তাহাই নহে, ইহাতে আমার সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্য্যাদাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

জমা দেওয়া চেকের টাকা আদায়ের যথেষ্ট সময় আপনারা পাইয়াছেন। তথাপি আমার চেকখানি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে—ইহার কারণ জানাইলে বাধিত হইব।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীতপনকুমার মৈত্র

প্রশ্ন ॥ ৪১ ॥ বিলাত হইতে মাল আনাইবার জন্য বিদেশী মুদ্রা চাহিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষকে পত্র লিখ। [ক. বি. '৬৩]

আদর্শ পত্র—৫৪

বসন্তপ্রাণ ইলেকট্রিক কোং

(বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আমদানি ও রপ্তানিকারক)

টেলিগ্রাম : বসন্ত — ২, গারষ্টিন প্লেস

টেলিফোন : ২৩-৪৭২২ — কলিকাতা-১

আমদানি লাইসেন্স নং ইন্ডিয়া চ/৫০২/৬৬-৬৭ — ৫ই মার্চ, ১৯৬৭

প্রশাসক,

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া

নয়াদিল্লী

সবিনয় নিবেদন,

স্বাধীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রম-সম্প্রসারিত হইতেছে। আমরা দীর্ঘকাল হইল এই বাণিজ্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি আমাদের বিদেশ হইতে আমাদের দেশের শিল্পপ্রগতির চাহিদানুসারে কিছু বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হইতেছে। এখন আমাদের রপ্তানির তুলনায় আমদানির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতে হইতেছে।

এমতাবস্থায় কয়েকটি সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আমদানির অর্ডার আমাদের নিকট আসিয়াছে। এইসব যন্ত্রপাতির মূল্য যথেষ্ট বেশী। পঃ জার্মানীর নিকট হইতে এই যন্ত্রপাতিগুলি আমাদের ক্রয় করিতে হইবে। বৈদেশিক মুদ্রা ব্যতীত এই অর্ডার অনুযায়ী এইসব যন্ত্রপাতি আমদানি করা ও সরবরাহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ভারতীয় মুদ্রায় উক্ত যন্ত্রপাতির মূল্য প্রায় ৮০ হাজার টাকা। কাজেই উপযুক্ত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। ইহার জন্য সমপরিমাণ ভারতীয় মুদ্রা আপনাদের নিকট জমা দিতে আমরা প্রস্তুত।

আশা করি, আমাদের দেশের দ্রুত শিল্পায়নের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের প্রার্থনা পূরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

শ্রীকাশীকান্ত রায়

বসন্তপ্রাণ ইলেকট্রিক কোং

॥ বীমা সংক্রান্ত পত্র ॥

মানুষের জীবনে যেমন বিপদ আপদ আছে, তেমনি ব্যবসা বাণিজ্যও আছে অনিশ্চয়তা। জীবনের এই বিপদাশঙ্কা ও ব্যবসার ক্ষেত্রের এই অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে রক্ষা-বাচক হল—বীমা।

বীমা নানাপ্রকার যেমন জীবনবীমা, অগ্নিবীমা, নৌবীমা প্রভৃতি। জীবন ও সম্পত্তির বীমা হয়।

জীবন-বীমা প্রধানত দুই শ্রেণীর হয়—আজীবনবীমা ও মেয়াদীবীমা। উভয় বীমাতেই বীমাকারী তাঁর দাবীদার (nominee) নির্বাচন করে যেতে পারেন। মেয়াদী-বীমার ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হলে বীমাকারী স্বয়ং বীমাকৃত অর্থ নিয়ে থাকেন অথবা মেয়াদকালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর দাবীদার বা আইনসম্মত উত্তরাধিকারী ওই টাকা পান। এই ধরণের বীমায় বীমাকারীকে মেয়াদকাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম (বা চাঁদা) দিতে হয়। আজীবনবীমায় বীমাকারীকে নির্দ্দিষ্টকাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম দিতে হয়, কিন্তু বীমাকৃত টাকা দেয়া হয় মৃত্যুর পরে। আজীবন ও মেয়াদী —উভয় বীমাই লভ্যাংশযুক্ত (with profit) ও লভ্যাংশহীন (without profit) হতে পারে। তবে প্রথমটির ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার কিছুটা বেশী।

জীবনবীমাকারীর জীবন-হানি ঘটলে যেমন, তেমনি অগ্নিবীমাকারীর সম্পত্তি অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হলে বা নৌবীমাকারীর সম্পত্তি জলপথে অথবা ডকে নষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট বীমা কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ দানে চুক্তি অনুযায়ী বাধ্য।

সাধারণতঃ দু' বছর প্রিমিয়াম দেওয়ার পর বীমাপত্রের প্রদত্ত প্রিমিয়ামের সম-পরিমাণ টাকা লাভ করার অধিকার আসে। সেই প্রাপ্য টাকাকে বলা হয় প্রত্যর্পণ মূল্য (Surrender Value)। যে সমস্ত বীমাকারী প্রিমিয়াম দিতে অপরাগ, তাঁরা এইভাবে বীমাপত্র প্রত্যর্পণ করে বীমাটিকে আদায়ীকৃত (Paid up) করে নিতে পারেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে বীমাকারী এই টাকা পান না। নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হলে সুদসমেত সেই টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। তবে দু বছর পরে প্রিমিয়াম দেওয়ার পর প্রত্যর্পণ মূল্যের সমান অর্থ বীমা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ঋণ হিসাবে নেওয়া যায়।

১৯৫৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ভারত সরকার জীবনবীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেওয়ার পর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ বহুদিকে প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে যৌথজীবন বীমা (Joint policy) বহুমুখী বীমা (multipurpose policy) কন্যার বিবাহ (marriage policy) সন্তানদের শিক্ষা (educations policy) প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বীমা হচ্ছে। বিভিন্ন বীমা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর সরকার এইসব প্রতিষ্ঠানকে একটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখন এই প্রতিষ্ঠান "লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া" নামে পরিচিত। তবে ভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠানগুলি এই কর্পোরেশনের অধীনে এক একটি 'ইউনিট' (unit) হিসেবে কাজ করেছে। তাই বীমা-সংক্রান্ত পত্রাদিতে পত্র সংখ্যার উল্লেখ যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ইউনিটের সংখ্যা ও ঠিকানার উল্লেখ।

প্রশ্ন ॥ ৪২ ॥ ভারতীয় বীমা নিগমের নিকট বীমাপত্র বন্ধক রাখিয়া তুমি ঋণ লইতে ইচ্ছুক; কি সর্তে কত দিনের মধ্যে কত ঋণ লইতে পার, জানিতে চাহিয়া কার্যাধ্যক্ষের নিকট একখানি পত্র লিখ।

[ব. বি. '৬২]

আদর্শপত্র—৫৫

টেলিফোন নং: ৪৭-৮৫২৩ — ২৯ এ হাজরা রোড, কলিকাতা: ২৬, ৭ ই মার্চ, ১৯৬৬

কার্যাধ্যক্ষ,
ভারতীয় বীমা নিগম
ইউনিট সংখ্যা—২
৬, কাউন্সিল হাউস
কলিকাতা-১

বীমাপত্র সংখ্যা—৭৮-২৩৫২০৫

সবিনয়ে নিবেদন,

ভারতে দ্রুত শিল্পায়ন হইতেছে। এই সময় ক্ষুদ্রশিল্পের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। তাই আমি একটি ক্ষুদ্র শিল্পোৎপাদন কারখানা স্থাপন করিব বলিয়া সিদ্ধান্ত লইয়াছি। আমি এই কারখানায় টিনের ছোট ছোট কৌটা প্রস্তুত করিব। এইরূপ একটি কারখানা স্থাপন করিতে প্রায় ২০,০০০৲ (কুড়ি হাজার টাকা) চলতি মূলধন প্রয়োজন। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত পুঁজি মাত্র ১০,০০০৲। তবে আমার প্রায় ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকার বীমাপত্র আছে।

আমি এই বীমাপত্র আপনাদের নিকট বন্ধক রাখিয়া আমার দরকারী মূলধন ঋণ লইবার সিদ্ধান্ত লইয়াছি। পঁচিশ বছরের মেয়াদী এই বীমাপত্রের বারো বছরের চাঁদা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় কি সর্তে, কতদিনের মধ্যে এবং কত পরিমাণ অর্থ আপনাদের নিকট হইতে ঋণ লইতে পারি, জানাইলে কৃতজ্ঞ থাকিব।

উত্তরের প্রত্যাশায় থাকিলাম।

নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রশ্ন ॥ ৪৩ ॥ নিয়মিত প্রিমিয়াম দিতে অসামর্থ্যহেতু বীমাপত্র প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত লইয়াছ। বীমা কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ একখানি পত্র প্রেরণ কর।

আদর্শ পত্র—৫৬

লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া
সিটি শাখা, ইউনিট সংখ্যা ৫
র‍্যালি বিল্ডিং, স্ট্র্যাণ্ড রোড
কলিকাতা

১৩সি বাগবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪
১২ই মার্চ, ১৯৬৭

বীমাপত্র সংখ্যা : ৬৭৫৪০২

সবিনয়ে নিবেদন,

আমার উল্লিখিত সংখ্যক বীমার প্রিমিয়ামটি বার্ষিক পর্যায়ের। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, সম্প্রতি আমার আর্থিক অবস্থা আকস্মিকভাবে অস্বচ্ছল হইয়া পড়ায় আমি নিয়মিতভাবে প্রিমিয়াম দিতে অক্ষম। গত ১৯৫১ সাল হইতে দেয় প্রিমিয়াম আমি এ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে দিয়া আসিয়াছি। তবে এই বীমাপত্রটি এখন প্রত্যর্পণ করা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উপায় দেখিতেছি না।

আমার উল্লিখিত সংখ্যক বীমার প্রত্যর্পণ মূল্য এই বৎসর কত হইবে এবং তাহা পাইতে হইলে আমার করণীয় কি, পত্রের উত্তরে জানাইলে বাধিত হইব।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীদীনবন্ধু ঘোষাল

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ তোমার বীমাপত্রটির প্রিমিয়ামের নির্দ্ধারিত কিস্তি অসুবিধাজনক হইয়া পড়ায় ইহার পরিবর্তন সাধনের জন্য আবেদন করিয়া একখানি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৫৭

কর্মাধ্যক্ষ,
লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া
সিটি শাখা, ইউনিট নং ৭
৬৪, গনেশচন্দ্র এভিন্যু,
কলিকাতা-১

১৬/১ গুরুসদয় দত্ত রোড
কলিকাতা-১৯
২৩শে মার্চ, ১৯৬৭

বীমাপত্র সংখ্যা ৪৩২২০২

সবিনয়ে নিবেদন,

আমার উপরোক্ত সংখ্যক বীমাপত্রটির জন্য প্রদত্ত প্রিমিয়াম মাসিক পর্যায়ের। সম্প্রতি নানারকম অসুবিধা দেখা দেওয়ায় আমি প্রিমিয়ামের সময়টি ষান্মাসিক করিয়া

লইতে চাহি। উক্ত বীমা পত্রটির জন্য আমি ছয় বৎসর ধরিয়া নিয়মিত কিস্তিতে প্রিমিয়াম দিয়া আসিয়াছি। সপ্তম বৎসরে চতুর্থ কিস্তির প্রিমিয়াম দিবার তারিখ হইতেছে ৪।৪।৬৭। আমি ইতিমধ্যে এই বৎসরের প্রথম তিনটি মাসের প্রিমিয়ামের কিস্তি নিয়মিতভাবে প্রদান করিয়াছি, কিন্তু এখন আমি এইটিকে ষান্মাসিক করিয়া লইতে চাহি, সুতরাং এসম্পর্কে আমার করণীয় কি তাহা সত্বর জানাইলে সবিশেষ উপকৃত হইব। ইহা ব্যতীত উক্ত বীমাপত্রটির জন্য ষান্মাসিক কিস্তিতে প্রিমিয়ামের হারই বা কিরূপ হইবে এবং এই ধরণের পরিবর্তনের ফলে কোনপ্রকার ছাড় (rebate) পাওয়া যাইবে কিনা তাহাও জানাইয়া বাধিত করিবেন।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক

শ্রীজীবন রতন ধর

প্রশ্ন ॥ ৪৫ ॥ তোমার বীমাপত্রের মূল প্রস্তাবের পরিবর্তন সাধনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ও করণীয় বিষয় সম্পর্কে জানিতে চাহিয়া পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৫৮

১১৭ রাসবিহারী এভিন্যু
কলিকাতা-২৯
৩১শে মার্চ, '৬৭

কার্যাধ্যক্ষ,
লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া
সিটি শাখা, ইউনিট নং ৯
৬৪, সাদার্ন এভিন্যু, কলিকাতা-১

মেয়াদী বীমাপত্র সংখ্যা : ২৬৩৪২৯

সবিনয়ে নিবেদন,

আমার উপরোক্ত বীমাটি ২৫ বৎসরের মেয়াদী বীমাপত্র। বর্তমানে উক্ত মেয়াদ কিছু কমাইয়া উহাকে ২০ বৎসরের মেয়াদী বীমাপত্রে পরিণত করিতে ইচ্ছা করি। এসম্পর্কে আমার করণীয় কি তাহা জানাইলে বাধিত হইব।

পত্রের উত্তরের প্রত্যাশায় রহিলাম।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রশ্ন ॥ ৪৬ ॥ কোন একটি কোম্পানী তাহার গুদামে রক্ষিত মালের জন্য অগ্নিবীমা করিতে মনস্থ করিয়াছে, তুমি সেই কোম্পানীর কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে একটি আবেদন পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৫৯

বেঙ্গল পাবলিশিং কোং
[প্রখ্যাত পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা]

গ্রাম : 'বেঙ্গল' ৩৩, কলেজ রো
ফোন : ৩৪-৪৪০৬ কলিকাতা— ৯
ফ্রি ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোং লিঃ ই মার্চ, ১৯৬৭
৪৪, মিশন রো একস্‌টেনশান
কলিকাতা-১

অগ্নিবীমা সংখ্যা : ক-ছ/২৬৯৪/৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

'বেঙ্গল পাবলিশিং কোং'-এর পরিচালকবর্গ কোম্পানির নিজস্ব গুদামে সংরক্ষিত ছাপা ফর্মা ও বাঁধানো পুস্তকাদির উপর আগামী বৎসরের জন্য ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টাকার একটি চলতি অগ্নিবীমা করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আমার উপর আপনাদের সহিত যোগাযোগ করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। এই কারণে, আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, এই বিষয়সংক্রান্ত প্রিমিয়াম-হার ও নিয়মাবলী যদি আপনারা আমার নিকট পাঠান, তবে আমি চলতি বৎসরের সমাপ্তি সভায় পরিচালক বর্গের সম্মুখে উহা উপস্থাপিত করিব। সুতরাং এবিষয়ে যত শীঘ্র সম্ভব আপনাদের মত জানাইয়া বাধিত করিবেন।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীকুলদারঞ্জন বিশ্বাস
কার্যাধ্যক্ষ
বেঙ্গল পাবলিশিং কোং

প্রশ্ন ॥ ৪৭ ॥ গুদামে রক্ষিত মালের জন্য অগ্নিবীমা করিবার জন্য যে আবেদন পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে তাহার উত্তরে ইন্‌সিওরেন্স কোং পক্ষ হইতে একখানি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৮৬০

ফ্রি ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

গ্রাম : ফ্রিইণ্ড
ফোন : ২৩-৪৭২২

৪৪, মিশন রো এক্সটেনশান
কলিকাতা-১
২৩শে মার্চ, ১৯৬৭

কর্মাধ্যক্ষ
বেঙ্গল পাবলিশিং কোং
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

সূত্র : অগ্নিবীমার আবেদন পত্র/১৮.৩.৬৭

মহাশয়,

আপনার ১৮ই মার্চ তারিখের লিখিত অগ্নিবীমা সম্পর্কিত অনুসন্ধান পত্র-খানি পাইয়া আমরা আনন্দিত। এজন্য আপনাকে ও আপনার প্রতিষ্ঠানকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্পর্কে আমাদের কোম্পানির নিয়মাবলী ও প্রিমিয়ামের হার সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠান-পত্রের একটি কপি এই পত্রের সহিত প্রেরণ করা হইল। এ সম্পর্কে আপনাদের সহিত সবিস্তারে আলোচনা করিবার জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানের একজন এজেণ্ট শীঘ্রই আপনায় সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তবে এজেণ্ট যাইবার পূর্বেই আপনাদের নিকট আমাদের অনুষ্ঠান পত্রটি পৌঁছাইবে এবং আপনারা প্রেরিত অনুষ্ঠান-পত্র হইতে সত্যই বুঝিতে পারিবেন যে, অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আমাদের প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী ও প্রিমিয়ামের হার বীমাকারীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছে।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীসুনির্মল বসু
আধিকারিক
অগ্নিবীমা বিভাগ
ফ্রি ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

ক্রোড়-পত্র :
একখানি অনুষ্ঠান পত্র

প্রশ্ন ॥ ৪৮ ॥ অগ্নিকাণ্ডের ফলে গুদামে রক্ষিত সমস্ত বই পুড়িয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ জানাইয়া অগ্নিবীমা কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র-৬১

বেঙ্গল পাবলিশিং কোং
(প্রখ্যাত পুস্তক প্রকাশক বিক্রেতা)

গ্রাম : বেঙ্গল
ফোন : ৩৪-৪৪০৬

৩১, কলেজ রো
কলিকাতা-৯
২৭শে এপ্রিল, ১৯৬৭

কর্মাধ্যক্ষ,
ফ্রি ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
৪৪, মিশন রো এক্‌সটেনশান
কলিকাতা-১

অগ্নিবীমাপত্র সংখ্যা—ল/২৪০২

সবিনয়ে নিবেদন,

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আজ ভোর ৫ ঘটিকায় আমাদের ২৯/১ এ্যাণ্টনি বাগান লেনস্থ উল্লিখিত অগ্নিবীমা পত্রসংস্থাবাহী গুদামটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে।

আমাদের গুদামের নিযুক্ত রক্ষী ভোররাত্রে হঠাৎ গুদামের একটি পার্শ্বে অগ্নি শিখা দেখিয়া হতবাক হইয়া যায়। কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া ফোনে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীকে এই সংবাদ প্রদান করে এবং দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই অগ্নিনির্বাপক দল উপস্থিত হইয়া আগুন নির্বাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু চল্লিশ মিনিট কাল ধরিয়া দুইটি অগ্নিনির্বাপক গাড়ী চেষ্টা করিয়াও আগুন আয়ত্তে আনিতে সক্ষম না হওয়ায় সমগ্র গুদাম ঘরটি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

কিরূপে এইরূপ অগ্নিকাণ্ড ঘটিল তাহা আমাদের অজ্ঞাত, তবে অগ্নিনির্বাপক বিশেষজ্ঞের মতে বৈদ্যুতিক তারের ত্রুটি হইতে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটা সম্ভব। কিন্তু আমরা মাত্র তিনদিন পূর্বে একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা সমস্ত লাইন পরীক্ষা করাইয়া লইয়াছিলাম। তিনি তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্টে বৈদ্যুতিক লাইনটি ত্রুটিমুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার স্বাক্ষরিত পত্রটি আমাদের নিকট আছে।

অদ্য প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকায় সংক্ষেপে এই সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সংবাদ লইয়া জানিয়াছি আগামীকাল সকল দৈনিক পত্রেই আলোকচিত্র সমেত অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ মুদ্রিত হইবে।

এই দুর্ঘটনার ফলে আমাদের গুদামে সংরক্ষিত আনুমানিক ৩৪,০০০ টাকা মূল্যের বই পুড়িয়া গিয়াছে। হিসাবের খাতাপত্র আমাদের ৩৩, কলেজ রো-স্থিত অফিস ঘরেই থাকে, সুতরাং আপনারা এই খাতাপত্র দেখিয়া ক্ষতির পরিমাণ সহজেই স্থির করিয়া লইতে পারিবেন।

অনুগ্রহপূর্বক পত্রপাঠ আপনাদের দুর্ঘটনা-পরিদর্শক মহাশয়কে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনের জন্য পাঠাইবেন। এবং সেইসঙ্গে আপনাদের প্রপত্র পাঠাইবেন। ক্ষতিপূরণের দাবীর সমর্থনে আমাদেয় কি কি প্রয়োজনীর কাগজপত্র দিতে হইবে, তাহা অবিলম্বে জানাইলে বাধিত হইব।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীকুলদারঞ্জন বিশ্বাস
কর্মাধ্যক্ষ
বেঙ্গল পাবলিশিং কোং

[বি, দ্র: এই জাতীয় ক্ষতিপূরণ দাবীর সমর্থনে যে পত্র রচিত হইবে, তাহাতে প্রমাণ করিতে হইবে দুর্ঘটনাটি ইচ্ছাকৃত নহে—সম্পূর্ণ আকস্মিক।]

প্রশ্ন ॥ ৪৯ ॥ নৌবীমা সম্পাদিত মাল বিদেশ হইতে জাহাজ যোগে আসিবার সময় সমুদ্রপথে জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া নৌবীমা কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখ।

আদর্শ পত্র-৬২

ইণ্ডিয়ান জুট এক্স্‌পোর্টাস্

গ্রাম: ইনজুট
ফোন: ২৩-৬৬০৪

২৪, হেয়ার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১
২৩ শে এপ্রিল, ১৯৬৭

আধিকারিক
নৌবীমা বিভাগ
ওভারসীজ ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
২৩/২ নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা-১

নৌবীমা সংখ্যা—ঘ ৬০৩২/৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

সম্ভবত আপনারা অবগত আছেন যে, কলিকাতা হইতে অষ্ট্রেলিয়াগামী জাহাজ

'এস. এম. জলপরী'র খোলে অগ্নিকাণ্ড হওয়ার ফলে আমাদের রপ্তানিকৃত ১৫,৭৫০ হাজার টাকা মূল্যের ১৫০ গাঁট পাটের মধ্যে ৬০ গাঁট পাট সম্পূর্ণভাবে ও ৩৩ গাঁট পাট আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। উক্ত তথ্য আমাদের মাদ্রাজস্থিত প্রতিনিধি মারফত প্রাপ্ত ও আপনাদের মাদ্রাজস্থিত পরিদর্শকের বিবৃতির দ্বারা সমর্থিত। আমাদের প্রতিনিধি ও আপনাদের মনোনীত পরিদর্শক—এই উভয়েরই পত্রের অনুলিপি নিম্নে সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

আপনাদের পরিদর্শকের বিবৃতি এবং আমাদের প্রতিনিধির দাবী অনুযায়ী ক্ষতির পরিমান নিম্নরূপ।

প্রতি গাঁট ১০৫৲ টাকা হিঃ সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ৬০ গাঁট পাটের দাম—	৬৩০০৲
প্রতি গাঁট ৫৩৲ টাকা হিঃ আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ৩৩ গাঁট পাটের দাম—	১৭৪৯৲
আপনাদের মনোনীত পরিদর্শকের পারিশ্রমিক—	৭৫
মোট—	৮১২৪৲

আশা করি, আপনারা আমাদের আমদানিকারক মালকানি ব্রাদার্স-এর দ্বারা প্রেরিত দাবী-জ্ঞাপক পত্র সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিয়া আমাদের বাধিত করিবেন।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীধনঞ্জয় দাস
ইণ্ডিয়ান জুট এক্স্পোর্টার্স

প্রশ্ন ॥ ৫০ ॥ পূর্ববর্তী উত্তরে বীমা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে একটি পত্র লিখ।

আদর্শ পত্র-৬৩

ওভারসীজ ইনসিওরেন্স ...

গ্রাম : ওভারসীজ
ফোন : ২৩-৬৯৭৩

২৩/২ নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা-১
২৭শে এপ্রিল, ১৯৬৭

ইণ্ডিয়ান জুট এক্স্পোর্টার্স
২৪, হেয়ার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১

পূর্বসূত্র : ঘ ৬০৩২/৬৭ সংখ্যক নৌবীমা পত্রের উপর দাবী

সবিনয়ে নিবেদন,

আপনাদের ২৩শে এপ্রিল তারিখে লিখিত পত্রটিতে আপনাদের প্রেরিত মালের ক্ষতির কথা জানিতে পারিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। এ সম্পর্কে আমরা আমাদের মাদ্রাজস্থিত পরিদর্শক ও সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশান কোম্পানির নিকট পত্র লিখিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে উত্তর আসিতে আরও সাত দিন সময় লাগিবে বলিয়া মনে হয়। ফলে উত্তর পাইবার পূর্বে আমাদের পক্ষে কোন রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

তবে আপনারা ইতিমধ্যে আপনাদের দাবীভুক্ত আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৩ গাঁট পাট স্বতন্ত্র ভাবে যথা[illegible] সুরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া দিবেন এবং এসম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত জানাইবার পর তবেই আপনারা ঐগুলির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীপ্রভাত রঞ্জন বোস
আধিকারিক
নৌ-বীমা বিভাগ

অনুশীলনী

১। কাস্টম্ হইতে মাল খালাস করিবার জন্য তোমার ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ চাহিয়া একটি পত্র রচনা কর। [ক. বি. '৫৯]

২। তোমার পরিচালিত কুটির শিল্পের প্রসার বাড়াইবার উদ্দেশ্যে যুক্তি দেখাইয়া অতিরিক্ত মূলধনের জন্য ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে পত্র লিখ। [ক. বি.'৬১]

৩। একটি নূতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে টাকার দাদন চাহিয়া ও ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদন পত্র লিখ। [ক. বি. '৬২]

৪। বিলাত হইতে মাল আনাইবার জন্য বিদেশী মুদ্রা চাহিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখ। [ক. বি. '৬৩]

৫। কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। একটি ব্যাঙ্কের পরিচালক হিসাবে এই নীতির অশুভ ফল প্রতিপন্ন করিয়া একটি স্মারক পত্র (memorandum) রচনা কর। [ক. বি. '৬৪]

৬। ব্যাঙ্কে তোমার হিসাবে উপযুক্ত পরিমাণ টাকা থাকা সত্ত্বেও তোমার একখানি চেক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এ বিষয়ে অভিযোগ করিয়া ও কারণ জানিতে চাহিয়া ম্যানেজারের নিকট একখানি পত্র লিখ। [ব. বি. '৬১]

৭। তোমার বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণকল্পে ব্যাঙ্ক হইতে টাকার-দাদন চাহিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদন পত্র লিখ।

৮। তোমার জীবন-বীমাপত্র হইতে ঋণ চাহিয়া বীমা প্রতিষ্ঠানের সহিত পত্রালাপ কর।

৯। ভারতীয় বীমা নিগমের নিকট বীমাপত্র বন্ধক রাখিয়া তুমি ঋণ লইতে ইচ্ছুক, কি শর্তে কতদিনের মধ্যে কত ঋণ লইতে পার জানিতে চাহিয়া কার্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখ। [ব. বি. (মার্চ) '৬২]

১০। মেয়াদী বীমার নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইয়াছে। জীবনবীমা কর্তৃপক্ষের নিকট বীমার টাকা দাবী করিয়া একখানি পত্র রচনা কর।

১১। তোমার অগ্নিবীমাকৃত বই বাঁধানোর কারখানাটী আগুন লাগিয়া আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া অগ্নিবীমা কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখ।

১২। চলতি নৌবীমার প্রস্তাব দিয়া একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বীমা প্রতিষ্ঠানের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ কর।

১৩। মাদ্রাজ হইতে রেঙ্গুনগামী একখানি জাহাজ জলমগ্ন হওয়ায় তোমার প্রেরিত নৌবীমাকৃত মাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নৌবীমা কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষতিপূরণ চাহিয়া একখানি পত্র রচনা কর।

আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত পত্র

একাদশ স্তর

Letters relating to Import and Export

যে কোন দেশের উন্নতি বাণিজ্য সম্প্রসারণের ওপর নির্ভরশীল। স্বাধীন ভারতের উন্নতিও অনেকাংশে বাণিজ্য-সম্প্রসারণের ওপর নির্ভরশীল বলে ভারত বিশেষত রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ফলে আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত পত্রের গুরুত্ব ক্রমবর্দ্ধমান।

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের অনুমতির (License) প্রয়োজন হয় কারণ এই বিষয়টি কেন্দ্রিয়সরকারের আয়ত্তাধীন। কাজেই আমদানি সংক্রান্ত পত্রে লাইসেন্স নং উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আমদানি সংক্রান্ত পত্র রচনা কালে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখতে হয়। যেমন—

এক. ভারত সরকার বিদেশীরাষ্ট্রের সঙ্গে যে সব পণ্যের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ, কেবলমাত্র সেই সব দেশের সঙ্গে এবং সেই সব পণ্যের ব্যাপারে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য চলতে পারে।

দুই. আমদানি ও রপ্তানি লাইসেন্স সংখ্যা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

তিন. কোন বিনিময় ব্যাঙ্ক বা ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট দেশের বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যেতে পারে।

চার. মূল্য প্রদান বা মূল্য পরিশোধ বিনিময় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

পাচ. সর্বশেষে, এই সকল পত্রগুলি সংক্ষিপ্ত ও বাহুল্য বর্জিত হওয়া উচিত এবং পত্রগুলি সৌজন্য পূর্ণ হওয়া একান্তে আবশ্যক।

মনে রাখা দরকার, এই জাতীয় পত্রের সঙ্গে জাতীয় মর্যাদা বিশেষ ভাবে জড়িত।

প্রশ্ন ॥ ৫১ ॥ ব্রিটেনের কোন একটি পুস্তক প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের নিকট কিছু সংখ্যক পুস্তক প্রেরণের অর্ডার দিয়া একখানি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৬৪

নিউম্যান পাবলিশিং কোম্পানি

গ্রাম ঃ নিউম্যান
ফোন ঃ ২৩-১২৩৭

৬৩/২এ চৌরঙ্গী প্লেস
কলিকাতা :
২৮ শে এপ্রিল '৬৭

কর্মাধ্যক্ষ,
ফোনেন্স হাউস লিঃ
এলডাইন হাউস
বেডফোর্ড ষ্ট্রীট
লণ্ডন, ডব্লু, সি, ২

আমদানি অনুমতি পত্র সংখ্যা ঃ ছ/৬৯৯/ভারত/৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

প্রথমেই আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত কোন কোন পুস্তকের চাহিদা ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আপনাদের প্রকাশিত কিছু বই আমাদের নিকট মজুত ছিল, চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বইগুলি কিছুদিন হইল নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, ফলে আমরা অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছি। আমাদের ক্রেতাদের অনুরোধে আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির অর্ডারসংখ্যা সমেত আপনাদের নিকট প্রেরণ করিতেছি। আশা করি, চাহিদার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন ও আপনারা যথা শীঘ্র সম্ভব পুস্তকগুলি বিমানে পাঠাইলে বাধিত হইব।

১৫০ খানি দি ইংলিশ নভেল—গ্রন্থকার শ্রী ওয়ালটার এ্যালেন

৫০ খানি ট্রাডিশন এণ্ড ড্রিম—গ্রন্থাকার শ্রী ওয়ালটার এ্যালেন

ব্রিটেন ও ভারতের বাণিজ্যচুক্তিতে পুস্তকের আমদানি রপ্তানি উভয় সরকারের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। আপনাদের দেয় কমিশন (আমাদের প্রাপ্য) বাদ দিয়া উল্লিখিত পুস্তকগুলির মূল্য আমরা মার্কেনটাইল ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় পরিশোধের জন্য আপনাদের দেয় ৩২২৫ টাকা ৬০ পয়সার (তিন হাজার ছশো পঁচিশ টাকা ষাট পয়সা) একখানি চেক পাঠাইতেছি।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রী ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীপ্রসেনজিৎ মাইতি
(নিউম্যান পাবলিশিং এর পক্ষে)

প্রশ্ন ॥ ৩২ ॥ কোনও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে শিল্প উন্নয়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানির অনুমতি চাহিয়া কেন্দ্রিয় সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত মন্ত্রকের নিকট একটি পত্র প্রেরণ কর।

আদর্শ পত্র—৬৫

স্ট্যান্স ইঞ্জিনীয়ারিং ফিরমা

টেলিগ্রাম : স্ট্যান্স
টেলিফোন : ৩৪-৯৭৭৯

সচিব
বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার
নয়া দিল্লী

৭০, মহাত্মাগান্ধী রোড
কলিকাতা : ৯
২০ শে এপ্রিল, ১৯৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

অনুন্নত ভারতকে উন্নত করার যে কর্মসূচী স্বাধীন ভারতের সরকার গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে সাফল্যের সহিত আমাদের সীমিত দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম হইয়াছি বলিয়া আমরা গর্বিত। ভারতের দ্রুত শিল্পায়নের পক্ষে এখন নানা প্রকার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, এবং কিছু কিছু যন্ত্রপাতি আমাদের দেশের বিভিন্ন শিল্প সংস্থা উৎপাদন করিলেও, কোন কোন যন্ত্রপাতি এখনও বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইতেছে।

আমরা ক্ষুদ্র শিল্পের দ্রুত প্রসারের জন্য লেদ ও ড্রিলিং মেশিন উৎপাদন করিতেছি। ইহার জন্য আমরা সূক্ষ্ম কয়েকটি যন্ত্রপাতি পশ্চিম জার্মাণী হইতে আমদানি করিতে মনস্থ করিয়াছি। এই যন্ত্রপাতিগুলি ব্যবহার করিলে আমাদের উৎপাদিত লেদ ও ড্রিল মেশিন উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে। ভারতে প্রয়োজনীয় অংশগুলি এখন সামান্য পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদের মান তত উৎকৃষ্ট নহে। এই জন্যেই আমরা কয়েকটি ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ আমদানি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি।

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, এবং ভারতের দ্রুত শিল্পায়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণে রাখিয়া আপনারা উক্ত যন্ত্রপাতিগুলি আমদানি করিবার অনুমতি দান করিবেন বলিয়া মনে

করি। এই অনুমতি দান করিয়া শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে সুযোগ দিলে আমরা বাধিত হইব।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীপ্রণব কুমার ভৌমিক
স্ট্যান্স ইঞ্জিনীয়ারিং ফিরমার পক্ষে]

প্রশ্ন ॥ ৫৩ ॥ বিদেশের কোন ব্যবসায় সংস্থা তোমার প্রতিষ্ঠানের পণ্য ক্রয় করিতে চাহিয়া পত্র দিয়াছে। এই পত্রের উত্তরে তোমার সম্মতি ও এই সঙ্গে তোমার সামর্থ্যের কথা জানাইয়া একখানি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৬৬

রাজা ইঞ্জিনীয়ারীং কোং (প্রাঃ লিঃ
[বৈদ্যুতিক পাখা উৎপাদক ও রপ্তানিকারক]

গ্রাম : রাজা
ফোন : ২৩-৭৮৮৭

৯, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১
২৭শে এপ্রিল, ১৯৬৭

হল এণ্ড এ্যাণ্ডারসন
২০৯, ক্লিপার মিল রোড
সিডনী
অষ্ট্রেলিয়া

সূচক সংখ্যা গ/৩০২৮/৬৭

সবিনয় নিবেদন,

প্রথমেই আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনাদের ৩রা এপ্রিল ১৯৬৭ সালে লিখিত পত্র আমরা যথাসময়ে পাইয়াছি। আপনারা আমাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত 'ক্লাইড' ফ্যান ক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমরা ইতিপূর্বে দূর প্রাচ্যে ও মধ্য এশিয়ার কয়েকটি দেশে আমাদের উৎপাদিত

'ক্লাইড' পাখা রপ্তানি করিয়াছি। এই সব দেশের ক্রেতাদের নিকট হইতে আমরা বিপুল ভাবে প্রশংসা লাভ করিয়াছে। এই প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া আমরা আমাদের পাখার মান আরও উন্নত করিবার চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছি। ইহাতে আমরা সন্তোষজনক ফলও লাভ করিয়াছি। এখন আমরা আত্মবিশ্বাস লইয়া যে কোন দেশে আমাদের পাখা রপ্তানি করিবার সাহস রাখি।

অষ্ট্রেলিয়া আমাদের প্রতিবেশীদেশ। আপনাদের শিল্পোন্নত দেশে আমাদের প্রস্তুত পাখা রপ্তানি করিতে পারিব ভাবিয়া আমরা যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করিতেছি। আমরা আপনাদের ক্রয় প্রস্তাবে সম্মত আছি। আমরা ইতিপূর্বে বিদেশে যে মাল প্রেরণ করিয়াছি তাহাতে ভারতীয় মুদ্রায় শতকরা কুড়ি টাকা হারে কমিশন দিয়াছি। আপনাদেরও আমরা এই [illegible] হারে কমিশন দিতে প্রস্তুত আছি। ইহা ব্যতীত ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন জাহাজে কোম্পানীর মাল প্রেরণের সমস্ত ব্যয় আমরাই বহন করিব। ভারতে শাখা আছে, এইরূপ যে কোন বিনিময় ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় আমাদের দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করা চলিবে। তবে ভারতীয় মুদ্রায় এই মূল্য শোধ করিতে হইবে।

আশা করি, আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে আপনাদের অসুবিধা হইবে না। আমাদের রপ্তানি অনুমতি পত্র আছে। কাজেই আমাদের প্রস্তুত পাখা আপনাদের নিকট রপ্তানি করিতে আমাদের কোন রূপ অসুবিধা নাই। পত্র পাঠ আপনাদের মূল্যবান অর্ডার দান করিয়া আমাদের বাধিত করিবেন।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক

শ্রীরাজকুমার বাগচি

[রাজা ইঞ্জিনীয়ারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ]

অনুশীলনী

১। ব্রিটেনের একটি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কারবারের উদ্দেশ্যে তোমার অভিপ্রায় ও সামর্থ্য জানাইয়া একটি পত্র লিখ।

[ক. বি. বি.কম '৫৭]

২। বিদেশী কারবারের এজেন্সী পাইবার উদ্দেশ্যে সেই কারবারের কর্তৃপক্ষকে নিজের ব্যবসায়ের বিবরণ দিয়া পত্র লিখ। [ক. বি. বি.কম '৬২]

৩। ফ্রান্সের কোন শিল্প সংস্থার নিকট হইতে তুমি ভারতের শিল্পোন্নয়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি আমদানি করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছ। এ বিষয়ে তোমার সামর্থ্য ও শর্ত জানাইয়া একখানি উপযুক্ত পত্র রচনা কর।

৪। ইটালির কোন প্রতিষ্ঠান তোমার প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করিতে চাহিয়া পত্র দিয়াছে। তোমার সামর্থ ও শর্ত জানাইয়া পত্র রচনা কর।

৫। যুগোশ্লভিয়ার কাছে ৫০খানি ট্রাক্টরের অর্ডার দিয়া এবং তোমার শর্ত জানাইয়া একখানি পত্র রচনা কর।

৬। সিঙ্গাপুরের কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তোমার কারখানায় উৎপাদিত সেলাই কল কিনিতে ইচ্ছুক। ব্যবসার শর্তাবলী জানাইয়া পত্র লিখ।

দ্বাদশ স্তর

প্রচার ও জনযোগ সংক্রান্ত পত্র
Letters relating to Publicity and Public Relation

যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হল সংবাদ পত্র। সংবাদপত্রের 'সম্পাদকের নিকট পত্র' স্তম্ভটির গুরুত্ব অসীম। সাধারণতঃ জনসাধারণের বৃহৎ স্বার্থের দিকে নজর রেখেই এই সব পত্র রচিত হয়। এই পত্রের বৈশিষ্ট্য [illegible], ব্যক্তিগত ভাবে এই পত্রে কোন উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্ভাষণ করা হয় না। সংবাদ পত্রে প্রকাশ করাই হল এই সব পত্রের লক্ষ্য। তাই এই সব পত্রে সম্পাদককে সম্ভাষণ করা হলেও তিনি লক্ষ্য নন—উপলক্ষ মাত্র। সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে রচিত এই সব পত্রে কোন অন্যায় বা অবাঞ্ছিত ব্যাপারের প্রতিকার কল্পে জনসাধারণের বিবেকবোধ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্তব্যবোধ জাগ্রত করাই এই সব পত্রের উদ্দেশ্য।

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে যেমন দেশের রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি যে কোন বিষয় নিয়ে সুনিশ্চিত মতামত প্রকাশিত হয়ে থাকে, তেমনি এই স্তম্ভে দেশের যে কোন নাগরিক যে কোন বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে তাঁর সুনিশ্চিত মত প্রকাশ করতে পারেন। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত মতামত যে, যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়ে থাকে তার প্রমাণ হল এই যে, এই চিঠিপত্র স্তম্ভটি সংবাদ পত্রের যে পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সেই পৃষ্ঠাতেই স্থান পায়; সুতরাং এই পত্র যথেষ্ট সুচিন্তিত ও সুলিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধারণত এই স্তম্ভে প্রকাশিত চিঠিপত্র সংক্ষিপ্তই হয়, তবে কখনও বিষয়ের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে তা দীর্ঘ ও হতে পারে। তবে প্রেরিত হলেই সমস্ত পত্র প্রকাশিত হয় না। সম্পাদকের বিবেচনার ওপর তা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

এই জাতীয় পত্রের ভাষা হবে মার্জিত, যুক্তিসিদ্ধ এবং সৌজন্যপূর্ণ। যদি পত্রলেখক বোঝেন তাঁর লিখিত পত্রের দ্বারা তাঁর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তবে পত্র লেখক তাঁর নাম ঠিকানা উল্লেখ করতে পারেন; কিন্তু ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে সম্পাদককে নাম গোপন রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। এধরণের ক্ষেত্রে 'প্রত্যক্ষদর্শী', 'জনৈক ভুক্তভোগী', 'জনৈক প্রধান শিক্ষক', 'ওয়াকিবহাল' প্রভৃতি ছদ্মনাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তবে সম্পাদককে পুরো নাম ঠিকানা জানাতে হয়। তবে এই সব পত্রের জন্য সম্পাদক কোন ভাবেই দায়ী নন।

প্রচার পত্র একটু ভিন্ন জাতের পত্র। প্রচার সংক্রান্ত পত্রও তাই। প্রচারপত্রে সাধারণত প্রতিষ্ঠান বিশেষকে সম্ভাষণ করা হয়ে থাকে ; কিন্তু দ্বিতীয় ধরণের পত্র লিখিত হয়ে থাকে সংবাদপত্রের সম্পাদকের উদ্দেশ্যে। কখনও কখনও সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তি রূপেও এই জাতীয় পত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে। 'স্মারকপত্র' বা 'খোলাচিঠি'-কে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

প্রশ্ন ॥ ৩৪ ॥ তোমার প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত কোন পণ্যের প্রচার কল্পে একটি প্রচার পত্র কর।

আদর্শ পত্র—৬৭

ঘোষ ডেয়ারি, আগড়পাড়া
২০শে এপ্রিল '৬৭

বিশুদ্ধ ঘি বিক্রেতা হিসাবে ঘোষ ডেয়ারির নাম আজ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সুপরিচিত। আজ কুড়ি বৎসর হইল ঘোষ ডেয়ারি তাহাদের আগড়পাড়াস্থিত কারখানায় কর্মীদের দ্বারা অভিজ্ঞ তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে যে ঘি উৎপাদন করিয়া আসিতেছে, বিশুদ্ধতা ও গুণগত মানের বিচারে বাজারে প্রচলিত অন্য কোন ঘি-এর সহিত তাহার তুলনাই হয় না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন ঘি প্রস্তুতকারকের গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে খাঁটি দুধ সংগ্রহ করিবার এমন ব্যাপক ব্যবস্থা নাই। ঘোষ ডেয়ারির দুধ সংগ্রহের ভ্যানগুলি বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে প্রতিদিন দুধ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসে। ফলে টাটকা দুধ ব্যবহার করিয়া তাহারা যে ঘি উৎপাদন করে তাহা গুণগত বিচারে ও বিশুদ্ধতায় অতুলনীয়। কিন্তু শুধুমাত্র খাঁটি দুধ সংগ্রহ করিলেই খাঁটি ঘি উৎপাদন করা যায় না। ইহার জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও দক্ষ কর্মী। বলা বাহুল্য, ঘোষ ডেয়ারি কুড়ি বৎসর ধরিয়া এই কাজে লিপ্ত থাকিয়া এক দল কর্মীকে সুদক্ষ করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ঘোষ ডেয়ারিতে নিযুক্ত কয়েকজন সুশিক্ষিত কর্মী প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ঘি উৎপাদনের উপযুক্ত পদ্ধতিটি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে। ফলে বর্তমানে বাজারে ঘোষ ডেয়ারির প্রস্তুত 'ঘি' অসাধারণ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

ঘোষ ডেয়ারি আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছে যে, তাহারা তাহাদের উৎপন্ন

উৎকৃষ্ট 'ঘি' এর মতই উৎকৃষ্ট 'মাখন' উৎপাদন করিবার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছে। এবং আগামী জুন মাস হইতে ঘোষ ডেয়ারির উৎপাদিত মাখন নানা পরিমাণের টিনের কৌটায় বা কাগজের প্যাকেটে বাজারে ছাড়া হইবে। ঘোষ ডেয়ারি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করিতেছে তাহাদের প্রস্তুত মাখন গুণগত বিচারে ও বিশুদ্ধতায় বাজারের সেরা মাখন বলিয়া অচিরেই পরিচিত ও জনপ্রিয় হইবে।

ঘোষ ডেয়ারির ঘি বিক্রয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত পাইকারী বিক্রেতা আছেন, তাঁহারা ব্যতীত এই মাখন যাহাতে আপন গুণগত বৈশিষ্ট্যে দ্রুত বাজার দখল করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে কলিকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের ঘি ও মাখন ব্যবসায়ীদের নিকট কারপরদাজ বা পাইকারী বিক্রেতা হইবার জন্য আহ্বান জানান যাইতেছে। দুই মাসে যাঁহারা এই আহ্বানে সাড়া দিয়া ঘোষ ডেয়ারিকে উৎসাহ দান করিবেন, প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ চিরকাল তাঁহাদের কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিবেন। এই সঙ্গে তাঁহারা এই প্রতিশ্রুতিও দিতেছেন যে, ভবিষ্যৎ কাজ কারবারে তাঁহাদের ব্যবসায়িক অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। ইহা ব্যতীত আরও ঘোষণা করা হইতেছে, প্রথম দুই মাসের কর্মপর্যায়ে যে দস্তুরি দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা শতকরা ৩ ভাগ অধিক দস্তুরি এই সব প্রাথমিক সহযোগী বিক্রেতাদের দেওয়া হইবে।

বাজারে ক্রেতাদের নিকট প্রিয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সরবরাহে ঘাটতি না পড়ে তাহার জন্য ঘোষ ডেয়ারি সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। সুতরাং ক্রেতাদের কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে না—ঘোষ ডেয়ারি এই প্রতিশ্রুতি দিতেছে।

নিবেদক
শ্রীরতনচন্দ্র ঘোষ
ঘোষ ডেয়ারি
অংশীদার ও মুখ্য পরিচালক।

প্রশ্ন ॥ ৫৫ ॥ গ্রামের হাসপাতাল তৈরী হইতে সুরু হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকার কালে গ্রামবাসীদের যে অসুবিধা, সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া পত্রিকা সম্পাদকের নিকট একটি পত্র প্রেরণ কর।

আদর্শ পত্র—৬৮

সম্পাদক
যুগান্তর পত্রিকা
১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা-৩

সবিনয় নিবেদন,

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্বন্ধে নূতন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মন্তব্য (৮-৯ এপ্রিল) দেখিলাম। এই প্রসঙ্গে বহু বৎসরেও না গড়িয়া ওঠা একটি গ্রামীণ হাসপাতালের বৃত্তান্ত নীচে বর্ণনা করিতেছি।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে একদিন দুর্ভিক্ষপীড়িত দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ থানার অন্তর্গত ফ্রেজারগঞ্জ পোস্ট অফিসের অধীন বিজয়বাটি গ্রামে ইনডোরে ২৫টি শয্যা ও আউটডোরে ডিস্‌পেনসারি সম্বলিত একটি সরকারী রিলিফ হাসপাতালের পত্তন হইয়াছিল। পরবর্তী কয়েক বৎসরে ক্রমে 'অকজিলিয়ারি গবর্ণমেণ্ট হাসপাতাল' এবং 'ইউনিয়ান হেলথ সেণ্টার' রূপে এর পরিচিতি ঘটে, হাসপাতালে বাড়িটি দেওয়াল ও টিনের চালের ছাউনি দেওয়া।

স্বাধীনতার পর ১৯৪৯-৫০ সাল নাগাদ ইনডোরের শয্যা সংখ্যা ২৫ হইতে নামানো হয় দশে। অতঃপর স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের বহু আবেদন-নিবেদনে কনসট্রাকশন বিভাগের জনৈক ইঞ্জিনীয়ার পুরাতন হাসপাতালের নিকটেই নূতন একটি স্থায়ী পাকা হাসপাতাল গড়িয়া তুলিবার জন্য স্থান নির্বাচন করিয়া উপর মহলে সুপারিশ করিয়াছিলেন; জায়গাটি সরকারি একটি বোর্ডেরও ছিল পছন্দ। বিজয়বাটি গ্রামের শ্রীপ্রসাদ মণ্ডল নূতন পাকা হাসপাতালের জন্য ছয় বিঘা জমি দান করিলেন। হাসপাতালের নামে অবিলম্বে তাহা রেজেষ্ট্রীকরা হইল। ১৯৫১ সালে ডিভিশনাল কমিশনার শ্রী এন তালুকদার স্থানীয় জনমণ্ডলীর সম্মুখে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন। সরকারী পূর্ত বিভাগ হইতে নাকি হাসপাতাল গৃহ নির্মাণ কল্পে তাহার পর অর্থ মঞ্জুর করাইয়া টেনডার আহ্বান করা হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে অনেক সময় বহিয়া গিয়াছে; স্বাস্থ্য দপ্তর জায়গা পাল্টাইবার নাম করিয়া বাধা দিয়াছেন। সরেজমিনে তদন্ত করিয়া তৎকালীন সিভিল সার্জন ১৯৪১ সালের ৩০শে জানুয়ারীর মেমো নং ৬৯৯/৩ দ্বারা এবং মহকুমা শাসক ১৯৫০ সালের ১৬ নভেম্বরের চিঠি নং ৫০-২৩২-৪৬ দ্বারা কিন্তু বিজয়বাটির দাবী সমর্থন করিয়াছিলেন। সেই সময়কার স্বাস্থ্যমন্ত্রীকেও ওই স্থানের একটি জনসভায় একদা

ঘোষণা করিতে শোনা গিয়াছিল, 'হাসপাতাল কোথাও যদি না হয়, তবে বিজয়বাটিতে নিশ্চয়ই হবে; সেখানে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হইয়াছে।

বিভাগীয় দপ্তর তখন বায়না ধরিলেন এবার তাহা হইলে গ্রামবাসীগণ পাঁচ হাজার টাকা তুলিয়া দিন। সেই সময়কার স্থানীয় এম.এল.এ-র মধ্যস্থতায় সঙ্গে সঙ্গে তাহা সরকারী কোষাগড়ে টাকা জমা পড়িল। টাকাটি দিলেন জমিদানকারী শ্রীমণ্ডল। ইহার পর শোনা গিয়াছিল যে সরকারের তরফ হইতে এক লক্ষ টাকা নাকি মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে।

হা হতোস্মি! আবার নূতন বায়না : গ্রামবাসীগণ আরও বিশবিঘা জমি সরকারকে দিক। ইহা ১৯৬৪ সালের কথা। গ্রামীণ মানুষ প্রস্তুত ছিল সেদিন আজও আছে। কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগ নিশ্চুপ। বিজয়বাটি গ্রামে প্রস্তাবিত ৭৫ শয্যা সম্বলিত পাকা হাসপাতাল আজও হয় নাই। ১৬ বৎসর পূর্বে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও হয় নাই।

শুধু তাহাই নহে, ২৩ বৎসরের পুরাতন মাটির ঘরের চালু দুর্ভিক্ষ রিলিফ হাসপাতালটির ইনডোরের শয্যাসংখ্যা ২৫ হইতে কমিতে কমিতে ১৯৬৭ সনে শূন্যে আসিয়া ঠেকিয়াছে। কেবল নড়বড়ে আউটডোরটিই সম্বল এবং তৎসহ মাত্র একজন কমপাউণ্ডার আছেন।

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রতি স্বাস্থ্য বিভাগের এই অবহেলা দেখিয়া বিজয়বাটি ও তৎসন্নিহিত গ্রামগুলির অসংখ্য দরিদ্র সাধারণ মানুষ হতবাক হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে আমি নূতন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইতি—

'জনৈক গ্রামবাসী'

প্রশ্ন ॥ ৩৬ ॥ নূতন বাজেট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে অনেক জিনিস অসঙ্গতরূপে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কোন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একখানি পত্র লিখ। [ব. বি. ৬১]

আদর্শ পত্র—৬৯

২০।এ হরপ্রসাদ দে লেন
বাগবাজার
কলিকাতা-৩
২২শে মার্চ ১৯৬৭

সম্পাদক,
দৈনিক বসুমতী
বউবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সবিনয়ে নিবেদন,

মাত্র কয়েকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের নূতন সরকার কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের উপপ্রধান মন্ত্রী ও অর্থবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আগামী 'সরকারী বৎসরের জন্য বাজেট পেশ করিয়াছেন। প্রতি বৎসর মার্চ মাসেই সাধারণত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারগণ তাঁহাদের বাজেট পেশ করেন।

বাজেট পেশের প্রতিক্রিয়া প্রতি বৎসরই কোন কোন পণ্যদ্রব্যের মূল্য হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। আজ কাল এই ঘটনাকে আর আকস্মিক বলা চলে না, ইহা বাৎসরিক ঘটনার গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বাজেট পেশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে কোন কোন দ্রব্যের মূল্য উর্দ্ধগতি হইয়াছে।

এইরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণ হিসাবে সাধারণত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারবারের কথাই উল্লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, যেখানে কোনরূপ কর আরোপিত না হওয়া সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি [illegible]; ইহা যথেষ্ট শঙ্কার কারণ।

শুধু মাত্র কারারোপই কি এই রূপ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী? নিশ্চিত ভাবে বলা চলে—না। কারণ এক শ্রেণীর অতিমুনফালোভী অসাধু ব্যবসায়ী আছে, যাহারা কোন কোন দ্রব্য গুদামজাত করিয়া রাখিয়া বাজারের কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করে। অনেক ক্ষেত্রেই যে ব্যবসায়ীগণ ব্যাঙ্ক হইতে অগ্রিম দাদন লইয়া এই জাতীয় মজুতদারী করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে এ ক্ষেত্রে কালো-টাকার ভূমিকাও কম নহে।

দেশ যদি এইভাবে চোরাকারবারী, মজুতদার ও অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতের ক্রীড়নক হইয়া পড়ে তবে গণতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িবে। তাই আমাদের জাতীয় সরকারকে সকল প্রকার দুর্বলতা পরিহার করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আগাইয়া আসিতে হইবে, উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করিয়া দেশের শত্রুদের কঠোর শাস্তি দানের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। এবিষয়ে আমরা গণতান্ত্রিক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীঅতুল সর্বাধিকারী

প্রশ্ন ॥ ৫৭ ॥ সাহিত্য বা বিজ্ঞানের পরিবর্তে তুমি বাণিজ্য বিদ্যা বাছিয়া লইয়াছ কেন, সেই সম্বন্ধে বন্ধুকে একখানি পত্র লিখ। [ব. বি. ১৯৬২]

আদর্শ পত্র—৭৪

১৭।১ সুইন হো ষ্ট্রীট
কলিকাতা-২৯
১৮ই আগস্ট, ১৯৬৭

প্রিয় সুমন্ত,

বহু-প্রতীক্ষিত চিঠিখানা পেয়ে দারুণ আনন্দ হচ্ছে। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর দীর্ঘ তিনমাস কেটে গেছে। এর মধ্যে তোর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। সেই সূত্র হারিয়ে মনে কেমন যেমন অভাব বোধ জেগেছিল, আজ তোর চিঠিখানা সেই অভাব অনেকখানি মিটিয়ে দিল। চিঠি পাওয়ার আনন্দ দ্বিগুণ হল যখন দেখলাম তোর ডাক্তারী পড়ার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। তুই মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিস জেনে মনটা আনন্দে ভরে উঠেছে।

বার বার মনে হচ্ছে, নবীন ভারত রচনার দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী হয়ে ওঠার পক্ষে তোর ডাক্তারী বিদ্যা হবে অপরিহার্য। কেননা ইংরেজরা যে ভারতবর্ষকে পেছনে ফেলে গেছে সে ভারতে স্তূপীকৃত হয়েছে দারিদ্র, জনসমস্যা, স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু বেকারত্ব এমনি আরও অন্তহীন সমস্যা। স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য আমরা সম্ভবত সেইদিনই উপলব্ধি করতে পারব, সেদিন ভারতবর্ষ এই সব স্তূপীকৃত সমস্যার পর্বত অতিক্রম করে সাফল্যের অধিকারী হবে। এর জন্য প্রয়োজন নানামুখী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার।

জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে আজ ভাঙ্গা-গড়ার পালা শুরু হয়েছে। অশিক্ষিত মানুষেরা চিরাচরিত ও প্রচলিত প্রথানুসরণে ইচ্ছুক, কিন্তু ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষেরা উপলব্ধি করছেন—পরিবর্তন প্রয়োজন। শিক্ষিত মানুষের দল ভারতে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। কিন্তু প্রকৃত সমাজতন্ত্রের সার্থক প্রতিষ্ঠা ঘটাতে সনাতন ভারতের বহুমুখী পরিবর্তন অপরিহার্য। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সহজসাধ্য নয়। ভারতের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নানান আদর্শের সংঘাতের ফলে সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান আজ পাওয়া যায়নি। শিক্ষানীতিও এই সংঘাতের আবর্তে পড়ে দ্বিধাগ্রস্ত, দিশাহারা।

নবভারত গঠনের স্বপ্নকে সফল করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে—নব-শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সমাজ; কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত ও উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা। আমাদের দেশের সরকার এ বিষয়ে সচেতন। তাই তাঁরা শিক্ষাসংস্কারের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করেছেন, নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার আয়োজন করেছেন কিন্তু আজও দেশের শিক্ষানীতি দ্বিধাহীন পদক্ষেপে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়নি। বিদেশী ইংরেজ শাসক নিজেদের স্বার্থের অনুকূল শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে আমাদের দেশের

স্বার্থহানি ঘটিয়েছে ; আমদের সেই ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন।

বহু শিক্ষিত মানুষই আজ এই মত পোষণ করেন যে ভারতের জাতীয় জীবনের সঙ্কটের মূলে আছে দ্বিধাগ্রস্ত শিক্ষানীতি। কারণ একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যদি শুধু মাত্র কেরানী সৃষ্টির উপযোগী হয়ে থাকে এবং সেই শিক্ষা ব্যবস্থা যদি দেশের সম্ভাবনাময় যুবশক্তির কল্পনা শক্তি, বিচার বিবেচনার ক্ষমতা, মেধা ও পর্যবেক্ষণ শক্তিকে জাগ্রত ও সম্প্রসারিত করতে না পারে, তবে সে শিক্ষা-ব্যবস্থা অসাড়, অসার্থক। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হল অজ্ঞতা অপসারিত করে জনগণের অন্তর্নিহিত বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত করে তাদের পরিপূর্ণ ও বলিষ্ঠ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। এর জন্য ইউরোপের সমস্ত দেশে করা হয়েছে গণ-শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের পরিধি এখনও সঙ্কীর্ণ।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অতীতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল, দেশের পক্ষে তা ছিল সামান্যই প্রয়োজনীয়। প্রকৃতপক্ষে দেশের এমন শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত যে ব্যবস্থার দেশ একই সঙ্গে বিজ্ঞান, সাহিত্য ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারবে। ইংরেজ শাসিত ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সেই বিচারে ছিল অসম্পূর্ণ। আজ স্বাধীন ভারতে আমাদের এমন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার যাতে বছরে বছরে শুধুমাত্র কয়েকহাজার স্নাতক উৎপাদিত হবে না, যাতে দেশ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের পথে হবে প্রকৃত অগ্রসর।

আনন্দের কথা এই, স্বাধীন সরকার সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের বর্তমান সময়ের প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর যেমন জোর দিয়েছেন; তেমনি বাণিজ্যবিদ্যার ওপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ শুধুমাত্র সাহিত্য আর বিজ্ঞানই নয়, দেশের সমৃদ্ধি অনেকখানি পরিমাণে ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপরও নির্ভরশীল। পরাধীন ভারতে এই দিকটি ছিল উপেক্ষিত আজ দেশের অন্তঃ ও বহির্বাণিজ্য—দুইই সেই উপেক্ষার অভিশাপ মুক্ত। অভিশাপমুক্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রকৃত সমৃদ্ধি ঘটতে পারে তখনই যখন দেশে বৈষয়িক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটবে। দেশের প্রতিভাবান যুবসমাজের এক বিরাট অংশ এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে। অর্থাৎ দেশের পক্ষে সেই শিক্ষা পদ্ধতিই হবে আদর্শ যে শিক্ষাপদ্ধতিতে সাহিত্য বিজ্ঞান ও বাণিজ্য চর্চার সুসামঞ্জস্য সাধন করা হয়েছে। স্বাধীন ভারত সেই অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকেই আজ অগ্রসর হচ্ছে।

আমি স্বাধীন ভারতের তরুণ নাগরিক হিসেবে বাণিজ্য শিক্ষার দিকটিই তাই বেছে নিয়েছি। আমার স্বপ্ন: আমি আগামী দিনের একজন কৃতী ব্যবসায়ী

হব। এবং সৎ ও আদর্শ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করব।

একদিন ছিল যখন ভারতবাসী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতিত্বের অধিকারী সরকারী চাকুরেকে সর্বাপেক্ষা সম্মানীয় বলে মনে করত। আজ সে মোহ কেটে যাচ্ছে। আজকের জাগ্রত ভারত শিল্পপতি, ব্যবসায়ীরও যোগ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত নয়। সুতরাং এই পরিবর্তিত পরিবেশে বাণিজ্যবিদ্যার গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী ভারতে এই বিদ্যার উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিকটি স্মরণে রেখেই আমি বাণিজ্য-বিদ্যা গ্রহণের সঙ্কল্প করেছি।

আশা করি, তুই আমার বক্তব্যের মূল্য স্বীকার করবি।

উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করিস। ইতি—

সুখময়

প্রশ্ন ॥ ৩৮ ॥ 'হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণের যৌক্তিকতা' বিচার করিয়া সংবাদ পত্রের চিঠিপত্র স্তম্ভে প্রকাশের উদ্দেশ্যে একখানি পত্র রচনা কর। [ব. বি. ১৯৬৫]

আদর্শ পত্র—৭১

সম্পাদক
আনন্দ বাজার পত্রিকা
৬, সুতারকিন স্ট্রীট
কলিকাতা-১

মহাশয়,

অর্থনীতিকে বাদ দিলে ভাষাই সম্ভবত বর্তমান ভারতের জটিলতম সমস্যা। ভাষার প্রশ্নে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় ভারত ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কিন্তু আজও কোন গ্রহণযোগ্য সূত্র আমরা নির্দ্ধারণ করতে পারিনি। এই সমস্যা নিয়ে তাই আজ আলোচনার অন্ত নেই। আমি আমার এই চিঠির মাধ্যমে বিনীত ভাবে আমরা সামান্য বক্তব্য উপস্থিত করতে চাই। আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় আমার বক্তব্য প্রকাশিত হলে বাধিত হব।

স্বাধীনতা লাভের পরই একদল উগ্র জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী বিদেশী শাসকের ভাষা ইংরাজীকে হঠানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং সেই স্থানে হিন্দী ভাষাকে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে অতি তৎপর হন; ফলে ভাষা সমস্যা জটিল হয়ে ওঠে।

হিন্দী প্রেমিকের দল সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার অজুহাতে সমগ্র ভারতের ওপর হিন্দীভাষাকে জোর করে চাপিয়ে দিতে গিয়ে ভাষাকে রাজনীতির সঙ্গে এমন ভাবে সম্পৃক্ত করে ফেলেন, যে সমগ্র ভারতে হিন্দী বিরোধী অভিযান প্রবল রূপ ধারণ করতে থাকে। সুতরাং হিন্দী ভাষা সমর্থক ও বিরোধী—দুদলকেই খোলা মন নিয়ে বিচার করতে বসতে হবে। নইলে সমস্যা ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতম রূপে পরিগ্রহ করবে। বিশেষতঃ ভারতের সর্বাত্মক উন্নতির প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখেই আমাদের ভাষা সমস্যার সমাধান সূত্র আবিষ্কার করতে হবে।

ইংরাজী ভাষা বিদেশী ভাষা। দেশের মাটির সঙ্গে এ ভাষার কোন যোগ নেই। এ সত্য অস্বীকার করার প্রশ্ন ওঠে না; দীর্ঘ দুশো বছর ধরে এই ভাষার মাধ্যমেই আমরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে যেমন যোগাযোগ রক্ষা করেছি তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই ভাষাই ছিল আমাদের যোগাযোগের একমাত্র ভাষা। সুতরাং রাতারাতি ইংরাজীকে বিদায় দেওয়ার চিন্তা অবিবেচনা প্রসূত। তবে দীর্ঘ দিন ধরে চর্চ্চিত হয়েছে বলেই স্বাধীন ভারতেও ইংরাজী ভাষা সেই একই মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এমন যুক্তিও অবান্তর।

সর্বভারতীয় সংহতি রক্ষায় আমাদের কোন একটি ভারতীয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করতে হবে, এ বিষয়ে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করেন না। বিরাট ভারতবর্ষে অনেকগুলি ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হওয়ার দাবী রাখে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনাও হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হিসেবে হিন্দী ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। হিন্দীভাষাভাষী ভারতীয়দের একাংশ এই সুযোগে নিজেদের প্রাধান্য জাহির করার জন্য অশোভন তৎপরতা দেখানোর ফলে অহিন্দী-ভাষী ভারতীয়দের মনে সঞ্চিত হয়েছে অসন্তোষ। এতে জাতীয় সংহতি ব্যাহত হতে বসেছে। সুতারাং রাষ্ট্রভাষার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত যাতে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না হয়, কেন্দ্রীয় সরকারকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। তা নইলে ভারতের বুকে নেমে আসবে দারুণ বিপর্যয়।

শ্রীশঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়
৩১, সদানন্দ রোড
কলিকাতা-২৬

প্রশ্ন ॥ ৩৯ ॥ এ বি সি কোম্পানী লিমিটেডের শ্রমিক সংঘ কর্তৃক আহুত ধর্মঘটকে বে আইনী প্রতিপন্ন করিয়া নাশকতামূলক অত্যাচার

হইতে কারখানাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মালিকের পক্ষ হইতে যে কারখানা বন্ধ (Lock out) করা হইয়াছে, তাহার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া এবং শ্রমিকদেই পক্ষ হইতে মানিয়া লইলেই কারখানা পুনরায় খোলা হইবে এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিয়া তুমি এ বি সি কোং লিমিটেডের কর্ম্মসচিব রূপে সংবাদ পত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি বিবৃতি রচনা কর।

[ব. বি. ১৯৬৬]

আদর্শ পত্র—৭২

এ. বি. সি. কোং লিমিটেডের কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

গত ১৪ই অক্টোবর হইতে এ.বি.সি. কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের লিলুয়ায় অবস্থিত কারখানাটি বন্ধ (Lock out) করিয়া দিয়াছেন। শ্রমিক সঙ্ঘ মাত্র দুদিনের নোটিশ দিয়া পূজা বোনাস ও অন্যান্য দাবী আদায়ের জন্য যে বেআইনী ধর্ম্মঘট শুরু করিয়াছেন, তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত লইতে বাধ্য হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, একদল উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিক যে ভাবে নাশকতা মূলক কার্য্যাদির দ্বারা কারখানার দামী যন্ত্রগুলির ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে শুধুমাত্র কোম্পানীর ক্ষতিই হইত না, দেশের শিল্পও ক্ষতিগ্রস্ত হইত। সেই ক্ষতির হাত হইতে কোম্পানীর সম্পত্তি ও দেশের শিল্পকে বাচাইবার জন্যই কারখানা বন্ধ করা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উপায় কোম্পানীর নিকট খোলা ছিল না।

শ্রমিকদের দাবী দাওয়া সম্পর্ক কোম্পানী উদাসীন নহে। সাধ্যমত শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করিতে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু তাহার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সহযোগিতার। শ্রমিক সঙ্ঘ যদি বেআইনী ধর্ম্মঘটের পথে না গিয়া আলাপ আলোচনার পথটি বাছিয়া লইতেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষকে কারখানা বন্ধ করিয়া দিবার মত অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইত না। কোম্পানী এখনও শ্রমিকদের দাবী দাওয়ার বিষয় বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন, যদি শ্রমিকগণ কোম্পানীর নিম্ন লিখিত শর্তগুলি বিনা প্রতিবাদে মানিয়া নেন :

(১) অবিলম্বে বেআইনী ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইবে। তবে শ্রমিক সঙ্ঘ পরিচালিত এই ধর্ম্মঘটের জন্য কোম্পানী কাহারও বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে না।

(২) পূজা বোনাসের বিষয়টি শিল্প-সালিশীতে (Industrial

tribunal) প্রেরণ করা হইবে এবং সালিশীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

(৩) কোম্পানী চিকিৎসা ব্যয়খাতে আরও কিছু অর্থ বরাদ্দ করিবে। তবে কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হইবে, তাহা ডাইরেক্টার বোর্ড স্থির করিবে।

(৪) অন্যান্য দাবী দাওয়ার বিষয়ও ডাইরেক্টার বোর্ডের আগামী সভায় বিবেচিত হইবে এবং সেই সভার সিদ্ধান্তই শ্রমিকদিগকে চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রমিক সঙ্ঘ যদি উপরিউক্ত শর্তগুলি বিনা প্রতিবাদে মানিয়া নেন তবে কোম্পানী শ্রমিকদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছে যে কারখানা অবিলম্বে খোলা হইবে।

কর্মসচিব

১৮ই অক্টোবর, ১৯৬৭। এ.বি.সি. কোং লিমিটেড

২০৬, জি. টি. রোড

লিলুয়া

হাওড়া

অনুশীলনী

১। কেন্দ্রিয় সরকার ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। একটি ব্যাঙ্কের পরিচালক হিসাবে এই নীতির অশুভ ফল প্রতিপন্ন করিয়া একটি স্মারকপত্র (memorandum) রচনা কর। [ক. বি. '৬৪]

২। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় জাতীয়করণের পক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করিয়া সংবাদ পত্রে প্রকাশের জন্য একখানি নাতিদীর্ঘ পত্র রচনা কর। [ব. বি. '৬৪]

৩। খাদ্যে ও ঔষধপত্রে ভেজাল মেশানো জাতীয় স্বার্থ ও মানবতার বিরোধী ইহার জন্য প্রয়োজন ভেজাল নিবারণী আইনের সংশোধন ও কঠোর ব্যবস্থা। এ বিষয়ে সংবাদপত্রের সম্পাদকের মাধ্যমে সরকারের উদ্দেশ্যে একখানি পত্র রচনা কর।

৪। ধান-চালের ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একখানি পত্র রচনা কর।

৫। প্রতি বৎসরই যে ভাবে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে কলেজগুলিতে ছাত্রদের স্থান সংকুলান হইবে না। আধুনিক

পদ্ধতিতে কারিগরী শিক্ষাদান এবং ব্যবসা বাণিজ্যে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করিতে পারিলে এই ভিড় হ্রাস পাইবে। এই মর্মে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র রচনা কর।

৬। বিধিবদ্ধ রেশনিং প্রথার বিকল্প হিসাবে কোন নূতন প্রস্তাব করিয়া সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য তাহা প্রেরণ কর।

৭। পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিয়া কোন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পত্র রচনা কর।

৮। শিল্প-কারখানায় ঘেরাও এর ফলে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, সেই সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণকারী একটি পত্র রচনা কর।

৯। অটোমেশানের পক্ষে অথবা বিপক্ষে তোমার মতামত জানাইয়া বন্ধুর কাছে একটি পত্র রচনা কর।

১০। কোন কারখানার শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক হিসেবে ঘেরাও-এর যৌক্তিকতা দেখাইয়া কারখানার কর্তৃপক্ষের কাছে একটি পত্র প্রেরণ কর।

১১। কোন কারখানার গণ-সংযোগ অফিসার (Public Relation Officer) হিসেবে ঘেরাও-এর যুক্তিহীনতা দেখাইয়া শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদকের উদ্দেশ্যে একটি পত্র প্রেরণ কর।

ত্রয়োদশ স্তর

কোম্পানীর সচিবের পত্র
Letters by Company Secretary

কোম্পানী সচিবের পত্র বিষয়ে আলোচনার আগে কোম্পানী বলতে কি বোঝায় তা বুঝে নেওয়া দরকার। কোম্পানী বলতে বোঝায় ১৯৫৬ সালের কোম্পানীর আইন অনুসারে গঠিত ও বিধিবদ্ধ কোন সংস্থাকে। আর যিনি নিয়োগকারী অথবা নিয়োগকারী সংস্থার সংগুপ্ত বিষয়াদির বিশ্বাসভাজন নির্বাহক, দলিল পত্রের সংরক্ষক নিয়োগকারী বা নিয়োগকর্তৃপক্ষের পত্রালাপ বা অন্যান্য [illegible] পালনের জন্য নিযুক্ত, তিনিই কোম্পানী সচিব বলে পরিচিত। কোম্পানী সচিবের পদমর্য্যাদা ও স্থান যৌথ মূলধনী কারবারের ব্যবস্থাপক বা নির্বাহী পরিচালকের ঠিক নীচে।

কোম্পানী সচিবের কার্যাবলী বহু রকমের। আইনত তিনি নির্বাহী পরিচালক বর্গের একজন নিযুক্ত কর্মচারী হলেও, নির্বাহী পরিচালক বর্গের (Managing Directors) পরিদর্শক। নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন সাপেক্ষ কারবারের বা সংস্থার সমস্ত প্রকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সচিবের ওপর বর্তায়। তবে সচিবের দায়িত্ব ব্যাপক হলেও তা অসীম। তিনি একদিকে নির্বাহী পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে এবং অন্যদিকে কোম্পানীর অংশীদার, পাওনাদারবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব বহন করেন। যেহেতু তিনি অধীনস্থ কর্মচারী সেহেতু তিনি নির্বাহী পরিচালক বর্গের সমস্ত রকম নির্দেশ ও আদেশ পালনে বাধ্য। পরিচালক মণ্ডলীর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি যথাকর্তব্য পালন করে থাকেন, তাই এই সিদ্ধান্তের বাইরের বা অতিরিক্ত কিছু করতে হলে তাঁকে সভার ব্যবস্থা করতে হয়। এর জন্য তাঁকে সভার বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে, পরিচালক গণের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পত্রালাপ করতে হবে, সভার আলোচ্য বিষয়-সূচী তৈরী করতে হবে, সভার সিদ্ধান্তগুলোকে লিপিবদ্ধ করতে হবে, এবং পরবর্তী অধিবেশনে এগুলির অনুমোদন করে নিতে হবে। অপর দিকে অংশীদার পাওনাদার এবং ঋণপত্রের মালিকদের সঙ্গে পত্রালাপ করার দায়িত্বও তাকে পালন করতে হবে।

বলা বাহুল্য, বিচিত্র দায়িত্ব পালন করতে বসে কোম্পানী সচিবকে নানা ধরণের পত্রাদি রচনা করতে হয়। প্রধানতঃ চারটি শ্রেণীতে কোম্পানী সচিবের পত্রাবলীকে শ্রেণীবিন্যস্ত করা চলে। যথা :

এক, নির্বাহী পরিচালকবর্গের নিকট পত্র ;
দুই, অংশীদারদের নিকট পত্র ,
তিন, বিভাগীয় কর্মচারীদের নিকট পত্র ;
চার, কোম্পানী নিবন্ধকের নিকট পত্র।

॥ নির্বাহী পরিচালকদের নিকট পত্র ॥

অধস্তন কর্মচারী হিসেবে যখন কোম্পানী সচিব পরিচালকবর্গের নিকট পত্র লেখেন তখন সেই পত্রে সৌজন্যবোধ থাকা বাঞ্ছনীয়ই নয়, একান্ত আবশ্যক। এবং এই বিনীত ভাবটি পত্রের ভাষা ভঙ্গীতে প্রকাশিত হবে। অনেক ক্ষেত্রে পরিচালকবর্গ সচিবের জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু তাই বলে সচিবের পক্ষে কোনভাবে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করা অনুচিত।

প্রশ্ন ॥ ৬০ ॥ কোন যৌথ মূলধনী কারবারের পরিচালক মণ্ডলীর সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সচিব হিসাবে পরিচালকগণের উদ্দেশ্যে সভার বিজ্ঞপ্তি পত্র লিখ।

আদর্শ পত্র—৭৩

ইস্টার্ন কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

গ্রাম : কেমিকো — ১৬২/এ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড
ফোন : ২৪-১২০২ — কলিকাতা-১৪
২রা মে, ১৯৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

আগামী ১২ই মে ১৯৬৭, শুক্রবার বেলা চার ঘটিকায়, ১৬৩।এ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা-১৪তে অবস্থিত ইষ্টান কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ এর কার্যালয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

ভবদীয়
(স্বাঃ) শ্রীচিত্তরঞ্জন মৌলিক
সচিব
ইস্টার্ন কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ (প্রাঃ) লিঃ

সভার কর্মসূচী

১। পূর্ববর্তী সভার কার্য বিবরণী অনুমোদন ;
২। আসানসোলে একটি বিক্রয় কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আলোচনা ;

৩। কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব আলোচনা ;

৪। বিবিধ।

প্রশ্ন ॥ ৬১ ॥ প্রতিষ্ঠানের আসন্ন অধিবেশন সম্পর্কে পরিচালক মণ্ডলীর জনৈক পরিচালক কিছু তথ্য জানিতে চাহিয়া যে পত্র দিয়াছেন ; কোম্পানীর সচিব হিসাবে সেই পত্রের উত্তর লিখ।

আদর্শ পত্র—৭৪

ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ (প্রাঃ) লিঃ

গ্রাম : কেমিকো
ফোন : ২৪-১২০২

১৬৩।এ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড,
কলিকাতা-১৪
৫ই মে, ১৯৬৭

সূচক সংখ্যা ৬।৩০৯।৬৭

শ্রীশচীন্দ্রমোহন নন্দী
৪০, বদ্রীদাস টেম্পল রোড
কলিকাতা

সবিনয়ে নিবেদন,

আপনার ১লা মের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। সেই পত্রের উত্তরে আপনাকে জানাইতেছি যে, পরিচালকবর্গের আগামী সভার অধিবেশন আগামী ১২ই মে শুক্রবার বেলা চার ঘটিকায় কোম্পানীর ১৬৩।এ ডাঃ সুরেশ সরকার রোডস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভার বিজ্ঞপ্তি গত ২রা মে সকল পরিচালকের নিকট যথা নিয়মে প্রেরণ করা হইয়াছে। আপনার বাড়ীর ঠিকানায় ঐ সভার বিজ্ঞপ্তি গত ২রা মে যথারীতি প্রেরণ করা হইয়াছে।

আপনার নির্দেশ মত আগামী সভায় যে বিষয়গুলি আলোচিত হইবে তাহা পুনরায় নিম্নে উল্লিখিত হইল :

(১) পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ;
(২) আসানসোলে একটি বিক্রয় কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আলোচনা ;
(৩) কর্মচারীদের মহার্গভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব আলোচনা ;
(৪) বিবিধ।

এই সভায় যদি আপনি বিশেষ কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহেন তবে আপনি তাহা 'বিবিধ' বিষয়ের আলোচনাকালে উত্থাপন করিতে পারেন। নমস্কারান্তে। ইতি—

(স্বাঃ) শ্রীচিত্তরঞ্জন সরকার
সচিব
ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ (প্রাঃ) লিঃ

প্রশ্ন ॥ ৬২ ॥ পরিচালকবর্গের সর্বশেষ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রদান করিয়া পরিচালকবর্গের নিকট উক্ত সংস্থার সচিবরূপে একখানি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৭৫

ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

গ্রাম : কেমিকো
ফোন : ২৪-১২০২

১৬৩।এ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড,
কলিকাতা-১৪
২৬শে মে, ১৯৬৭

সূচক সংখ্যা ত।১০৬৬।৬৭

শ্রীশচীন্দ্রমোহন নন্দী
৪০, বদ্রীদাস টেম্পল রোড
কলিকাতা

সবিনয়ে নিবেদন,

গত ১২ই মে ১৯৬৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালকবর্গের সভার কার্য বিবরণী প্রেরণ করিবার জন্য ১৫ই মে তারিখের পত্রে আপনি যে নির্দেশ দিয়াছেন, সেই নির্দেশ অনুসারে আমি সেই সভার কার্য বিবরণীর অনুলিপি প্রেরণ করিতেছি। এই সঙ্গে আমি ৩নং প্রস্তাবের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

৩নং প্রস্তাবে কর্মচারীদের মাগ্‌গীভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন শ্রীসুশান্ত চ্যাটার্জী। তিনি বলেন, ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্যমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত কর্মচারীর ৩০০ শত টাকা পর্যন্ত মাসিক আয়, তাহাদের জন্য ৫ টাকা করিয়া মাগ্‌গীভাতা বৃদ্ধি করা হউক। এবং প্রস্তাবটি সমর্থন করেন শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন শ্রীসুধাংশু যশ। তিনি বলেন, কোম্পানীর বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, ৫ টাকা করিয়া মাগ্‌গীভাতা বৃদ্ধির ফলে যে দায় বৃদ্ধি হইবে, তাহা কোম্পানীর পক্ষে এখন বহন করা সম্ভব নহে, সুতরাং

প্রস্তাবটি অন্ততঃ সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত স্থগিত থাকুক। কিন্তু অন্যান্য পরিচালক তাঁহার সহিত একমত হন না। তাঁহারা বলেন, কোম্পানীর উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে কর্মচারীদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন, কারণ ক্ষুব্ধ কর্মচারীদের নিকট সন্তোষজনক কাজ পাওয়া কঠিন। অথচ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি একান্ত কাম্য। এমতাবস্থায় ৫ টাকা করিয়া মাগ্‌গীভাতা বৃদ্ধি করিয়া নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে তাহাদের নিকট হইতে বেশী পরিমাণে কাজ পাওয়া সম্ভব হইবে। সুতরাং এই প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহার পর শ্রী যশ তাঁহার বিরোধিতা প্রত্যাহার করিয়া লইলে সভায় প্রস্তাবটি সমর্থন লাভ করে।

ইহার পর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাবটি সমর্থনে একটি নীতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। এবং প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভার অন্যান্য কার্যসূচী গতানুগতিকভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেগুলি উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া অনুল্লেখিত থাকিল। যদি আর কোন বিষয়ে জানিতে চাহিয়া পত্র প্রেরণ করেন, তবে সানন্দে আপনাকে বিস্তারিত জানান হইবে।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
(স্বাঃ) শ্রীচিত্তরঞ্জন মৌলিক
সচিব
ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

॥ অংশীদারগণের নিকট পত্র ॥

অংশীদারগণ কোম্পানীর প্রকৃত মালিক, তাই কোম্পানীর কর্মচারীরূপে যখন সচিব ইঁহাদের নিকট পত্র লিখবেন, তখন সেই পত্রের ভাষায় ও ভঙ্গীতে থাকবে শালীনতা, নম্রতা, ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধ।

প্রশ্ন ॥ ৬৩ ॥ কোন যৌথ মূলধনী কারবারের অংশীদারদের নিকট উক্ত প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে সংবিধিবদ্ধ সভার একটি বিজ্ঞপ্তি পত্র লিখ।

আদর্শ পত্র—৭৬

ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

গ্রাম : কেমিকো
ফোন : ২৪-১২০২

১৬৩।এ, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড
কলিকাতা-১৪
৯ই জুন, ১৯৬৭

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আগামী ২৫শে জুন ১৯৬৭, বেলা সাড়ে চার

ঘটিকায় ১৬৩/এ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা-১৪, স্থিত ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ-এর সভাগৃহে প্রতিষ্ঠানের ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

সভায় পরিচালকবর্গের কার্য বিবরণী এবং হিসাব আলোচনা ও গ্রহণ, নূতন পরি-পরিচালক বর্গ ও নিরীক্ষক নির্বাচন, লভ্যাংশ ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সাধারণ কার্যাদি সম্পাদিত হইবে।

আপনার উপস্থিত বাঞ্ছনীয়।

পরিচালকবর্গের অনুমত্যানুসারে
(স্বাঃ) শ্রীচিত্তরঞ্জন মৌলিক
সচিব
ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

প্রশ্ন ॥ ৬৪ ॥ কোন যৌথ মূলধনী কারবারের অংশীদারদের নিকট উক্ত প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে সাধারণ লভ্যাংশের বিবৃতিসহ একটি বিজ্ঞপ্তি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৭৭

ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

১৬৩/এ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড,
কলিকাতা-১৪
[illegible]

গ্রাম : কেমিকো
ফোন : ২৪-১২০২

শ্রীশিবপ্রপাদ সিংহ
৬, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা-১৯

সূচক সংখ্যা ল।৩৭৬।৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

অত্যন্ত আনন্দের সহিত আপনাকে এই পত্রের সঙ্গে লভ্যাংশ-লিপি প্রেরণ করিতেছি। ইহার বিবৃতি নিম্নরূপ :

২৫০০ টাকার মূল্যের সাধারণ শেয়ারে ১০% হিসাবে লভ্যাংশ ২৫০·০০ টাকা
৪% হিসাবে আয়কর বাদ ৫০·০০ টাকা
২০০·০০ টাকা

প্রেরিত লভ্যাংশ লিপিখানি যত শীঘ্র সম্ভব আপনার স্বাক্ষর সহ ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া আবশ্যক।

এই সঙ্গে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লিখিত লভ্যাংশ হইতে যে পরিমাণ টাকা আয়কর বাবদ কাটিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর আধিকারিকের নিকট জমা হইয়াছে বা হইবে।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
(স্বাঃ) শ্রীচিত্তরঞ্জন মৌলিক
সচিব
ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

প্রশ্ন ॥ ৬৩ ॥ কোন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার তাঁহার কতকগুলি সাধারণ শেয়ার হস্তান্তর করিবার জন্য স্বাক্ষর করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে একটি হস্তান্তরের বিজ্ঞপ্তি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৭৮

ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

গ্রাম : কেমিকো
ফোন : ২৪-১২০২

১৬৩এ, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড,
কলিকাতা-১৪
১৮ই জুলাই, ১৯৬৭

সূচক সংখ্যা গা।৫৪০১।৬৭

শ্রীশ্রদ্ধানন্দ ভাদুড়ী
২৩, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড
কলিকাতা-২৮

সবিনয়ে নিবেদন,

আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, আপনার স্বাক্ষরিত ১৫ খানি সাধারণ শেয়ারের একটি হস্তান্তর কবালা শ্রীহরনাথ বসুর নামে হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং এই কার্যালয়ে নিবন্ধনের (registration) জন্য দাখিল করা হইয়াছে।

যদি আজ হইতে দশ দিনের মধ্যে এবিষয়ে আপনার নিকট হইতে কোন উত্তর

না পাই, তবে হস্তান্তর বৈধ বলিয়া ধরিয়া লইব এবং ইহা পরিচালক মণ্ডলীর আগামী সভায় অধিবেশনে উপস্থাপিত বলিয়া প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধকের নিকট নিবন্ধন করিয়া লইব। ইতি—

ভবদীয়
(স্বাঃ) শ্রীচিত্তরঞ্জন মৌলিক
সচিব
ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

॥ বিভাগীয় কর্মচারীগণের নিকট পত্র ॥

কোম্পানী সচিব পরিচালক মণ্ডলীর অধস্তন কর্মচারী কিন্তু কোম্পানীর অন্যান্য কর্মচারীদের তিনি উর্ধ্বতন কর্তা। কোম্পানী সচিবের কর্মদক্ষতা, বিচক্ষণতা ও নিয়মানুবর্তিতার ওপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের সফল ও সুষ্ঠু কর্মসম্পাদন। সুতরাং ব্যবহারে যেমন, তাঁর পত্রাদিতে ও তেমনি ব্যক্তিত্বের ছাপ থাকবে স্পষ্ট। এই ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটে উপযুক্ত দৃঢ়তা, সৌজন্য, শিষ্টতা, নিরপেক্ষতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে। কর্মচারীদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি তাঁকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। এই ভাবে তিনি কর্মচারীদের বিশ্বাস ভাজন ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলে তবে তাঁর পক্ষে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় সফল হওয়া সম্ভব হবে। পরিবারের প্রধান যেমন সমগ্র পরিবারটির কল্যাণের জন্য সদাই তৎপর, আবার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যেমন সর্বদাই তাঁকে মান্য করে চলেন, তেমনি কোম্পানীর কর্মচারীরা একদিকে যেমন সচিবকে শ্রদ্ধা করবে তেমনি ও তাঁদের প্রতি হবেন সহানুভূতিশীল ও ন্যায়নিষ্ঠ। অশ্রদ্ধা ভাজন হয়ে পড়লে কোম্পানী সচিব দক্ষ-পরিচালনায় হবেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এর জন্য চাই সদাসতর্কতা।

প্রশ্ন ॥ ৩৬ ॥ কর্মপ্রার্থীর আবেদনের উত্তরে যৌথ মূলধনী কারবারের সচিব-রূপে সাক্ষাৎকারের একখানি আমন্ত্রণ পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৭৯

ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

গ্রাম : কেমিকো
ফোন ; ২৪-১২০২

১৬৩।এ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড,
কলিকাতা-১৪
২২শে জুলাই, ১৯৬৭

শ্রীসুজনকান্তি রায়চোধুরী
৯ডি, কালি টেম্পল রোড
কলিকাতা-২৬

সূচক সংখ্যা কা২০২।৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃএর সহকারী কেমিস্টের পদের জন্য আপনার প্রেরিত আবেদন পত্রের উত্তরে সানন্দে জানানো যাইতেছে যে, আপনি সাক্ষাতকারের জন্য নির্বাচিত হইয়াছেন। আগামী ২৭শে জুলাই '৬৭ বৃহস্পতিবার বেলা ৩ ঘটিকায় আপনার মূল প্রশংসা পত্রাদি সহ উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে নির্বাচন-পর্ষতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
(স্বাঃ) শ্রীচিত্তরঞ্জন মৌলিক
সচিব
ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

প্রশ্ন ॥ ৬৭ ॥ যৌথ মূলধনী কারবারের সহকারী কেমিস্টের পদের জন্য নির্বাচন পর্ষতের দ্বারা নির্বাচিত প্রার্থীর নিকট উক্ত প্রতিষ্ঠানের সচিব হিসাবে একখানি নিয়োগপত্র প্রেরণ কর।

আদর্শ পত্র—৮০

ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়াকর্স (প্রাঃ) লি

গ্রাম : কেমিকো
ফোন : ২৪-১২০২

১৬৩।এ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড
কলিকাতা-১৪
২৮শে জুলাই, ১৯৬৭

শ্রীসুজনকান্তি রায়চৌধুরী এম. এস. সি
৯ডি, কালিটেম্পল রোড
কলিকাতা-২৬

সূচকসংখ্যা চ/২৭/৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

অত্যন্ত আনন্দের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, নির্বাচন-পর্ষৎ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রীত হইয়া আপনাকে সহকারী কেমিস্টের পদে নিয়োগ করিয়াছেন। আপনার বেতনের হার নিম্নে প্রদত্ত হইল :

বেতনের হার ৪৫০'০০-১৫'০০—৬০০'০০—২৫'০০—৭০০'০০—নৈ. ধা ৩০.০০—৯৫০'০০ অন্যান্য ভাতা—মাগ্‌গীভাতা ৬০'০০ এবং বাড়ী ভাড়া ভাতা—২৫'০০।

আশা করি, আগামী ২রা আগষ্ট, ১৯৬৭ তারিখে বেলা ৯ ঘটিকায় আপনি আমাদের ১৭৫।২ মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা ৫৪-এ অবস্থিত কারখানায় আসিয়া আপনার কার্যভার বুঝিয়া লইবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীচিত্তরঞ্জন মৌলিক
সচিব
ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়াকর্স (প্রাঃ) লিঃ

প্রশ্ন ॥ ৬৮ ॥ জনৈক কর্মচারী স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য ছুটির আবেদন করিয়াছেন। যৌথ মূলধনী কারবারের সচিব হিসাবে পরিচালক মণ্ডলীর ছুটি মঞ্জুরীর সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া একখানি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৭৮

ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়াকর্স (প্রাঃ) লিঃ

গ্রাম : কেমিকো
ফোন : ২৪-১২০২

১৬৩।এ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড
কলিকাতা-১৪
৪ ঠা আগস্ট, ১৯৬৭

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার
৬১।১ আনন্দ মুখার্জী লেন, কলিকাতা-৪

সূচক সংখ্যা প।১৫৭।৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

আপনার স্ত্রীর চিকিৎসা সূচক প্রত্যয়লিপি সহ ১লা আগস্ট ৬৭ তারিখের আবেদন পত্রের উত্তরে আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, পরিচালকগুলী আপনার স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য ১লা আগস্ট '৬৭ তারিখ হইতে আপনাকে পনেরো দিনের সবেতন ছুটি মঞ্জুর করিয়াছেন। এই ছুটি চিকিৎসা ভিত্তিক ছুটি বলিয়া গণ্য হইবে না। আপনার স্ত্রীর সত্বর রোগ নিরাময় কামনা করি। নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
(স্বাঃ) শ্রীচিত্তরঞ্জন মৌলিক
সচিব
ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়াকর্স (প্রাঃ) লিঃ

প্রশ্ন ॥ ৬৯ ॥ কোন কর্মচারী ছুটির আবেদন না করিয়াই দীর্ঘদিন যাবৎ অনুপস্থিত থাকায়, তাঁহাকে বরখাস্ত করা হইল জানাইয়া যৌথ মূলধনী কারবারের সচিবরূপে একখানি পত্র লিখ।

আদর্শ পত্র—৮২

ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়াকর্স (প্রাঃ) লি

গ্রাম : কেমিকো
ফোন : ২৪-১২০২

১৬৩/এ ডাঃ সুরেশসরকার রোড
কলিকাতা-১৪
৬ই আগষ্ট, ১৯৬৭

শ্রীঅখিল নিয়োগী
২৬ হালদার পাড়া লেন, কলিকাতা ২৬

সূচক সংখ্যা খ/২৬১/৬৭

সবিনয়ে নিবেদন,

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আপনি বিনা নোটিশে গত ১৫ জুন হইতে

কাজে যোগদান করেন নাই। অবিলম্বে কার্যে যোগদানের জন্য আপনাকে গত ২৫শে জুন ১৯৬৭ তারিখে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। আপনার নিকট হইতে সেই পত্রের কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই, এবং আপনি কাজেও যোগদান করেন নাই।

গত ২রা আগস্ট, ১৯৬৭ তারিখে পরিচালকমণ্ডলীর সভায় আপনাকে উল্লিখিত কারণে বরখাস্ত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। তদনুযায়ী আপনাকে জানাইতেছি যে আপনাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইল।

এই প্রতিষ্ঠানে আপনার প্রাপ্য যদি কিছু থাকে, তাহা আজ হইতে ১ মাসের মধ্যে গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
(স্বাঃ) শ্রীচিত্তরঞ্জন মৌলিক
সচিব
ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়াকর্স (প্রাঃ) লিঃ

॥ কারবার নিবন্ধকের পত্র ॥

ভারতে সমস্ত যৌথমূলধনী কারবার ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। যথাযথ ভাবে কোম্পানী আইন প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা তা দেখাশোনার ভার মূলত কোম্পানী সচিবের। তিনিই মুখ্য আধিকারিক। কিন্তু কোম্পানী আইন দেশের সমস্ত যৌথ কারবারী সংস্থার যথোপযুক্ত ভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব কারবার নিবন্ধকের (Registrar)। সুতরাং সচিবের দায়িত্ব সেই আইনের ভিত্তিতে নির্দ্দিষ্টকালের কার্য বিবরণী নিয়মিত ভাবে কারবার নিবন্ধকের কাছে প্রেরণ করা। সচিব প্রেরিত এই পত্রাবলী আইনানুগ ও নিয়মমাফিক হলেও পত্রাবলীতেও সৌজন্যবোধর প্রকাশ একান্ত আবশ্যক।

প্রশ্ন ॥ ৭০ ॥ কারবার নিবন্ধকের নিকট কোন যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানের সচিব রূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আবণ্টন বিবরনী জ্ঞাপন করিয়া একখানি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৮৩

ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়াকর্স (প্রাঃ) লিঃ

গ্রাম-কেমিকো

ফোন-২৪-২২০২

স্থচক সংখ্যা ক/১০৮/১৯৬৭

কারবার সমূহের নিবন্ধক মহাশয় ১৬৩/এ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড

পশ্চিমবঙ্গ কলিকাতা-১৪

৪৭, গনেশ চন্দ্র এভিনু, ৯ই আগস্ট, ১৯৬৭

কলিকাতা-১

বিষয়ঃ আবণ্টন বিবরণী

সবিনয়ে নিবেদন,

১৯৫৬ সালের বিঘোষিত কোম্পানী আইনের ৭৫ ধারানুযায়ী ১৯৬৬ সালের ৩০শে জুলাই তারিখে পরিসমাপ্ত শেয়ারের যথাবিধি বিলিকরণের আবণ্টন বিবরণী প্রেরিত হইল।

এই সঙ্গে পত্রবাহক মারফত দাখিল করবার জন্য ৫০০ (পাঁচ শত টাকা) পেশমাশুলও প্রেরিত হইল।

আবণ্টন বিবরণী ও পেশমাশুল প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া বাধিত করিবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়

(স্বাঃ) শ্রীচিত্তরঞ্জন মৌলিক

সচিব

ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়াকর্স (প্রাঃ) লিঃ

প্রশ্ন ॥ ৭১ ॥ কারবার নিবন্ধকের নিকট কোন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সচিব হিসাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রত্যাগম, স্থিতিপত্র ও লাভ-ক্ষতির হিসাব জ্ঞাপক করিয়া একখানি পত্র রচনা কর।

আদর্শ পত্র—৮৪

ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়াকর্স (প্রাঃ) লিঃ

গ্রাম কেমিকো ১৬৩/এ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড

ফোনঃ ২৪-২২০২ কলিকাতা-১৪

১২ ই আগস্ট, ১৯৬৭

সূচক সংখ্যা গ/৬২৬৭

কারবার সমূহের নিবন্ধক মহাশয়

পশ্চিমবঙ্গ

৪৭ গণেশ চন্দ্র এভিনু

কলিকাতা : ১

বিষয় : বার্ষিক প্রত্যাগম, স্থিতিপত্র ও লাভক্ষতির হিসাব

সবিনয়ে নিবেদন,

১৯৫৬ সালের বিঘোষিত কোম্পানী আইনের ১১৯ ও ২২০ ধারানুসারে ২৮ শে মার্চ ১৯৬৭ সালে অনুষ্ঠিত কোম্পানীর অংশীদারগণের সাধারণ বার্ষিক সভায় গৃহীত ১৯৬১-৬২ সালের লাভ-ক্ষতির হিসাব, নিরীক্ষিত স্থিতিপত্রের তিনখানি প্রতিলিপি এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদিসহ স্বাক্ষরিত প্রত্যাগম দাখিল করা হইল।

উক্ত দলিলপত্রাদির পেশমাশুল ২৫'০০ (পঁচিশ টাকা) অত্রসহ পত্রবাহক মারফত প্রেরিত হইল। প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া বাধিত করিবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়

স্বাঃ শ্রীচিত্তরঞ্জন মৌলিক

সচিব

ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ওয়াকর্স (প্রাঃ) লিঃ

ক্রোড়পত্র :

১। বাৎসরিক প্রত্যাগম (Annual return)

২। স্থিতিপত্র

৩। লাভলোকসানের হিসাবপত্র

অনুশীলনী

১। নির্দ্দিষ্ট তারিখে সভানুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি রচনার যে নির্দেশ পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি লিখিয়াছেন তদনুসারে প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে একটি বিজ্ঞপ্তি পত্র রচনা কর।

২। পরিচালক পর্ষতের সভায় কার্যবিবরণী পেশ করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের সচিব হিসাবে পরিচালকবর্গের নিকট একখানি উপযুক্ত পত্র প্রেরণ কর।

৩। কোন যৌথ মূলধনী কারবারের অংশীদারদের সংবিধিবদ্ধ সভা অনুষ্ঠানের তারিখ স্থির হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের সচিব হিসাবে উক্ত সভার বিজ্ঞপ্তি পত্র রচনা কর।

৪। কোন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণের নিকট উক্ত প্রতিষ্ঠানের সচিব হিসাবে সাধারণ লভ্যাংশের বিবৃতি দিয়া একখানি পত্র রচনা কর।

৫। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের জনৈক অংশীদার শেয়ার হস্তান্তরে আগ্রহী। এবং তিনি স্বাক্ষর করিয়া কতকগুলি শেয়ারপত্র প্রেরণও করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানের সচিব হিসাবে একখানি শেয়ার হস্তান্তরের বিজ্ঞপ্তিপত্র রচনা কর।

৬। কর্মপ্রার্থীর আবেদন পত্রের উত্তরে যৌথকারবারী প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে একখানি সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণ লিপি রচনা কর।

৭। নির্বাচন পর্ষৎ কর্তৃক নির্দ্ধারিত কর্মপ্রার্থীর নিকট যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে একখানি নিয়োগপত্র প্রেরণ কর।

৮। জনৈক কর্মচারী অসুস্থতার জন্য সবেতন ছুটি চাহিয়া পত্র দিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানের সচিব হিসাবে ছুটি মঞ্জুরী সম্পর্কে পরিচালক মণ্ডলীর অনুকূল বা প্রতিকূল সিদ্ধান্ত জানাইয়া উক্ত কর্মচারীর নিকট একখানি পত্র রচনা কর।

৯। কারবার নিবন্ধকের নিকট আবণ্টন বিবৃতি প্রেরণ করিবার জন্য প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে একখানি উপযোগী পত্র রচনা কর।

১০। কারবার নিবন্ধকের নিকট একখানি যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রত্যাগম, স্থিতিপত্র ও লাভ-লোকসানের হিসাব প্রেরণ কালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সচিব হিসাবে একখানি উপযুক্ত পত্র রচনা কর।

বাণিজ্যিকা

অনুবাদ

বাণিজ্যিকা

ভূমিকা

অনুবাদ কি ?

বক্তব্য বা চিন্তা যখন এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ব্যক্ত হয়, তখন তাকে বলি অনুবাদ। কিন্তু দুর্বল অনুবাদক এক ভাষার কথাকে অন্য ভাষায় এনে হাজির করলে তা প্রায় সব ক্ষেত্রেই আড়ষ্ট আর অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। অনুবাদের এই সাধারণ দুর্বলতা এড়াতে তিনটি বিষয় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে :

এক—ভাষা কি ও কেন ?

দুই—যে ভাষা থেকে অনুবাদ করা হচ্ছে তার গতি প্রকৃতি।

তিন—যে ভাষায় অনুবাদ করা হবে তার চরিত্র।

ভাষা কি ও কেন ?

"ভাষা কি ?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—ভাষা মানুষের সচেতনতার ফসল। বাইরের জগতকে মানুষ যখন ইন্দ্রিয় গ্রামের ছাঁকনি দিয়ে চুঁইয়ে এনে, মনোজগতের করে নেয়, তখন তা ক্রমে ভাষায় ধ্বনিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বাইরের রূপকে, মানুষ যখন কণ্ঠ-ধ্বনিতে পরিণত করে, তখনই তার নাম আমরা দিই—"ভাষা"।

আমাদের ভাবনা মূলতঃ ভাষাশ্রয়ী ব'লে সরব চিন্তার নাম—কথা বলা। অন্য দিকে আবার, নীরবে বাক্য উচ্চারণের অর্থ চিন্তা করা। কিন্তু এই ভাষা,—সরবেই হোক বা নীরবেই হোক—তার প্রধান কাজটাই হ'চ্ছে—ছবি আঁকা।—ধ্বনি দিয়ে রূপ ফোটানো। তাই কোন কবি যখন বলেন—"কানে জাগে রূপ"—তখন তাঁর কথাটাকে অত্যুক্তি বলে অগ্রাহ্য করা যায় না।

যখন বলি 'ফুল-বিছানো-পথ', 'ময়লা ফেলা গাড়ী', বা "শিল্প-মেলা"—তখন আমাদের মনের পর্দায় বিভিন্ন হাতের ছবিই ফুটে ওঠে।

ভাষা যত পরিচ্ছন্ন হবে, এই ছবি ততই স্পষ্ট হবে, প্রাণবান হবে। ক্যামেরার লেন্স বা পরকলা, বাজে হ'লে, তার ছবি (বা Image) যেমন খারাপ হয়ে যায়, ঠিক তেমনি, ভাষা অশুদ্ধ বা দুর্বল হ'লে, তা-দিয়ে-বলা ছবিটিও অপরিচ্ছন্ন হ'তে বাধ্য।

এই বিভাগটি রচনার ব্যাপারে আমি অধ্যাপক ধীবানন্দ রায়ের কাছে ঋণী।

অনুবাদককে মনে রাখতে হবে,—এক ভাষার ছবিকে অন্য ভাষার পরকলার মধ্যে দিয়ে ফোটাতে হ'চ্ছে।—আর তা করতে গিয়ে ভাষার পরক্ষেপন (Focus) একটু এদিক-ওদিক হ'লে চলবে না।—তা হলেই অনুবাদ ধোঁয়াটে আর ঝাপ্‌সা হয়ে যাবে।

অনুবাদকের ধর্ম যদি এক ভাষায় প্রকাশিত ছবিকে অন্য ভাষার মারফৎ ফুটিয়ে তোলা হয়,—তো', বুঝতেই পারছ' আক্ষরিক অনুবাদ বা তথাকথিত ভাবানুবাদ—দুটোর কোনটাই বিশিষ্ট অনুবাদকের কাজে লাগবে না।

একটা উদাহরণ দিই,—যদি এই অংশটির অনুবাদ করতে হয়:—In ordinary speech a wealthy man is a man with a large income—আক্ষরিক অনুবাদ করলে এটা দাঁড়াবে:—"সাধারণ কথায় একজন ধনী ব্যক্তি হ'চ্ছে সে, যার প্রচুর আয় আছে।"—কিন্তু স্বল্প কথায় ছবি ফোটানো যার উদ্দেশ্য সে লিখবে:—"চলতি কথায়, যার আয় অনেক বেশী তাকেই বলি ধনী।" মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক ভাষার প্রতিটি শব্দের ব্যক্তিত্ব আছে, তাপ আছে, রং আছে। অনুবাদে সেই রং-রেখা উত্তাপ আর ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হ'লেই তা হবে সার্থক।

ভাল অনুবাদক হ'তে গেলে প্রচুর অথচ সহজ ভাষা-সম্পদের অধিকারী হতে হবে। আর সেগুলিকে স্মরণ মাত্রেই ব্যবহারযোগ্য করে তোলার ক্ষমতাও অর্জন করা চাই।—এই ক্ষমতা যাতে অর্জন করতে পারো সে দিকে লক্ষ্য রেখেই একটি বিশেষ অনুশীলনী অধ্যায় সুরু করা হ'চ্ছে।—এটির জন্যে তোমার মাত্র কয়েক মিনিট সময় ব্যয় হবে। কিন্তু এর ফলে যা উপকার তুমি লাভ করবে তা হবে চিরস্থায়ী।

পর্ব থেকে পর্বান্তরে অনুশীলনীটি অনুসরণ করলে ইংরিজী ও বাংলা দুয়েরই শব্দ সম্ভার বাড়বে আর সেই সংগে অনুবাদের ক্ষেত্রে সাফল্য তোমার সহজ-লভ্য হবে।

দ্বিতীয় স্তর

প্রয়োগ : প্রথম

প্রথম পর্ব—ক

শব্দ কত তাড়াতাড়ি তোমার মনে আসে? একটা ঘড়ি হাতের কাছে রাখো।

নীচে যে ইংরিজী শব্দগুলি আছে সেগুলোর অপর দিকের খালি স্থানটি বিপরীতার্থক শব্দ দিয়ে পূর্ণ করো। অর্থাৎ ফাঁকা স্থানটিতে উল্টো-মানে-বোঝায় এমন এক একটি শব্দ বসাও। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শব্দটি সুরু হবে "S"—এই অক্ষরটি দিয়ে।

যেমন এই দেখো :—

1. North   South
2. Fast   Slow
3. Dull   Sharp

এইবার সুরু করো। সময় সীমা ১ মিনিট। মনে রাখবে তোমার শব্দগুলি "S" অক্ষর দিয়ে সুরু হবে—

এইখানে বিপরীতার্থক শব্দ লেখো। সুরু করো "S" অক্ষর দিয়ে

1.	Big ...	...	1.S	6.	Expenditure	...	6 S
2.	Sit ...	...	2.S	7.	Buy ...	...	7.S
3.	Receive	...	3.S	8.	Earning	...	8.S
4.	Tall ...	...	4.S	9.	New ...	...	9.S
5.	Joint ...	...	5.S	10.	Open ...	...	10.S

[এর উত্তরগুলি অবশ্য শেষের দিকে দেওয়া আছে। কিন্তু এক মিনিট সময়ের মধ্যে লেখা শেষ হলেই তবেই তা দেখো ঠিক হোল কিনা জানবার জন্যে।]

প্রথম পর্ব—খ

ওপরে লেখা ইংরাজী বাংলা পরিভাষাগুলি এলোমেলো ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এই পর্বে। তোমার প্রথম কাজ হবে সে[illegible] খাতায় সাজানো।

যেমন "১ম পর্ব ক" উদাহরণ দেওয়া আছে

1. North
2. Fast
3. Dull

} এগুলির বাংলা প্রতিশব্দ এলোমেলো করে রাখলে এই রকম হয়:

১. ভোঁতা
২. উত্তর
৩. দ্রুত

ক্রম অনুযায়ী সংখ্যা বসালে ওগুলো দাঁড়ায় এই রকম:

১. ভোঁতা >3
২. উত্তর >1
৩. দ্রুত >2 বা ১>3; ২>1; ৩>2

এইবার সুরু করো। সময় সীমা ৩০ সেকেণ্ড :—

	সংখ্যা	বিপরীতার্থক শব্দ
১. নূতন		
২. প্রকাশ		
৩. আয়		
৪. ক্রয়		
৫. বড়		
৬. লম্বা		
৭. বস		
৮. নাও		
৯. যুক্ত		
১০. ব্যয়		

প্রথম পর্ব—খ

ক্রম অনুযায়ী সংখ্যা বসানোর কাজ শেষ হ'লে, ঐ বাংলা শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ তাড়াতাড়ি খাতায় লিখে ফেলো। সময় সীমা এক মিনিট মাত্র মনে রেখো।

উত্তর সহযোগে উদাহরণ দেওয়া হোল ঠিক এইভাবে লিখবে:

১. ভোঁতা>3>ধারালো।
২. উত্তর >1>দক্ষিণ।
৩. দ্রুত >2>ঢিমে।

এবার সুরু করো

মনে রেখো ১ম পর্বের "খ" ও "গ" অনুশীলনী ১ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডে শেষ করতে হবে। সময় বেশী লাগলে বুঝতে হবে পেছিয়ে যা—।

দ্বিতীয় পর্ব

নীচের দশটি ইংরিজী শব্দের পাশে দশটি সমার্থক বাংলা শব্দ বসাও। তবে সেই বাংলা শব্দগুলির প্রত্যেকটি যেন 'ব'—এই অক্ষর দিয়ে সুরু হয়। সময় ১ মিনিট।

উদাহরণ

Market বাজার

Insurance বীমা।

1. School...........
2. Pure...............
3. Annual...........
4. Actual............
5. Scarcity.... .....
6. Manage...............
7. Consul................
8. Commerce.............
9. Department..........
10. Cancel ....

তৃতীয় পর্ব—ক

নীচে দুটো কলমে যে ইংরিজী শব্দগুলো রয়েছে তাদের ভেতর থেকে এক একটি শব্দ বেছে এক জোড়া শব্দ তৈরী করো। এর পর তোমার বানানো সেই ইংরিজী জোড়া শব্দের বাংলা প্রতিবাক্য লেখো। সময় সীমা—২ মিনিট

দেখো ব্যাপারটা এই রকম হবে :— ইংরিজী শব্দের দুটো কলম

Big	Draft
Sitting	Member
Received	Industry

ধরা যাক ঐ দুটো কলম থেকে জোড়া শব্দ তৈরী করবে এই ভাবে :—

Big industry

Sitting member

Received draft—এদের বাংলা প্রতিবাক্য হবে—

বৃহৎ শিল্প

অধিষ্ঠিত সদস্য

গৃহীত খসড়া।

এবার সুরু করো

Export	Development
Market	Fixed
Material	Realised
Competition	Productivity
Increased	Resources
Object	Factor
Price	Activity
Common	Raw
Plan	Unit
Economic	Stage

তৃতীয় পর্ব — খ

তৃতীয় পর্ব-ক-এ যে বাংলা যুগ্ম শব্দ লিখেছ এইবার সেইগুলোর সংগে এমন এক একটি ক্রিয়া পদ যুক্ত করো যাতে বাক্য সম্পূর্ণ হয়।

ঠিক এই ভাবে :—

Big industry > বৃহৎ শিল্প + প্রতিষ্ঠিত হোল

Sitting member > অধিষ্ঠিত সদস্য + বেরিয়ে গেলেন

Received draft ▷ গৃহীত খসড়া + বাতিল হোল।

ক্রিয়া পদ যোগ করে, বাক্য সম্পূর্ণ করতে ৪০ সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগা উচিত নয়।

তৃতীয় পর্ব — গ

ইংরিজী বাক্যরীতির সংগে বাংলা বাক্য গঠনের একটা মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ইংরিজীতে কর্তার পরই ক্রিয়া পদ বসে। যেমন দেখো :—

Industry **is facing** severe competition

কিন্তু বাংলায়, পদের একেবারে শেষে বসে ক্রিয়াপদ। এই দেখো :—

শিল্প প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার **মুখোমুখি হচ্ছে**।

অনুবাদের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ প্রয়োগের এই তাৎপর্য যদি বুঝতে পারো তো, অনুবাদের অনেকখানি কাজ ঐখানেই হয়ে গেল। বাকি রইল কেবল বাক্যাংশের যথাযথ উপস্থাপন। এই উপস্থাপন প্রসংগে আর একটি কথাও মনে রাখতে হবে; অনেক সময় ইংরিজী বাক্যের শেষ অংশটি বাংলা বাক্যের প্রথমে এসে হাজির হয়।

এইবার যে অনুশীলনী পর্ব সুরু হচ্ছে তাতে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আর বাক্যাংশ উপস্থাপনের পারম্পর্য শেখানো হচ্ছে।—এটি অনুসরণ কর।

নীচে ইংরিজী বাক্যগুলির বঙ্গানুবাদ দেওয়া আছে। তবে ইংরিজী বাক্যের শেষাংশের আর ক্রিয়াপদের অনুবাদের স্থানগুলিতে ফাঁক রাখা হয়েছে সংখ্যাযুক্ত ঐ শূন্য স্থানগুলি তোমাকে পূর্ণ করতে হবে।

সময় সীমা— ৪ মিনিট।

India's export were facing severe competition in over seas market.

(১)—(২)—ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য তীব্র প্রতিযোগিতার (৩)—(৪)—

In order that these might stand competition in both quality and price, per unit productivity should increase.

(৫)—ও (৬)—প্রতিযোগিতায় (৭)—(৮)—প্রতি একক উৎপাদনশীলতা (৯)—(১০)—।

The importance of productivity at the present stage of industrial development, should be realised by all concerned.

শিল্পোন্নয়নের বর্তমান (১১)—উৎপাদনশীলতার (১২)—সংশ্লিষ্ট সকলেরই (১৩)—(১৪)—।

উত্তরমালা

প্রথম পর্ব—ক-এর উত্তর

1. Small 2. Stand 3. Send 4. Short 5. Separate 6. Saving 7. Sell 8. Spending 9. Second-hand 10. Secret.

প্রথম পর্ব—খ-এর উত্তর

১>9, ২>10; ৩>8. ৪>7; ৫>1; ৬>4; ৭>2; ৮>3; ৯>5; ১০>6.

প্রথম পর্ব—গ-এর উত্তর

১.>9-পুরাতন; ২.>10-গোপন; ৩>8; ব্যয়; ৪>7 বিক্রয়; ৫>1. ছোট; ৬>4-বেঁটে; ৭>2.-দাঁড়াও; ৮>3-পাঠাও; ৯>5.-আলাদা; ১০>6

দ্বিতীয় পর্বের উত্তর

1. বিদ্যালয় 2. বিশুদ্ধ 3. বাৎসরিক 4. বাস্তব 5. বিরলতা 6. ব্যবস্থা 7. বাণিজ্যদূত 8. বাণিজ্য 9. বিভাগ 10. বাতিল।

তৃতীয় পর্ব—ক এর উত্তর

Export Activity—রপ্তানী কার্যকলাপ
Market resources—বাজার সম্পদ
Material unit—বস্তুভিত্তিক একক
Increased productivity—বর্ধিত উৎপাদন
Object realised—লক্ষ্যে উপনীত
Price fixed—মূল্য নির্ধারিত
Common Factor—সাধারণ কারক
Plan stage—পরিকল্পনা পর্ব
Economic development—অর্থনৈতিক উন্নয়ন

উত্তরে দেওয়া এই ধরণে যমক শব্দ তোমার নাও-ও হতে পারে কিন্তু যাই হোক বাংলা প্রতি শব্দগুলো যেন স্পষ্ট হয়।

তৃতীয় পর্ব—খ

ইচ্ছা মত ক্রিয়াপদ বসাও।

তৃতীয় পর্ব—গ

(১) বিদেশের (২) বাজারে (৩) মুখোমুখি (৪) হচ্ছে (৫) উৎকর্ষ (৬) দামের (৭) দাঁড়াতে (৮) হ'বে (৯) বাড়াতে (১০) হবে (১১) অবস্থায় (১২) গুরুত্ব (১৩) বোঝা (১৪) দরকার।

পরের স্তরের প্রয়োগ অনুশীলনীতে বাংলা থেকে ইংরিজীর আংশিক অনুবাদ করে দেওয়া আছে। সেই আংশিকতাকে পূর্ণ করার দায়িত্ব তোমার। শূন্য স্থানগুলিতে সংখ্যা বসানো আছে। পূর্ণ করে সে দায়িত্ব পালন করো।

—

● বাংলা থেকে ইংরেজী ●

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪৫

রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য স্যার লক্ষ্মীপতি মিশ্র কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে নিখিল ভারতীয় বেতারে এইরূপ আশা প্রকাশ করেন যে, যুদ্ধান্তে ভারত গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ের উন্নতির জন্য ৩২০ কোটি টাকা ব্যয়ের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে মরুভূমি ও পাহাড় ব্যতীত অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানই কোন রেলপথ হইতে ২৫ মাইলের অধিক দূরবর্তী থাকিবে না। তিনি আরও বলেন যে, এই যুদ্ধে ভারতের একস্থান হইতে অন্যস্থানে দ্রব্যাদি প্রেরণের অসুবিধা হইতে যে শিক্ষালাভ হইয়াছে তাহা ভুলিয়া যাওয়া হইবে না এবং ভারতে যানবাহনের যোগাযোগ ব্যবস্থা সমগ্রভাবে বিবেচিত হইবে। দেশের উন্নতিতে, স্টীমারপথ ও বিমানপথ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিবে। যাহা হউক, ইতিমধ্যেই প্রায় ১৫ হাজার মাইল রেলপথ নির্মাণের জন্য জরিপ করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে নূতন রেলপথ নির্মাণের তালিকার বিস্তার-সাধন সহজ হইবে।

Sri Lakshmipati Misra, member of the 1 2 in reply to certain questions expressed the hope over All India Radio that according to the 3 of 4 post-war 5 6 plan of, Rs. 320 crores all important places, except those in deserts and mountains, would come within a range of twenty five miles from the railways. He added that the 7 derived from the difficulties in sending goods from one place to another in 8 during war would not be forgotten and that the 9 system in India as a whole would be taken into consideration. The Railways, the water-ways and the air-ways would take their 10 roles in the development of the

country. However, in the meantime, survey has been made for the 11 of about fifteen thousand miles of railways and it will be easy to extend the programme of 12 of new railways, if occasions demand.

১৯৪৬

মহাসমর আরম্ভ হইবার পূর্বে কাপড়ের দিক হইতে ভারতবর্ষ অনেকটা স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ এবং মুষ্টিমেয় সহরবাসী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের বাদ দিলে এদেশের অধিকাংশ লোকই এখনও আধুনিক সুসভ্য জীবনধারণের উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার করে না। মোটের উপর ১৯৩৮-৩৯ সাল, অর্থাৎ যে বৎসর বিশেষ সামরিক প্রয়োজনে এক গজও বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয় নাই, সেই বৎসর ভারতের মিল ও তাঁতগুলির উৎপন্ন কাপড়েই এদেশের শতকরা ৯০ ভাগের বেশী অভাব মিটিয়াছিল। উক্ত বৎসরে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ৪ শত-কোটি গজ ও তাঁতে দেড়শত কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হয় এবং ৭০ কোটি গজ কাপড় জাপান, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানি হয়। এই ৬২০ কোটি গজ কাপড়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ২০ কোটি গজ কাপড় সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি নিকটবর্তী নির্ভরশীল দেশে রপ্তানি করিয়া ভারতে উদ্‌বৃত্ত থাকে পুরা ৬০০ কোটি গজ এবং ইহাই কিঞ্চিদধিক ৩৭ কোটি নরনারীর লজ্জা নিবারণ করে। পৃথিবীর সভ্যদেশ সমূহের তুলনায় এইভাবে কমবেশী ১৬ গজ কাপড় ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নহে। কিন্তু ভারতবর্ষ চিরকাল অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত বলিয়া এই সামান্য পরিমাণ কাপড়েই ভারতবাসীর মোটামুটি চলিয়া গিয়াছিল।

1 became self-sufficient to a great extent before the outbreak of the great war in respects of 2. 3 4 India is a poor country and if the handful of townsfolk and rich persons are not taken into consideration, even now most of the people of this country 5 6 7 8 in keeping with the standard of modern living of modern times. 9 10 · 11 in 1938-39 i.e. the year in which not even a single yard of cloth was required for special military purpose, the production of cloth in Indian mills and handlooms met more than 90 percent of the 12 13 15. Indian mills produced 16 · 17 yards and handlooms produced 1,500 million yards of cloth in that year. And 18 19 yards were imported in India from Japan, Britain and other countries. Out of this 6,200 million yards

pactically 20 21 yards of cloth were exported to 22 23 and other neighbour countries dependent on India and there was a net surplus of 24 25 yards in the country with which a little over 370 million men and women clothed themselves. This per capita 26 of about 16 yards of cloth is not worth mentioning in comparison with the civilised countries of the world, but because Indians are always 27 to simple living, they could somehow manage with this meagre 21.

১৯৪৭

যুদ্ধের পর সকল জাতির আর্থিক উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা এবং সকল জাতি যাহাতে সমানভাবে পণ্যের উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে—এ বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট হইতে সিনেটর গিলেটি পর্যন্ত সকলেরই একমত। প্রস্তবটি সম্মুখ দৃষ্টিতে কতকটা নিরীহ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু শিল্পকার্যে যে সকল জাতি পশ্চাৎপদ তাহাদের পক্ষে ইহাতে শঙ্কার কথা আছে। কারণ, অবাধ বাণিজ্য দ্বারা কৃষিপ্রধান জাতির শিল্পসেবার প্রবৃত্তিকে পঙ্গু করা সম্ভব। ভারতবর্ষকেও এই অবাধ বাণিজ্যের প্রভাবে শিল্পহীন করা হইয়াছে। কৃষিপ্রধান জাতীয় আর্থিক দুর্দশা কখনও ঘুচে না। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে প্রত্যেক জাতি শিল্পসাধন বিষয়ে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এইবার এই যুদ্ধের পর তাহা নষ্ট করিবার চেষ্টা হইবে বলিয়া শঙ্কা হয়। ইহার ফলে- পরিণামে কোন পক্ষের হিতসাধন হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে ভবিষ্যতে বিপদের বীজ উপ্ত হইবে এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিরাজ করিবে।

From 1 2 to 3 4 every one is of the same opinion that an arrangement should be made in the post-war period so that all nations 5 6 7 for their economic development and may have equal scope in production and may carry on trade and commerce 8 9 10. 11 12 may appear somewhat harmless on a 13 14 . But for the industrially 15 16 there is something to be afraid of in it. The reason behind is that the industrial aspiration of an 17 18 can be crippled by free trade. India has also been deindustrialised by the influence of this free 19 . The 20 distress of an agrarian nation never 21. Since the last Greatwar every

nation is trying to be industrially, 22 23 , but it is apprehended that after this war there will be an attempt to 24 such endeavour. It 25 26 27 that any side would gain in consequence eventually. The seeds of future 28 would be sown in it and 29 would prevail in 30 31.

১৯৪৮

ভারতে ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে শ্রমিক সম্প্রদায় ও জাতীয় সরকার উভয়েই বর্তমান শ্রমসংক্রান্ত আইন পরিবর্তনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। খনি আইনের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হওয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা নিঃসন্দেহে সন্তোষ বোধ করিবেন। কারণ প্রধানতঃ ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নয়নের জন্য কয়লার গুরুত্ব অসামান্য। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শ্রমিকের তুলনায় খনি মজুরদের অবস্থা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সালিশী বোর্ডের সুপারিশ মালিকেরা কার্যে পরিণত করায় কয়লাখনি শ্রমিকদের মজুরির হারের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। সকল শ্রেণীর শ্রমিকই ইহার ফলে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছে। কয়লাশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ছাড়া ভারতের অন্য কোন শিল্পের মজুরেরা সম্ভবত বৎসরে চার মাসের বোনাস পায় না।

In view of the new circumstances that has come to prevail after the end of 1 2 in 3 , both the labour community and the 4 5 are showing their eagerness to amend the existing 6 7 . The attention of the Government of India has been attracted to the 8 9 and as such the trade union workers would undoubtedly feel satisfied; because, mainly the importance of coal is immeasurable towards the 10 11 of industries in India. Moreover in relation to other workers, the condition of the miners is the worst. The 12 have given effect to the recommendations of the 13 14 appointed by the Government of India and there have been revolutionary changes in the 15 of 16 the coal miners. Labourers of all categories have been benefited to a great extent by this. Probably workers of no other industries in India except the coal miners enjoy 17 equivalent to four months' 18 .

১৯৪৯

পাশ্চাত্য জগতের মূলমন্ত্র সঙ্ঘশক্তি, গণশক্তি। দল বাঁধিতে পারিলেই কাজ হাসিল। কিন্তু এ আমরা কি দেখিলাম? দল নাই, সম্প্রদায় নাই, সঙ্ঘ নাই— একক। কঠোরভাবে একক,—কেবল একখানি যষ্টিমাত্র সম্বল করিয়া দাণ্ডী-যাত্রা। মনে পড়ে? 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে'? একবার কল্পনা কর—একাকী অর্ধনগ্ন ফকির নির্ভীক ভাবে পথ চলিয়াছেন। দূরে দুর্ধর্ষ বিদেশী টাইরাণ্টের কামান নিষ্ফল আক্রোশে গর্জন করিতেছে, আর কাতারে কাতারে নরনারী বক্ষ প্রসারিত করিয়া সঙ্গী হইতেছে। মরণ তখন কোথায় ছিল? কোথায় ছিল মৃত্যু যখন মহাত্মা একাকী অগণিত রক্তলোলুপ সিংহব্যাঘ্র অপেক্ষা হিংস্র ভয়াল নরপশুর মধ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন?

The chief motto of the West is the strength of 1 the strength of the people. The 2 of a group means the achievement of all objects. But what do we 3 4? Here is only an individual and no group, no 5 or no organisation. He is alone and severely alone—with only a stick he 6 on towards Dundee. Do you remember? Even if no one 7 at your call, march alone? Just imagine—the half 8 Fakir 9 the way undaunted and alone. At a distance the cannon of the indomitable foreign tyrant 10 in impotent rage, and at the sametime 11 of men and women join him with their chests expanded. Where 12 death then? Where was death when 13 wandered alone amidst innumerable beastly men, more 14 and terrible than blood-thirsty and 15 and 16?

১৯৫০

বেকারেরা যাঁহাদের অভিশপ্ত করে, তাঁহারা ধনিক, পুঁজিপতি ও শিল্পপতি। তেমনি অভিশাপ দেয় শিল্পী, কৃষক, কেরানী এমন কি শিক্ষা-সম্পর্কিত ব্যক্তিও। দাসবৃত্তি দ্বারা যাহারা জীবিকা অর্জন করে, অভিশাপ দিতে তাহারা একটুও ইতস্ততঃ করে না। কাজ না থাকিলেই মানুষ হয় বেকার। পরিবারবর্গের ভরণপোষণ না করিতে পারিলেই বেকারের বিপ্লবপন্থী হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং বেকার সমস্যা খুব বড় সমস্যা। এ সমস্যা প্রাচ্যেও আছে, প্রতীচ্যেও আছে। তবে প্রাচ্যের সমস্যা প্রতীচ্যের মতো তীব্র নহে। ধনিক, শিল্পপতি, পুঁজিপতি ও সরকার বাহাদুর দেশ ও দশের কল্যাণে একমত হইয়া যদি শিল্প, কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা করেন, তাহা হইলে সমস্যার রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইতে পারে।

The 1 persons 2 the rich the 3 and the industrialists. Artists, peasants, clerks and even persons attached to education 4 them in the same way. Those who have to earn livelihood by servility do not hesitate in the least to 5. A man is unemployed when he is jobless. It is quite natural that an unemployed man will turn a 6 if he fails to maintain his family. So the problem of unemployment is a 7 one. The problem exists both in the East as well as in the West. But the problem in the East is not so intensive as it is in the West. The problem 8 9 a solution if the rich, the industrialists, the Capitalists and the Government are unanimous regarding the welfare of the country and the people ; and they make 10 to expand industry, agriculture, 11 and 12 education.

চতুর্থ স্তর

পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ

● বাংলা থেকে ইংরেজী ●

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫১

স্বাধীনতা যারা এনেছে তাদের পুরোভাগে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তারা স্বভাবতঃই প্রত্যাশা করেছিল যে রাষ্ট্রীয় অধিকার তাদের সামনে আত্মোন্নতির সিংহদ্বার খুলে দেবে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে তাদের সে প্রত্যাশা পেয়েছে রূঢ় আঘাত। আত্মোন্নতির সুযোগ-সুবিধা করাতো দূরের কথা, মধ্যবিত্তশ্রেণী আজ আরও বিরূপ পারিপার্শ্বিকের সম্মুখীন হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছে। চোখ খুললেই এ দৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। দেড়শো টাকা মাইনের একজন অধ্যাপক, দুশো টাকা মাইনের একজন সাংবাদিক বা একশো টাকা মাইনের একজন কেরানীর পক্ষে আজ পরিবারাদি নিয়ে বেঁচে থাকা যে কি কঠিন ব্যাপার তা সহজেই বুঝা যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখবার দুষ্প্রয়াস করতে গিয়ে দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছে ধ্বংসের দিকে—অথচ এদিকে কারও দৃষ্টি নেই বললেই চলে।

The middle class was the vanguard who achieved freedom. Naturally they hoped that the political rights would open the gate-way of self-progress before them. But in free India their expectation has received a rude shock. Far from speaking of self-progress the middle class to-day has to face more adverse circumstances and are on the verge of collapse. As soon as we open our eyes this scene freely comes to our sight. It is easily understood what a stiff task it is for a college-teacher with rupees 150/- per month, a journalist with rupees 200/- per month or a clerk with rupees 100/- per month to maintain their families. The middle class people are now approaching

their destruction day by day in trying hard to cope with the standard of living—but nobody cares to pay attention to this.

১৯৪৩

দেশে পণ্যদ্রব্যের তুলনায় দেশবাসীর হাতে অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতার যোগানবৃদ্ধি পাইলেই যে দেশে মুদ্রাস্ফীতি অপরিহার্য হইবে তাহার কোন অর্থ নাই, দেশে তখনই মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে যখন দেশবাসীর হাতে অতিরিক্ত হিসাবে প্রভূত পরিমাণে ক্রয়ক্ষমতা সঞ্চিত হইবে—অথচ সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে পণ্যদ্রব্য ও মজুরির যোগান বাড়িবে না। কিন্তু এইরূপ একটা অবস্থার মধ্যেও টাকার সুদবৃদ্ধি, ব্যাঙ্কের ধার দিবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং, পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, শ্রমিকের মজুরি নিয়ন্ত্রণ, শিল্প ও বণিক প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত লভ্যাংশের সীমা নির্দেশ ইত্যাদি বহুপ্রকার ব্যবস্থার দ্বারা দেশে মুদ্রাস্ফীতির কুফল নিবারণের নানা পন্থা বর্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইসব ব্যবস্থা অবলম্বনেই বিগত মহাযুদ্ধের সময় জগতে বহু দেশ দেশবাসীর হাতে প্রচুর অর্থ ছড়াইয়াও দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

It is not imperative that inflation will be inevitable in a country where the purchasing power of the people excels the supply of commodities. Inflation begins when excessively surplus purchasing power accumulates in the hands of the people without proportionate increase in commodities and in wages simultaneously. But even in such a condition to prevent the evils of inflation verious preventive measures have been devised now, such as increasing the rate of interest, putting a check upon the lending capacity of banks, rationing, controlling production, sale and movement of commodities, compulsory saving, restricting wages of labourers, fixing up the dividends paid by the industrial and commercial firms etc. etc. By adopting these very measures during the last Great War, many countries of the world maintained price-level within fixed limits although they circulated huge sum of money in the hands of the people.

১৯৫৫

বাঙ্গালীর গৃহে চিনির ব্যবহার অল্প নহে। আমরা যে পরিমাণ চিনি ব্যবহার করি তাহা আমাদের দেশেই জন্মিতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা কে করিয়াছে? একদিন ভারতবাসী ভাবিত, জাভার সহিত চিনি প্রস্তুত ব্যাপারে তাহারা কখনই প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। অথচ এখন জাভা হইতে চিনি তো এদেশে একেবারেই আসে না। কেবল তাহাই নহে, এখন ভারতবর্ষ হইতে চিনি বাহিরে রপ্তানি হইবার জন্যও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। বাঙালী চেষ্টা করিলে তাহারই চিনির কল হইতে সমস্ত বাংলা দেশকেই চিনি সরবরাহ করিতে পারে। অতএব এদেশে ব্যাপক ভাবে ইক্ষুর চাষ হওয়া প্রয়োজন। ইক্ষু হইতে কেবল যে চিনি প্রস্তুত হইবে তাহাই নহে, ইক্ষুর রস নিঙড়াইয়া লইলে যে ছিবড়া পড়িয়া থাকে তাহাকেও কাজে লাগানো [illegible]। অবশ্য সাধারণ গুড়ের ব্যবসায়ীরা ঐ পদার্থটীকে পুড়াইয়া ইক্ষুরস জ্বাল দেয়। কিন্তু তাহা না করিয়া উহাকে কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা শ্রেষ্ঠতর ব্যবস্থা। ইক্ষুর ছিবড়ার সহায়তায় মাঝারি আকারে কাগজের কারখানা স্থাপিত হইতে পারে।

The consumption of sugar is not of negligeable quantity in the houses of Bengalees. The quantity of sugar we consume can be produced in our country. But who has tried for that? Once the Indians thought that they would not be able to compete with Java in the matter of the production of sugar. But now sugar is not at all imported from Java. Not only this, India now produces sufficient quantity of sugar for export purpose too. If Bengalees endeavour they can produce sugar and meet the demand of the whole of Bengal off their own mills. For that sugarcanes should be cultivated over wide areas. Not only sugar can be produced from sugar-canes but the crushed refuse which remains after squeezing out the juice from sugar-cane, may be utilised for other purposes. Of course, ordinary gur-manufacturers use this refuse for fuel in their production. But it can be better utilised in the manufacture of paper. Paper mills of medium size can be started with the help of this crushed refuse of sugar-cane.

১৯৫৭

রূপার হইতে নাঙ্গাল পর্যন্ত নূতন রেল-লাইন স্থাপন করা হইয়াছে। বাঁধ অঞ্চল হইতে নাঙ্গাল উপনগর পর্য্যন্ত আরও একটি রেল-লাইন নির্মাণ সমাপ্ত

হইয়াছে। দুই কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত এই উপনগরে পনের হাজার লোকের বসবাসের জন্য গৃহ, বিশ্রামাগার, হাসপাতাল, গবেষণাগৃহ, আপিস, বিদ্যালয়, কল্যাণকেন্দ্র, শ্রমিকদের প্রমোদকেন্দ্র, ডাক ও তার বিভাগ, টেলিফোন আপিস বাজার, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা রহিয়াছে।

এখানে যে কারখানা হইয়াছে তাহাতে নূতন যন্ত্রপাতি তৈয়ারী ও মেরামত করা হইতেছে। সেখানে ইতিমধ্যে ছয় হাজার টন ইস্পাত তৈয়ারী হইয়াছে। প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নাঙ্গালে পাঁচ হাজার কিলোওয়াটের বাষ্পচালিত যন্ত্র, পাঁচশত কিলোওয়াটের দুইটি টার্বো সেট ও ডিজেল চালিত যন্ত্র এবং ভাকরাতে দুই হাজার চারিশত কিলোওয়াটের ডিজেল চালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। এ অঞ্চলের অভূতপূর্ব উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

A new Railway line has been construct from Ruper to Nangal. From the Dam area to the township of Nangal the construction of another railway lines has been completed. In this newly built township which was built at a cost of two crores of rupees, there are dwelling houses, rest houses, hospitals, research centres, offices, schools, welfare centres for amusement and recreation for labourers, post and telegraph offices, telephone office, market, water supply and sanitary arrangements which serve the requirements of fifteen thousand people.

New machines are being produced and old machines are repaired in the factory that has been established here. Six thousand tons of steel have been produced in this factory by this time. For the supply of required electricity a steam engine of five hundred kilowatts, two terbo-sets and diesel-driven engines of five hundred kilowatts, and at Bhakra a diesel-propelled generator to produce two thousand four hundred kilowatts have been installed. An unprecedented improvement of this area is inevitable.

১৯৫৯

সাত বন্ধু বেকার এবং শিক্ষিত, তাহাদের তিনজন বিবাহিত। তাহারা চাকুরীর জন্য নানাস্থানে দরখাস্ত করে, নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ায়। চাকুরী কিন্তু হয় না। নিরাশ হইয়া তাহারা ঠিক করিল, চাকুরীর খোঁজে আর নয়—অন্নাভাব ঘুচাইবার সত্যকার পথের সন্ধানে এবার নামিতে হইবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা কৃষিকার্যে নামিয়া পড়াই স্থির করিল। নিজেদের

সোনারূপা বিক্রয় করিয়া, হাওলাত করিয়া এবং নানাপ্রকারে তাহারা ১০,০০০ টাকা জোগাড় করিল। কাজ শুরু হইয়া গেল। তাহাদের প্রাথমিক সম্বল চারিটি গাই—প্রতিদিন সকাল-বিকালে পনর-ষোল সের দুধ পাওয়া যায়। নিজেদের জন্য পাঁচ সের রাখিয়া বাকি দুধ তাহারা বিক্রয় করে। তাহাতে গড়ে রোজ আট টাকা রোজগার হয়। জলতোলা ও ধানভানা কল আসিল। যখন জল তুলিবার দরকার হয় না তখন ঐ কল দিয়া ধান ভানিয়া কিছু রোজগার হইতে লাগিল। ছয় ঘণ্টাতে গড়ে চব্বিশ মণ ধান ভানিয়া আঠারো টাকা মুনাফা আসিতে লাগিল।

Seven friends are educated but unemployed. Three of them are married. They apply in various places to secure jobs and they wander about in different places. But all in vain. Being disappointed they decide to draw an end to their search for securing job. It is time now to find out the real means that will bring an end to starvation. They ponder over the matter and eventually decide to launch upon agriculture. They sell their golds and silvers and take some loan and in various ways they collect ten thousand rupees. The work starts. Their primary asset are four cows, of whom fifteen or sixteen seers of milk is procured in every morning and afternoon. They keep five seers for them selves and the rest they sell. They earn rupees eight daily in average from that. Then they install a water-pump and a paddy-husking machine. When they do not require water-pumping they put its service to paddy-husking and as such earn something. In course of six hours they husk on an average twenty four maunds of paddy and earn a profit of eighteen rupees.

১৯৬০

ভারতে স্বল্পবিত্তদের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা ১৯৫৪ সালে গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৮ সালের শেষাশেষি সমগ্র ভারতে প্রায় ৩৫ হাজার বাসগৃহ নির্মিত হইয়াছে এবং আরও ১৪ হাজার বাসগৃহের নির্মাণকার্য চলিতেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসের শেষাবধি মোট প্রায় ২৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ভারতে সহরবাসীদের অধিকাংশের আয় স্বল্প বলিয়া তাঁহারা সরকারী সাহায্য ব্যতীত নিজ নিজ বাসগৃহ নির্মাণ করিতে পারেন না।

সাহায্যের জন্যই সরকার এই গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বহু লোকই এই পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণে ইচ্ছুক। কিন্তু জমির অত্যধিক মূল্য এবং ভালো জমির অভাবের জন্য সকলের পক্ষে ইহার সুযোগ গ্রহণ সম্ভব হইতেছে না। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে বিভিন্ন রাজ্যের গৃহনির্মাণ মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে এই অসুবিধা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার পর স্থির হয় যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থের একটা বড় অংশ রাজ্য সরকারসমূহ জমি সংগ্রহ ও উন্নয়নে ব্যয় করিবেন। উপরন্তু অপর এক পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতসরকার রাজ্য সরকার-সমূহকে প্রকৃত বাসগৃহনির্মাতাদের মধ্যে বিনা-লাভ বিনা-ক্ষতি ভিত্তিতে জমিবণ্টনের উদ্দেশ্যে জমি সংগ্রহ ও উন্নয়নের জন্য অর্থ প্রদান করিবেন।

In 1954 the Housing Scheme for lower income group was accepted in India. Towards the end of 1958 thirty-five thousand dwelling houses were built throughout India under this scheme and another fourteen thousand houses are under construction. According to the scheme an amount of twenty-nine crores and fifty-six lakhs of rupees was spent in total by the end of March, 1958.

As the income of most of the inhabitants of towns in India is low, it is not possible for them to build their own houses without any help from the Government. With a view to help them the Government has taken up this housing scheme. Many people are willing to avail of the advantage of this scheme. But for the very high price of lands and for the scarcity of good plots, it is not possible for everyone to take the opportunity. In October, 1958 in a conference of the Ministers for Housing in different States it has been settled after special discussions on these difficulties that, the State Governments will spend a major portion of the sum allocated in the plan for acquiring and developing of lands. Moreover, according to another scheme, the Government of India will offer money to State Governments to acquire and develop land for the purpose of distributing them on no profit and no loss basis among those who will actually build dwelling houses.

● ইংরেজী থেকে বাংলা ●

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬২

The Union Government has decided to set up five pilot goods transport societies on a co-operative basis in the states. West Bengal will have one and some progress has been made in work in that connection. Under the scheme unemployed people who have passed the school final or an equivalent examination will be given training in automobile engineering in the state transport corporation factory for about a year.

[এইবার অপূর্ণ অনুবাদের শূন্যস্থান গুলি চলতি ভাষায় পূর্ণ করো]

কেন্দ্রীয় -- বিভিন্ন রাজ্যে — — পাঁচটি পরীক্ষামূলক — — সমিতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত —। পশ্চিমবঙ্গে — — একটি প্রতিষ্ঠিত —- ও এসম্পর্কে কাজ কিছুটা —। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী — — বা অনুরূপ কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বেকার -- রাজ্য পরিবহন — কারখানায় প্রায় একবছরের জন্য — — বিষয়ে শিক্ষা — —।

১৯৬১

The Reserve Bank's recent notification regarding foreign account held by persons resident in India would not apply to U.K.—nationals and other foreigners who are not domiciled. Explaining the position an officer of the Reserve Bank said that it would apply only to Indian nationals and others who become Indian nationals by domicile.

ভারতে বসবাসকারী যে সকল লোক বিদেশে টাকা লগ্নী করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে — — সম্প্রতি যে — প্রকাশ — তা যুক্ত রাজ্যের নাগরিক বা ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেননি এমন — গণের ওপর প্রযুক্ত — — অবস্থার ব্যাখ্যা করে — — একজন কর্মচারী বলেন যে — ভারতীয় — ও অন্যান্য যাঁরা স্থায়ী ভাবে বসবাস — ভারতীয় নাগরিক — — তাঁদের ক্ষেত্রেই — প্রয়োগ — —।

১৯৬২

A container service between Howrah and Patna junctions has been introduced as an experimental measure for the transport of "smalls" consignments of selected items like medicines, electric goods, cycle parts, books, printing materials and tea etc.

The new service for which no additional fee is charged, is expected to minimize the risk of damage to goods while in transit.

ঔষধ পত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সাইকেলের অংশ, বইপত্র, মুদ্রন — চা ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি "ছোট ছোট" মাল পাঠানোর জন্যে হাওড়া ও পাটনা জংশনের মধ্যে — ব্যবস্থা হিসাবে একটি আধার-পরিবহন — চালু — —। আশা করা যায়, এই নোতুন — — ফলে, যাতায়াতে, মালের ক্ষতির সম্ভাবনা খুবই — —।

১৯৬২

The share market have been moving rather indecisively of late. Shortage of funds and tightness in money market have led to a shrinkage in the volume of business, with values of most counter tending to look down. A good portion of investible funds is tied up with new issues and the markets will continue to feel acute need for funds until the excess over calls is released.

সম্প্রতি — বাজার গুলি কিছুটা অনির্দ্দিষ্ট ভাবেই সঞ্চরণ —। অর্থের — জন্যে ও টাকার বাজার সঙ্কুচিত — বলে, ব্যবসার প্রসার কমে এসেছে, অধিকাংশ শেয়ারের দাম পড়তির মুখে। বিনিয়োগযোগ্য টাকার অনেকটাই শেয়ার গুলোতে — — এবং যতদিন না অতিরিক্ত অর্থ ছেড়ে দেওয়া হয় ততদিন তহবিলের ঘাটতির জন্যে অভাববোধ থেকে যাবে।

ষষ্ঠ স্তর

প্রয়োগ : চতুর্থ

● ইংরেজী থেকে বাংলা ●

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

[সংখ্যা চিহ্নিত স্থানগুলি পূরণ কর]

১৯৪০

The Reser   ort on Currency and Finance for 1937-38 dealt with a peri od, the latter part of which witnessed a general recession in world economic cond tions. In the year 1938-39 there were signs of a recovery which would probably have been more pronounced but for growing uncertainties of the international situation which dominated the financial markets internat onal situation which dominated the financial markets during the latter part of the year. The five years of increasing eco- trend early in 1937-38. This downward movement which had its origin in the U S.A. appears to have been arrested in the country about June, 1938.

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১৯৩৭-৩৮ সালের মুদ্রা ও অর্থব্যবস্থার বিবরণীতে যে সময়ের কথা আলোচিত ১ ২ শেষার্ধে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে একটা সাধারণ মন্দাভাব ৩ ৪। বৎসরের শেষদিকে অর্থনৈতিক বাজারের উপর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান অনিশ্চিত অবস্থার প্রভাব না ৫ , ১৯৩৮-৩৯ সালের উন্নতির লক্ষণ সম্ভবতঃ আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশিত ৬ । ১৯৩২ সালে আবদ্ধ পঞ্চবর্ষব্যাপী ক্রমবর্ধমান আর্থিক অগ্রগতি, ১৯৩৭-৩৮ সালের প্রথম দিকে নিম্নাভিমুখী হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম এই নিম্নগতির সূত্রপাত হয় এবং সেখানেই ১৯৩৮ সালের জুন মাস নাগাদ ৭ ৮ হয় ৯ মনে হয়।

১৯৪১

Under the stimulus of high prices, production was expanded in most industries after the outbreak of the war, according to the Review of Trade in India in 1939-40. The output of jute manufactures increased by 5% as compared with 1938-39. The iron and steel industry was fully booked with order resulting in a considerable increase in its output, production of finished steel rising to 804,000 tons, which was 11% higher than in the preceding year. Production of paper attained a new record amounting to 1,416,000 cwt. which exceeded the previous year's figures by 232,800 cwt. Coal raising increased to 25,56,000 tons, a level which was not reached at any time during the past ten years.

১৯৩৯-৪০ সালের ভারতীয় ১ ২ পত্রানুসারে (রিভিউ অফ ট্রেড) যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মূল্য বৃদ্ধির প্রত্যাশায় অধিকাংশ শিল্পেই উৎপাদন বৃদ্ধি ৩। ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় পাটজাত পণ্যের উৎপাদন শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি ৪। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ৫ কাজে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত থাকায় উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, খাঁটি ইস্পাতের উৎপাদন বাড়িয়া ৮,২৪,০০০ টনে পৌছায়। ইহা পূর্ববর্তী বৎসরের ৬ তুলনায় শতকরা ১১ ভাগ বেশী। কাগজের উৎপাদন একটি ৭ ৮ স্থাপন করে, পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ২ লক্ষ ৩২ হাজার হন্দর বৃদ্ধি ৯ উহা ১৪ লক্ষ ১৬ হাজার হন্দরে ১০। কয়লা উত্তোলন বৃদ্ধি পাইয়া ২,৫০,৫৬,০০০ টন পর্য্যন্ত ১১। গত দশ বৎসরের মধ্যে উত্তোলিত কয়লার ১২ আর কখনও এত বেশী ১৩ ১৪।

১৯৪২

The growth of Trade Unionism was very slow in its early stages and had only reached a million members in 1874. Before the Great War it had reached four millions and in 1920 the number had swollen to 8½ millions. Since then there had been a decline of membership due to a variety of causes, the general strike of 1926, perhaps, being the principal factor. Nevertheless, trade unions to-day are powerful bodies and the principle of collective bargaining is recognised by the public as a wise means of settling

disputes. No one with a knowledge of the historical facts arrive at any other conclusion than this : that the workers have not received a fair share of profits of the industry during that period. Now-a-days, a much more enlightened view in regard to payment of workers is generally taken by employers of labour and the standard of living has certainly been raised since the Great War.

শ্রমিকসঙ্ঘ আন্দোলনের প্রসার প্রথম পর্যায়ে খুব মন্থর গতিতে ১। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিকসঙ্ঘসমূহের সভ্যসংখ্যা হইয়াছিল মাত্র দশ লক্ষ। মহাযুদ্ধের পূর্বে এই সংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ এবং ১৯২০ সালে তাহা বৃদ্ধি ২ পঁচাশি লক্ষে দাঁড়ায়। ৩ হইতে নানা কারণে সভ্যসংখ্যা হ্রাস পায়; সম্ভবতঃ ১৯২৬ সালের সাধারণ ধর্মঘট ৪ সর্বপ্রধান কারণ। পরন্তু, বর্তমানে শ্রমিকসঙ্ঘগুলি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে আলোচনা ৫ বিবাদ মীমাংসার নীতি জনসাধারণ যুক্তিযুক্ত পথ হিসাবে স্বীকার ৬ ৭। শ্রমিকের শ্রমমূল্য প্রদান বিষয়ক বিগত শতবর্ষের ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে ৮ পরিচিত ৯ কেহই এই সিদ্ধান্তে উপনীত না ১০ ১১ না যে, এই সময়ের মধ্যে শিল্পের লাভের ন্যায়সঙ্গত অংশ শ্রমিকেরা পায় ১২। আজকাল শ্রমিক নিয়োগকারীরা সাধারণতঃ শ্রমিকদের মজুরী প্রদান সম্পর্কে অনেক বেশী উদার মনোভাব গ্রহণ করেন এবং মহাযুদ্ধের সময় ১৩ শ্রমিকদের জীবনযাত্রাবমান নিশ্চিতরূপে উন্নীত ১৪।

১৯৪৩

The French Revolution of 1789 swept away the ancient but corrupt dynasty of Bourbon, and the First Republic was set up, based upon the declaration of the Rights of Man which was the Bible of the extreme Left until the issue of Karl Marx's Communist Manifesto. This Republic, like modern Communism, aimed at the international brotherhood of man, but, unlike the institute in Russia, a revolutionary France set out to achieve the brotherhood of the workers by war. From 1789 the ragged revolutionary hords of France poured over Europe into Germany, the Natherlands, and Italy, to subdue and dethrone the surrounding princes. They succeeded ; but the success destroyed the Revolution, for from it sprang up the military dictatorship of Napolean Bonaparte.

১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব প্রাচীন দুর্নীতিপরায়ণ বুরবঁ রাজবংশের বিলোপ সাধন করে, এবং কার্ল মার্কসের 'সাম্যবাদী ঘোষণাপত্র' (কম্যুনিষ্ট

ম্যানিফেষ্টো) প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত চরম বামপন্থীদের ১ বাইবেলতুল্য 'মানুষের অধিকার' সংক্রান্ত ঘোষণার উপর ভিত্তি ২ প্রথম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক সাম্যবাদের ন্যায় এই সাধারণতন্ত্রেরও লক্ষ্য ছিল মানুষের মধ্যে, এক ৩ সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, তবে রাশিয়ার আদর্শের অনুরূপভাবে নয়, বিপ্লবী ফরাসী দেশ যুদ্ধের দ্বারা শ্রমিকদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ৪ থাকে। ১৭৮৯ সাল হইতে অনিয়ন্ত্রিত ফরাসী বিপ্লবীর দল চতুষ্পার্শ্ববর্তী রাজ শক্তিগুলিকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত ৫ উদ্দেশ্যে জার্মানী, হল্যাণ্ড, ইটালী প্রভৃতি ইউরোপের নানা দেশে ৬ পড়ে। তাহারা সফল ৭; কিন্তু এই সাফল্যের জন্যই বিপ্লব ধ্বংস হয়, কারণ ৮ ফলেই উদ্ভুত ৯ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সামরিক একনায়কত্ব।

১৯৪৪

For waging war on the scale and with the intensity demanded in these days, the first requirement of economic policy is to make the fullest possible use of productive resources of the nation in man power, equipment and command over materials. This in itself is problem enough, especially in view of the absorption of men into the armed forces, the unavoidable impairment of equipment, and the physical difficulty of keeping up the necessary inflow of materials. It is scarcely less necessary, however, to ensure that the goods and services produced, shall be of the kinds most urgently required. So great are the demands, direct and indirect, imposed by modern war that little margin is left for producing, the ordinary luxuries of peaceful times or for accumulating assets which makes for a rising level of social welfare

• আধুনিক কালে সমর পরিচালনা যে প্রাচুর্য ও তীব্রতা দাবী করে ১ সহিত সংগ্রাম ২ ৩ অর্থনীতির দিক ৪ সর্বপ্রথমে প্রয়োজন জনবল, সাজসরঞ্জাম ও পণ্যাদির কর্তৃত্বাধিকার বিষয়ে জাতির সমগ্র উৎপাদন শক্তির যথাসম্ভব পূর্ণতম ব্যবহার। সশস্ত্র বাহিনীতে লোক সংগ্রহ, সাজসরঞ্জামের অনিবার্য ক্ষয়ক্ষতি ও প্রয়োজনমত পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা অটুট রাখার প্রাকৃতিক অসুবিধা—বিশেষ করিয়া এইসব দিক ৫ এবং এমনিতেই ৬ একটি বিরাট সমস্যা। ৭ ৮ অতি অল্পক্ষেত্রেই এই কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, যে সকল পণ্য ও কাজের অবিলম্বে প্রয়োজন, সেই সব পণ্য ও কাজ উৎপন্ন হওয়া উচিত। আধুনিক যুদ্ধ এত বেশী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাহিদার সৃষ্টি করে যে, শান্তিকালীন সাধারণ

বিলাস দ্রব্য সমূহ উৎপাদন ৯ অথবা সমাজ কল্যাণকর ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের উপযোগী সম্পত্তি সঞ্চয়ের সামান্যতম সুযোগও ১০ না।

১৯৪৫

Statistics of unemployment mean rows of men and women, not of figures only. The three million or so unemployed in 1932 means three million lives being wasted in idleness, growing despair and numbering indifference. Behind these three million individuals seeking an outlet for the energies and not finding it, are their birthright of healthy development, pondering whether they should have been born ? Unempoyment in the ten years before this war meant unused resources in Britain to the extent of at least £500,000,000 per year. That was the additional wealth we might have had if we had used instead of wasting our powers. But the loss of material wealth is the least of the evils of unemployment. The greatest evil of unemployment is not the loss of additional material wealth which we might have with full employment. There are two other great evils : first that unemployment makes men seem useless, not wanted, second that unemployment makes men live in fear springs hate.

বেকারত্বের ১ ২ কেবলমাত্র (একটি) সংখ্যা বুঝায় না, বুঝায় সারি সারি নারী পুরুষকে। ১৯৩২ সালের ৩০ লক্ষের ন্যায় বেকার সংখ্যার অর্থ—আলস্যে, ক্রমবর্ধমান নৈরাশ্যে এবং অসাড় উদাসীনতায় ৩০ লক্ষ লোকের জীবনের অপচয়। কর্মোৎসাহ নিয়োগের পথ অনুসন্ধানে ব্যর্থ মনোরথ এই ৩০ লক্ষ ব্যক্তির পিছনে রহিয়াছে তাহাদের স্ত্রী এবং পরিবারবর্গ এবং ৩ অভাবের তাড়নায় অসহায়ভাবে ছটফট ৪ ও সুস্থ বিকাশলাভের জন্মগত অধিকার ৫ ৬ যে, তাহাদের জন্মগ্রহণ সঙ্গত ৭ কিনা। ব্রিটেনে এই যুদ্ধের পূর্বের দশ বৎসরের বেকারত্বের অর্থ—বৎসরে অন্ততঃ ৫০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের সম্পদ অব্যবহৃত ৮ যাওয়া। আমাদের শক্তির অপচয়ের পরিবর্তে ব্যবহার ৯ ১০ আমরা এই পরিমাণ অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী ১১ ১২। কিন্তু জাগতিক সম্পদহানি বেকারত্বের তুচ্ছতম ক্ষতি। পূর্ণ-নিয়োগে যে অতিরিক্ত পার্থিব সম্পদ লাভ ১৩ ১৪ ১৫ ক্ষতিও বেকারত্বের বৃহত্তম ক্ষতি ১৬। আরও ১৭ বৃহত্তর ক্ষতি আছে—প্রথমতঃ, বেকার অবস্থার মানুষকে অপদার্থ ও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়, দ্বিতীয়তঃ, বেকারত্বে মানুষ ভয়ের মধ্যে বাঁচে ও ভয় ১৮ উদ্ভূত হয় ঘৃণা।

১৯৪৬

The internal situation in Australia after the war will be dominated by the requirements of reconstruction. The absorption into civilian employment of men discharged from the services, and the transfer of many people now engaged in war occupations to civilian activities will be an immense task. It is clear that one of the conditions conducive to the successful solution of the post-war employment problem will be the continued maintenance of a high level of industrial activity. This implies that the reduction of industry to civilian production must be enlarged, when necessary, to absorb any surplus capacity left by declining war production. Some labour and materials will need to be allocated to undertake the necessary preparatory work, particulary in connection with hausing and certain phases of manufacturing industry. In the immediate post-war period there will be no lack of effective demand for both goods and services. Plant and equipments have deteriorated the supply of durable consumption goods in the hands of consumers will need to be replenished, the demand for housing will be urgent. The amount of purchasing power already available to the community, in the hands of institution and individual consumers, is extremely high.

যুদ্ধোত্তর কালে অস্ট্রেলিয়ার আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি পুনর্গঠনের প্রয়োজন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ১। সেনাবাহিনী ২ কর্মচ্যুত লোকদের অসামরিক চাকুরীতে নিয়োগ এবং বর্তমানে যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যাদিতে নিযুক্ত বহুসংখ্যক লোককে অসামরিক কার্যাদিতে ৩ আনা এক কঠিন ৪। স্পষ্টই বুঝা ৫ যে, যুদ্ধোত্তর-কালীন নিয়োগ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ অবিচ্ছিন্নভাবে উন্নত পর্যায়ে শিল্পাদি চালু রাখা। ৬ অর্থ, সমর-পণ্য উৎপাদন ৭ ফলে যে সব লোকজন উদ্বৃত্ত ৮, ৯ কাজে নিয়োগ ১০ জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনমত অসামরিক পণ্য উৎপাদনে অধিকতর সম্প্রসারিত ১১ :২। প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কার্যাদি নির্বাহের জন্য বিশেষতঃ, গৃহনির্মাণের এবং পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পের বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রের জন্য কিছুসংখ্যক শ্রমিক ও উপকরণাদি নির্দিষ্ট ১৩ ১৪ প্রায়াজন ১৫। যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরে পণ্য ও শ্রমের কার্যকরী চাহিদা কিছুমাত্র হ্রাস ১৬ না। যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্ষয়প্রাপ্ত ১৭, পণ্য ব্যবহারকারীদের হস্ত দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্যসমূহের দ্বারা

সারপূর্ণ ১৮ দিবার প্রয়োজন ১৯, বাসগৃহের দ্রুত চাহিদা ২০ ২১ ২২ ২৩। সমাজের অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত ভোগকারীর হাতে, ক্রয়ক্ষমতা ইতিমধ্যেই যে পরিমাণে ২৪ ২৫ ২৬ ২৭।

১৯৪৭

The main trends in the world production and distribution of gold noticed in 1943 continued during 1944. The production of gold which had been risen, particularly since 1934, partly as a result of the rise in its doller value from 26.67 lb. to 35 lb. an ounce in February 1934, reached the peak of 41 million ounces in 1940 and stood at 40 million ounces in 1941 ; during the seven years 1934 to 1940 production had expanded by about 50 per cent. There has been a continuous decline in production during the three years ended 1944 owing mainly to the more pressing requirements of the War. The total world output declined by 10 per cent in 1942, 17 per cent in 1943 and 7 per cent in 1944. Production in 1944 was lower than the record output of 1940 by about 32 per cent., the largest decline occurring in the United States where the output fell to as low a level as 20 per cent of 1940. Production in South Africa showed a relatively small decline of about 14 per cent. compared with the country's record output in 1941. The estimated production of gold in India amounted to 1,87,918 ounces as compared with 2,522,228 ounce in the previous year.

১৯৪৩ সালের বিশ্বের স্বর্ণ উৎপাদন ও বণ্টনের প্রধান প্রবণতা ১৯৪৪ সালেও ছিল অব্যাহত। বিশেষ ১ ১৯৩৪ সাল হইতে স্বর্ণ উৎপাদনে যে বৃদ্ধি ঘটে ২ অন্যতম কারণ, ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বর্ণের ডলার মূল্য বৃদ্ধি ৩ প্রতি আউন্স ২০·৬৭ ডলারের স্থলে ৩৫ ডলার হয়। উৎপাদন ১৯৪০ সালে সর্বোচ্চ অবস্থায় ৪ কোটি ১০ লক্ষ আউন্সে উঠে এবং ১৯৪১ সালে ৪ কোটি আউন্সে দাঁড়ায়। ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এই সাত বৎসরে স্বর্ণ উৎপাদন শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক ও যন্ত্রপাতি স্বর্ণের খনি ৫ যুদ্ধের প্রবলতর প্রয়োজনে নিযুক্ত ৬ জন্যই ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিন বৎসর উৎপাদন ক্রমেই হ্রাস ৭ থাকে। বিশ্বের মোট স্বর্ণ উৎপাদন ১৯৪২ সালে ১৯৪৩ সালে এবং ১৯৪৪ সালে যথাক্রমে শতকরা ১০ ভাগ, ১৭ ভাগ এবং ৭ ভাগ

হ্রাস পায়। ১৯৪০ সালে যে সর্বোচ্চ পরিমাণে স্বর্ণ উৎপাদন হয়, ১৯৪৪ সালের উৎপাদন তাহা অপেক্ষা শতকরা ৩২ ভাগ কম ছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেই সর্বাধিক উৎপাদন হ্রাস ঘটে, ঐ দেশে ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত ৮ যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার উৎপাদন হ্রাস অপেক্ষাকৃত ৯ হয় এবং এইদেশে ১৯৪১ সালের সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ উৎপাদন কমে। ভারতবর্ষে আনুমানিক স্বর্ণ উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসরের ২,৫২.২২৮ আউন্সের তুলনায় ১,৮৭,৯১৮ আউন্সে ১০ ।

১৯৪৮

Unfortunately, we are accustomed in these days all over the world to budget-deficits, and familarity breeds contempt in spite of the fact that more than one awful example is before us among the nations of Europe of the chaos which continued budget-deficits inevitably induce. The individual who lives beyond his income year by year does not escape the penalty and the same is true of a State. The individual who makes this mistake quickly finds himself compelled to a ruthless cutting down of his expenditure or is driven either to sell or mortage a part or the whole of his possession ; or in the worst event, to cheat his creditors. A state is in the same position is frequently obscured by the fact that the State's creditors are in another capacity the citizens of the State and its tax-payers.

দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী ঘাটতি বাজেটে অভ্যস্ত ১ ২ এবং ইউরোপীয় দেশগুলিতে অবিরাম ঘাটতি. বাজেটের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে ৩ একাধিক আশঙ্কাজনক দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও অত্যধিক পরিচিতির জন্য ব্যাপারটা তাচ্ছিল্য ৪। বৎসরের পর বৎসর কোন লোক যদি তাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক ৫ থাকে, ৬ জন্য যেমন তাহাকে দুঃখ ৭ হয়; তেমনি এই কথা রাষ্ট্রের সম্পর্কেও সত্য। ব্যক্তি-বিশেষ এই ভুল ৮ অল্পকালের মধ্যে ৯ নির্মমভাবে ব্যয়-সঙ্কোচে বাধ্য ১০ বা ১১ সম্পত্তির কোন অংশ বা সম্পূর্ণ বিক্রয় বা বন্ধক দিতে হয়। আর সব চেয়ে শোচনীয় অবস্থায় ১২ পাওনাদারদের প্রতারণা ১৩ হয়। রাষ্ট্রের অবস্থাও একইরূপ, তবে রাষ্ট্রের পাওনাদারগণই অন্য হিসাবে রাষ্ট্রের নাগরিক ও করদাতা হওয়ায় এই অবস্থা প্রায়শঃ অস্পষ্ট ১৪ যায়।

১৯৪৯

The general attitude towards abolition of the zamindari system in India seems somewhat more certain than a year ago. In an inflationary period it is important to preserve sources of revenue, especially when, as now, provinces are finding it difficult to reduce expenditure, are for some purposes having to increase it and have been warned by the Centre not to weaken its borrowing powers. These are not the only practical difficulties. Moreover, at least as important as abolition itself is the policy to be adopted after it. On this the Agrarain Reforms Committee has yet to report and it may be held that the merits of provincial legislation cannot be properly judged until what is to replace zamindari has been broadly settled.

পূর্বের বৎসরের তুলনায় এই বৎসর ভারতে জমিদারীপ্রথা বিলোপ সম্পর্কে সাধারণ মনোভাব কিছুটা বেশী সচেতন ১ মনে ২। মুদ্রাস্ফীতির যুগে বিশেষ করিয়া বর্তমানে যখন প্রদেশগুলিকে ব্যয় সঙ্কোচে অসুবিধা বোধ ৩ ৪ এবং কতকগুলি কারণে ব্যয় বৃদ্ধি ৫ হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ যখন ৬ ঋণ সংগ্রহ ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ না ৭ জন্য সতর্ক ৮ ৯, তখন রাজস্বের উৎসগুলিকে সংরক্ষণ করাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আসল ১০ এখানেই শেষ নয়। অধিকন্তু, জমিদারী বিলোপের পর কোন্ নীতি গৃহীত ১১, তাহাও অন্ততঃ জমিদারী-প্রথা বিলোপের ন্যায় সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে কৃষিসংস্কার কমিটি এখনও রিপোর্ট দেন নাই এবং বলা ১২ পারে যে, জমিদারী-প্রথার পরিবর্তে কোন্ ব্যবস্থা চালু ১৩ তাহা মোটামুটি ভাবে স্থিরীকৃত না হওয়া পর্যন্ত প্রাদেশিক আইনের গুণাগুণ যথার্থ বিচার করা ১৪ না বলিয়া মনে হয়।

১৯৫০

With the war, an era of industrial expansion dawned upon the country. The lessons taught by the war brought about a remarkable change in the industrial position of the country as also in the outlook of the businessman as compared with those of 1913. Government experienced a great shortage of materials required for munitions and the industries were handicapped on account of interruptions in the supply of machinery and stores. The

Munition Board was started with the object of applying manu facturing resources of India to war purposes. But the industrial boom was shortlived.

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে ১ এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। যুদ্ধের শিক্ষা, ১৯১৩ সালের তুলনায়, দেশের শিল্প পরিস্থিতিতে এবং ২ দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন আনে। সরকার যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈয়ারীর উপকরণাদির তীব্র অভাব অনুভব করেন এবং যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্রের সরবরাহে প্রতিবন্ধকতার ফলে শিল্প গুলি ৩ পড়ে। যুদ্ধের কাজে ৪ শিল্প পণ্যাদি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে 'সমর পর্ষদ', (মিউনিশান বোর্ড) সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু এই তেজী অবস্থা স্বল্পস্থায়ী হয়।

● ইংরেজী থেকে বাংলা ●

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫১

In oramary speecn a wealthy man is a man with a large income. How do we state a man's income ? Usually in pounds, dollars and francs and in the same way we state a country's income in terms of money. But the pounds, shillings and pence are not the wealth. No one except the miser, desires them for their own sake ; they are wanted only for their purchasing power. The real wealth consists of the things that the money will purchase. The precious metals and precious stones, the materials and implements of manufactures, food-stuffs, land and building these, and not their money-prices are what we mean by wealth. *

চলতি কথায়, যাঁর আয় অনেক বেশী, তিনিই ধনী। আমরা মানুষের আয় কি ভাবে দেখাই ? সাধারণতঃ পাউণ্ড, ডলার, ফ্রাঙ্কের সাহায্যে ; ঠিক এই ভাবে আমরা কোন দেশের আয় প্রচলিত মুদ্রার হিসাবেই দিয়ে থাকি। কিন্তু পাউণ্ড, শিলিং ও পেন্স সম্পদ নয়। কৃপণ ছাড়া অর্থের জন্যেই অর্থ কেউ চায় না ; ক্রয় ক্ষমতার জন্যই তা আকাঙ্ক্ষা করে। প্রকৃতপক্ষে, সম্পদ বলতে আমরা তাকেই বুঝি যা দিয়ে কেনা যায়। মূল্যবান ধাতু ও পাথর উৎপাদনের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি, খাদ্যদ্রব্য, জমি ও ঘর বাড়ী—এইগুলিকেই আমরা সম্পদ বলতে বুঝি, এদের মুদ্রামূল্যকে নয়।

১৯৫৩

A striking feature of the present structure of taxation in India is the relatively narrow range of the population affected by

* এই অনুবাদটি চলতি ভাষায় করা।

it. About 28 percent of the tax revenue comes from direct taxation (land revenue being treated as indirect tax) which directly affects only about half of one per cent of the working population. Another 17 per cent is accounted for by import duties which are derived to a large extent from consumers of commodities like motor vehicles, high quality tobacco, silk and silk manufactures, liquors and wines and affect only a relatively small section of the population. On the other hand land taxation contributes now only about 8 per cent of the total tax revenue compared with about 29 per cent in 1939.

তুলনামূলক ভাবে জনসংখ্যার অতি অল্পাংশের অন্তর্ভুক্তিই ভারতের বর্তমান কর কাঠামোর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। মোট কর-রাজস্বের শতকরা প্রায় ২৮ ভাগ প্রত্যক্ষ কর হইতে আসে (ভূমি রাজস্বকে পরোক্ষ কর হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে)। কর্মরত জনসংখ্যার শতকরা মাত্র একভাগের অর্ধাংশের মত প্রত্যক্ষভাবে ইহার অধীনে পড়ে। অপর শতকরা ১৭ ভাগ আসে আমদানী শুল্ক হইতে ; ইহা প্রধানতঃ মোটর গাড়ী, উচ্চ শ্রেণীর তামাক, রেশম ও রেশমজাত পণ্য, সুরা এবং মদ্য ইত্যাদি পণ্য-ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে আসে এবং তুলনামূলক ভাবে জনসংখ্যার ক্ষুদ্রাংশকেই মাত্র ইহা স্পর্শ করে। অপর পক্ষে, ১৯৩৯ সালে শতকরা প্রায় ২৯ ভাগের তুলনায়, বর্তমানে ভূমি-রাজস্ব হইতে মোট কর-রাজস্বের শতকরা মাত্র ৮ ভাগের মত আসে।

১৯৫৫

"Credit", says and old proverb, "supports the farmer as the hangman's rop supports the hanged." But if credit is sometimes "fatal" it is often indispensable to the cultivator. An Indian proverb in verse tells him that only that village is fit to live in which has "a money-lender from whom to borrow at need, a Vaid to treat in illness, Brahmin priest to minister to the soul and a stream that does not dry up in summer." Agricultural credit is a problem when it can't be obtained ; it is also a problem when it can be had—but in such a form that on the whole it does more harm than good. It may be said that, in India it is this two-fold problem of inadequacy and insuitability that is perennially peresented by agricultural credit.

"ঋণ কৃষককে ধারণ করে, কিন্তু তেমনভাবেই ধারণ করে, যেমনভাবে জল্লাদের

রজ্জু ফাঁসির আসামীকে ধারণ করে”—ইহা একটি প্রাচীন প্রবাদ। ঋণ অনেক সময় 'মারাত্মক' হইলেও কৃষকের নিকট প্রায়শঃ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। কৃষকদের জন্য একটি ভারতীয় শ্লোকে আছে—“যে গ্রামে প্রয়োজনে ঋণ দেওয়ার মহাজন আছে, অসুখে চিকিৎসার জন্য বৈদ্য আছে, আত্মার সদ্‌গতির জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে এবং গ্রীষ্মে শুকাইয়া যায়না এমন নদী আছে”, সেই গ্রামই বাসের যোগ্য। কৃষি ঋণ যখন পাওয়া যায়না তখন ইহা একটি সমস্যা; আবার যখন ইহা পাওয়া যায় তখনও ইহা একটি সমস্যা,—পাওয়া গেলে মোটের উপর মঙ্গলের চেয়ে মন্দই করে বেশি। একথা বলা যায় যে, ভারতে, কৃষি ঋণের অপ্রতুলতা ও অনুপযোগিতার দ্বিমুখী সমস্যা স্থায়ীভাবে বর্তমান।

১৯৫৭

Great Britain in 1908 passed its Old Age Pension Law. This provided free payment by the Government, as compared with the old-age insurance plan of Germany, in which employer, employee and Government all contributed. At the age of seventy a pension was to be paid to any needy individual provided he or she had been a British subject for twenty years and had never been either a pauper or a criminal. The maximum pension was a little over a dollar a week. For many years old age insurance programmes have been introduced in the United States for teachers and other Governmental employees.

১৯০৮ সালে গ্রেটব্রিটেনে বার্ধক্য অবসর ভাতা আইন বিধিবদ্ধ হয়। জার্মানীর বার্ধক্য বীমায় নিয়োগকারী, নিযুক্ত ব্যক্তি এবং সরকার সকলকেই অর্থ দিতে হইত সেই তুলনায় এক্ষেত্রে একমাত্র সরকারই নিঃসর্তে অর্থ প্রদান করিত। যে ব্যক্তি কখনও নিঃস্ব বা আইনতঃ অপরাধী নয় এবং যাহার ব্রিটিশ নাগরিকত্ব অন্ততঃ কুড়ি বৎসরের, সেই ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হইলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সত্তর বৎসর বয়সে এই ভাতা দেওয়া হইত। এই ভাতার সর্বোচ্চ পরিমাণ সাপ্তাহিক এক ডলারের সামান্য কিছু বেশী। বহুদিন হইল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীদের জন্য বার্ধক্য বীমা কার্যসূচী চালু করা হইয়াছে।

১৯৫৯

The newly formed Small Savings Board will meet at Lucknow tomorrow as a result of the substantial shortfall in the target of small savings, to which attention was recently drawn by the

Standing Committee of the National Development Council. Importance will therefore attach to the decisions that the Board may take to simplify the procedure for sale, transfer and cashing of National Plan savings certificates and postal savings coupons, for the small savings sectors will in future have to be relied on more and more to raise internal resources for the Second Five Year Plan. With the formation of this Board all the agencies responsible for fostering small savings have been brought under unified control.

ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের ঈপ্সিত মাত্রায় যথেষ্ট পরিমাণে যে ঘাটতি পড়িয়াছে তাহার প্রতি সম্প্রতি জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের স্থায়ী সমিতি দৃষ্টি আকর্ষণ করায় আগামীকল্য লখ্‌নৌয়ে নব গঠিত ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংস্থার এক অধিবেশন হইবে। জাতীয় পরিকল্পনা সঞ্চয় সার্টিফিকেট এবং পোষ্টাল সঞ্চয় কুপন বিক্রয়, হস্তান্তর এবং ভাঙ্গানোর নিয়মাবলী সরলতর করিবার জন্য বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হইবে, যাহাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র সঞ্চয় তহবিলের উপরই অধিকতর নির্ভর করা যায়। স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করিবার জন্য যে সকল সংগঠন দায়িত্ববদ্ধ, এই বোর্ড গঠন করিয়া তাহাদিগকে সুসংহত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা হইয়াছে।

১৯৬০

India's exports were facing severe competition in overseas markets. In order that these might stand competition in both quality and price, per unit productivity should increase. The importance of productivity at the present stage of industrial development should be realised by all concerned.

The primary aim of the national productivity movement was to stimulate productivity consciousness among employers and employees in all spheres of economic activity. Factors like outmoded plant and equipment, substandard raw material, faulty production techniques, lack of properly trained personnel and inefficient management contributed to the low level of production.

The object of the movement was to improve quality through improved techniques of production. It aimed at the optimum utilization of available resources in men, machines, material, power and capital.

বিদেশের বাজারে ভারতীয় রপ্তানি-পণ্য সুকঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াছে। গুণগত ও মূল্যগত—উভয় বিচারে ইহারা যাহাতে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে তাহার জন্য একক প্রতি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমান শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সর্বস্তরে নিযুক্ত শ্রমিক ও নিয়োগকারীর মধ্যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সম্পর্কে সচেতনতা জাগ্রত করা। প্রাচীন সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, নিম্নমানের কাঁচামাল; ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদন-পদ্ধতি, সুদক্ষ শ্রমিকের অভাব, অক্ষম পরিচালনা প্রভৃতি উৎপাদনের মান নিম্নগামী হওয়ার মূল কারণ।

উৎপাদন শৈলীর উন্নয়নের দ্বারা মানোন্নয়নই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। প্রাপ্তব্য শ্রমিক, যন্ত্র, উপকরণ, শক্তি এবং মূলধনের বাঞ্ছিততম সদ্ব্যবহারই ইহার লক্ষ্য।

অষ্টম স্তর

সংকেত সম্বলিত

● ইংরেজী থেকে বাংলা ●

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬১

High level consumer demand has provided the chief source of strength to the American economy in the year so far, says 'The Times' New York Correspondent. But there are a number of indications that the consumer is growing more cautions. Hire-purchase credit extensions no longer are rising even through personal income continues upward. Withdrawals of savings deposits and redemptions of savings bonds are/declining for the first time in a year and a half. And a national survey finds a sharp curtailment of consumer buying Plans for the rest of the year.

The survey, conducted by the National Industrial Conference Board and News Week magazine, learnt that consumers planned to buy 10 to 20% fewer electrical applianees this year than last 35% fewer used automobiles, 27 p.c. fewer new homes than early this year, and 21% fever older homes. Only new automobile sales were expected to continue upward increasing 5%.

সংকেত : Consumer demand—ভোগ্য পণ্যের চাহিদা। Chief source—প্রধান উৎস। Correspondent—সংবাদ দাতা। Indications—লক্ষণ। Hire-purchase credit extension—ঠিকা সওদার ঋণ সম্প্রসারণ। Personal income—ব্যক্তিগত আয়। Withdrawals of savings deposits—সঞ্চয় তহবিল থেকে টাকা তোলা। Redumption of savings bonds—সঞ্চয় পত্র পরিশোধ। National survey—জাতীয় সমীক্ষা। National Indus

trial Conference Board—জাতীয় শিল্প সম্মেলন বোর্ড। Electrical appliance—বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। Automobiles—মোটর গাড়ী।

১৯৬২

The shellac trade has come to a standstill in Calcutta. There has been virtually no business with foreign countries nor has any export been made during the past few weeks.

The stalemate has taken place due to official bungling. It may be recalled that the trade has formulated as new export scheme for shellac to replace the existing one by making export prices more flexible. The idea to that unless prices can be adjusted in line with supply and demand, trading will be hampered. The previous export scheme was rigid because maximum and minimum export prices were fixed.

The Government of India has, nevertheless, disapproved the new export scheme but it has not made up its mind as to how the trade is to be regulated. As a result, export licenses, it is believed, have not been issued.

সংকেত ঃ Shallac trade—গাত গালার ব্যবসায়। Stand still—অচলাবস্থা। Virtually—কার্যতঃ। Export—রপ্তানি। Stalemate—অচল অবস্থা। Bungling—গাফিলতি। Flexible—পরিবর্তন যোগ্য; নমনীয়। Disapproved—অনুমোদন করে নাই। License—অনুমতি পত্র।

১৯৬২ (ত্রৈবার্ষিক)

A Commonwealth common market and Commonwealth regional free trade area were suggested to-day at the Commonwealth Parliamentary Association Conference as alternatives to be considered if Britain decided not to join the European Common Market, says Reuter.

The suggestions came from a Nigerian Minister, speaking in the debate on economic affairs which was opened yesterday by the leader of the Australian delegation.

The debate will continue until mid day tomorrow when the Lord Privy Seal and Minister in charge of Britain's Common Market negotiations will sum up.

A member of Parliament suggested that a Commonwealth representative should take part in the Common Market negotiations. That would give the Commonwealth a chance to see Britain's difficulties and envisage alternatives if negotiations broke down.

সংকেত : Commonwealth Common Market—কমনওয়েলথ সাধারণ বা কমনওয়েলথ বারোয়ারী বাজার। Regional free trade area—আঞ্চলিক অবাধ বাণিজ্য এলাকা। Parliamentary Association—সংসদীয় সমিতি। Alternative—বিকল্প। Economic affairs—অর্থ নৈতিক বিষয়াদি। Delegation—প্রতিনিধি। Envisage—লক্ষ্য করা গেল।

১৯৬৩

The gloom which prevailed in the stock market earlier is vanishing steadily due to the fact that the economic situation has taken a turn for the better. Although the Aid India Club has not given India all the aid which is necessary during the second year of the Third Plan, New Delhi thinks that the gap in aid will be ultimately filled.

In spite of the improved prosepects for aid, investors have been cautious. So turnover has largely been confined to speculative shares. Although bigger aid has been sanctioned, it is doubtful whether it can be of much use as far as the current working of industries is concerned. As most of the aid has been tied to various projects, India may have to obtain the foreign exchange for maintenance of imports out of export earnings. But the possibility of increasing exports to any great extent is being discounted. The various industries have suffered due to the shortage of raw materials, coal power and transport. The increase from 45 to 50% in the corporation tax has also squeezed industrial profits.

সংকেত : Gloom—অবসাদ। Stock market—শেয়ার বাজার। Vanish—অপনোদিত হওয়া। Aid India Club—ভারত-সাহায্যদান ক্লাব। Gap—ব্যবধান। Turn over—ব্যবসায় বিনিয়োগ। Speculative shares—ফাটকা শেয়ার। Foreign exchange—বৈদেশিক মুদ্রা। Export earnings

—বণ্টানির অংশ। Is being discounted—দেওয়া হইতেছে। Corporation tax—কর্পোরেশন কর। Profit—লভ্যাংশ।

১৯৬৩ (ত্রৈবার্ষিক

Jute shares have been hesitant and prices have drifted downwards. The easier trend is partly due to the general weakness in the stock market and partly because of the fall in gunny prices during the past few days.

Forcing enquiries for jute goods have become sluggest during the past couple of weeks. As stocks in the U.S.A. are sufficient, that country has not shown much interest. Inquiries from the Argentine have stopped due the shortage of foreign exchange she is facing.

The trade is nevertheless optimistic about the outlook. Judging from the present indications it looks as if the demand for jute goods has increased due to an expansion of international trade. As prices of gunnies have moved down to more reasonable levels, inquiries from overseas countries are expected to broaden. It is also hoped that the Government will meanwhile take steps to facilitate the shipment of goods by stopping harassment by the Customs authorities.

সংকেত : Hesitant—দ্বিধাগ্রস্ত। Have drifted downwards—নিম্নমুখী হইয়াছে। Gunny prices—চটের মূল্য। Sluggish - মন্থর। Optimistic—আশাবাদী। Indication—লক্ষণ। International trade expansion—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ। Reasonable levels—যুক্তিসঙ্গত স্তর। Overseas countries—সাগরপারের দেশগুলি, (বিদেশ)। Shipment of goods—জাহাজে মাল প্রেরণ। Harassment—হয়রাণি। Customs authorities—শুল্ক কর্তৃপক্ষ।

১৯৬৪

Efforts are being made to arrest the growth of slums surrounding the Durgapur steel project and the Durgapur thermal power station.

Comprehensive Plans exist for the establishment of townships for various employees, but construction work has not kept pace with demand and low paid staff, in particular, experience much difficulty in finding shelter. Many of them have been compelled to live in miserable huts in the slums which have spranning up. About 10% population of the steel Plant live in these slums—within the Plant area itself.

According to a senior official of the Durgapur steel project abortive attempts were made sometime ago to demolish the slums. Human considerations prevailed because the plant authority was unable to provide accommodation for its own men. Also the supply of milk to the township would be hampered if the Khatals in the slum areas were removed, he thought.

সংকেত : Growth of slum—বস্তির প্রসার। Steel project—ইস্পাত কারখানা। Thermal power station—তাপ শক্তিকেন্দ্র। Establishment of township—শহর পত্তন। Low paid staff—নিম্নবেতন বা অল্পবেতনের কর্মচারী। Difficulties—অসুবিধা। Shelter—আশ্রয়। Senior official—ঊর্ধ্বতন বা উচ্চপদস্থ আধিকারিক। Abortive attempts—ব্যর্থ প্রয়াস বা প্রচেষ্টা। Demolish—ভাঙ্গিয়া ফেলা। Human consideration—মানবিক বিচার বিবেচনা। Plant authority—কারখানার কর্তৃপক্ষ। Would be hampered—বিঘ্নিত হইবে।

১৯৬৪ (ত্রৈবার্ষিক)

Describing the Life Insurance Corporation authorities as "trustees of policy-holders," the Organisation Chairman told a Press Conference in Calcutta on Wednesday that it was not interested in "back door nationalization" of private concerns with any change of directors in them but sought to safeguard the policy-holders' interest.

When a correspondent referred to apprehersion in some quarters about such nationalization, the Chairman said, the L. I. C. certainly watched the dividend the investment brought. It invested only in good concerns, although it had inherited some bad investments from some of the insurance companies nationalized.

The Chairman repudiated another correspondent a suggestion that the sharp rise in investments in the private sector would indirectly lead to dangers of cartels and concentration of economic power in a few hands. The pattern of investment evolved during the past few years represented a happy blending of the conflicting views of the protagonists of the private and public sectors.

সংকেত : Trustees of the policy holders—বীমাকারীদের অছি। Press Conference—সাংবাদিক সম্মেলন। Nationalisation—রাষ্ট্রায়ত্তকরণ। Concern—প্রতিষ্ঠান। Interest—স্বার্থ। Correspondent—সাংবাদিক। Apprehension—আশঙ্কা। Bad investment—অলাভজনক বিনিয়োগ। Repudiated—নাকচ করেন বা প্রত্যাখ্যনা করেন। Suggestion—ইঙ্গিত। Cartels—বিক্রয় জোট। Conflicting views—বিরুদ্ধমত সমূহ।

১৯৬৫

The consumer price index number for working class at Kanpur (base, August 1939-100) for the month of July, 1964 registered a rise of 42 points to 650 as against 608 points in the preceding month, reports the Labour Commissioner, Uttar Pradesh.

The index for 'food' groups registered a rise of 67 points to 732 as against 658 points in the preceeding month due to rise in the price of firewood.

The index of clothing group registered a rise of 7 points to 618 as against 611 points in the proceeding month due to rise in the prise of dhotees for males.

The indexes for 'house rent' and 'miscellaneous' groups remained stationary at 252 and 713 points respectively.

সংকেত : Consumer price index—ভোগ্য দ্রব্য মূল্যের সূচক সংখ্যা। Preceeding month—পূর্ববর্তী মাস। House rent—বাড়ী ভাড়া। Miscellaneous—বিবিধ। Stationary—স্থির।

১৯৬৫ (ত্রৈবার্ষিক)

Sometimes in the last few weeks the London Stock Exchange has focussed its attention on companies that rumour or reason has suggested will soon be the subject of a bid. This month it has turned its attention to companies whose shares will (presumably)

rise strongly if the conservatives win the general election a few weeks hence. The particularly relevant categories are steel companies and property companies. The procedure of "Professionals" is not to buy actual shares but to buy "call options" entitling them to buy shares at a specified price three months hence. A three-month option will now cover the general election and the recent rise in the price of options, particularly for the steel shares, reflects the growth of confidence (at least among these "Professionals") in the Conservatives' ability to win it.

The economic problem is generally discussed separately from the political, for people who believe that the balance of payments is running into serious trouble believe that either a Conservative or Labour Government will be compelled to correct it.

সংকেত : Rumour—গুজব। Attention—দৃষ্টি। Conservatives—রক্ষণশীল দল। General Election—সাধারণ নির্বাচন। Procedure—পদ্ধতি। Call-option—ক্রয় অধিকার। Specified price—নির্দিষ্ট মূল্য। Recent rise in the price—সাম্প্রতিক মূল্য বৃদ্ধি। Confidence—বিশ্বাস।

১৯৬৬

There have been wide fluctuations in the Calcutta jute goods market during the past week. The undertone was steady at first, but around mid week prices declined. At the close there has once been a rally on speculative support.

The initial stediness was mainly due to the publication by the Indian Jute Mills Association of its gunny production and stock figures for July. The market had expected that production in the past month would be virtually unchanged, but stocks would show a modest increase because shipments reportedly were disappointing. I was therefore surprised to learn that inspite of a considerable rise in output, stocks were only slightly higher. With an increase of 5,300 tonnes in production, the rise in stocks amounted to only 2,600 tonnes. These figures suggested that the whole of July's production was nearly sold.

There was however a reaction around mid-week as many

operators felt that the Jute mills' stocks of manufactured goods were at extra-ordinarily high level. The hession stocks were considered to be perhaps not so large since the U.S buying season is approaching. But sacking stocks were a little over one month's production while the demand for the immediate future is not too encouraging.

সংকেত : Fluctuations—ওঠা নামা ; Rally on speculative support—ভবিষ্যতের ভরসায় (ফাটকার সমর্থনে) জমা। Initial—প্রাথমিক। Production—উৎপাদন। Virtually—কার্যত: । Modest increase—সামান্য বৃদ্ধি। Considerable rise in output—উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। Reaction—প্রতিক্রিয়া। Operators—পরিচালক। Is approaching—আসিতেছে। Sacking—থলে। Immediate future—অদূর ভবিষ্যত। Encouraging—উৎসাহজনক।

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬১

Perhaps most important of all is to hasten the adoption of well known but insufficiently practiced improved methods of cultivation. Criticism of the draft plan's small percentage allocation to agriculture is widespread. The last point for mention here is that the creation of greater employment opportunities has not been given the great prominence that it deserves. The problem demands more systematic analysis. This is easier said than done.

সংকেত : Most important—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। Insufficient—অপর্যাপ্ত। Cultivation—কৃষি কার্য। Criticism—সমালোচনা। Draft plan—খসড়া পরিকল্পনা। Employment—নিয়োগ। Problem—সমস্যা। Analysis—বিশ্লেষণ।

১৯৬২

Besides direct grant of loans by the State Governments, the Central Government has taken two important steps to facilitate

availability of industrial finance to very small and small units. One is that the Central Government has put into effect a scheme of guarantee under which commercial banks and finance corporations can provide loans to small industries upto Rs. 5 lakhs, the Government stands as guarantor for risk up to 80% of what is assumed by the lending institutions.

সংকেত: Loan—ঋণ। Industrial finance—শিল্পীয় মূলধন। Commercial bank—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক। Risk—ঝুঁকি।

১৯৬৩

The failure of the D.V.C. irrigation schemes about which we have had occassions to make adverse comments is particularly serious. Against the irrigation capacity of 9.18 lakhs acres of Kharif crops, the area actually irrigated was only 6.30 lakhs acres. Equally miserable is the record of irrigation of rabi crops, there is a difference of 24,000 acres between the target and the actual irrigation area. The Public Accounts Committee calculates that nearly 30 per cent of the D.C.V. irrigation potential could not be utilised for lack of pro-excavation of the field channels and water courses.

সংকেত: D.V.C.—দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন। Irrigation—সেচ। Adverse comments—বিরূপ মন্তব্য। Irrigation capacity—সেচ ক্ষমতা। Target—লক্ষ্য। Short fall—ঘাটতি। Excavation—খনন।

১৯৬৪

On the textile, jute and sugar industries India has registered impressive progress. The textile trade has a pre-eminent position in the country and is the one big industry mainly controlled by the Indians, India has long excelled in the manufacture of textiles. Many people forget that until 1787 this country was exporting manufactured cotton goods to France, Britain and Holland. Indian silks and muslins were world famous.

সংকেত: In the textile, jute and sugar industries—বয়ন, পাট ও চিনি শিল্পে। Impressive progress—লক্ষণীয় বা স্মরণীয় অগ্রগতি। Pre-eminent—প্রধান, শ্রেষ্ঠ। World famous—বিশ্ববিখ্যাত।

১৯৬৫

A "guide to success in making balck money" has been discovered by the Income Tax Department, Calcutta. Claimed to be authoritative publication, revised over the last half century, it is said to be popular with a section of the city's business community. Having an all India circulation, the guide was originally written in Guzrati and has been translated into several other Indian languages. It deals first with how to make black money, where to keep it and finally how to conceal it from the taxman. The instructions given in the hand book are:—Hoard commodities which cannot be damaged by vermin, rats and other pests; invest money in goods, the price of which will rise and rise sharply; hold black money at several places away from your office and residence. Some money should be kept in one's office to testify to daily transations.

সংকেত: Black-money—কালোটাকা। Has been discovered—আবিষ্কৃত হয়েছে। Income Tax Department—আয়কর দপ্তর। Popular—প্রিয়। To conceal—গোপন করা। Hoard—গোপনে মজুত করা। Invest—বিনিয়োগ। Residence—বাসগৃহ।

১৯৬৬

Almost all the states of the present day world have discarded bimetallism. During the earlier part of East India Company's rule, India was a bimetallic country and with the demonetisation of Gold in 1835, she accepted monometalism with silver rupee coins of 180 grains, $\frac{11}{12}$ th fine as unlimited legal tander. In 1893, large influx of African silver lowered the market price of silver by about 20%, as a result of which the intrinsic value of the silver rupee fell below par (i.e. its face value) and this compelled the then Government of India to abolish free coinage of rupees which was in vogue up to that year, much to the chagrin of the nationalist-minded Indian intelligentsia of that period. Now, after the second World War, we find that the coins of almost all the countries of the world are token coins. A large majority

of the states of the world have been forced to devalue their currencies for the preservation of equilibrium in their foreign trade and in the national economy.

সংকেত : Bimetallism—দ্বিধাতুমান। Monometallism—একধাতুমান। Legal Tander—বিহিত মুদ্রা বা বৈধ মুদ্রা। Market price—বাজার দর। Intrinsic value—স্বকীয় মূল্য বা নিহিত মূল্য। Face value—অবিহিত মূল্য বা লিখিত মূল্য। Abolish—বিলুপ্ত করা। Chagrin—বিরক্তি। Intelligentsia—বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। Devalue—মূল্য হ্রাস। Equilibrium—সমতা; ভারসাম্য। Foreign trade—বৈদেশিক বাণিজ্য।

● ইংরেজী থেকে বাংলা ●

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬১

গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক কারিগর, পুরুষানুক্রমে পল্লীশিল্পে নিযুক্ত থাকলেও কৃষিকাজ করে। তাতে জমির উপর আরও বেশি চাপ পড়ে। এই সমস্ত কারিগর আবার তাদের নিজেদের পৈতৃক ব্যবসায়ে ফিরে গিয়েছে। অবশ্য, এজন্য তারা সরকার থেকে শিল্প-ঋণ পেয়েছে। এই ঋণ সুবিধামত কিস্তিতে শোধ করতে হয়। আবার অনেকে এই ঋণ নিয়ে বেশি পরিমাণে কাঁচামাল এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনে রেখেছে। তাতে তাদের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একথা সত্য যে, অনেক সময়ে এই ঋণ জমি পুনরুদ্ধারের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে অথবা কন্যার বিবাহে খরচ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যেখানে ঋণ সংগ্রহ করা খুবই দুষ্কর সেখানে এই ধরণের ব্যয় অসম্ভব নয়।

পল্লী অঞ্চলে হাজার হাজার নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। আর সেই বাবদ খরচের ব্যাপারেও পল্লীবাসীরা সাহায্য করছে। পল্লীর জনসাধারণ পূর্বে একই পুকুরের জলে স্নান করত, কাপড়-চোপড় কাচত আবার সেই পুকুরের জলই তারা পান করত। কিন্তু এখন তারা নলকূপ থেকে বিশুদ্ধ জল পাচ্ছে।

সংকেত : কারিগর—Artisans, পুরুষানুক্রমে—From generation to generation. পৈতৃক ব্যবসায়—Ancestral vocation. শিল্প-ঋণ—Industrial law. সুবিধামত কিস্তিতে—In easy instalments. কাঁচা মাল—Raw materials. কর্ম দক্ষতা—Efficiency of work. জমি পুনরুদ্ধারের কাজে—In reclamation of land. নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে—Tubewells have been sunk. কাপড়-চোপড় কাচত—Used to wash their garments.

১৯৬২

কেন্দ্রীয় পূর্ত, গৃহ ও সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের সরবরাহ দপ্তর দেশী শিল্প উন্নয়নের উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে মূল্য সম্পর্কে সুবিধা দান, দ্রব্য সরবরাহে দীর্ঘ মেয়াদী ঠিকা ও দেশের কোন দ্রব্যের সম্পর্কে যে অভাব আছে সে সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে থাকেন।

তা ছাড়া এই সংস্থা বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে ব্যবহারের জন্য দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য কিনে থাকেন। দেশে নতুন নতুন পণ্য দ্রব্য উৎপাদনেও উৎসাহ দেওয়া হ'য়ে থাকে। এই প্রচেষ্টার ফলে দেশীয় পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে বছরে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাচ্ছে। রেলওয়ের প্রয়োজনীয় যে সব দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় এবং ভারতে যে সব দ্রব্যের অভাব রয়েছে সেগুলির একটি তালিকা সরবরাহ দপ্তর প্রণয়ন করেছেন। এই তালিকা দেখে দেশী শিল্প উৎপাদকরা নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে উদ্যোগী হতে পারেন।

সংকেত ঃ কেন্দ্রীয় পূর্ত, গৃহ ও সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের সরবরাহ দপ্তর—The Supply Department of the Central Ministry of Works, Housing and Supply. দীর্ঘ মেয়াদী ঠিকা—Long term contract. তথ্য—Information. উৎসাহ দেওয়া—To encourage. বৈদেশিক মুদ্রা—Foreign exchange. তালিকা দেখে—Consulting the list

১৯৬২ (ত্রৈবার্ষিক)

কয়লা শিল্প ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। স্বভাবতঃই এই সময়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেমন বাংলা-বিহার কয়লাখনি অঞ্চলগুলি থেকে কয়লা প্রেরণে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সম্প্রতি খনিগুলিতে মজুত কয়লার পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এজন্য হতাশ হবার কোন কারণ নেই। কারণ রেলওয়ে এ ব্যাপারে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছেন। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ও দ্রুত অগ্রগতি ঘটছে। এর সঙ্গে সমানভাবে ওয়াগন সরবরাহ কষ্টকর হ'য়ে উঠছে। তবে সকলেই নিজের নিজের নিম্নতম চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। ইঁট তৈয়ারীর শিল্পগুলিরই সর্বাধিক উন্নতি হচ্ছে। অবশ্য কয়লা-ব্যবহারকারীদের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই শিল্পের স্থান সর্বশেষ।

সংকেত ঃ কয়লা শিল্প—Coal industry. নানা অসুবিধা—Various difficulties. মজুত কয়লা—The reserves of coal. ব্যাপক ও দ্রুত অগ্রগতি —Comprehensive and rapid progress. ইঁট তৈরীর শিল্পগুলির—Brick making industries. মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি—Representatives of the ministry.

১৯৬৩

সমবায় ঋণ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ভারত-সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান সীমা স্থিরীকরণের নিয়মাবলী শিথিল করেছেন। জামিন হিসাবে জমি বন্ধক না নিয়ে ৫০০ টাকা পর্যন্ত মাঝারি মেয়াদের ঋণ দেওয়া যেতে পারে এবং ঋণগ্রহীতা জমি বন্ধক রাখলে ৫০১ টাকা থেকে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া যেতে পারে।

প্রাথমিক সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি যাতে সমাজের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের উৎসাহদানে প্রেরণা পায়, সেজন্য তাদের সম্পূর্ণ সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যের ১৯৬২-৬৩ সালের পরিকল্পনায় ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রাথমিক কৃষি-উৎপাদকের শক্তি-বৃদ্ধির জন্য সমবায় বিপণন ও কৃষিজাত দ্রব্যের বিন্যাস একান্ত প্রয়োজন। আলোচ্য বৎসরে এই বিপণন ও বিন্যাসের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়।

১৯৬০ সালের ৩০ এ জুন পর্যন্ত সমবায় সমিতি যে সব কৃষি দ্রব্যের বিপণন করেন তার মূল্য আনুমানিক ১৫৮ কোটি টাকা। প্রায় সকল রাজ্যে সমবায় সমিতিগুলি সম্পূর্ণরূপে রাসায়নিক সার বণ্টনের ভার গ্রহণ করেছেন। সেগুলি ক্রমশ উন্নত কৃষি-যন্ত্রপাতি, উৎকৃষ্ট বীজ, কীটনাশক দ্রব্য, চিনি, কেরোসিন এবং কৃষিকাজের উপযোগী লৌহ ও ইস্পাত বণ্টনের ভার নিচ্ছেন।

সংকেত : সমবায় ঋণ কমিটির সুপারিশ অনুসারে—On thc recommendation of the Co-operative Credit committee. ভারত সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী—According to the decision taken by the Government of India. ঋণদান সীমা স্থিরীকরণের নিয়মাবলী শিথিল করেছেন—Has relaxed the regulations relating to the fixation of credit-limit. জামিন—Security. বন্ধক—Mortgage. মাঝারি মেয়াদ—Medium term. সমবায় বিপণন—Co-operative marketing. রাসায়নিক সার—Chemical ferriliser. বণ্টনের ভার—Responsibility of distuibution. কৃষি-যন্ত্রপাতি—Agricultural machineries. উৎকৃষ্ট বীজ—Improved seeds. কীটনাশক দ্রব্য—Insecticides.

১৯৬৩ (ত্রৈবার্ষিক)

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটিতে সম্প্রতি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জানান যে, সরকার কাঁচা পাটের মূল্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। গত বৎসর কাঁচা পাটের অভাব হেতু অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ বৎসর পাটের ফসল ভাল হয়েছে। সেজন্য মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নজর রাখা আবশ্যক হয়েছে।

খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রীমহাশয় এই আন্তর্জাতিক গুরুত্ব-সম্পন্ন ফসল উৎপাদনকারী চাষীদের স্বার্থ রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। গত কয়েক বৎসর ধরে পাটের অধিক ফসলের জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এবং ফলে পাটের উৎপাদন ১৯৪৭-৪৮ সালের ১৬ লক্ষ গাঁইট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬১-৬২ সালে ৬২ লক্ষ ৬৯ হাজার গাঁইট হয়েছে।

তিনি বলেন, অধিক ফসলের ফলে চাষীদের যাতে অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। জাতীয় স্বার্থেই তা করা প্রয়োজন। আশা করা যায়, পাটের মণ প্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ৩০ টাকার বেশি হবে।

কৃষি-সেক্রেটারী শ্রী জি, আর, কামাথ বলেন যে, পাট উৎপাদনের ব্যয় পর্যালোচনা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে ধানচাষের ব্যয়ের তুলনামূলক আলোচনা হবে। আশা করা যায়, ভারত-সরকার শীঘ্রই পাট উৎপাদকদের ন্যায্য মূল্য পাবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন।

সংকেত : উপদেষ্টা কমিটি—Advisory committee. ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী—Minister-in-charge. সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন—Is keeping vigilant eyes. কাঁচা পাট—Raw jute. অস্বাভাবিক মূল্য—Abnormal price. মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি—Fluctuation of price. আন্তর্জাতিক গুরুত্ব—International importance. চাষীদের স্বার্থ রক্ষার উপর—On the protection of interest of the cultivators. গাঁইট—Bale. পর্যালোচনা—Review. তুলনামূলক আলোচনা—Comparative study.

১৯৬৪

সমবায় ভাণ্ডার হ'ল ক্রেতাদের নিয়ে অর্থাৎ আমার আপনার মত যারা নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস বাইরের দোকান থেকে কিনে সংসার চালাই তাদের নিয়ে তৈরী একটা সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত দোকান বা ভাণ্ডার। সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন ধান,—চাল, ডাল, আটা, তেল, মসলা, কাপড়—এছাড়া আরও অনেক জিনিস সকলে বাইরের দোকান থেকে কেনেন। দোকানদার যে পরিমাণ লাভ রেখে জিনিস বিক্রি করে তা থেকে তার ঘর ভাড়া, কর্মচারীর বেতন, নিজের ভরণপোষণ ইত্যাদি নির্বাহ করবার পরও তার বেশ কিছু উদ্বৃত্ত আয় থাকে। ক্রেতারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যদি নিজেরাই সমবায় দোকান বা ভাণ্ডার স্থাপন করে এবং সেখান থেকে জিনিসপত্র কেনে তবে সে লাভ নিজেদেরই থেকে যাবে এবং সমবায় নিয়ম অনুসারে সে টাকা নিজেদের মধ্যে ক্রয়ের ওপর ছাড় বা রিবেট হিসাবে ভাগ ক'রে নিতে পারেন। তা ছাড়া আপনি জানেন যে, অনেক দোকানদার খারাপ জিনিস ভাল ব'লে চালায়; এবং অনেকেই কম ওজনের মাপ দিয়ে আপনাদের ঠকায়; আবার সুযোগ বুঝে সাময়িক ঘাটতি অবস্থার সৃষ্টি ক'রে আপনাদের কাছ থেকে ইচ্ছে মত দাম আদায়

ক'রে নেয়। সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন ক'রে ক্রেতারা এসবের হাত থেকে রেহাই পাবেন, কারণ সমবায় ভাণ্ডারের আদর্শ হ'ল ন্যায্য দামে ঠিক ওজনে ভাল ও খাঁটি জিনিস সরবরাহ করা।

সংকেত: সমবায় ভাণ্ডার—Co-operative store. বেশ কিছু উদ্বৃত্ত আয় থাকে—There remains a surplus of returns to a great extent. ছাড়—Discount. সাময়িক ঘাটতি অবস্থা—Occasional deficit situation. রেহাই পাবেন—Will get rid of. ন্যায্য দামে—At a fair price.

১৯৬৪ (ত্রৈবার্ষিক)

গবাদি পশু থেকে দুধ, শ্রম এবং সার প্রভৃতির আকারে বিভিন্ন ভাবে উপকার পাওয়ার কথা সকলেই স্বীকার করবেন এবং এগুলি যে কোন মিশ্র খামার ব্যবস্থায় প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। সুতরাং এই জন্যই আমাদের সমগ্র মনোযোগ আমরা গৃহপালিত গবাদি পশুর উনয়নমূলক কাজে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করেছি। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের গৃহপালিত গবাদি পশুর সংখ্যা যথেষ্ট বেশি এবং অবিরত ভাবে তা আরও বেড়েই চলেছে। এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টেও তা দেখানো হয়েছে। নবম পঞ্চ বাৎসরিক আদমসুমারিতে দেখানো হয়েছে যে প্রসূতি গাভীর সংখ্যা ৭·৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসূতি মহিষীর ব্যাপারে সংখ্যা বৃদ্ধিটা আরও বেশি চমকপ্রদ এবং বর্তমান প্রসূতি মহিষীর সংখ্যা দাঁড়িয়াছে প্রায় ১৩·৫২ শতাংশ। কিন্তু গৃহপালিত গবাদি পশুর সংখ্যা বৃদ্ধিতে আত্মপ্রসাদ লাভ করার কোন হেতু নেই। শুধুমাত্র সংখ্যার পিঠে সংখ্যা হওয়াটাই বড় কথা নয়, যদি না সেই সঙ্গে গবাদি পশুর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমবঙ্গের পশু সম্পদ উন্নয়নের প্রধান কাজ এরই মধ্যে নিহিত। গবাদি পশুর উৎকর্ষ বৃদ্ধির ব্যাপারটা দুটো বড় বড় জিনিসের উপরে নির্ভরশীল, যথা—পশুর জাত বা বংশ এবং উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের সহজ লভ্যতা।

সংকেত: গবাদি পশু—Cattle. বিভিন্ন ভাবে···স্বীকার করবেন—Every body will agree to the verious benefits. মিশ্র খামার ব্যবস্থা—Mixed farming system উন্নয়নমূলক কাজ—Development work. কেন্দ্রিভূত করা—To concentrate. পরিশিষ্ট—Appendix. আদমসুমারি—Census. প্রসূতি গাভী—Breeding cows. মহিষ—Buffaloes. চমকপ্রদ—Surprising. আত্মপ্রসাদ—Self satisfaction. পশু সম্পদ উন্নয়ন—Improvement of live stock. পুষ্টিকর খাদ্যের সহজ লভ্যতা—Easy availability of nutritious food.

১৯৬৫

বেসরকারী শিল্প-এস্টেট স্থাপনের একটি কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচী অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের শেয়ার বিক্রি করে শিল্প এস্টেট সমবায়ের জন্য

প্রয়োজনীয় অর্থের এক ষষ্ঠাংশ থেকে এক পঞ্চমাংশ ও শিল্প-এস্টেট কোম্পানীর জন্ম আবশ্যক অর্থের এক চতুর্থাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশ টাকা সংগ্রহ করতে হয়। বাকি টাকা ঋণ সংস্থা সরবরাহ করে। এই সব ঋণ সাত থেকে দশ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। সাধারণ সুদের হারে ব্যাঙ্কও ঋণ দিতে পারে। কয়েকটি রাজ্যসরকার এই ধরণের শিল্প-এস্টেট সমবায় ও শিল্প-এস্টেট কোম্পানি স্থাপনের জন্যেও সচেষ্ট হয়েছেন। এই সব সংগঠনকে জীবন বীমা কর্পোরেশনও ঋণ দিতে সম্মত হয়েছেন।

বিশেষ নির্দ্দিষ্ট শিল্পের জন্য শিল্প-এস্টেট স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছে এবং তার গুরুত্বও স্বীকৃত হয়েছে। হালকা যন্ত্রপাতি, রেডিওর যন্ত্রাংশ ও মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ শিল্পের জন্য এই ধরণের বিশেষ শিল্প-এস্টেট স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনা কালেই এই প্রকার শিল্প-এস্টেট স্থাপনের জন্য কয়েকটি রাজ্যসরকার সচেষ্ট হয়েছেন।

বোম্বাইয়ের কল্যাণে ও গুজরাটের বরোদার কাছে মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ, নাগপুরের কাছে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ, পুণার কাছে একটি ইলেক্‌ট্রনিক্স ও প্রেসিশন যন্ত্রপাতি, জয়পুরে রেডিওর যন্ত্রাংশ এবং মাদ্রাজে চামড়া শিল্পের যন্ত্রপাতির অনুরূপ শিল্প-এস্টেট স্থাপনের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে রাজ্যসরকারগুলি বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন।

সংকেত: বেসরকারী—Private. শিল্প এষ্টেট—Industrial estate. কর্মসূচী—Programme. এক ষষ্ঠাংশ—One sixth. ঋণ—Loan. পরিশোধ—To repay. জীবন বীমা কর্পোরেশন—Life Insurance Corporation. হালকা যন্ত্রপাতি—Light machineries.

১৯৬৫ (ত্রৈবার্ষিক)

কলিকাতার বাজারে উচিত মূল্যে আলু সরবরাহ সম্পর্কে কলিকাতার একটি দৈনিক সংবাদপত্রের সাম্প্রতিক এক সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভতে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তার প্রতি পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের আধিকারিকগণ সম্প্রতি এই বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন। যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে তদনুসারে বিগত বৎসরে উদ্ভিদ ক্ষয়কারী রোগের বিস্তারের দরুণ কেবল পশ্চিমবঙ্গেই নয়, উত্তর প্রদেশ ও বিহারের অংশ বিশেষেও চলতি বৎসরে উৎপন্ন আলুর প্রায় ৪০ শতাংশ নষ্ট হয়েছে। আলু উৎপাদনে এই বিপর্যয়ের ফলে বাজারে আলুর সরবরাহ কমে গিয়েছে ও দ্রুত দাম বাড়ছে।

অবশ্য খুবই আশার কথা এই যে, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত ২,০০০ থেকে ৩,০০০ মণ আলু ছাড়াও কলিকাতার বাজারে অন্যান্য রাজ্য থেকে ৩,০০০ থেকে ৪,০০০

মণ হিসাবে আঁলু আসতে আরম্ভ করেছে। ঐ সরবরাহের ফলে আলুর পাইকারী মূল্য মণ প্রতি ২০ থেকে ২৩ টাকার মধ্যে স্থস্থিত আছে। অন্যান্য রাজ্য থেকে আলু আমদানীকারী ব্যবসায়ীরা রেলযোগে পরিবহণের ব্যাপারে কোন অসুবিধায় পড়লে সরকার তাঁদের সহায়তা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সংকেত : উচিত মূল্যে—At fair price. সম্পাদকীয় স্তম্ভ—Editorial Column. মন্তব্য—Comment. দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে—Attention has bein drawn. কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন—Agriculture and community development. সরবরাহ—Supply. পাইকারী মূল্য—Wholesale price. অসুবিধা—Difficulties. প্রতিশ্রুতি—Assurence.

১৯৬৬

আমেরিকার অন্যতম বৃহত্তম রাসায়নিক কারখানা ডুপণ্ট কোম্পানী সম্প্রতি একটি নতুন কৃত্রিম বস্তুর কথা জানিয়েছেন। এই নতুন বস্তুটি চামড়ার পরিবর্ত হিসাবে একটা বিপ্লব আনবে বল মনে হচ্ছে।

কৃত্রিম বস্তু আবিষ্কারে ডুপণ্ট কোম্পানীর কৃতিত্ব অনেক আগেই স্বীকৃত হয়েছে। এর শ্রেষ্ঠ অবদান নাইলন। নাইলন একটি প্লাষ্টিক জাতীয় পদার্থ, যা রেয়ন, রেশম প্রভৃতির জায়গা দখল করেছে। আধুনিক সভ্য জগতে নাইলনের স্থান অপ্রতিদ্বন্দী। এর ব্যবহার বিস্তৃত ক্ষেত্রে। এ দিয়ে যেমন দাঁতের বুরুশ তৈরী হচ্ছে, তেমনি আবার মোটা গাড়ীর গিয়ার ও যন্ত্রপাতির বেয়ারিং পর্যন্ত তৈরী হচ্ছে।

কিন্তু ডুপণ্টের এই নতুন আবিষ্কৃত পদার্থটি যে ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করবে সেখানে এতদিন কোন কৃত্রিম বস্তুর প্রচলন ছিল না। এই নতুন বস্তুটির নাম 'করফাম"। এর সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে এর মধ্য দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। আগেই বলা হয়েছে করফাম চামড়ার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। রবারের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। রবারের জুতোর একটা অসুবিধে, এই যে এর মধ্যে দিয়ে বাতাস প্রবেশ করতে পারে না, কাজেই রবারের জুতো পরলে স্বভাবতই একটা অস্বস্তি হয়। এই করফামের তৈরী জুতোয় তা হবে না।

সংকেত : বৃহত্তর রাসায়নিক কারখানা—Largest Chemical factory. কৃত্রিম—Synthetic ; Artificial। বিপ্লব—Revolution. আবিষ্কার—Discovery. কৃতিত্ব—Credit. আধুনিক সভ্য জগৎ—Modern civilized world. বুরুশ—Brush. তুলনা করা যেতে পারে—Can be compared with.

● বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ●

১৯৬১

এই মহানগরীর দুর্গন্ধ অলিগলি, বস্তি প্রভৃতি দুঃখ ও দৈন্যের কেন্দ্রর ; বেকার সমস্যা, নিদারুণ অর্থকষ্টে ও অভাবের গা ঘেঁষিয়া এখানে ভোগ ও ঐশ্বর্যের জাঁকজমক প্রকট ভাবে দেখা যায়। বিপ্লব যদি ঘটে ত কলিকাতাতেই ঘটিতে পারে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই কলিকাতার উন্নতির জন্য ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শতাধিক কোটি মুদ্রা ব্যয় করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু সহরের যাহারা স্বাভাবিক অধিবাসী তাহাদিগকে যদি যথাযথরূপে জীবন পথে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা না যায় তাহা হইলে শুধু ড্রেন গড়িয়া সহরের বিস্ফোরক অবস্থা সুসংযত করা যাইতে পারে না।

সংকেত ঃ বস্তি—Slum. কেন্দ্র—Centre. বেক[illegible] ment problem. বিপ্লব—Revolution. উন্নতি—Development. স্বাভাবিক—Natural. বিস্ফোরক অবস্থা—Explosive condition.

১৯৬২

ভারত সরকার বর্তমানে যে প্রকার বেপরোয়াভাবে অর্থ বিনিয়োগ করিতেছেন এবং তাঁহাদের শিল্পগুলি উৎপাদনের দিক হইতে বর্তমানে যেভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে শিল্পপণ্য বিক্রয়ের জন্য বিদেশের বাজারের দিকে নজর দিতে হইবে। উহার একান্ত প্রয়োজনীয়তাও আছে। কারণ স্বাধীনতা লাভের পর হইতে খাদ্যশস্য ক্রয়, পরিকল্পনার রূপায়ণ ইত্যাদির জন্য ভারত সরকার ইতিমধ্যে বিদেশ হইতে যে বিপুল পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও বেশী ঋণ সংগ্রহে তাঁহারা যেভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহা সুদে আসলে পরিশোধের একমাত্র উপায় বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি।

সংকেত : বেপরোয়া ভাবে অর্থ বিনিয়োগ—The undaunted nature of investment. অদূর ভবিষ্যতে—Near future. শিল্পপণ্য—Industrial commodities. স্বাধীনতা—Independence খাদ্য শস্য—Food grains. পরিকল্পনা রূপায়ণ—Implementation of plan. সুদ—Interest.

১৯৬৩

পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতিরই চরিতার্থ করিবার মত উদ্দেশ্য আছে, প্রত্যেকেরই প্রচার করিবার মত কিছু জ্ঞান ও বাণী আছে এবং প্রত্যেক জাতিরই অনুসরণ করিবার মত একটি নিশ্চিত আদর্শও রহিয়াছে। অতএব প্রথমেই আমাদিগকে

আমাদের জাতীয় আদর্শটি কি তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। আর্যজাতির প্রগতির ক্ষেত্রে এই দেশ কোথায় স্থানলাভ করিবে এবং জাতীয় সমন্বয়ের ক্ষেত্রেই বা আমাদের কি বলিবার আছে তাহাও যথাযথ ভাবে অনুধাবন করিতে হইবে।

জগতে দুই প্রকার বিভিন্ন ভিত্তির উপর সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে এক ধর্ম ভিত্তির উপর, আর এক, সামাজিক প্রয়োজনের উপর। একটির ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা, অপরটির জড়বাদ।

সংকেত : উদ্দেশ্য—Purpose. অনুসরণ—Persue. আদর্শ—Ideal. আন্তর্জাতিক প্রগতি—International progress. জাতীয় সমন্বয়—National integration. সামাজিক জীবন—Social life. আধ্যাত্মিকতা—Spiritualism. জড়বাদ—Materialism.

১৯৬৪

ভারতের অর্থনীতিতে ফেব্রুয়ারী মার্চ মাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়। প্রতি বৎসরই এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্যের সরকারের বাজেট প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া আছে ভারতের রেল বাজেট। ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারীর শেষ দিনটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট সংসদে পেশ করা হয়। ইহার কয়েকদিন পূর্বে বাহির হয় রেলপথের আয় ব্যয়ের হিসাব। আবার সঙ্গে সঙ্গে চলতি আর্থিক বৎসর অর্থাৎ এপ্রিল হইতে মার্চ শেষ হওয়ার পূর্বেই বিভিন্ন রাজ্যের সরকারের বাজেট উপস্থিত করা হয়। এই বাজেট হইতে আগামী বৎসরের আর্থিক অবস্থার ও বিনিয়োগ বাজারের সম্ভাব্য গতির নির্দেশ পাওয়া যায়।

সংকেত : ভারতীয় অর্থনীতিতে—In Indian economy. গুরুত্বপূর্ণ সময়—Decisive period. আয় ব্যয়ের হিসাব—Revenue and expenditure accounts. আবার সঙ্গে সঙ্গে—Simultaneously. চলতি আর্থিক বৎসর—Current financial year. সম্ভাব্য গতির নির্দেশ—Probable future course.

১৯৬৫

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চল পরিষদের অধিবেশনে স্থির হইয়াছে চাকুরিতে নিয়োগ অথবা বিদ্যায়তনে প্রবেশের ক্ষেত্রে বসবাস মূলক কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা অতঃপর চলিবে না। সিদ্ধান্তটি নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার তাৎপর্য এই যে পূর্ব ভারতের কোন রাজ্যে চাকুরি পাইতে হইলে কিংবা সেখানকার কোন বিদ্যায়তনে ভর্তি হইতে গেলে স্থানীয় লোক হইবার কোন প্রয়োজন নাই। যোগ্যতা থাকিলে ভারতবর্ষের যে কোন নাগরিক সে সুবিধা

ভোগের অধিকারী হইবেন। এই সিদ্ধান্ত যে খুবই সমীচীন সে কথা লইয়া তর্কের অবকাশ নাই। যে ষোলটি অঙ্গরাজ্য লইয়া ভারতবর্ষ গঠিত সেগুলি ভারতরাষ্ট্রের অংশ মাত্র, নিজেরা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র নয়; সুতরাং এক অঙ্গ রাজ্যের অধিবাসী অন্যত্র বিদেশী নয় সে রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দাদের মত সেও ভারতীয় নাগরিক।

সংকেত: পূর্বাঞ্চল পরিষদ—Estern Zonal Council. অধিবেশন—Meeting. বিধি নিষেধ—Restrictions. সিদ্ধান্ত—Resolution. তাৎপর্য—Significance. অঙ্গ রাজ্য—Constituent state. বিদেশী—Alian.

১৯৬৬

ইতিহাসের বিরাট বিস্তৃতির মধ্যে দেড় বৎসর পরিমাণ সময়টুকুর বিশেষ মূল্য নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু আমাদের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এই সামান্যমাত্র সময়ের মধ্যে যে অতুলনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা চমকপ্রদ, চিরস্মরণীয়। একদিকে ইংরাজ শোষিত খণ্ডিত ভারতের অবলম্বিত বিরাট পরিকল্পনাগুলির অব্যাহত অগ্রগতি, অন্যদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রবল আক্রমণের প্রবলতর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই উভয়বিধ সুকঠিন কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া স্বদেশে এবং বিদেশে তিনি যুগপৎ বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অবিস্মরণীয় বাণী 'জয় জোয়ান, জয় কৃষাণ, জয় হিন্দ্'-এর অন্তর্নিহিত অর্থ বিশ্লেষণ করিলে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, আমাদের চরম লক্ষ্যও জয়হিন্দ্ অর্থাৎ হিন্দুস্থানের সর্ব্বাঙ্গীণ জয় লাভ, কিন্তু সেই জয় তখনই সম্ভব যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে জোয়ানরা এবং কৃষাণেরা সমভাবে জয় লাভ করিবে। কারণ সামগ্রিক ভাবে দেশ রক্ষার কাজে জোয়ানদের যে দায়িত্ব, সাধারণ-ভাবে প্রতিরক্ষার কাজে কৃষাণদের দায়িত্বও তদনুরূপ। বরং নিশ্চিতভাবে ইহাই বলা যায় যে, কৃষাণেরাই দেশের মেরুদণ্ড, তাহারাই দেশকে বাঁচাইয়া রাখে। সবল করে, পৃথিবীর প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দেশকে দৃঢ় পদে অগ্রসর হইবার উপযুক্ত পাথেয় তাহারাই সরবরাহ করে।

সংকেত: চমকপ্রদ—Surprising। শোষিত—Exploited. পরিকল্পনা—Planning. আক্রমণ—Attack. প্রতিরক্ষা—Defence. অর্জন করিয়াছিলেন—Has earned, অন্তর্নিহিত অর্থ—Inner meaning. বিশ্লেষণ—Analysis. দায়িত্ব—Responsibility. মেরুদণ্ড—Backbone. প্রতিযোগিতা—Competition.

● ইংরেজী থেকে বাংলা ●

1. A considerable part of the loan on Indian Iron have drifted downwards since the private sector steel companies will face a heavy financial burden in repaying their loans to the Government Engineering and paper shares have been quite. Except for Indian Aluminium and Hindustan Motors which are steady, miscellaneous shares have lacked interest. The prices of jute shares have dropped in the absence of buyers. Coal and cotton mill shares have been neglected. Only a few transactions have been done in selected Assam and Dooars tea gardens.

Government securities have been dull and quite. The prices of State Government loans in particular have weakened since the list for the new State Government loan opens next Monday. Indications are that selling pressure will be aggreavated as soon as the loans are subscribed because a large number of subscribers are likely to invest their funds due to pressure.

[B.Com. Calcutta University '67]

[Miscellaneous—বিবিধ, Have dropped—হ্রাস পাইয়াছে, Transactions—লেন-দেন, Invest—নিয়োগ করা।]

2. The management of four establishments of Kilburn and Company's industrial estate at Majerhat, near Calcutta, declared a lockout on Friday. About 500 employees are involved.

The lockout followed a 13-hour demonstration by the employees within the factory premises which began at 4 p.m. on Thursday. The men demanded that the management should announce at a workers' gathering the date of the next meeting of the parties in dispute to negotiate a settlement. An earlirer

meeting had been held in the middle of July. The management declined to do so on the ground that they had already informed the men's union of the date for the next meeting, which was August 6.

The police intervened early on Friday and the workers left the factory building at 5 a.m. The officers had stayed on in the establishments during the workers' stay-in-strike.

[B.Com., Calcutta University '67]

[Management—কর্তৃপক্ষ, Industrial estate—শিল্প-তালুক, Demonstration—বিক্ষোভ প্রদর্শন, Settlement—আপোষ মীমাংসা, Interven—হস্তক্ষেপ, Stay-in-strike—অবস্থান ধর্মঘট]

3. What is our problem? Too many people, too few things to go round and too few resources.

What is the answer? Improve productivity in farms and factories, diversify production, waste less, curtail needs and work hard. Then, increase exports, reduce imports, attain self-sufficiency and self-reliance.

That is what other countries did, who have gone ahead of us. So can India do.

There is no cause for despair. The situation calls for determination and dedication.

[Problem—সমস্যা, Productivity—উৎপাদনশীলতা, Curtail—কমান, Self-reliance—আত্ম-নির্ভরতা, Determination—দৃঢ়তা]

4. The Fourth Five Year Plan represents a crucial stage in the development of our economy. It has to consolidate and carry forward the achievements of the three earlier Plans, make up for their shortfalls as far as practicable and prepare the ground for a self-reliant economy to be attained by the end of the Fifth Plan. The tasks set out in this outline are the minimum that require to be done and are well within the capacity of the nation. Every effort has to be made to see that they are fully achieved and, wherever possible, improved upon in course of the five years of the Fourth Plan.

[As far as practicable—যতদূর সম্ভব, Minimum—সর্বনিম্ন, Effort—প্রচেষ্টা]

5. The Third Five Year Plan raised the sights and set the achievement of a "good life" for every citizen as the ultimate goal of socialist society that the country had already accepted. It defined the task of the next three Plans to be, (i) to lay down foundations of self-reliant economic growth, (ii) to provide avenues and opportunities for employment to all those who seek it, and (iii) to ensure a minimum level of living to every family in the country, while narrowing economic and social disparities. It sets 1976-77 as the target date for doubling the level of per capita income obtaining in 1950-51 after taking into account the difficulties faced in implementing the Second Plan and the revised projections of population growth.

[Sight—দৃষ্টি, Ultimate goal—চূড়ান্ত লক্ষ্য, Socialist society—সমাজতান্ত্রিক সমাজ, Level of living—জীবন ধারণের মান, Social disparities—সামাজিক বৈষম্য]

6. It should be noted, however, that in several respects the Third Plan period turned out to be very abnormal. Firstly, weather conditions were adverse during three out of five years of the Third Plan period. Secondly, the country had to face serious hostilities in the very second year and again in the fifth year of the Plan. Thirdly, the delays in tying up the needed external credits in certain important cases in the earlier years and the virtual suspension of bulk of these credits during the last year accentuated the difficulties. The sharp step-up in defence outlay that the country was compelled to undertake added to the pressure on resources. Further, the external aggression and severe drought in 1965 created problems which demanded urgent attention of the administrative machinery.

[Abnormal—অস্বাভাবিক, Adverse—প্রতিকূল, Hostilities—বৈরিতা, Defence outlay—প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ, Aggression—আক্রমণ]

7. The Third Plan had set self-reliance as a goal to be achieved by 1975-76. The experience during the recent

emergency, when there was a sudden suspension of certain non-commercial foreign credits, and the devaluation of the rupee have underlined the overriding importance of attaining this goal as early as possible. Programmes for export promotion and import substitution have been, therefore, given the heighest priority in the Fourth Plan. With this objective, steps will be taken to restrain non-essential consumption in general and domestic consumption of exportable goods in particular and ensure maximum possible utilization of existing capacity in all enterprises which can provide for exports or replace imports.

[Goal—লক্ষ্য, Emergency—জরুরিকালীন অবস্থা, Devaluation—মুদ্রার মূল্য হ্রাস, Priority—অগ্রাধিকার]

8. Before abolishing the managing agencies the Government will have to examine two important issues, the legality of its proposed action and the problem of obtaining credit for units deprived of the surety of the managing agents. Under the law the Government can disallow an individual managing agency for various reasons and can also abolish all managing agencies in a particular industry. It was under the latter category that the Government last year decided to abolish all managing agencies in five industries. But the Government cannot announce a general abolition of managing agencies in all industries without a change in the existing law.

[Abolish—বিলোপ, Proposed—প্রস্তাবিত, Announce—ঘোষণা করা, Existing law—প্রচলিত আইন]

9. An open crisis in the Common Market is now inevitable. This was the first reaction last night in Brussels after President de Gaulle's final rejection of British membership, writes The Times' European economic correspondent. The diametric differences of opinion between France and the five reached the point of a decision of whether to open talks with Britain next month. The result is likely to lead to a breakdown in Common Market activities, bringing in a period of freeze or stagnation.

The five, led by the Benelux countries (*Belgium, the Netherlands* and Luxembourg) will certainly counter General de Gaulle's argument that British entry will destroy the present form of the community.

[Crisis—সঙ্কট, Common Market—সাধারণ বা বারোয়ারী বাজার, Reaction—প্রতিক্রিয়া, Breakdown—ভাঙ্গিয়া পড়া]

10. Although indigenous banking as represented toady by the mahajans, banias, sowcars and shroffs has existed in India from time immemorial, banking on the western lines in this country dates from only the seventies of the eighteenth century. Most of the early banks owed their inception to the enterprise of the Calcutta Agency Houses, and their fortunes consequently varied with that of the parent companies. The earliest known among such banks was the Bank of Hindusthan founded in Calcutta by Alexander & Company, about 1770. After having a phase of critical time the bank ultimately put up its shutters in 1832 with the failure of the firm of Alexander & Company. Two other banks that existed in Calcutta in the clsoing years of the eighteen century were the Bengal Bank and the General Bank of India.

[Time immemorial—বিস্মৃত অতীত, Inception—জন্ম বা উৎপত্তি, Ultimalely—শেষ পর্যন্ত, Failure—ব্যর্থতা]

11. In addition to the legislations passed to facilitate reconstruction or amalgamation of weaker banks with other units, the Government also proposed to introduce a scheme for the insurance of bank deposits. Accordingly, the Deposit Insurance Corporation was established on January 1, 1962, as an autonomous statutory body with the objective of giving a measure of protection to depositors to a specified extent, (as present fixed at Rs. 1,500 per depositor), from the risk of loss in the event of a bank's failure. The Act covered all functioning banks. The Corporation has fixed the rate of premium to be paid by insured banks at 5 P per annum for every Rs. 100 of their total deposits. The maximum premium permissible under the Act is 15 P per Rs. 100 of deposi

12. Sealed Tenders are invited for the supply of the following which has to reach the Asst. Purchase Officer, Andhra Pradesh State Road Transport Corporation, Murshirabad, Hyderabad-20, on or before 14-30 hours on 20-12-1967, and will be opened on the same day at 15-00 hours. Tenderers or their Representatives may be present at the time of opening the tender: —

1. Wildow Pans and Shutters as per RTC drawings (for 100 bus bodies).

2 White glass sheets (ordinary) 60"×30"×¼"

Full particulars required will be enclosed to the Blank Tender Form. The Blank Tender Forms can be had from our Asst. Purchase Officer from 20-11-67 on payment of Rs. 5 for each item by cash. The Tenders will be opened on the date mentioned above.

13. India will reach her Fourth Plan target of expanding her overseas shipping by 3 million tons by March 1971, according to Dr. V. K. R. V. Rao, the Union Minister for Transport and Shipping. Dr. Rao told reporters yesterday that in the past five months India had placed orders in Yugoslavia for five vessels with a total tonnage of 450,000 tons on a rupee credit basis. Orders had also been placed with Germany and the U.K. and with shipbuilders within the country. All these ships are to be delivered before March 1971. Referring to the development of Mangalore Port Dr. Rao said the committee appointed by the Union Government, to study the traffic potential of Mangalore, had already submitted its report.

14. Since the construction cost of projects accounts for 50% of the total Plan investment, "even a marginal savings in the cost of construction can make a significant difference in the deployment of the resources available for Plan development," Mr. Venkataraman, Member Planning Commission pointed out. He also called upon cement manufacturers to tap the vast export market for cement in the developing countries to achieve full use

of the production capacity and earn much-needed foreign exchange for the country. Referring to the rapaid growth of the cement industry, he said the production had increased from a bare 2.5 million tons at the beginning of the First Plan to 11 million tons at the end of the Third Plan. But despite this progress, "it cannot be said the consumer has been adequately served in terms of supply, quality or price," he remarked.

15. The Union Food Minister stated in the Lok Sabha today that foodgrain prices were showing a down ward trend and after the main harvest, there would be an appreciable fall in food prices. He was confident that this would have an impact on prices of other commodities. Some members described the Minister's expectations as "wishful thinking." Earlier, Mr. A. P. Shinde, Minister of State for Food, informed the House that during the last 22 days the prices of food grains had fallen by 4.3%. The Food Minister ruled out any fixing of price for the sugar partially de-controlled from November 23.

16. Tea attracts both Export Duty and Central Excise Duty. An export duty was first levied at two annas per lb. in 1947. By 1955 it had been increased to 62 P. per lb. From March 1, 1955 this was changed to a slab system based on price per lb.; when the price per lb., when its was between Rs. 2.50 to Rs. 3.00 the duty was 25 P. per lb., and when it was between Rs. 3.75 to Rs. 4.00 it was 50 P. per lb., where it was between Rs. 4.00 and Rs. 4.75 it was 62 P. per lb., and where it was above Rs. 4.75 it was 75 P. per lb. By the Finance Act of 1956-57 the slabs of Rs. 2.50 to Rs. 3.25 and Rs. 3.25 to Rs. 4.00 were merged and the rates of the duty were changed. To afford the industry competetive strength in overseas market, the export duty on tea was successively reduced since June 1, 1958 till it was brought down to 55 P. per lb. and thereafter to 44 P. per lb.

17. India had became the largest exporter of cotton cloth in the world in 1950. Exports during the year amounted to 1060 million yards valued at Rs. 95.4 crores. But in view of the

fact that unlimited export of cloth had resulted in domestic needs remaining unsatisfied, the Government had to restrict exports in 1951 and as a result thereof exports during the year 1951 considerably came down. The total exports during 1951 amounted to 736 million yards valued at Rs. 73.3 crores. This demoted India to the fourth place in the rank of order as a textile exporting country. The exports in 1950 constituted 28.9 per cent of the total production and in 1951 it was 18 per cent. Although 61 countries bought Indian cloth, of which exports in 'appreciable' quantities were made to the United Kingdom, United States of America, Canada, Australia, Burma and Egypt.

18. The revenue of the Government from the import duty on foreign sugar having dwindled down enormously since 1932, the Government of India to make up for same imposed in 1934-35 an excise duty of Rs. 1-5-0 per cwt. on factory sugar and 10 annas per cwt. on Khandsari sugar. The general effect of this was to eat into the profit of the mills, which, however, were for some time past on the wane on account of internal competition in the industry caused by over production. Despite protest against it an additional excise duty of eleven annas per cwt. was imposed on indigenous sugar from 1937. And this further reduced the profitability of the mills.

19. In May 1964 the Union Government decided to set up a State-owned public limited company called the Cement Corporation of India with a view to bolsterings up the development of the cement industries. The Corporaiton will not only direct its efforts towards facilitating private investment in the private sector, especially in its expansion programmes, but will also assist the growth of the public sector in this vital industry. The need for such a corporation arose because of the expected phenomenal increase in the demand for cement during the Fourth Plan. According to the Fourth Plan projections made by the Planning Commission the likely growth in demand for cement in the next Plan would call for the creation of fresh capacity of at least 10 million tons per annum

20. The iron and steel industry had a boom period during the second World War. The industry supplied almost all the requirements of steel for the prosecution of war in this part of the world. This led the Government of India seriously athinking about expanding steel production in India. The Iron and Steel (Major) Panel appointed by the now defunct Planning & Development Department of the Government of India in their reports submitted to the Government in March, 1946 estimated India's present requirement of steel at 2,500,000 tons and present capacity of output of the four existing works at 1,2000,000 tons. Later remarkable developments took place in the sphere of steel industry.

21. Along with the industrial development and expansion of literacy the demand for paper has continuously gone up in recent years. In pre-war period the total production was a little over 50,000 tons. By 1951 the production had gone up to 114,000 tons. Since then it has been the purposive policy of the Government to encourage the growth of paper mills in the country. At the beginning of the Second Plan the production had increased to 193,400 tons and by the end of it to over 300,000 tons. The Tariff Commission which enquired into it in 1960 estimated the year's demand at 350,000 tons and that for the next three years at 400,000 tons, 460,000 tons and 520,000 tons respectively. It was emphasised that it would be necessary to have a minimum installed capacity of 7 lakh tons by the end of the Third Plan. So the Government has granted licences not only for the expansion of the existing mills, but also for the establishment of new ones.

22. The Government of India as from time to time raised in India Loans for various amounts. These loans are in amounts and multiples of Rs. 100 and are transferable by endorsement. Cross endorsements are not allowed and all notes so endorsed must be renewed or registered as stock.

Government Securities may also be transferred in multiples

of Rs. 100 into any name or names, not exceeding four, by the holder (or holders) personally executing a transfer in the book at the Reserve Bank of India at any of its branches on his (or their) being identified at the bank by a stock broker. A fee of Re. 1 for each Promissory Note of Rs. 5,000 stock transferred is charged. There are no stamp duties payable for these operations.

23. The resilience of shares in tyre-manufacturing companies has been remarkable during recent weeks, although sluggish conditions are otherwise prevailing in the stock market. The steadiness is largely due to the absence of selling pressure rather than to renewed support since holders are inclined to take a fairly bullish view of such shares. The demand for nearly all kinds of tyres is as present running ahead of output. It is reliably learnt that the Government has urged the manufacturers to increase their production for coping with the rising demand. The Government has also taking active steps to encourage expansion in the output capacity.

24. Applications are invited for undermentioned posts. Age as on 1.1.68 must be within the prescribed age limits but is relaxable for Government servants except where otherwise specified. Upper age limit relaxable upto 45 years for displaced persons from East Pakistan who migrated on or after 1.1.64 and repatriates from Burma and Ceylon who migrated on or after 1.3.63 anb 1.1.64 respectively. Upper age limit relaxable by 5 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates. No relaxation for others save in exceptional circumstances and in no case beyond a limit of three years. Higher initial pay may be granted to specially qualified and experienced candidates.

25. The Government Securities quoted on the Stock Exchange carry various rates of interest and maturity dates. Of the Companies quoted on the Calcutta Stock Exchange no less than 85 companies consistently paid dividends on the Equity shares during the past 25 years, 151 companies have consistently paid dividends over the past 15 years, 220 companies over the

past 10 years, and 307 companies over the past five years. The yield obtained from the securities quoted on the Calcutta Stock Exchange is generally higher than the yield obtainable from securities in the Bombay Market.

26. Evidence of the preferential attention to the home market and of the corresponding neglect of markets abroad is in (a) our production statistics and (b) our export performance. During the decade ending 1964-65, industrial production doubled to 206 per cent. During about the same period, the output of tea increased by about 24 percent. The slow pace of expansion in the output of tea was not owing to any slowing of world demand for tea. World production of tea during this period rose by 47 percent, and in Africa and other countries by 67 percent and world trade in tea rose by 53 percent. It is India's share of world production and world trade in tea that declined—an out come of the shift of investment resources away from export industries, induced by inflation, currency over-valuation and the planned diversion of funds to finance the industrial bulge. In 1965, for the first time in history, India lost to Ceylon her, hitherto undisputed, rank as the largest exporter of tea in the world.

27. Last, but not the least, is the fact that no industry is so vitally involved with people as tourism. It deals with welcoming people from a foreign land who will be put up and dined at hotels, restaurants where 40 percent of tourist money and time spent It therefore involves large numbers of trained hotel personnel. Again, tourists are taken on tours by guides entertained by artists, given hospitality by friends or acquaintances at every stage, tourism, which is today the world's largest export industry deals with human beings and not machines. This is its weakness and its strength. The weakness arises if, as a nation, we present a picture of hawkers, touts and beggars-looking on the tourist not as a potential friend but as an easy prey for quick money. It is its strength because it develops friendships, amity and under standing if we as a host country understand the long-term advantages of tourism and its direct effect on world peace

28. If a film has to play it proper role in the promotion of national integration, regional films must be encouraged and built up to assume their full stature. Emotional integration is not annihilation or surrender of one's cultural characteristics but an apreciative understanding of the diverse patterns of self-expression that go to make a synthesis of the Indian way of life. To discover the unity in diversity and to feel the nearness of the neighbour's hand, a deliberate effort must be made through films. Inter-State festivals are as important as International 'festivals. Then alone the regional films can become cultural ambassadors to their neighbouring regions. Once and for all it must be recognised by the State that films are a social necessity and not an idle luxury to be connived at, just because they are a growing source of substantial revenue.

29. The point of controversy is whether automation is a boom or it is a threat of unemployment amongst different categories of workers. There are various views on the subject expressed by various types of people. Considering both the aspects of automation, we find that on one hand it dose bring some practical benefits to both the sides, i.e. employer and the employees as the former gets more production per man-hour by increased productivity and hence lower cost of manufacture whereas the latter get larger pay packets for higher production, safer working conditions and reduction in manual toiling of the job. On the other hand, the other aspect is of the fear of displacement of labour and less employment.

30. In fulfilling our national aspiration for ushering in an egalitarian social order, a process of levelling up and levelling down is inevitable. The image of modern India—vibrant, throbbing with nation-building activities—envisioned by our peerless Leader, Sri Jawaharlal Nehru or Ram-Rajya of Mahatma Gandhi's conception can become a reality only when there emerges a sound, sturdy and stable Cooperative Socialistic Commonwealth of all the States of Indian Union where in every

strata of society pledges itself to put in united, massive efforts for the realisation of common weal. The Five Year Plans have evolved the strategy of India's productive development in this very direction for ensuring everlasting success in our quest for vanquishing the national foes—poverty, squalor, disease and ignorance—by accomplishing a balanced, integrated growth.

বাংলা থেকে ইংরেজী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১॥ গত দুই দশকে ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার ধারণায় এবং পাঠ্যক্রমে এক বিরাট পরিবর্তন হইয়াছে—আমূল পরিবর্তন বলা যাইতে পারে। উহার মধ্যে মহাত্মা গান্ধীব চিন্তাধারার বিশেষ প্রভাব আছে। যে আদর্শে মহাত্মাজী অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহা হইল এই: দেশের জনসাধারণের জন্য এমন এক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাহা হইবে সুলভ ও স্বয়ংনির্ভর এবং যাহা শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই আসিবে না, তাহাকে একটি গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনেও উদ্বুদ্ধ করিবে। তিনি সেজন্য এক সমাজ কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করিলেন—এই ব্যবস্থা সমাজের প্রয়োজনের উপরে নির্ভর করিয়া সৃষ্টি হইবে এবং ফলে সমাজ উহাতে উপকৃত হইবে। এই শিক্ষার সর্বজন-স্বীকৃত নীতি এই যে উহা কেবল মাত্র পুঁথিগতই হইবে না, পরিবেশের সঙ্গে শিশুর পরিচয়ের মাধ্যমেও উহা গড়িয়া উঠিবে। শিক্ষা তখনই কার্যকরী হয়, যখন উহা হাতে কলমে করিয়া ফল পাওয়া যায়। এই নীতির উপর ভিত্তি করিয়া মহাত্মাজী বলিলেন যে এই শিক্ষার বুনিয়াদ উৎপাদন মূলক এবং লাভ জনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইবে এবং সেজন্য চরকাকে তিনি তাঁহার সেই শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মতে সূতাকাটা এবং তাঁতবোনাই এই উদ্দেশ্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহায়ক। এই ভাবেই আমাদের দেশে বুনিয়াদী শিক্ষার জন্ম হইল। মহাত্মাজীর গোঁড়া সমর্থকদের মতে, ভারতীয় গণতন্ত্রের পোষাক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই।

[বি, কম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় '৬৭]

[প্রাথমিক শিক্ষা—Primary education; সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ—Socialistic Pattern; বুনিয়াদী শিক্ষা—Basic education]

২ ॥ মানুষ কোন বস্তু বা পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারে না; সেইরূপ মানুষ কোন পদার্থ ধ্বংসও করিতে পারে না। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। উৎপাদন মানে যেমন উপযোগের সৃষ্টি, সেইরূপ ভোগ মানে উপযোগের ধ্বংস। কমলালেবু খাওয়া মানে এই নয় যে কমলালেবুকে ধ্বংস করা, আসলে উহার উপযোগ বিনষ্ট করা। কতকগুলি দ্রব্য আছে যাহা একবার মাত্র ভোগ করিলেই ইহাদের উপযোগিতা নষ্ট হইয়া যায়। আবার কতকগুলি দ্রব্য আছে যাহাদের উপযোগিতা আমরা দীর্ঘদিন ধরিয়া ভোগ করি, যেমন, পোষাক, আসবাবপত্র ইত্যাদি। ভোগ এবং উৎপাদন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদন না হইলে ভোগ সম্ভবপর নয়, আবার ভোগ না হইলে উৎপাদন অর্থহীন। জনৈক অর্থনীতিবিদের মতে ভোগ নেতিবাচক উৎপাদন।

[ভোগ—Consumption ; বৈজ্ঞানিক সত্য—Scientific truth ; নেতিবাচক উৎপাদন—Negative production.]

৩ ॥ জমি প্রকৃতির দান হইলেও জমির উৎপাদিকা শক্তি বহুল পরিমাণে মানবিক প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। জমিতে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার প্রয়োগের ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি করা যায় এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধির কার্যকারিতাকে বন্ধ রাখা যায়। জমিতে ঠিক ভাবে সার প্রয়োগ করিতে পারিলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ক্রমাগত জমি চাষ করিলে জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। জমিতে সাধারণতঃ দুই ধরণের সার প্রয়োগ করা হয়—রাসায়নিক সার ও সবুজ সার। ভারতে রাসায়নিক সারের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য সিন্ধ্রীতে সার কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে।

[জমির উৎপাদিকা শক্তি—Productivity of Land ; প্রয়োগ—Application ; রাসায়নিক সার - Chemical fertiliser.]

৪ ॥ শেয়ার সাধারণতঃ তিন ধরণের হয়—সাধারণ শেয়ার, অগ্রগণ্য শেয়ার ও প্রতিষ্ঠাতৃদিগের শেয়ার। কোম্পানীর লাভ হইলে যাহাদের অগ্রগণ্য শেয়ার আছে সর্বপ্রথম তাহাদিগকে ডিভিডেণ্ড দিতে হইবে। এই সকল শেয়ার হোল্ডারকে লভ্যাংশ দিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা সাধারণ শেয়ারের অধিকারীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। অগ্রগণ্য শেয়ার আবার সঞ্চয়মূলক হইতে পারে। এইরূপ শেয়ার সম্পূর্ণরূপে ঋণ পত্রের সামিল। শেয়ার বিক্রয় ছাড়াও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া কোম্পানী মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। ডিবেঞ্চার হইল একপ্রকার ঋণপত্র। যাঁহারা এই ঋণপত্র কেনেন তাঁহারা কোম্পানীর মহাজন। ডিবেঞ্চার ক্রেতাগণ নির্দিষ্ট হারে সুদ পাইয়া থাকে। কোম্পানীর লাভ হউক আর নাই হউক, ডিবেঞ্চারের উপর কোম্পানীকে সুদ

দিতেই হইবে। এই জন্য ডিবেঞ্চারের উপর সুদকে কোম্পানীর উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

[অগ্রগণ্য শেয়ার—Preference Share ; প্রতিষ্ঠাতৃগণের শেয়ার—Founders' Share ; সঞ্চয়মূলক—Cumulative ; নির্দিষ্ট হারে—At a fixced rate]

৫ ॥ আধুনিক সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার সহিত আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য শ্রম বিভাগ। উৎপাদনের সমগ্র কাজকে কতকগুলি ছোট ছোট অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশে পৃথক পৃথক লোক নিযুক্ত করিলে সেই ব্যবস্থাকে শ্রম বিভাগ বলে। শ্রম বিভাগের ফলেই বিশেষিকরণ সম্ভব হয়। শ্রম বিভাগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়; তাহার কারণ কর্ম্মবিভাজনের দরুণ প্রত্যেককে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেওয়া সম্ভবপর হয়। একজন দক্ষ শ্রমিক যোগ্য স্থানে থাকিলে নিশ্চয়ই একজন আনাড়ী শ্রমিকের তুলনায় নিপুণভাবে কাজ করিবে। শ্রমবিভাগ শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে।

[শ্রম বিভাগ—Division of Labour ; বিশেষিকরণ—Specialisation]

৬ ॥ সম্প্রতি দুই হাজার গ্রাম ও বারো শত শহর এলাকায় নমুনা সমীক্ষায় প্রকাশ, ১৯৬১ সন হইতে ১৯৬৬ সনের ১লা জুলাইয়ের মধ্যে ভারতের শহর এলাকায় ২০.১৫ শতাংশ ও গ্রামাঞ্চলে ১১.০৭ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এই সময়ে ভারতের মোট সাড়ে উনপঞ্চাশ কোটি লোক সংখ্যার চল্লিশ কোটি গ্রামে এবং বাকি সাড়ে নয় কোটি শহরে বাস করে। লোক সংখ্যার অনুপাতে এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী, পঞ্চান্ন লক্ষের মত। বিহারে লোক সংখ্যা ছাপ্পান্ন লক্ষ বাড়িলেও তুলনামূলকভাবে এই বৃদ্ধির হার পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে কম। উড়িষ্যাতেও এই সময়ে মাত্র কুড়ি লক্ষ লোক বাড়িয়াছে। ১৯৬১ সনে অন্ধ্রের লোকসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা দশ লক্ষ কম ছিল। কিন্তু ১৯৬৬ সনে অন্ধ্রে তিন কোটি চুরানব্বই লক্ষ হইলেও পশ্চিমবঙ্গ এই সময়ে জন সংখ্যার পরিমাণ চার কোটি চার লক্ষে পৌছিয়াছে।

[নমুনা সমীক্ষা—Sample Survey ; শতাংশ—Per cent.]

৭ ॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের কাছে বড় রকমের আর্থিক সাহায্য চাইছেন। কেন এই সাহায্য অত্যাবশ্যক এবং এই সাহায্য না পেলে তার আশু পরিণতিই বা কী হতে পারে, মুখ্যমন্ত্রী সোমবার কলকাতায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইকে তা বুঝিয়ে বলবেন। অ্যাশোসিয়েটেড চেম্বারস্ অফ কমার্স-এর বার্ষিক সভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য ঐদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কলকাতায়

আসছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অর্থদপ্তর পশ্চিমবঙ্গের সর্বশেষ আর্থিক পরিস্থিতির একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রস্তুত করেছেন। সরকার যদি নতুন আয় বৃদ্ধির পথ বের করতে না পারেন তাঁহলে আগামী বছরে বহু উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ বন্ধ রাখতে হবে। চলতি বছরের বহু কাজ ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

[আর্থিক সাহায্য—Financial help ; বার্ষিক সভা—Annual meeting ; চলতি বছরে—in the current year.]

৮॥ কোন দ্রব্যের সমগ্র যোগান যখন একজন মাত্র ব্যক্তি বা একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে তখন সেই অবস্থাকে একচেটিয়া কারবার বলে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মিলিত হইয়া একচেটিয়া কারবার স্থাপন করিতে পারে আবার রাষ্ট্র হইতে সনদ লাভ করিয়াও একচেটিয়া কারবার গড়িয়া উঠিতে পারে। ব্যবসায় একচেটিয়া হউক আর প্রতিযোগিতা মূলকই হউক, ব্যবসায়ীর লক্ষ্য মুনাফা সর্বাধিক করা। একচেটিয়া কারবারে ব্যবসায়ীর দ্রব্যের যোগানের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে বলিয়াই সে দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। একচেটিয়া কারবারীর কোন প্রতিযোগী থাকে না বলিয়া সে ইচ্ছামত দামে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে। আবার সে যোগানের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে।

[যোগান—Supply ; একচেটিয়া কারবার—Monopoly bussiress ; মুনাফা—Profit ; সর্বাধিক—Maximum.]

৯॥ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার শীর্ষদেশে আছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। অপর সকল ব্যাঙ্ককে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা ইহার রহিয়াছে। এই ব্যাঙ্ক দেশের অর্থ ব্যবস্থা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। বর্তমানে পৃথিবীর সকল উন্নতিশীল দেশেই একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মূল উদ্দেশ্য হইল ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে এরূপ ভাবে পরিচালক করা যাহাতে দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য বজায় থাকে, অর্থের বিনিময় হার এবং আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব বজায় থাকে এবং দেশের আর্থিক উন্নয়নকে সহায়তা করা হয়। এই উদ্দেশ্যকে রূপদান করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে কাগজী মুদ্রা বাজারে প্রচলন করিবার একমাত্র অধিকারী করা হয়। কি পরিমাণ কাগজী মুদ্রা বাজারে চালু থাকিবে, কখন তাহার পরিমাণ প্রসারিত ও কখন তাহার পরিমাণ সঙ্কুচিত করা হইবে তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্ধারণ করে।

[কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক—Central Bank ; নিয়ন্ত্রণ—Control ; উন্নতিশীল দেশ—Developing countries ; মূল্যস্তর—Price level ; কাগজী মুদ্রা—Paper currency.]

১০॥ রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার সংশোধন অরডিন্যান্স (১৯৬৭) নামে একটি বিধান জারি করেছেন। ফসলের ভাগ নিয়ে বর্গাদারের

স্বার্থরক্ষায় এটি জারি হয়েছে বলে সরকারী মুখপাত্র মন্তব্য করেন। এই অরডিন্যান্সে বলা হয়েছে যে, জমির মালিক যদি বর্গাদারকে তার প্রাপ্য অংশ না দিয়ে জমির সবটা ফসল নিজের খামারে তোলেন তবে ঐ বর্গাদার অনুমোদিত অফিসারের কাছে এর প্রতিকারের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট অফিসার এই আবেদন বিচার করে জমির মালিককে বিধান অনুযায়ী বর্গাদারের প্রাপ্য ফসল মিটিয়ে দেওয়ার অথবা তা না করলে প্রাপ্য ঐ ফসলের নির্দিষ্ট দাম বর্গাদারকে দিতে বাধ্য করার নির্দেশ দিতে পারবেন। বর্তমান আইনে বর্গাদারের এরূপ আবেদন করার অধিকার ছিল না। অরডিন্যান্সটি অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে শুক্রবার রাজ্য সরকারের এক প্রেস নোটে জানানো হয়েছে।

[রাজ্য সরকার—State Government , ফসল—Crop ,
অবিলম্বে—Immediate.]

১১ ॥ সহকারী প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ লোক সভায় বলেন যে, বীমা আইনে কয়েকটি পরিবর্তন সাধন করে সাধারণ বীমা শিল্পকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হবে এবং এই শিল্পের জন্য 'দৃঢ়, সুস্থ ভিত্তি' তৈরী করতে হবে।

শ্রীদেশাই সাধারণ বীমা কোম্পানীগুলিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেন, এজন্য একটি বিল সংসদের আগামী অধিবেশনে উত্থাপন করা হবে।

বিলটির মূল উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রধান ব্যবস্থাবলী ব্যাখ্যা করে শ্রীদেশাই বলেন, প্রিমিয়ামের হার ন্যায়সঙ্গত করা হবে, বীমাকারীদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা বীমাকোম্পানী পরিচালিত হবে না, তেমনি ব্যক্তিগত স্বার্থে ঐসব কোম্পানীর তহবিল খরচ করা হবে না। সাধারণ বীমাকোম্পানীর কাজকর্ম পরিচ্ছন্ন ও সবরকম দুর্নীতির উর্ধ্বে থাকবে।

[সহকারী প্রধানমন্ত্রী—Deputy Prime Minister ; , বীমা—Insurance , দুর্নীতি—Curruption , সামাজিক নিয়ন্ত্রণ—Social Control]

১২ ॥ প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ক্ষেত্রে বিপুল পরিমান ব্যয় বরাদ্দ করার ফলে শিল্পের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। সংশোধিত হিসাবানুসারে মোট ব্যয়ের মাত্র শতকরা ৭.৯ ভাগ শিল্প ও খনির জন্য বরাদ্দ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের দায়িত্ব প্রধানতঃ বেসরকারী উদ্যোগের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি অনুসারে সরকার নিজেও কতকগুলি মূল শিল্প সম্প্রসারণের ভার গ্রহণ করে। সরকারি মালিকানায় সিন্ত্রীর সার কারখানা, চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানা, ইনটিগ্রাল

কোচ ফ্যাক্টারী, হিন্দুস্তান মেশিন টুলস কারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃহদায়তন শিল্প এবং খনিক্ষেত্রে ১৩৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়। বেসরকারী ক্ষেত্রে ২.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২ টি শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে।

১৩॥ যুদ্ধোত্তর দেশবিভাগের সংকটে অর্থনৈতিক অবস্থায় যে অসমতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করিয়া জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করাই ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের গতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করাই হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। তৃতীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য স্বয়ং নির্ভরশীল সম্প্রসারণ (Self-sustaining growths) সৃষ্টি করা। সুন্দর জীবন যাপনের সুযোগ দানই তৃতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। স্বয়ং নির্ভরশীল অর্থনীতি বলিতে আমরা সেই অর্থনীতিকে বুঝিব যেখানে প্রয়োজনীয় উন্নয়নের হার নিজস্ব সম্পদের দ্বারাই সম্ভবপর হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন উৎপাদনের হার বৃদ্ধি, খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন ও মূল শিল্প সম্প্রসারণ। আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে জাতীয় আয় দ্রুত হারে বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

১৪॥ সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সমাজ ব্যবস্থা গড়িবার পথে প্রথম প্রয়োজন হইল প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রসার করা। ইহা ছাড়া, সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করিতে হইবে। তবে প্রথমেই খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান কর্মসংস্থান এবং সর্বনিম্ন আয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পরিশেষে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করা ছাড়াও দেখিতে হইবে যে দ্রুত অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের দরুণ সকল অর্থনৈতিক ক্ষমতা যেন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়। এই উদ্দেশ্যে, মূলধন লাভ, ফাট্‌কা বাজী প্রভৃতি সীমিত করিয়া রাষ্ট্রকে তাহার প্রাপ্য অংশ গ্রহণে উদ্যোগী হইতে হইবে। কর ফাঁকি কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে। অত্যাবশ্যক খাদ্য দ্রব্যের দাম যাহাতে স্থিতিশীল হয় এবং দরিদ্র জনগণের আয়ত্তে থাকে তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। বেকারদিগকে যতদূর সম্ভব কর্মসংস্থানের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে।

১৫॥ অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় রাষ্ট্র পৃথক মর্যাদার অধিকারী হইলেও উহা মূলত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান অপর সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত রাষ্ট্রের কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে। উদ্দেশ্যের দিকে হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কোন বিশেষ সংগঠন গড়িয়া ওঠে কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল মানবজীবনে সামগ্রিক আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য সদস্যদের মধ্যে আধ্যাত্মি চেতনার উন্মেষ করা ও রেডক্রশ সোসাইটির উদ্দেশ্য আর্তমানবতার সেব করা ইত্যাদি। অপরপক্ষে, রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনের কোন্ বিশেষ উন্নতি সাধনে আদর্শে অনুপ্রাণিত নয়। উহার উদ্দেশ্য নির্বিশেষ। নাগরিককে মহৎ ও সুখী জীবনের অধিকারী করিয়া তোলাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

১৬॥ প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখ গেল। রাশিয়া, ইতালী, জার্মানী, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে একের পর এক একনায়কতন্ত্রের অভ্যুত্থান ঘটিতে লাগিল। গণতন্ত্র সঙ্কটের সম্মুখীন হইল। সকলের মনে একটিই প্রশ্ন জাগ্রত হইল : গণতন্ত্র কি টিকিবে? গণতন্ত্রকে এখন আর সকলে শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা বলিয়া মানিতে চাহে না। দক্ষতার মানদণ্ডে বিচার করিলে গণতন্ত্র অপেক্ষা একনায়কতন্ত্র শ্রেয়। কিন্তু একনায়কতন্ত্র কখনোই গণতন্ত্রের বিকল্প হইতে পারে না। ইহা সাময়িক শাসন ব্যবস্থা মাত্র; চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। সকল দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও গণতন্ত্র বাঁচিয়া থাকিবে; কারণ একমাত্র গণতন্ত্রেই ব্যক্তির আশা আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হইয়া উঠে।

১৭॥ মানব জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। রুশো বলিয়াছেন স্বাধীনতা অস্বীকার করা হইলে মনুষ্যত্ব অস্বীকার করা হয়— মানুষের অধিকার এমন কি কর্তব্যকে পর্যন্ত অস্বীকার করা হয়। পরাধীন জীবন ক্রীতদাসের জীবন বলিয়া ইহা ঘৃণ্য। ইহা মানব জীবনের সকল তাৎপর্য বিনাশ করিয়া মানুষকে একটি সজীব যন্ত্রে পরিণত করে। এই কারণেই স্বাধীনতাকে এতো মূল্যবান আদর্শ বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিংশ শতাব্দীতে এশিয়া ও আফ্রিকার নবজাগ্রত দেশগুলিকে যে আদর্শ অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহাও জাতীয় স্বাধীনতা; পরশাসনের নাগপাশ ছিন্ন করিবার আমৃত্যু প্রতিজ্ঞা। রক্তের মূল্যে স্বাধীনতা অর্জনেও তাহারা বিশেষ বিচলিত নয়। স্বাধীনতা অর্জন করাই কঠিন নয়, তাহা রক্ষা কাজও বেশ কঠিন কাজ।

১৮॥ ভারতের ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে ভূদান আন্দোলনের একটি ভূমিকা রহিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইল ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় সত্যাগ্রহ পদ্ধতিতে নিঃশব্দ কিন্তু বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করা। ১৯৫১ সালে হায়দারাবাদের অন্তর্গত তেলেঙ্গনায় উপস্থিত হইলে কয়েকজন কৃষক আচার্য বিনোবা ভাবেকে বলে যে তাহাদের কাজ করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে কিন্তু ভূমিহীন বলিয়া কিছু করিবার উপায় নাই। এই কথা শুনিয়া সেখানকার এক জমিদার ১০০ একর জমি দান করিবার সিদ্ধান্ত জানান। এই ভাবেই ভূদান আন্দোলন শুরু হইল। ভারতের ভূমিহীন কৃষকেরা যাহাতে ভূমি

পায় এবং গ্রামাঞ্চলে আর্থিক বৈষম্য হ্রাস পায়, সেই মহান উদ্দেশ্যেই আচার্য ভাবে ভূদান আন্দোলন শুরু করেন। প্রথমে কৃষিক্ষেত্রে এই আন্দোলন শুরু হইলেও বর্তমানে অকৃষিগত ক্ষেত্রেও ইহা সম্প্রসারিত হইয়াছে।

১৯॥ ভারত কৃষি প্রধান দেশ। ১৯২১ সালের কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ১৫,লক্ষ। ১৯৩১ সালে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষে। কৃষি মজুর অনুসন্ধান সমিতির হিসাবানুসারে ১৯৫০-৫১ সনে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৫০ লক্ষ; ইহার মধ্যে ১ কোটি ৯০ লক্ষ পুরুষ, ১ কোটি ৪০ লক্ষ স্ত্রীলোক, এবং ২০ লক্ষ বালক। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী কৃষি ৬৯·৮% লোকের প্রধান উপজীবিকা ছিল। ১৯৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী ১৮·৮৪ কোটি শ্রমিকের মধ্যে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩·১৪ কোটি। বিগত ৬০-৭০ বৎসরে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় কৃষি শ্রমিকের অবস্থা দুর্বিষহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা সারা বৎসর কর্মে নিযুক্ত থাকে না, সমাজের নিকট ইহারা ন্যায় বিচার পায় না। কৃষি ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা দুর্বলতার উৎস হইল কৃষক।

২০॥ ১৯৫৮ সালে জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিল গ্রাম সমাজকে প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে ধরিয়া প্রতি গ্রামে একটি করিয়া গ্রাম সমবায় গঠন করার নির্দেশ দেয়। গ্রামের যাবতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব বহন করিবে গ্রামপঞ্চায়েত ও গ্রাম সমবায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায়ের জন্য ৩৪ কোটি ও তৃতীয় পরিকল্পনায় ৮০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। ১৯৫৯ সালে শ্রীবৈকুণ্ঠ মেহাতাকে সভাপতি করিয়া সমবায় ঋণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। ১৯৬০ সালের মে মাসে ওই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। তৃতীয় পরিকল্পানায় এই কমিটির সুপারিশ গুলি কার্যকরী করা হয়। এই পরিকল্পনা কালে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের শতকরা ৬০ জনকে সমবায়ের অধীনে আনার লক্ষ্য নির্ধারিত হইয়াছে।

২১॥ সমাজের সর্বক্ষেত্রে বিশেষত অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্যোগ-হীনতার বিভিন্ন কারণ বিশ্লেষণ করে তার প্রতিকার সম্পর্কে কোলকাতার প্রাক্তন সেরিফ বলেন, এ বিষয়ে সরকার ও জনসাধারণ উভয়েরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চাই। যথেষ্ট মূলধনের প্রয়োজনে সাধারণ মানুষকে সঞ্চয়ী মনোবৃত্তি সম্পন্ন করতে হবে। ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারে ব্যাঙ্ক ও অর্থ কর্পোরেশনগুলির ঋণদান নীতি আরও উদার করা উচিত। বেসরকারী শিল্পাগুলির উন্নতি সাধনে তাদের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দেবার ব্যাপারে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ দিতে হবে, ক্ষুদ্রশিল্পগুলোকে উৎসাহ দিতে হবে। দেশের যুবসমাজের মধ্যে

ব্যবসা করার মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে হবে এবং শ্রমিকদের আরও সুশৃঙ্খল ও দায়িত্বশীল করে তোলার জন্যে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই দেশ অর্থনৈতিক ও শিল্পক্ষেত্রে যথার্থ উন্নত হয়ে উঠবে।

২২ ॥ ব্রিটেন মুদ্রামূল্য হ্রাস করার পর মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জনসন ঘোষণা করেন যে, ডলারের বিনিময় মূল্য কমান হবে না। মার্কিন প্রেসিডেণ্টের ঘোষণার অর্থ এই নয় যে, কোন অবস্থাতেই ডলারের মূল্য হ্রাস করা হবে না। ব্রিটেন মুদ্রামূল্য হ্রাস করার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোন্নত অন্যান্য দেশ মুদ্রা মূল্য হ্রাস করবে না—এই ধারণা থেকেই প্রেসিডেণ্ট জনসন ঐ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি দেখা যায় যে, প্রধান প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলি মুদ্রামূল্য হ্রাস করছে, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ডলারের মূল্য হ্রাস করতে হবে। মুদ্রা মূল্য হ্রাসের ফলে বিদেশে ব্রিটিশ পণ্য অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে বিক্রী হবে। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য বিক্রয়ে কিছুটা অসুবিধা হতে পারে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যাঙ্ক আজ ব্যাঙ্কের সুদের হার ৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪½ শতাংশ করেছে।

২৩ ॥ আজ ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে এক কোটি কুড়ি লক্ষ পাউণ্ডের সুদহীন ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারতের পক্ষে উপপ্রধান মন্ত্রী শ্রীদেশাই ও ব্রিটেনের পক্ষে ভারত সফরত ব্রিটিশ বৈদেশিক উন্নয়ন মন্ত্রী মিঃ বেগ প্রেণ্টিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সাধারণভাবে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে এই ঋণ লইয়া বর্তমান আর্থিক বৎসরে ভারতকে ব্রিটেনের দেয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইল তিন কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড। ইহার সমস্ত অর্থই প্রকল্প বহির্ভূত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হইবে। মিঃ বেগ প্রেণ্টিস শ্রীদেশাইকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, ঋণ প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে ব্রিটেন বরাবরই ভারতের প্রতি সমানুভূতিশীল থাকিবে। দ্বিপাক্ষিক সাহায্যদানের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরই ব্রিটেনের স্থান।

২৪ ॥ নির্বাহী বাস্তুকার, কুচবিহার সেচ বিভাগ, কুচবিহার আই এণ্ড ডব্লু বিভাগের তালিকাভুক্ত ঠিকাদার ও প্রকৃত বহিরাগতদের নিকট হইতে (ঐরূপ কাজের অভিজ্ঞতার পরিচয় পত্র অবশ্যই জমা দিতে হইবে।) "কুচবিহার তুফানগঞ্জ থানার মহিষকুটির নিকট রিডাক—২ নদীর দক্ষিণ তীর রক্ষণের" জন্য বি, এফ, ২৯১১ (২)এ সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। বরাদ্দীকৃত ব্যয়: ১,৫০,৮৮৫ টাকা। বায়না ৩,০১৮ টাকা। প্রদত্ত সময়: ৩ মাস। চলতি আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের সার্টিফিকেট জমা দিয়া ঐ অফিসারের অফিসে বিশদ বিবরণ প্রাপ্তব্য ও সেট প্রতি ১০ টাকা দিয়া টেণ্ডার পত্র সংগ্রহ করা যাইবে। ১৯৬৮ সালের ১৬ই জানুয়ারী বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং -টা ৺৫ মিঃ খোলা হইবে।

২৫ ॥ গতকাল শেয়ার বাজার খোলার সময় পাটের বাজার তেজী ছিল এবং দরও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তবে মিলগুলি এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক ছিল। লেনদেনের ধরণ ছিল মামুলি। বটম ভিত্তিতে প্রতি কুইন্টল পাটের দর ছিল নিম্নরূপ: আপার আসাম ১০৫'৮৩, লোয়ার আসাম ১০৪'৪১, কিষাণগঞ্জ ১০১'৮১ ও লখিমপুর ৮৫'৭৪। বিদেশী ক্রেতাদের আগ্রহের অভাবে চট ও থলের বাজারে সামান্য মন্দা ভাব দেখা দেয়। কিন্তু শেয়ার বাজারের অন্যান্য লেনদেনের ক্ষেত্রে ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। নূতন করিয়া ক্রয়ের হিবিক পড়িয়া যাওয়ায় ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর অন্যান্য শেয়ারের তুলনায় গতকাল চড়তির দিকে যায়। অন্যান্য শেয়ারের অবস্থা মোটামুটি অপরিবর্তিত ছিল। আজ সপ্তাহের তৃতীয় দিনে আবার বাজার-মন্দা নামিয়া আসে এবং সমস্ত ফটকা এবং পাঁচমিশালী শেয়ারের বেচাকেনায় মন্দা পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলেই বাজারে এইরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

২৬ ॥ শিল্পে শান্তি রক্ষায় এবং কলকারখানার উৎপাদন অব্যাহত রাখার ব্যাপারে একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছিবার জন্যে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী আগামী সপ্তাহে এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকবেন। ঐ বৈঠকে যোগদানের জন্য রাজ্যের সমস্ত শ্রমিক সংস্থা ও বণিকসভাকে আহ্বান জানান হবে। রাজ্যের শ্রমদপ্তরের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন। সকল শ্রম-বিরোধীর দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে কী কী করা যায় সে সম্পর্কে এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে শ্রমিক ও মালিকদের সুপারিশ চাওয়া হবে। সকল বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা গেলে সহজেই শিল্পে শান্তি ফিরিয়ে আনা যাবে। যে সমস্ত শ্রমিক সংস্থা প্রথম দিনের বৈঠক বর্জন করেছিলেন, ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় তাঁদের আবার আমন্ত্রণ জানানো হবে। শ্রমদপ্তর আশা করেন যে, শেষ পর্যন্ত সকল কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থাই শ্রমিকদের চাপে বৈঠকে যোগ দেবেন।

২৭ ॥ টালা-পলতা পাইপ লাইন সংস্কার ও কলিকাতা শহরের অনুন্নত এলাকায় উন্নত জল নিকাশী ব্যবস্থা চালু করার জন্য সি. এম. পি. ও যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট লইতে দশ কোটি টাকা পাওয়া যাইতেছে। বৃহত্তর কলিকাতার জল নিকাশী ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের কর্মসূচীর বাস্তবে রূপদানের উদ্দেশ্যে ১৯৬৫ সনের ২রা অক্টোবর সরকারী ভাবে এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম আরম্ভ হয়; কিন্তু সংস্থাটি এখনও পর্যন্ত কোন কার্যসূচী বাস্তবে রূপদানের সুযোগ পায় নাই। সি. এম. পি. ও পরিকল্পিত কার্যসূচী কার্যকর হইলে টালা-পলতার পাইপ ফাটিয়া জল বাহির হওয়া বন্ধ হইবে এবং তখন কলিকাতার পানীয় জল সরবরাহও অব্যাহত থাকিবে।

২৮॥ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পঞ্চম জাতীয় সমবায় কংগ্রেসের উদ্বোধন করে ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য "সুপরিকল্পিত সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মসূচী"র প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, এইরূপ কর্মসূচী স্বল্প সঞ্চয় একত্রিত করায় সাহায্য করবে। দেশের উন্নয়নে সমবায়ের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সব ক্ষেত্রে সমান উন্নতিই আমাদের কাম্য। এই কারণেই সরকার পরিচালিত সংস্থা ও সমবায়ের উন্নতিতে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। শ্রীমতী গান্ধী বলেন, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা এবং গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই সমবায় গড়ে ওঠে। এই সমবায় আধুনিক বৃহৎ পরিচালন ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিতে পারে। জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত তিন দিনের এই সম্মেলনে সারাদেশের ১৫০০ প্রতিনিধি এবং ২০ জন বিদেশী প্রতিনিধি যোগদান করেন।

২৯॥ ইতিহাসকে নতুন যুগের আলোকে নতুন ভাবে দেখার চেষ্টা হচ্ছে পৃথিবীর নানা দেশে। রাজা মহারাজাদের পারিবারিক কাহিনী আর যুদ্ধ বিগ্রহের বৃত্তান্তকে ইতিহাস বলে বর্ণনার যে রীতি ছিল, এযুগের সমাজ বিজ্ঞানী ইতিহাসবিদরা তা বাতিল করেছেন। ইতিহাসের প্রধান উপকরণ সমাজ, তার মানুষ এবং তার উত্থান পতনের বৃত্তান্ত নিয়েই নতুন যুগের ইতিহাস রচিত হচ্ছে। মোটকথা, সভ্যতার বিকাশের ধারা নিয়েই ইতিহাসের কারবার। ইতিহাস রচনার রেওয়াজ এই দেশে ছিল না। কাব্যে, সঙ্গীতের, শিলালেখে, লোকপ্রবাদের মধ্যে অতীতের ইতিহাসের উপকরণ ছড়িয়ে থাকত। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত সত্য।

৩০॥ যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে আমারা যে ভাবে জীবন নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে, আমরা যে গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই, যে সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্মযাপন করিতেই হইবে সেই সমাজের কোনো উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না, আমাদের পিতা মাতা—আমাদের সুহৃৎ বন্ধু—আমাদের ভ্রাতা ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোন স্থান পায় না, আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী—আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা—আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোনো সংগীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না, তখন বুঝিতে পারি, আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোন স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই, উভয়ের মাঝখানে ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে।

বাণিজ্যিকা

পরিভাষা

বাণিজ্যিক পরিভাষা

ভূমিকা

'প্রতিশব্দ' বা 'পরিভাষা' এক ধরণের বিশেষ অর্থবাহী শব্দ। ইংরাজীতে পরিভাষাকে বলা হয় Technical terms. আমরা যখনই কিছু পাঠ করি তা সে অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, দর্শন-চিন্তা বা অন্য যা কিছুই হোক না কেন, তার মধ্যে এমন কতকগুলো শব্দ আমরা ব্যবহৃত হতে দেখব, যে সমস্ত শব্দ তাদের আভিধানিক অর্থের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। অর্থাৎ সেই সব শব্দ বিশেষ কোন অর্থ বহন করছে। তখনই সেই শব্দগুলোকে বলা হয়—পরিভাষা। তাহলে লক্ষ্য করা গেল, কোন শব্দকে পরিভাষা হয়ে উঠতে হলে তাকে আভিধানিক অর্থের সীমা ছাড়িয়ে বিশেষ অর্থদ্যোতক হয়ে উঠতে হবে। বিশিষ্টার্থ-দ্যোতক শব্দ বা শব্দাবলীই হল—পরিভাষা।

ইংরাজী—পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী ভাষা হওয়ায়, ইংরাজী ভাষার Terminology শক্তিশালী, সার্থক ও বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠেছে। ইংরাজীর পরিভাষা কোষ এত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে যার সঙ্গে অন্য কোন ভাষার পরিভাষা কোষের তুলনা করা চলে না। এই ইংরাজী ভাষার সঙ্গে ভারতের বিশেষত বাংলাদেশের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের হওয়ায় আমাদের বাংলা ভাষায় যেমন বহু ইংরাজী শব্দ স্বাভাবিক ভাবেই স্থান পেয়েছে, তেমনি অনেক ইংরাজী পারিভাষিক শব্দও নিঃশব্দে অনুপ্রবেশ করেছে। এটা অগৌরবের নয়—গৌরবের।

স্বাধীন ভারত বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট। বাংলাদেশের সরকারও ঘোষণা করেছেন: "সরকারী কার্যে বাংলা ভাষা প্রয়োগের ব্যাপারে সরকারী নীতি পরিষ্কার। অর্থাৎ আমাদিগকে সরকারী কার্যে বাংলা ভাষা প্রবর্তন করিতেই হইবে। বলা বাহুল্য, এই সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে বাংলা ভাষা শুধু তার প্রাপ্য মর্যাদার আসনটিই লাভ করেনি, তার গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলা ভাষা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় শুধুমাত্র সরকারী কাজেই স্থান পায়নি, ব্যবসা-

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ভাষার ভূমিকাও ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। এর জন্য চাই উপযুক্ত পরিভাষার বই। সরকার এবিষয়ে উদ্যোগী হয়ে একটি পরিভাষা কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটি যে বইটি প্রকাশ করেছেন তার নাম হল: 'সরকারী কার্যে ব্যবহৃত পরিভাষা'। এই বইটি একেবারে ত্রুটিশূন্য—এমন কথা বলা হয়ত চলে না, কিন্তু প্রয়াসটুকুর মূল্য অনস্বীকার্য। কোন দেশেই পরিভাষা রাতারাতি গড়ে ওঠেনি, আমাদের দেশেও তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিশীলিত হতে হতে সার্থক ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে—এমন আশা করা বাতুলতা নয়। বলা বাহুল্য, পরিভাষা গড়ে তোলার সময় কোন রকম সংস্কার বা গোঁড়ামি না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

কলকাতা, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য-স্নাতক শ্রেণীর সর্বোচ্চ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের বাংলা পরিভাষা বা প্রতিশব্দের জন্য ১০ নম্বর দেওয়া হয়। এই প্রশ্নের উত্তর করতে বসে ছাত্ররা অনেক সময় শুদ্ধ পরিভাষা যেমন লিখতে পারে না, তেমনি ব্যাকরণ গত শুদ্ধিও বজায় রাখতে পারে না। এর জন্য চাই ছাত্রদের আন্তরিক ও আত্যন্তিক প্রয়াস। না বুঝে মুখস্থ করলে বেশীর ভাগ পরিভাষাই বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাবে; কিন্তু তার পরিবর্তে ছাত্ররা যদি শব্দগুলির তাৎপর্য বুঝে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে তবে নিঃসন্দেহে এই শব্দগুলো তাদের আয়ত্তাধীন হবে।

'বাণিজ্যিকা'-র অন্তর্ভুক্ত পরিভাষা পরিচ্ছেদে যে সমস্ত পরিভাষা সংযোজিত হয়েছে তার কতকগুলি (* *) তারকা চিহ্ন, আবার কতকগুলি (*) তারকা চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। যে সমস্ত পরিভাষা এ পর্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্রে প্রদত্ত হয়েছে সেগুলোকে (* *) দুটি তারকা চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। আর এমন অনেক পরিভাষা আছে সেগুলো হয়ত এখনও প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত হয়নি, কিন্তু যেগুলো প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল—সেই সব পরি-ভাষাকে (*) একটা তারকা চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। আশা করি ছাত্ররা এতে বিশেষ উপকৃত হবে।

ইংরেজি বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সংজ্ঞাসমূহের বাংলা প্রতিশব্দ

A

*Abatement—ছুট, বাদ

*Abbreviation—সংক্ষেপণ

*Ab initio—প্রারম্ভ হইতে

Abortive—অকাল প্রসূত

Abrasion—মুদ্রায় ধাতুক্ষয়

Absolute rent—উৎপাদন নিরপেক্ষ খাজনা

„ value—নিরপেক্ষ মূল্য

Abstinence—ভোগবিরতি

*Abstract Book—চুম্বক খাতা

Acceptance—স্বীকার, স্বীকৃতি

Acceptance, Bank—ব্যাঙ্কের অনুমোদন

*Acceptance charge—স্বীকৃতি-দক্ষিণা

Acceptance, conditional—সর্তাধীন স্বীকৃতি

„ , General— সাধারণ „

„ , Qualified—বিশেষিত „

Acceptance of Bills—হুণ্ডি স্বীকার, হুণ্ডি সাকরাণ

*Accepting House—হুণ্ডি স্বীকৃতি

*Accessio—আকস্মিক বৃদ্ধি

Account—হিসাব, খাতে

*Account of profit and loss—লাভ-লোকসানের হিসাব

Account, Advertisement—বিজ্ঞাপন খাতে

*Account, Bad debts—বিলাত খাতে, নাজাই খাতে

„ , Current—চলতি হিসাবে

„ , Capital—মূলধন খাতে

„ , Cash—রোকড় খাতা

„ , Consignment—মাল প্রেরণ খাতে

„ , Cost—আসল খরচ খাতে

„ , Current—চলতি হিসাব

Account, Current Credit—চলতি ধারের হিসাব

** „ , Dead—তামাদি হিসাব

„ , Deposit—আমানত খাতে

** Account, Drawing—ব্যক্তিগত টাকা তোলার হিসাব

„ , Fixed—স্থায়ী হিসাব

* „ , Imprest—জিম্মা খাতে

„ , Joint—যৌথ হিসাব

„ , Permutation—অদল-বদল খাতে

** „ , Pro-forma—নকল হিসাব, খসড়া হিসাব

** , Sales—বিক্রীর হিসাব, বিক্রয় বিবরণী

, Suspense—স্থগিত হিসাব, বিচারাধীন হিসাব, কান টোকা হিসাব

, Transfer—পালটা জমা খরচ

, Travelling—রাহা খরচ খাতে

, Wages—মজুরী খাতে

Account Written Off—বাতিল হিসাব
Accountant—হিসাব নবীশ, হিসাব রক্ষক
Accrued—উপার্জিত
Accumulation—মজুত, সঞ্চয়
Acknowledgement—প্রাপ্তি স্বীকার
Acquisition—অর্জন, দখলীকরণ
*Acquittance—ফারখতি, দায়মুক্তি
Act—আইন, বিধি, বিধান
*Actuals—প্রকৃত, বাস্তব
*Actuary—বীমা গণিতজ্ঞ, বীমা গাণিতিক
Ad hoc—তদর্থক
**Ad interim অন্তর্বর্তীকালীন
Adjournment—স্থগিত, মুলতুবি
Adjudication Order—আদালতী হুকুম
Adjustment of Accounts—হিসাব মীমাংসা, হিসাব মিল
Adulteration—ভেজাল, অপমিশ্রণ
Advance—দাদন, অগ্রিম, বায়না
**Ad valorem—মূল্যানুসারে, মূল্যানুযায়ী
*Affidavit—শপথপত্র, হলফনামা
Afforestation—বনীকরণ
After sight—মেয়াদ অন্তে, দৃষ্টে
Agency—এজেন্সী, আড়তদারী, প্রতিনিধিত্ব
*Agency House—কুঠিওয়ালা
Agenda—কার্যক্রম, কার্যসূচী
*Agent, managing—নির্বাহী প্রতিনিধি
*Agio—মুদ্রাবাট্টা
Agrarian—কৃষিভূমি বিষয়ক
*Agriculture, Extensive—ব্যাপক কৃষি
,, , Intensive—নিবিড় কৃষি
Agricultural Credit Society—কৃষি ঋণদান সমিতি
**Agricultural Economy—কৃষি অর্থনীতি
,, Marketing—কৃষিপণ্য বিপণন
Alias—ওরফে
Alienated Land—হস্তান্তরিত ভূমি
*All Rights Reserved—সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
*Allocation—বিভাজন, বণ্টন
*Allotment of Shares—শেয়ার বিলিকরণ
*Allowance, Compensatory—ক্ষতিপূরণ ভাতা
,, , Conveyance—যান-বাহন ভাতা
* ,, , Dearness—মাগ্‌গি ভাতা
* ,, , Halting—বিরাম ভাতা
* ,, , Travelling—রাহা খরচ
Alloy—খাদ, মিশ্রধাতু
Alluvial Soil—পাললিক মৃত্তিকা
*Amalgamation—একত্রীকরণ
Amendment—সংশোধন
Ammunition—যুদ্ধোপকরণ
*Amortisation—ক্রমশোধ (ঋণ)
Anarchist—নৈরাজ্যবাদী
Annuity—বার্ষিক বৃত্তি

**Annuity Fund—বার্ষিক বৃত্তি তহবিল, বার্ষিকী তহবিল
Anticipation—পূর্বানুমান
*Appendix—পরিশিষ্ট
Appraisal—মূল্য নির্ধারণ
Appreciation of Money—অর্থের মূল্য বৃদ্ধি
Apprenticeship—শিক্ষানবিশী
Appropriation—উপযোজন, প্রয়োগ
Approximation—সন্নিকর্ষ
Arable—চাষযোগ্য
*Arbitrage—আর্বিট্রেজ, পরোক্ষ বিনিময়, অন্তর পণন
Arbitrator—মধ্যস্থ, সালিশ
*Arbitration—মধ্যস্থতা, সালিশী
Aristocracy—অভিজাততন্ত্র, অভিজাত সম্প্রদায়
Armament—যুদ্ধোপকরণ
*Articled Clerk—শিক্ষানবীশ
Arts and Crafts—চারু ও কারু শিল্প
*As per—অনুযায়ী
Assay—যাচাই, পরখ
Assembly, Legislative—আইন সভা, বিধান সভা
*Assessment of Taxes—কর নির্ধারণ
Assets—সম্পত্তি, পরিসম্পদ
*Assets and Liabilities—পরিসম্পদ ও দায়, দেনা পাওনা
*Assets, Circulating—প্রচলিত পরিসম্পদ
*Assets, Fixed—স্থাবর সম্পত্তি
*Assets, Floating—প্রবাহী পরিসম্পদ
Assignee—স্বত্বগ্রহীতা, স্বত্বনিয়োগী
*Assignment—স্বত্ব নিয়োগ
Association—সমিতি, সংঘ
*Assort—বাছাই করা
Assurance—বীমা
Attachment—ক্রোক
*Attestation—প্রত্যায়ন
*Attested Copy—প্রত্যায়িত অনুলিপি
*Attesting Officer—প্রত্যায়ন আধিকারিক
Attorney, Power of—আমমোক্তার নামা
Auction—নীলাম
**Auctioneer—নীলামকারী, নীলামদার
**Audit—আয়-ব্যয় পরীক্ষা, হিসাব পরীক্ষা
**Auditor—হিসাব পরীক্ষক, নিরীক্ষক
Authentic—প্রামাণিক
*Authorisation—প্রাধিকার অর্পণ
Autocracy—স্বৈরতন্ত্র
Automatic—স্বয়ংক্রিয়, স্বয়ংচল
Autonomy—স্বায়ত্তশাসন
Average—গড়, গড়পড়তা
Average Price—গড়পড়তা মূল্য
**Average, Successive—পৌনঃপুনিক গড়
**Aviation, Civil—অসামরিক বিমান চলাচল
Avoidance of Tax—কর পরিহার
Award, interim—অন্তর্বর্তী রোয়েদাদ

B

*Back a Bill—হুণ্ডি পিছসহি করা
*Bail Bond—জমিননামা

Bailor—জামিনদার
Balance, Cash—নগদান উদ্বৃত্ত
„ Certificate—উদ্বৃত্তের প্রত্যয়পত্র
* „ , Closing—অন্তিম উদ্বৃত্ত
* „ in Hand—মোকড় বাকি
* „ of Accounts—হিসাব নিকাশের জের
** „ of Payments—আন্তর্জাতিক দেনাপাওনার সমতা
*Balance of Trade, Favourable—অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত
*Balance of Trade, Unfavourable—প্রতিকূল বৈদেশিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত
** „ , Debit—খরচের জের, ফাজিল বাকি
* „ , Opening—প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত
* „ , Outstanding—অনাদায়ী উদ্বৃত্ত, বাজার বাকি
„ , Sheet—স্থিতি পত্র
* „ , Trial—রেওয়া মিল
„ , Unclaimed—অপ্রার্থিত উদ্বৃত্ত
*Bank Balance—ব্যাঙ্ক জমা
** „ Charges—ব্যাঙ্কের দক্ষিণা
** „ Bank Draft—ব্যাঙ্কের হুণ্ডি
* „ Note—ব্যাঙ্কের বরাত চিঠি
** „ Rate—ব্যাঙ্কের বাট্টার হার
*Bank, Agricultural—কৃষি ব্যাঙ্ক
„ , Chartered—সনদপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক
*Bank, Commercial—বাণিজ্য ব্যাঙ্ক
„ , Co-operative—সমবায় ব্যাঙ্ক
„ , Exchange—বিনিময় ব্যাঙ্ক
Bank, Indigenous—দেশী প্রথার কারবারী ব্যাঙ্ক
„ , Joint-Stock—যৌথ ব্যাঙ্ক
„ , Land Mortgage—জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক
„ , Postal Savings—ডাক বিভাগীয় সঞ্চয় ব্যাঙ্ক
* „ , Rural—গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
* „ , Seheduled—তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক
Banker—মহাজন, কুঠিয়াল, সাহুকার, শেঠ, পোদ্দার
*Bankrupt—দেউলিয়া
Barred by limitalion—তামাদি হওয়া
**Barter—বস্তু বিনিময়, বদলাই
*Bear—নিম্নগ, মন্দীওয়ালা।
**Betterment Fee—উন্নয়ন দক্ষিণা
Bid—নিলামের ডাক
*Bill after Sight—মুদ্দতী হুণ্ডি
** at Sight—দর্শনী হুণ্ডি
for Collections—আদায়ী বিল
Bill Market—হুণ্ডির বাজার
** , of Entry—দাখিলী পণ্যদ্রব্যের তালিকা
** of Exchange—বিনিময়পত্র, ব্যবসায়ী হুণ্ডি
** of lading—বহনপত্র, (রেল বা জাহাজের) চালানী রসিদ
„ of Parcels—মূল্য সংবলিত চালান তালিকা
„ of Right—অধিকার পত্র
** „ of Store—শুল্ক ছাড়পত্র

*Bill, Dishonoured—প্রত্যাখ্যাত হুণ্ডি
,, Duplicate—দ্বৈপট
* ,, Honoured—স্বীকৃত হুণ্ডি
* ,, Treasury—সরকারী হুণ্ডি
,, Triplicate—পর-দ্বৈপট
* ,, Bimetallism—দ্বিধাতুমান
Black-mail—ভয় দেখাইয়া অসদুপায়ে গৃহীত অর্থ
Black-market—চোরাবাজার
Block—সংলগ্ন গৃহপুঞ্জ
Blockade—অবরোধ
Blue Book—সরকারী বিবৃতি
*Blue Print—খসড়া
Board—বোর্ড, পর্ষদ, মণ্ডলী, সংঘ
,, of Adjustment—মীমাংসা পর্ষৎ
,, of Directors—পরিচালক-সংঘ
Board of Revenue—মালগুজার (বা রাজস্ব) পর্ষৎ
,, of Trustees—অছিপর্ষৎ
Board, Arbitration—সালিশী বোর্ড
** ,, Licensing—অনুজ্ঞাপত্র পর্ষৎ
Bonafide—আসল, খাঁটি, অকৃত্রিম
Bond—তমস্থক, পাট্টা, খত
*Bond, Active—সক্রিয় তমস্থক, চলৎ পাট্টা
,, , Fidelity—দায়িত্ব স্বীকারপত্র
* ,, , Gold—কাঞ্চনপত্র
,, , Horder—উত্তমর্ণ
* ,, , Indemnity—খেসারৎ নামা, ক্ষতিপূরণ পত্র
* ,, , Personal—মুচলেখা
Bond, Registered—রেজিষ্ট্রীকৃত পাট্টা
Bonded goods—শুল্কাধীন পণ্য
** Warehouse—শুল্কাধীন পণ্যাগার
Bonus—বোনাস, অধিবৃত্তি
Book-keeping—হিসাব প্রণালী, হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি
*Boom—চড়া বাজার, তেজী বাজার
Bottomary—জাহাজ বন্ধকী ঋণ
Bounty—সরকারী সাহায্য, রাজবৃত্তি
Boycott—বর্জন, বয়কট্
Brassage—মুদ্রানির্মাণ বানি
Breach of Agreement—চুক্তি ভঙ্গ
* ,, of Contract—চুক্তিভঙ্গ
,, of Trust—বিশ্বাস ভঙ্গ
**Broadcast—সম্প্রচার, বেতার-প্রচার
**Broker—দালাল, ফড়িয়া
Brokerage—দালালী
Brought Forward—জের
**Budget—বাজেট, আয়ব্যয়ক
**Budgetary, Surplus—বাজেট উদ্বৃত্ত; আয়ব্যয়ক উদ্বৃত্ত
*Bull—ঊর্ধ্বগ, তেজীওয়ালা
Bulletin—ইস্তাহার, বুলেটিন
**Bullion—থাম, বাট, পিণ্ড
Bureaucracy—আমলাতন্ত্র
*Business cycle—কারবার চক্র
Bye-law—উপবিধি
*Bye-Product—উপজাত

C

Cabinet—মন্ত্রীপরিষদ
Cadastral survey—দেশব্যাপী জরিপ

*Call Money—তলবী অর্থ
Campaign, Grow More Food—অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন
*Canal Tolls—খালকর
Cancellation—বাতিল করণ
*Canons of Taxation—করনীতির সূত্রসমূহ
*Canvasser—উপার্থক
Capital Account—মূলধন খাতে
** „ Expenditure—মুখ্য ব্যয়
** „ Formation—মূলধন গঠন
* „ Goods—মূলধনী পণ্য
** „ Outlay—মূলধন বিনিয়োগ
*Capital, Authorised—অনুমোদিত মূলধন
* „ , Circulating—চলতি মূলধন
* „ . Floating— „
* „ , Fixed—স্থায়ী মূলধন
* „ , Foreign—বৈদেশিক মূলধন
* „ , Issued—বিলিকৃত মূলধন
** „ , Paid up—আদায়ীকৃত মূলধন
* „ , Subscribed—প্রতিশ্রুত মূলধন
* „ , Sunk—ব্যয়িত মূলধন
** „ , Working—কার্যকরী মূলধন
Capitalism—ধনতন্ত্র, পুঁজিবাদ
Caption—শীর্ষলিপি
*Carat—ক্যারাট, বিশুদ্ধ স্বর্ণের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ
*Cargo Book—জাহাজী মালের হিসাব বই
*Carry Forward—জের টানা
*Cartel—মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংঘ
Cash a Bill—হুণ্ডি ভাঙ্গান

Cash Book—রোকড় বই, জমা খরচের বহি
„ Credit—নগদ লেনদেন
* „ Deposit—নগদ আমানত
* „ Entry—রোকড় বন্দ
* „ Memo—নগদ বিক্রয়ের রোকা, ক্যাশ মেমো
*Cash, Hard—নগদ পুঁজি
** „ Imprest—স্থায়ী আমানত
** Casting Vote—চূড়ান্ত ভোট
Casual Labour—সাময়িক শ্রম
* „ Leave—নৈমিত্তিক ছুটি
*Caution Money—জামানতী টাকা
*Caveat Emptor—ক্রেতা সতর্কীকরণ
**Ceiling Price—সর্বোচ্চ দর
Censor—(দোষগ্রাহী) প্রহরী
Census—আদম সুমারি, জনগণনা
Certificate—প্রশংসাপত্র, প্রত্যয় পত্র
*Certificate of Identity—অভিজ্ঞা-পত্র
„ of Insurance—বীমার অভিজ্ঞা-পত্র
** „ of Origin—প্রভব লেখ, উৎপাদন নিদর্শন পত্র
* „ of Posting—ডাকের প্রেরণপত্র
**Certificate Sale—বয়নামা
Certified Copy—প্রামাণ্য প্রতিলিপি
Cess—কর (বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত)
*Chamber of Commerce—বণিক সভা
**Charge, Overhead—উপরি ব্যয়, উপরি খরচ
**Cheap Mony Policy—সুলভ মুদ্রানীতি

*Cheque, Crossed—রেখাঙ্কিত চেক
* „ , Dishonoured—প্রত্যাখ্যাত চেক
„ , Order—বরাতি চেক
* „ , Out of date—খারিজ চেক
** „ , Post dated—মেয়াদী চেক, পরতারিখী চেক, উত্তর-তিথি চেক
Chief Accountant—মুখ্য গাণনিক
„ Engineer—মুখ্য বাস্তুকার
„ Executive Officer—মুখ্য নির্বাহক
„ Whip—মুখ্য সচেতক
Circular—পরিপত্র
**Circular Letter—প্রচারপত্র
* Circulation of Money—মুদ্রা প্রচলন
*Circulation, Active—সক্রিয় প্রচলন
* „ , Velocity of—প্রচলন গতি
Civil—দেওয়ানী
*Civil supply—জন সংভরণ
* „ War—গৃহযুদ্ধ, অন্তর্বিপ্লব
*Claim, Preferential—সর্বাগ্রগণ্য দাবি
*Clearrnce of Goods—মালের নিকাশ
„ Sale—নিকাশ বিক্রয়
*Clearing Bank—চেক চুকানী ব্যাঙ্ক
* „ House—নিকাশ-ঘর
*Clerk, Audit—নিরীক্ষা করণিক
* „ , Confidential—আপ্ত করণিক
** „ Correspondence—পত্র-বিনিময়
** „ , Establishment—সংস্থা করণিক
* „ , Head—প্রধান করণিক
Client—মক্কেল
Code—সংকেত
Co-existence—সহ-অবস্থান
**Coin, Base—হীনমুদ্রা
** „ , Subsidiary—সহায়ক মুদ্রা
„ , Token—নিদর্শন মুদ্রা
*Collective bargaining—যৌথ দরদস্তুর
Collectivism—সঙ্ঘক্রিয়াবাদ
Colony—উপনিবেশ
*Colonial preference—ঔপনিবেশিক পক্ষপাত
Combination—জোট
* „ Horizontal—সমশিল্প জোট
* „ Vertical—ভিন্নশিল্প জোট
*Commercial crisis—বাণিজ্যিক সংকট
* „ Depression—বাণিজ্যিক মন্দা
Commission—দস্তুরি
* „ Sale—দস্তুরি প্রথায় বিক্রয়
Commissioner of Excise—অন্তঃশুল্ক মহাধ্যক্ষ
Commissioner of Police—নগরপাল
*Committee, Executive—কার্যনির্বাহক সমিতি
**Commodity Taxation—পণ্য শুল্কারোপ
Communalism—সাম্প্রদায়িকতা
Communqiue—ইস্তাহার, বিজ্ঞপ্তি
Communism—কমিউনিজ্ম্, সাম্যবাদ

*Community Development—সমাজ উন্নয়ন
Commutable—পরস্পর বিনিময়-যোগ্য
Commutation—লঘূকরণ
*Commuted Value—পরিবর্তন মূল্য, নিষ্কৃত মূল্য
*Company, Joint-Stock—যৌথ কারবার, যৌথ মূলধন সংঘ
* „ , Limited—সসীম দায়বদ্ধ কারবার
*Compensation, Workmen's—শ্রমিক ক্ষতিপূরণ
*Compensatory Allowance—ক্ষতিপূরণ ভাতা
Compound Rate—চক্রবৃদ্ধি হার
** „ interest—চক্রবৃদ্ধিহার সুদ
Concession—রেয়াৎ
Confederation—সংরাষ্ট্র
Configuration—গঠন প্রণালী
Conference—সম্মেলন
Confidential—সংগুপ্ত
Confirmation—সমর্থন
Confiscated—বাজেয়াপ্ত
**Consideration—ক্ষতিপূরণ, পণ
Consignee—প্রাপক
**Consignment—চালান, প্রেরিতক
Consignor—প্রেরক
Consols—একত্রীভূত
Consolidation of debt—ঋণ একত্রীকরণ
Consolidation of Land holdings—জোতের চকবন্দীকরণ
Constituency—নির্বাচন কেন্দ্র, নির্বাচক মণ্ডলী
Consumer—পণ্য ব্যবহারকারী
**Consumer's Surplus—ভোগোদ্বৃত্ত
Consumption—ভোগ
** „ , Current—চলতি ভোগ
*Contango—সম্ভাব্য ব্যয়
*Contingent Bill—সম্ভাব্য মূল্যপত্র
Contract—চুক্তি, ঠিকা
„ , Breach of—চুক্তিভঙ্গ
* „ , forward—আগাম চুক্তি
Contract of Hire—ভাড়ানামা
„ of Indemnity—খেসারৎ-নামা
Contraband gold—অবৈধ স্বর্ণ
*Contra-entry—পাল্টা হিসাব
*Control—নিয়ন্ত্রণ
Controller—নিয়ন্ত্রক
Conventional—প্রথানুযায়ী
*Convertible paper money—পরিবর্তনযোগ্য কাগজী মুদ্রা
Co-ordination—সহযোজন
*Co-operative movement—সমবায় আন্দোলন
*Co-operative credit society—সমবায় ঋণদান সমিতি
*Corporate Body—আইনগঠিত সমিতি
„ Management—যৌথ পরিচালনা
Corporation—পৌরনিগম, বিধিবদ্ধ যৌথ-প্রতিষ্ঠান
**Corporation Tax—নিগম কর
Copyright—গ্রন্থস্বত্ব
Corner—একচেটিয়া
Corvee—বেগার

*Cost, Establishment—সরঞ্জামী ব্যয়, স্থাপন ব্যয়
* ,, , Marginal—প্রান্তিক ব্যয়
* ,, , Supplementaty—অনুপূরক ব্যয়
** ,, , Over head—উপরি ব্যয়
Cost of living—জীবনযাত্রার ব্যয়
* ,, ,, production—উৎপাদন ব্যয়
Cost Price—ক্রয়মূল্য
Cost Sheet—উৎপাদন ব্যয়ের হিসাব
Cottage Industry—কুটির শিল্প
*Counter Balance—সমভার (করা)
Counter Foil—প্রতি পত্র
Counterpart—মুড়ি, প্রতিমান
*Counter Signature—প্রতি স্বাক্ষর
Craft—কারু শিল্প
*Craft Guild—কারিগরসংঘ
**Credit—ধার
Credit entry—জমার দাখিলা
,, balance—উদ্বৃত্ত তহবিল
,, sale—ধারে বিক্রয়
,, note—খরচ চিঠা
Creditor—উত্তমর্ণ
Crop, cash—অর্থকরী ফসল
*Cultivation, Extensive—ব্যাপক চাষ
* ,, , Intensive—নিবিড় চাষ
,, , Terrace—সোপান চাষ
Cum-Dividend—লভ্যাংশসহ
Currency—মুদ্রা
*Currency Note—কাগজী মুদ্রা
,, , Contraction of—মুদ্রা সংকোচন
* ,, , Deflation of— ,,
,, , Inflation of—মুদ্রা স্ফীতি
,, , Hard—দুর্লভ মুদ্রা
** ,, , Soft—সুলভ মুদ্রা
*Currency Duty—শুল্ক, বহিঃশুল্ক
*Custom-House—শুল্কাগার
* Cycle of Trade—ব্যবসায় চক্র
Cyclical fluctuation—চক্রানুক্রমিক আবর্তন

D

Dam—বাঁধ
Data—তথ্য
*Date of Maturity—(হুণ্ডি) ভাঙানোর তারিখ
**Days of Grace—মেয়াদাতীকাল, অনুগ্রহ মেয়াদ
*Dead Account—অচল হিসাব
Dead Letter Office—অবিলি পত্রের দপ্তর
,, Lock—স্থগিত অবস্থা
Dead loss—পুরা লোকসান
,, rent—সর্বনিম্ন কর
,, stock—অবিক্রেয় সম্ভার
Dealar, Retail—খুচরা বিক্রেতা
,, , Wholesale—পাইকার
**Death duty—মৃত্যুকর
Debenture—ঋণপত্র
** ,, , Naked—বন্ধকহীন তমসুক
* ,, , Mortgage—বন্ধকী ঋণপত্র
,, , Redeemable—পরিশোধ্য ঋণপত্র
Debit—খরচ
*Debit and credit—জমা খরচ

*Debit balance—ফাজিল বাকি
**Debit note—বাকির হিসাব,
Debit side—খরচ খাতে
*Debt, bad—অনাদায়ী দেনা
,, , conciliation of—ঋণ মীমাংসা
,, , Floating—চলতি ঋণ, অল্পকালীন ঋণ
* ,, , Liquidation of—ঋণ
* ,, , Redemption of—ঋণ-মুক্তি
* ,, , Repudiation of—ঋণ অস্বীকৃতি
*Debtor—অধমর্ণ
Decentralisation—বিকেন্দ্রীকরণ
Declared value—ঘোষিত মূল্য
*Decreasing Return—হ্রাসমান আগম
Deed—দলিল
* ,, of agreement—চুক্তি পত্র
* ,, of acquittance—মুক্তি পত্র
,, of gift—দান পত্র
* ,, of lease—পাট্টা
* ,, of Mortgage—বন্ধকী পত্র
* ,, of Partition—বণ্টন নামা, অংশ নামা, বাঁটোয়ারা নামা
,, of Partnership—অংশীদার পত্র
,, of sale—কবালা।
De facto—কার্যতঃ
Defalcation—তহবিল তছরূপ
**Deferred payment—বিলম্বিত পরিশোধ
Deficit—ঘাটতি, ঊনতা
** ,, financing—ঘাটতি ব্যয়
**Deflation—অবপাত, সংকোচন
De jure—আইনতঃ
*Deflution—মুদ্রা সংকোচন
Deforestation—নির্বনীকরণ
Del credere commission—আশ্বাস দস্তরি
*Delivery Express—দ্রুত বিলি
*Demand, Active—তেজী চাহিদা
* , Alternative—বিকল্প চাহিদা
* , Competitive—প্রতিযোগিতামূলক চাহিদা
Demand, Composite—মিশ্র চাহিদা
,, , Continuous—অবিরাম চাহিদা
,, , Derived—উদ্ভূত চাহিদা
,, , Direct—প্রত্যক্ষ চাহিদা
,, , Effective—কার্যকরী চাহিদা
,, , Elastic—পরিবর্তনশীল (বা সংকোচ-প্রসারশীল) চাহিদা
,, , Elasticity of—চাহিদার নম্যতা
,, , Genuine—অকৃত্রিম
,, , Inelastic—অনম্য চাহিদা অস্থিতি-স্থাপক চাহিদা
,, , Joint—সম্মিলিত (যুগ্ম) চাহিদা
,, , Marginal—প্রান্তিক চাহিদা
,, , National—জাতীয় চাহিদা
,, , Prospective—প্রতিশ্রুতিশীল চাহিদা
** , Reciprocal—পারস্পরিক চাহিদা
Democracy, Direct—প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

Democracy, Representative —প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র
**Demonetisation—মুদ্রাবিচ্যুতি, বিমুদ্রীকরণ
Demonstration—প্রদর্শক, ব্যাখ্যাতা
**Demurrage—গুদামভাড়া, গচ্ছিতি, হর্জানা, বিলম্ব শুল্ক, ডেমারেজ
*Denomination of value—মুদ্রা-মূল্য
Denominator of value—মূল্য পরিমাপক
Density of Population—লোক সংখ্যার ঘনত্ব
*Department, Civil Supplies—জন সংভরণ বিভাগ
" Finance—অর্থবিভাগ
" Home—স্বরাষ্ট্র বিভাগ
Departmental Store—বিভাগীয় বিপণি, বিভাগীয় ভাণ্ডার
Depopulation—জনশূন্যকরণ
Deposit—আমানত
*Depreciation—অবচয়
Depreciation Fund—অবচয় পূরক তহবিল
*Depression—মন্দা
Depression of Market—বাজার মন্দা
" of Trade—ব্যবসায় মন্দা
Deputation—প্রতিনিধিদল, প্রতিনিধ্য
Deputy Director of Agriculture —উপকৃষি-অধিকর্তা
*Deputy Secretary—উপসচিব
Detention—নিরোধ, অবরোধ
*Devaluation—মূল্যহ্রাস
Development Loan—উন্নয়ন-ঋণ
" , Rural—পল্লী উন্নয়ন,
Differential Duties—ভেদাত্মক শুল্ক
*Dies Non—ছুটির দিন
*Differential Duties—বিভেদাত্মক শুল্ক
Diminishing Point—ক্রমহ্রাসমান বিন্দু
" productivity—ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনশীলতা
* " returns—ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন
* " utility—ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতা
Direct demand—প্রত্যক্ষ চাহিদা
* " tax—প্রত্যক্ষ কর
* " charge—প্রত্যক্ষ ব্যয়
Director—ডিরেক্টর, পরিচালক
* " , Managing—কর্মাধ্যক্ষ
Director Board—পরিচালক সংঘ
*Disarmament—নিরস্ত্রীকরণ.
**Disability Insurance—অসামর্থ্য বীমা
*Disbursement—ব্যয়ন
*Disbursing officer—ব্যয়নাধিকারিক
Discharge—কার্যচ্যুতি, বরখাস্ত
Discount—বাট্টা, ব্যাজ
**Discount, Trade—কারবারী বাট্টা
**Discounting of Bills—বাট্টায় হুণ্ডি ভাঙান
*Dividend Warrant—লভ্যাংশপত্র
*Dividend, Accumulated—সঞ্চিত লভ্যাংশ
" , Announced—ঘোষিত লভ্যাং

*Dividend, Interim—অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ
„ , National—জাতীয় লভ্যাংশ
„ , Non-Cumulative—অবর্ধমান লভ্যাংশ
* „ , Paying—প্রদায়ী লভ্যাংশ
* „ , Unclaimed—অপ্রার্থিত লভ্যাংশ
*Division of Labour—শ্রমবিভাগ
Division of Labour, Territorial—আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ
Dock Warrant—ডকের ক্ষমতাপত্র
„ Yard—পোতাশ্রয়
Dockage—ডক-শুল্ক
Doctrine—মতবাদ
Document—দলিল, নথিপত্র
Document of Title—স্বত্বাধিকার-পত্র
**Dollar Reserve—ডলার সঞ্চয়
*Domestic System—ঘরোয়া পদ্ধতি
Double Account System—দো-তরফা হিসাব পদ্ধতি
„ Cropped Land—দোফসলী জমি
„ Dealing—দ্বৈত কারবার
„ Standard—দ্বিমান
„ Taxation—দ্বৈত কর
*Draft—হুণ্ডির খসড়া
*Draw Back—মাল গুদামজাত করা
**Drawback—ফিরতি শুল্ক
*Drawee—হুণ্ডি গ্রাহক
Drawer—হুণ্ডি প্রেরক
* „ , Food—খাদ্য অভিযান
Dry Farming—শুকনা চাষ-আবাদ
*Dumping—ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিদেশে মাল চালান
Duplicate—প্রতিলিপি
Duty—শুল্ক
**Duty, Ad valorem—মূল্যানুসার (বা মূল্যানুযায়ী) শুল্ক
* „ , Customs—বাণিজ্য শুল্ক,
* „ , Discriminating—প্রভেদাত্মক শুল্ক
**Duty, Death—মৃত্যুকর
„ , Estate—সম্পদ শুল্ক,
** „ , Excise—উৎপাদন শুল্ক, অন্তঃশুল্ক
*Duty, Export—রপ্তানি শুল্ক
* „ , Import—আমদানি শুল্ক
** „ , Preferential—পক্ষপাত-মূলক শুল্ক
* „ , Probate—মৃত্যুপত্র শুল্ক
„ , Productive—উৎপাদক শুল্ক
* „ , Protective—সংরক্ষণ শুল্ক
„ , Succession—উত্তরাধিকার শুল্ক

E

E & O. E—ভুল বাদে
Ear marked—নির্দিষ্ট
*Earnest Money—বায়না, দাদন
Easy market—অনুকূল বাজার
Econometrics—অর্থমিতি
Economic activity—আর্থিক প্রযত্ন
„ , applied—ব্যবহারিক ধনবিজ্ঞান
* „ holding—স্বয়ংপূর্ণ জোত
* „ Planning—অর্থনৈতিক পরিকল্পনা
** „ Rehabilitation—অর্থনৈতিক পুনর্বাসন

*Economic Welfare—আর্থিক কল্যাণ
*Education, Technical—কারিগরি শিক্ষা
Efficiency—দক্ষতা
* „ Bar—নৈপুণ্য ধাপ
* „ of labour—শ্রমিকের কর্মকুশলতা, শ্রমপটুতা
* „ of Money—অর্থের পটুতা
*Ejectment—উচ্ছেদ
*Elasticity of demand—চাহিদার স্থিতি-স্থাপকতা
Electorate—নির্বাচক মণ্ডলী
**Embargo—রোধ, আটক, নিষেধাজ্ঞা
*Embarkation permit—আরোহ পত্র
*Emergency—জরুরী অবস্থা
*Emigrant—প্রবসিত
**Emigration—প্রবসন
**Employees' Provident Fund—কর্মচারীদের ভবিষ্য নিধি
*Employment Bureau—নিয়োগ সংস্থা
**Employment, Full—পূর্ণ নিয়োগ
*En bloc—একযোগে
Enclosure—ক্রোড়পত্র
*Endorse—পিছসহি করা
*Endorsee—স্বত্ব গ্রহীতা
**Endorsement—স্বত্বান্তরকরণ, পিছসহি
**Endorsement, Restrictive—নিয়ন্ত্রিত স্বত্বান্তরকরণ
*Endowment Assurance—মেয়াদী বীমা
Enfarnchisement—নির্বাচনাধিকার প্রদান
Enterprise—উদ্যোগ, প্রচেষ্টা
*Entertainment Tax—প্রমোদ কর
Entrepreneur—উদ্যোক্তা
Entry—লেখ, দাখিলা
** „ , Contra—পালটা দাখিলা
„ , Single—একহরা বা একবারগী লিখন
„ , Double—দোহরা বা দ্বিবারগী লিখন
„ . Equitable Asset ন্যায়ানুকূল সম্পদ
Equilibrium—ভারসাম্য
Equimarginal—সমসীমান্তর
Establisment—সংস্থা
* „ Charge—সংস্থা ব্যয়াদি
* „ Cost—সরঞ্জামী খরচ
Estimate—অনুমান, প্রাক্কলন
* „ , Budget—আয়ব্যয়ক অনুমান
* „ , Revised—সংশোধিত অনুমান
* „ , Supplementry—পরিপূরক অনুমান
Estimated Value—অনুমিত মূল্য
*Evacuation—উদ্বাসন
Evacuee—উদ্বাস্তু
*Evaluation—মূল্য নির্ধারণ
*Evasion of Tax—কর ফাঁকি
Eviction—বহিষ্কার
**Excess Prafit Tax—অতিরিক্ত মুনাফা কর
**Exchange, Foreign—বৈদেশিক বিনিময়
„ , Produce—পণ্য বিনিময় কেন্দ্র
** „ , Rate—বিনিময় হার
„ , Ratio—বিনিময় অনুপাত

Executive Engineer—নির্বাহী বাস্তুকার
Exemption—মুক্তি
Ex-gratia—কৃপাপূর্বক কৃত
Ex-officio—পদাধিকার বলে
Ex parte—একতরফা
Expenditure—ব্যয়
* „ , Recurring—আবর্তক ব্যয়
Explotation—শোষণ
Export—রপ্তানি
External trade—বহির্বাণিজ্য

**Face value—অভিহিত মূল্য
Facsimile—প্রতিরূপ
Factory Act—কারখানা আইন
Fair—মেলা, উচিত, ন্যায্য
„ cash book—পাকা রোকড় বই
„ dealing—ন্যায্য লেনদেন
„ ledger—পাকা খাতা
„ price—ন্যায্য মূল্য
„ Rent—ন্যায্য খাজনা বা ভাড়া
Family Budget—পারিবারিক আয়ব্যয়
„ , Joint—যৌথ পরিবার
*Famine Relief—দুর্ভিক্ষ ত্রাণ
*Farming, Collective—যৌথ খামার
* „ , Co-operative—সমবায় খামার
* „ , Mixed—মিশ্র খামার
**Federal Finance—যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থা
*Feeder—উপনদী, উপবর্ত্ম
Fertilizer—সার
*Feudual System—সামন্ত প্রথা
Fibres—তন্তু, আঁশযুক্ত মাল
**Fiduciary Issue—প্রত্যয়ী মুদ্রা
* „ Paper Money—দৃঢ় প্রত্যয়ী কাগজী মুদ্রা
Finance Act—অর্থ আইন
„ Bill—অর্থ বিল
„ Commission—রাজস্ব কমিশন
* „ Corporation—অর্থ নিগম
* „ Public—রাজস্ব বিজ্ঞান
Financial Adviser—আর্থিক উপদেষ্টা
** „ Control—আর্থিক নিয়ন্ত্রণ
„ Crisis—আর্থিক সংকট
Financial Year—আর্থিক বর্ষ
*Fiscal Policy—রাজস্ব নীতি
*Floating of a Company—কোম্পানীর পত্তন
Flow of Capital—পুঁজির প্রবাহ
*Fluctuation—উঠানামা, সংকোচ-প্রসার
Fodder—পশু খাদ্য
Folio—পত্রাঙ্ক পৃষ্ঠা
*Forced Currency—অস্বাভাবিক অধিকার বলে প্রচলিত মুদ্রা
* „ Labour—বাধ্যতামূলক শ্রমদান, বেগার
Forecast—পূর্বানুমান
**Fore closure—স্বত্ব রহিতকরণ
Foreign Trade—বৈদেশিক বাণিজ্য
Foreman—অধিকর্মিক
Forest, Coniferous—সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন

*Forest Reserve—সংরক্ষিত অরণ্য
Forester—বনকর্মী
Forfeiture—বাজেয়াপ্ত করণ
Forgery—জাল করণ
Form—ফরম, ফর্মা, আকার, প্রপত্র
Formal—নিয়ম মাফিক
Forum—বিচারালয়
*Forward Exchang—অগ্রিম বিনিময়, আউতি বিনিময়
* „ Exchange Contract—বিনিময়ের আউতি চুক্তি
„ Purchase—আউতি সওদা
*Fragmentation of Holdings—জোতের খণ্ডীকরণ
„ Delivery—অবাধ অর্পণ
„ Mintage—অবাধ মুদ্রা ঢালাই
Franco—পণ্যার্পণ মূল্য
*Free port—পণ্যশুল্কহীন বন্দর
**Freight—মালের ভাড়া, বা মাশুল
„ Note—চালানী রসিদ
* „ , Pro Rata—সমানুপাতিক মাশুল
Fund—কোষ, নিধি, তহবিল
**Fund, Annuity—বার্ষিক তহবিল
** „ , Consolidated—একত্রীকৃত তহবিল
* „ , Contingency—নৈমিত্তিক তহবিল
* „ , Provident—ভবিষ্য নিধি
* „ , Reserve—সংরক্ষিত তহবিল
* „ , Redemption—ঋণমুক্তি তহবিল
* „ , Sinking—কর্জশোধ তহবিল, ঋণশোধক তহবিল

Funded debt—স্থায়ী ঋণ
*Future Transaction—মুদ্দতী লেনদেন
*Futures—আউতি কেনাবেচা

G

Gambling—জুয়া
General Acceptance—সর্তহীন সাকরাণ
* „ Manager—সাধারণ কর্মাধ্যক্ষ
** „ Price Level—সাধারণ পণ্যের মূল্যস্তর
Genuine Demand—প্রকৃত চাহিদা
*Gilt-edged—স্বর্ণ তুল্য
* „ Bill—সাহুকারী হুণ্ডি
„ Security—সর্বোত্তম ঋণপত্র
Glut of Capital—পুঁজির প্রাচুর্য
*Gold bullion standard—স্বর্ণপিণ্ড মান
* „ Bond—কাঞ্চন পত্র
Gold currency—স্বর্ণমুদ্রা মান
* „ exchange—স্বর্ণবিনিময় মান
* „ Reserve Fund—স্বর্ণ রক্ষণ তহবিল
** „ Standard—স্বর্ণ মান
**Gold Standard Reserve—স্বর্ণমান কোষ
*Goods, Bonded—শুল্কাধীন মাল
„ , Consumers'—ভোগ্য বস্তু
„ , Finished—তৈরী মাল
„ , Free—নিঃশুল্ক মাল
„ , Manufactured—শিল্পজাত বস্তু

Goods, Productive—উৎপাদক মাল
" , Unproductive—অনুৎপাদক মাল
Governing body—পরিচালক বর্গ
Government, Federal—যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার
" , Interim—অন্তর্বর্তী সরকার
" , Unitary—কেন্দ্রীভূত সরকার
Gradation—পর্যায়ক্রম
Grading—পর্যায় করণ
Graduated Tax—ক্রমবর্ধমান কর
Granary—শস্যাগার
Grant—অনুদান
" , Supplementary—পরিপূরক অনুদান
*Grant-in-aid—সহায়ক অনুদান
*Gratuity—আনুতোষিক
*Ground, ranching—পশুপালন ক্ষেত্র
Gross Produce—মোট উৎপাদন
" Profit—মোট মুনাফা
Guarantee—গ্যারান্টি, প্রত্যাভূতি
**Guild—কারু সংঘ
" Socialism—শ্রেণীগত সমাজতন্ত্র

H

Hand bill—ইস্তাহার
*Handicraft—হস্তশিল্প
*Hand loom—হস্তচালিত তাঁত
" note—হাত চিঠা
Hawker—ফেরীওয়ালা
Have-nots—নিঃস্ব
Harvest—ফসল কাটা
*Hereditament—মৌরস, পৈতৃক বিত্ত
Higgling—দর কষাকষি
**Hire purchase—ঠিকা লওয়া
Holding—জোত
**Home charges—বিলাতের দক্ষিণা
" consumption—দেশের উপভোগ
Homogeneous—সমজাতিক
*Honorarium—দক্ষিণা
Husbandry—কৃষিকর্ম
Hush money—ঘুষ
*Hydro-electric—জলবিদ্যুৎ
*Hypothecation—বন্ধক
" , Letter of—বন্ধকপত্র

Identical—অভিন্নরূপ
Identification—সনাক্তকরণ
Illegal contract—অবৈধ চুক্তি
*Immigration—অভিবাসন
Immovable—স্থাবর
Immunity—অব্যাহতি
*Immunity from Taxation—কর-অব্যাহতি
*Impact of taxes—কর সংঘাত
*Imperial preference—সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত
*Import duty—আমদানি শুল্ক
" , gross—মোট আমদানি
** " quota—আমদানি বরাদ্দ
*Imprest account—অগ্রদত্ত অর্থের গণিতক
*Imprest money—অগ্রদত্ত অর্থ, স্থায়ী জিম্মা তহবিল
*Incidence (of tax)—করভার
*Incidental—আনুষঙ্গিক, প্রাসঙ্গিক

Income and expenditure—আয় ব্যয়ের হিসাব
,, tax—আয়কর
*Income, percapita—মাথাপিছু আয়
,, , National—জাতীয় আয়
* ,, , Annual—বাৎসরিক আয়
,, , Net—নীট আয়
,, , Real—খাঁটি আয়, বাস্তব আয়
,, , Unearned—অনুপার্জিত আয়
Inconvertiable Paper Money—অবিনিময়েয় কাগজী মুদ্রা, অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা
Incorported—বিধিবদ্ধ, নিগমবদ্ধ
Increasing Return—ক্রমবর্ধমান আগম
Increase of Demand—চাহিদা বৃদ্ধি
" of Supply—যোগান বৃদ্ধি
Increment, Unearned—অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি
**Indemnity—খেসারত, ক্ষতিপূরণ
,, Bond—ক্ষতিপূরণ পত্র
*Indent—সংভূতিপত্র, সংভূতক
,, ,Direct—সরাসরি মাল চালান
,, Pending—বিলম্বিত মাল চালান
**Index Number—সূচক সংখ্যা
Indigenous Bank—দেশীয় ব্যাঙ্ক
,, Capital—দেশীয় মূলধন
Indirect Tax—পরোক্ষ কর
,, Utility—পরোক্ষ উপযোগিতা
*Indorse a Bill—হুণ্ডি হস্তান্তরকরণ
*Idorsement—পিছসহি
Industrial Committee—শিল্প সমিতি
Industrial Crisis—শিল্প সংকট
* " Depression—শিল্প মন্দা
" Efficiency—শিল্প দক্ষতা
" Bank—শিল্প ব্যাঙ্ক
** Housing—শিল্প শ্রমিকের গৃহ নির্মাণ
Revolution—শিল্প বিপ্লব
** Tribunal—শিল্প আদালত
Industrialisation—শিল্পায়ন
Industrialist—শিল্পপতি
* Industry, Basic—মূল শিল্প
,, , Chemical—রসায়ন শিল্প
,, , Complementary—অনুপূরক শিল্প
,, , Cottage—কুটির শিল্প
,, , Home—গৃহশিল্প
,, , Key মূলশিল্প, বনিয়াদী শিল্প
,, , Subsidiary—গৌণ শিল্প
,, , Supplementary—পরিপূরক শিল্প
Inefficient Labour—অনিপুণ শ্রম
Inelastic Demand—অনম্য চাহিদা
,, Supply—অনম্য যোগান
Inequality of Wealth—সম্পদের অসাম্য, আর্থিক বৈষম্য।
Infant Mortality—শিশু মৃত্যু
** Inflation—উৎসার, সম্প্রসারণ, স্ফীতি
,, of Currency—মুদ্রা স্ফীতি
Ingot—ধাতুপিণ্ড

Inheritance—উত্তরাধিকার, দায়
Inhibition—নিষেধ
Initials—সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর
Injunction—নিষেধাজ্ঞা
Inland—অন্তর্দেশ, অন্তর্দেশীয়
Innovation—নব পরিবর্তন
Insatiable Want—অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা
*Insolvency Act—দেউলিয়া আইন
Insolvent—দেউলিয়া
*Instalment—কিস্তি
*Insurance Policy—বীমাপত্র
Insurance, Accident—দুর্ঘটনা বীমা
** ,, , Disability—অসামর্থ বীমা
,, , Endowment—মেয়াদী বীমা
** , Fire—অগ্নিবীমা
, Indemnity—ক্ষতিপূরণ বীমা
** , Marine—নৌবীমা,
* ,, , Old Age—বার্ধক্যবীমা
,, , Whole Life—আজীবন বীমা
Intensity of demand—চাহিদার প্রাবল্য
,, of supply—যোগানের প্রাবল্য
*Inter alia—সংযোগে
Interest—সুদ, কুসীদ
** ,, , compound—চক্রবৃদ্ধি
,, , gross—মোট কুসীদ
* ,, , vested—কায়েমী স্বার্থ
Inter-alia—সংযোগে
*Interim Dividend—মধ্যবর্তীকালীন লভ্যাংশ
Inter-state Trade—আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য
Integral—অখণ্ড

Intregrity—অখণ্ডতা, ঐক্য
*Intrinsic value—নিহিত মূল্য
Inundation canal—বন্যাপুষ্ট খাল
*Inventory—গৃহস্থালীর ফর্দ
Inverse ratio—বিপরীত হার
**Investment—বিনিয়োগ, লগ্নী
Investment of capital—মূলধন নিয়োগকরণ, মূলধন বিনিয়োগ
Investigation—অনুসন্ধান, গবেষণা
*Invoice—চালান
Irrigation—জল সেচ, সেচ
*Irrigation project—সেচ পরিকল্পনা
Issued capital—বিলিকৃত মূলধন
Item of expenditure—ব্যয়পদ

J

Jailor—কারাপাল, কারাধ্যক্ষ
Jobber—ঠিকাদার, দালাল
Joint—যৌথ, মিলিত, সংযুক্ত
,, Account—সম্মিলিত হিসাব, যৌথ হিসাব
,, Adventure—যৌথ উদ্যোগ
,, Demand—সংযুক্ত চাহিদা
,, Estate—একমালী সম্পত্তি
,, Family—একান্নবর্তী পরিবার
,, Liability—যৌথ দায়িত্ব
,, Life Annuity—সম্মিলিত আজীবন সালিয়ানা
,, Ownership—যৌথ মালিকানা, সহমালিকানা
,, Stock Company—যৌথ কারবার, বা প্রতিষ্ঠান
Jointure—স্ত্রীধন
*Journal—জাবেদা খাতা

Judgement Creditor—ডিক্রী পাওনাদার
,, Debtor—ডিক্রী দেনাদার
**Jurisdiction—অধিকার, এলাকা
Jurisprudence—ব্যবহার শাস্ত্র
**Jute Future Market—পাটের মুদ্দতী বাজার
Juvenile labour—শিশু শ্রমিক

K

*Kartel—কার্টেল, মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংঘ,
*Keelage—বন্দরস্থ জাহাজী শুল্ক
*Keeper of Records—লেখ্যপাল, মহাফেজ
*Kind, Payment in—বস্তু বিনিময়
*Kite—সুপারিশী হুণ্ডি
*Kite Flying—সুপারিশী হুণ্ডি কাটা

*Labour Bureau—শ্রমিক সংস্থা
* „ Dispute—শ্রমিক বিরোধ
** Union—শ্রমিক সংঘ
** Welfare—শ্রমকল্যাণ
* „ Saving machine—শ্রম লাঘব যন্ত্র
„ Productive—ফলপ্রসূ শ্রম
„ Unproductive—নিষ্ফল শ্রম
„ Skilled—দক্ষ শ্রমিক
*Laissez faire—অবাধ-বাণিজ্য নীতি
**Land Acquisition Collector—ভূমিগ্রহ সমাহর্তা
„ Alienation Act—ভূমি হস্তান্তর আইন
**Land Policy—ভূমি নীতি
„ revenue—ভূমি-রাজস্ব
„ survey—ভূমি জরীপ
* „ mortgage bank—জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক
Land Tenure—প্রজাস্বত্ব
„ „ System—প্রজাস্বত্ব প্রথা
„ , Arable—কর্ষণযোগ্য জমি
„ , Barren—অনুর্বর জমি।
„ , Boggy—জলা জমি
„ , Cultivated—আবাদী জমি
„ , Fallow—পতিত জমি
„ , Irrigated—জলসেচপ্রাপ্ত জমি
* „ , Nationalisation—জমির রাষ্ট্রায়ত্ত করণ
„ , Rent-free—নিষ্কর জমি
Landed Interest—ভূমি স্বার্থ
Landing—মাল নামান, অবতরণ
Lapsed—বাতিল, খেলাপ।
*Lapsed Policy—বাতিল বীমাপত্র
*Large Scale Production—বহুল উৎপাদন
Law of Supply and Demand—যোগান ও চাহিদা-বিধি
,, ,, Derived Demand—উদ্ভূত চাহিদা-বিধি
„ ,, Diminishing Demand ক্রমহ্রাসমান চাহিদা-বিধি
* „ „ Diminishing Return ক্রমহ্রাসমান আগম-বিধি
* „ „ Diminishing Utility—ক্রমহ্রাসমান উপযোগ-বিধি
„ „ Increasing Return—ক্রমবর্ধমান আগম-বিধি

Law of Increasing Utility—ক্রমবর্ধমান উপযোগ-বিধি
*Laws of Marginal Utility—প্রান্তিক উপযোগ-বিধি
Law, Civil—দেওয়ানী আইন
,, , Criminal—ফৌজদারী আইন
,, , International—আন্তর্জাতিক বিধি
,, , Martial—সামরিক আইন
,, , Tenancy—প্রজাস্বত্ব আইন
League of Nations—জাতি সংঘ
Lease—ইজারা, লীজ, পাট্টা
Ledger—খতিয়ান বহি
* ,, Folio—খতিয়ান পত্রাঙ্ক
* ,, Entry—খতিয়ানের দাখিলা,
*Legal Tender—বিহিত মুদ্রা, বৈধ মুদ্রা
Legislative Assembly—বিধান সভা
,, Council—বিধান পরিষদ
*Letter of Allotment—বিলিকরণ পত্র, অংশবণ্টন পত্র
,, ,, Attorney—আমমোক্তারনামা
**,, ,, Credit—প্রতিশ্রুতি-পত্র, প্রত্যয় পত্র
,, ,, Guarantee—জামিন-পত্র
**,, ,, Hypothecation—বন্ধকী পত্র
* ,, ,, Indemnity—খেসারত-পত্র
Letter of Indication—অভিজ্ঞান-পত্র
,, ,, Instruction—নির্দেশপত্র
* ,, ,, Introduction—পরিচয়পত্র
* ,, ,, Licence—অনুমতি-পত্র
,, Renunciation—স্বত্বত্যাগপত্র
Liability—দায়, দেনা
,, , Contingent—সম্ভাব্য দায়
**,, , Limited—সীমাবদ্ধ দায়
,, , Unlimited—সীমাহীন দায়
,, , Outstanding—অপরিশোধিত দেনা
Liaison officer—সংযোজক কর্মচারী
License—অনুজ্ঞা
Life anniuty—আজীবন বৃত্তি
Lien—পূর্বস্বত্ব
**Life Annuity—আজীবন বার্ষিক বৃত্তি
,, Assurance—জীবন বীমা
Liquidation—কারবার গুটান
**Liquidator—দেউলিয়া নিকাশকারী, অবসায়ক
Livestok—পশুসম্পদ
Loan, Capital—ঋণকৃত পুঁজি
,, , Long term—দীর্ঘমেয়াদী ঋণ
,, , Short term—স্বল্পমেয়াদী ঋণ
,, , Public—রাষ্ট্রীয় ঋণ
,, , Secured—নিরাপদ ঋণ
**,, , Unsecured—বন্ধকহীন ঋণ
Localisation—স্থানীয় করণ
,, of industries—শিল্পের একদেশতা
*Lock out—কারবার স্থগিত
Loco price—উৎপাদনস্থানে পণ্যমূল্য
Loss, Consequential—পরোক্ষ ক্ষতি
Lump—থোক

M

Machinery—কলকব্জা
Magnitude—পরিমাণ

Mail Order Business—ডাকে কারবার
Maintenance cost—পোষণ ব্যয়
Mala fide—প্রবঞ্চনামূলক
Maldistribution of Wealth—সম্পদের বণ্টন বৈষম্য
Malfeasance—সরকারীকার্যে ত্রুটি
Malpractices—অবৈধ কার্যকলাপ
Management—পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা
** ,, , Corporate—যৌথ পরিচালনা, সংঘবদ্ধ পরিচালনা
**Managing Agent—নির্বাহী নিযুক্তক
,, Committee—পরিচালন সমিতি
,, Director—নির্বাহী পরিচালক
Mandate—আজ্ঞাপত্র
*Manifest—জাহাজের মালের চালান
Manifesto—ঘোষণা পত্র
Manipulation of Accounts—হিসাবের কারসাজি, কৌশলে হিসাবের হেরফের
Manorial System—মহলওয়ারী প্রথা
Manufacture—নির্মাণ, উৎপাদন
Manual—কায়িক
Margin of Profit—মুনাফার সীমা, লাভের পরিমাণ
Marginal—প্রান্তিক, প্রান্তীয়
Marginal Cost—প্রান্তিক ব্যয়
,, Price—প্রান্তিক মূল্য
* ,, Profit—প্রান্তিক মুনাফা
* ,, Productivity—প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা

Marginal Utility—প্রান্তিক উপযোগ
*Market Fluctuatian—বাজারের উঠা-নামা
*Market, Active } তেজী বাজার,
* ,, , Brisk } গরম বাজার
* ,, , Depressed } নরম বাজার
* ,, , Dull }
,, , Easy—অনুকূল বাজার
** ,, , Money—হুণ্ডির বাজার, টাকার বাজার
*Market, Sagging—দমে যাওয়া বাজার
* ,, , Tight—চাপা বাজার
*Marketable Goods—পণ্য সামগ্রী
Marketing—বাজার করণ
Mass Deputation—গণ-প্রতিনিধ্য
Material Prosperity—পার্থিব উন্নতি
Maturity of Bill—হুণ্ডির মেয়াদ পূর্তি
*Maturity, Date of—মুদ্দতি হুণ্ডির মেয়াদী তারিখ
*Mean, Arithmetic—যোগোত্তর মাধ্যম
* ,, , Geometric—গুণোত্তর মাধ্যম
Means of Subsistence—জীবিকা
Mechanical—যান্ত্রিক, যন্ত্রীয়
Medium—মাঝারি, মাধ্যম
**Medium of Exchange—বিনিময়ের মাধ্যম
*Memo—রোকা, স্মারক
Memorandum—স্মারক লিপি

Mercantile Agent—বাণিজ্য প্রতিনিধি

* ,, Marine—পণ্যবাহী নৌবহর

Merchant Vessel—পণ্যবাহী জাহাজ

Merchant, Export—রপ্তানিকার সওদাগর

,, , Import—আমদানিকার সওদাগর

*Metropolitan Scheme—রাজধানিক পরিকল্পনা

*Migration of Labour—মজুরের স্থানান্তর গমন

*Milling—মুদ্রার কিনারায় খাঁজকাটা

Minimum Wage—নিম্নতম মজুরী

* ,, ,, Act—নিম্নতম মজুরী আইন

Minister in charge—ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী

Minister, Cabinet—পূর্ণ মন্ত্রী

Minstry of Agriculture—কৃষিমন্ত্রক

* ,, of Commerce—বাণিজ্যমন্ত্রক

,, of Defence—প্রতিরক্ষা মন্ত্রক

*Mintage—টাঁকশালী শুল্ক

*Mint par—টাঁকশালী কর

*Minute Book—কার্যবিবরণী বহি

Misappropriation—আত্মসাৎকরণ

*Misfeasance—বৈধ ক্ষমতার অপব্যবহার

*Modus operandum—কার্য প্রণালী

Money, Consideration—প্রতিলাভ অর্থ

** ,, market—টাকার বাজার

,, order—অর্থ প্রেরণ

,, , Appreciation of—অর্থের উপচয়

*Money Convertible—পরিবর্তন-যোগ্য মুদ্রা

* ,, , Cheap—সুলভমুদ্রা

* ,, , Depreciation of—অর্থের অবচয়

* ,, , Earnest—বায়না

* ,, , Fiat—অবিনিময় কাগজী মুদ্রা

* ,, , Hard—কাঁচা মুদ্রা

,, , in circulation—চলতি অর্থ

,, , Paper—কাগজী মুদ্রা

* ,, , Ready—নগদ টাকা

,, , Token—নিদর্শক মুদ্রা

*Monometallism—একধাতুমান

**Monopoly—একচেটিয়া

* ,, , Absolute—পূর্ণ একাধিকার

**Moratorium—সাময়িক ঋণ-রেহাই

Mortgage—বন্ধক

Mortgage debenture—বন্ধকী

Mortgagee—বন্ধক গ্রাহী

Mortgagor—বন্ধকদাতা

Multipurpose—সর্বার্থসাধক

* ,, River Schemes—বহুমুখী নদী প্রকল্প সমূহ

*Multi-lateral Trade—বহুমুখী বাণিজ্য

Municipality—পৌরসভা

*Munition—সমর সামগ্রী

*Mutation—নাম খারিজ, নামান্তর করণ

N

*Naked Debenture—বন্ধকহীন ঋণপত্র

Name Day (Stock Exchange)—টিকিট দিন

*National Debt—জাতীয় ঋণ
** „ Defence Fund—জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল
* „ Income—জাতীয় আয়
Nationnl Income calculation—জাতীয় আয় পরিগণনা
„ Prosperity—জাতীয় সমৃদ্ধি
* „ Wealth—জাতীয় সম্পদ
**Nationalisation—রাষ্ট্রায়ত্ত করণ
* „ of Land—ভূসম্পত্তির রাষ্ট্রায়ত্ত করণ
** „ of Industries—শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্ত করণ
*Natural Resources—প্রাকৃতিক সম্পদ
Naturalisation—দেশীয়করণ
Navigable—নাব্য, নৌপরিবহণশীল
Navigability—নাব্যতা, নৌপরিবহণশীলতা
Navigation—নৌপরিবহণ
Navigation canal—নাব্য খাল
* „ law—সমুদ্র বিধি
*Navigation, Inland—আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ
**Negotiable Instrument—সম্প্রদেয় পত্র
**Negotiable Instrument Act—সম্প্রদেয় পত্র আইন
*Negotiate a Bill—হুণ্ডি ভাঙানো
Negotiator—কথাবার্তা-চালক
Net—নীট্, আসল, পাকা
Neutral—নিরপেক্ষ
*Neutrality Pact—নিরপেক্ষতা চুক্তি
Nominal—নামমাত্র
Nomination—মনোনয়ন
*Non-acceptance—অস্বীকৃতি
*Non-alignment—নিরপেক্ষতা
*Non-feasance—কর্তব্য-ত্রুটি
Non-metallic—অধাতব
*Non-recurring Expenditure—অনাবর্তক ব্যয়
*Non-transferable—হস্তান্তর-অযোগ্য
*Notary Public—লেখ্য প্রামাণিক
* „ , Govt, Promissory—সরকারী ঋণপত্র
Notice—নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি
Notification—বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপত্র
Novice—নবীশ
*Null and void—বাতিল ও বে-আইনী
Nullify—বাতিল করা
Numbers odd and even—সম ও বিষম সংখ্যা

O

Oath—শপথ
Objective Value—ব্যবহারিক মূল্য
Obligation—ঋণ, দায়, বাধ্যবাধকতা
Obsolescence—পুরাতন যন্ত্রের মূল্যহ্রাস
*Occupancy Right—দখলীস্বত্ব
Occupant—দখলিকার
**Octroi Duty—চুঙ্গি, দ্বারদেয় শুল্ক
Officer-in-charge—আযুক্ত আধিকারিক
*Officer, Administrative—প্রশাসন আধিকারিক
* „ , Disbursing—ব্যয়নাধিকারিক

*Officer Gazetted—ঘোষিত আধিকারিক
** " , Public Relations—গণসংযোগ আধিকারিক
" , Rationing—সংবিভাগ আধিকারিক
Officer, Special—প্রাধিকারিক
" , Transport—পরিবহণ আধিকারিক
**Official Assignee—সরকারী তত্ত্বাবধায়ক
Officiating—স্থানাপন্ন
On Approval—পরীক্ষার্থ
**On Cost—পরোক্ষ পড়তা
Onerous Tax—দুর্বহ কর
*Optimum—বাঞ্ছনীয়তম, কাম্য
Optimum Population—কাম্য জনসংখ্যা
Order, Conditional—সসর্ত আদেশ
" , Verbal—মৌখিক আদেশ
*Ordinance—অর্ডিন্যান্স, ফরমান,
*Outlay—বিনিয়োগ
Out Agency—মোকাম
Out-turn—উৎপত্তি, উৎপন্ন দ্রব্যজাত
Over-Capitalisation—অতিরিক্ত পুঁজি নিয়োগ
**Over-draft—জমাতিরিক্ত টাকা তোলা
Over-draw a Bill—হুণ্ডি-নির্ধারিত টাকার অতিরিক্ত গ্রহণ
Over-due—মেয়াদ অতীত
Over-estimation—অতি-অনুমান
Over-population—অতিপ্রজনতা, অতিপ্রজনন, জনাধিক্য
Over-production—অত্যুৎপাদন
Over-ruled—রহিত, বাতিল
**Over-time work—অধিককাল কর্ম
Over-trading—অতি ব্যবসায়
Overseer—উপদর্শক
*Overseer, Public Works—পূর্ত-কর্ম উপদর্শক
*Overture—প্রস্তাব
Over-valued—অতি-মূল্যায়িত
Ownership, Private—বেসরকারী মালিকানা
* " , Public—সরকারী মালিকানা

P

Paid in full—পরিদত্ত
**Paid-up capital—আদায়ীকৃত মূলধন
Paper currency—কাগজী মুদ্রা
**Par, Above—অতিরিক্ত মূল্যে অধিহারে, অধিমূল্যে
** " , At—সমমূল্যে, সমহারে
" , Below—উনমূল্যে, উনহারে
" , Mint—টাঁকশালী হার
Partner—অংশীদার
" , Quasi—বেনামা অংশীদার
Partnership Agreement—অংশীদারী চুক্তিপত্র
Parity of Exchange—বিনিময়-সমতা, বিনিময়ে সমমূল্য
" , Prices—দামের সমতা
*Parity, Purchasing Power—ক্রয়শক্তির সমতা
Parliament—সংসদ

Passport—ছাড়পত্র, নিষ্ক্রম পত্র
Pawn—বন্ধকী দ্রব্য
*Pay Bill—বেতন খসড়া
„ Roll—বেতন পত্র
*Payable at sight—দর্শনমাত্র দেয়
Payment, Part—আংশিক পরিশোধ
* „ , On account—অগ্রিম অর্থ প্রদান
Payment of balance—হিসাব শোধ
*Pegging of exchange—বিনিময় হারবন্ধ
*Pending List—অপেক্ষা সূচী
*Per capita—মাথাপিছু
Periodicity—পর্যাবৃত্তি
Permit—আজ্ঞাপত্র
*Per pro—আমমোক্তার সহি
Petty Cash Book—খুচরা নগদান
Piece Wages—ফুরান মজুরী
* „ Work—ঠিকা কাজ
Plaintiff—বাদী
Planned Economy—পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
*Planning, Economic—অর্থনৈতিক পরিকল্পনা
Plant—স্থায়ী যন্ত্রসামগ্রী, সাজসরঞ্জাম
Policy—বীমাপত্র, নীতি
Policy-holder—বীমাকারী
**Policy of Insurance—বীমাপত্র
*Policy, Floating—চলতি জাহাজী বীমাপত্র
* „ , Lapsed—বাতিল বীমাপত্র
„ , Mature—পাকা বীমাপত্র
„ , Open—অমীমাংসিত বীমাপত্র
* „ , Paid-up—হারাহারি বীমাপত্র

Policy, Unvalued—অমূল্যাম্বিত বীমাপত্র
„ , Valued—মূল্যাম্বিত
Political Science (Politics)—রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শাসনবিজ্ঞান
Polity—শাসন-পদ্ধতি
Poll—ভোটগ্রহণ
Polytechnic—বহুশিল্পবিদ্যাত্মক
Pool—ব্যবসায়িক জোট বা অর্থভাণ্ডার
* „ , Market—বাজার-চাহিদা সংঘ
„ , Output—উৎপাদন সংঘ
* „ , Profit—মুনাফা সংঘ
*Portfolio—দপ্তর
Post script—পুনশ্চ
Power-loom—শক্তি চালিত তাঁত
*Preamble—প্রস্তাবনা, ভূমিকা
**Pre-emption—অগ্রক্রয়াধিকার
Preference—পক্ষপাত, সর্বাগ্রগণ্যতা
„ Bond—পক্ষপাতমূলক খত
** „ Share—সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার
„ Stock—সর্বাগ্রগণ্য স্টক
*Preference, Colonial—ঔপনিবেশিক পক্ষপাত
„ Compulsory—আবশ্যিক পক্ষপাত
Premium—(বীমার) কিস্তি, চাঁদা
Prerogative—বিশেষাধিকার
Price Fluctuation—দামের ওঠানামা
** „ Level—মূল্যস্তর, দামের স্তর
„ Movement—দামের গতি
„ Preference—দামের পক্ষপাত
Price, Averge—গড়পড়তা দাম
** „ , Ceiling—সর্বোচ্চ দর
„ , Closing—শেষ বাজারের দাম
„ , Current—চলতি দাম

„ , Demand—চাহিদা দাম (মূল্য)
„ , Equilibrium—সাম্য দর (মূল্য)
** „ , Floor—সর্বনিম্ন দাম
„ , Gross—মোট দাম
„ , Net—নীট দাম
„ , Nominal—নামমাত্র দাম
„ , Normal—স্বাভাবিক দর
„ , Preferential—পক্ষপাতমূলক দাম
„ , Reserve—ন্যূনতম দাম
„ , Selling—বিক্রয়-দাম
„ , Supply—যোগান দাম
Prime Cost—প্রাথমিক খরচ
*Priority—অগ্রাধিকার
Private Company—ঘরোয়া কোম্পানী, ব্যক্তিগত কোম্পানী
Probationer—অবেক্ষাধীন ব্যক্তি
*Producer's Monoply—উৎপাদক-একাধিকার
Producer's Rent—উৎপাদকের কর
* „ Surplus—উৎপাদক আধিক্য
Product, Finished—তৈয়ারী মাল,
**Production Large Scale—বহুল উৎপাদন
„ , Mass—ব্যাপক উৎপাদন
* „ , Small Scale—লঘু উৎপাদন, স্বল্প মাত্রায় উৎপাদন
• Productive Consumption—উৎপাদক উপভোগ
„ Labour—উৎপাদক শ্রম
„ Work—ফলপ্রসূ কার্য
„ Productivity—উৎপাদকতা
„ Profession—পেশা, বৃত্তি
„ Profit and Loss Account—লাভ লোকসান হিসাব
*Profit Sharing Scheme—লাভবণ্টন ব্যবস্থা
*Profiteer—মুনাফাখোর
*Pro forma Account—নমুনা হিসাব
Pro forma Invoice—নমুনা চালান
Pro forma Defendant—গৌণ প্রতিবাদী
Progression—প্রগতি
* „ , Arithmetic—যোগোত্তর প্রগতি
Progression, Geometric—গুণোত্তর প্রগতি
„ , Harmonic—সমন্তর প্রগতি
Progressive Principle—প্রগতিশীল নীতি
„ , Tax—ক্রমবর্ধমান কর
Prohibited Goods—নিষিদ্ধ মাল
Prohibition—নিষেধ, প্রতিষেধ
Proletariate—সর্বহারা, নির্ধন শ্রমজীবী
Promissory note—প্রত্যর্থ পত্র
Pro rate—হারাহারি
**Prospectus of a company—যৌথ কারবারের অনুষ্ঠানপত্র
**Protection—সংরক্ষণ
Provident Fund—ভবিষ্য নিধি
** „ , Employee's—কর্মচারীদের ভবিষ্য নিধি
Proxy—প্রতিনিধি, প্রতিপত্রী
*Public Debt—সরকারী ঋণ
* „ Finance—জাতীয় অর্থব্যবস্থা
„ Health—গণস্বাস্থ্য
* „ Revenue—জাতীয় আয়
„ „ Commission—কৃত্য নিয়োগাধিকার, লোকসেবাধিকার
* „ Works—পূর্তকার্য, সরকারী নির্মাণ কার্য, বাস্তুকর্ম

**Purchasing Power—ক্রয়শক্তি
Proviso—অনুবিধি
*Put and Call—শেয়ার ক্রয় বিক্রয় অধিকার

Q

*Qualified Acceptance সর্তাধীন

Qualitative—গুণানুসারে
„ Distribution—গুণানুসার বণ্টন
Quantitative—পরিমাণবাচক
Quantity Theory—পরিমাণবাদ
„ Theory of Money অর্থের পরিমাণবাদ
*Quantum—পরিমাণ
Quayage—ঘাটের খাজনা
*Quid pro quo—পরিবর্ত দ্রব্য
**Quinquennial—পঞ্চবার্ষিক
*Quit rent—পরিশ্রমের পরিবর্ত দেয় খাজনা
*Quittance—ঋণ মুক্তি
**Quorum—গণপূরক সংখ্যা, সিদ্ধ সংখ্যা
*Quota—বরাদ্দ, পরিমাণ
Quotation—বাজার দর, মূল্য জ্ঞাপন

R

Range—অঞ্চল
Rate—দর, হার
„ of exchange—বিনিময় হার
„ of wages—মজুরীর হার
Ratio—অনুপাত
**„ of Exchange—বিনিময়ের অনুপাত
Ration—সংবিভাগ, বরাদ্দ
Ration Card—সংবিভাগ বা বরাদ্দপত্র
*Rationalisation—সুসংবদ্ধ সংস্কার
*Rationalisation of Industry—শিল্পের সুসংবদ্ধ সংস্কার
Raw Material—কাঁচা মাল
Real Cost—প্রকৃত খরচ
* „ Estate—স্থাবর সম্পত্তি
* „ Exchange—বাস্তবিক বিনিময়
„ income—বাস্তব আয়
„ wages—বাস্তব মজুরী
Realisation—উসুল, আদায়
Realisable dues—আদায়যোগ্য পাওনা
Reappointment—পুনর্নিয়োগ
Reassessment—পুনঃ করনির্ধারণ
*Rebate—রিবেট, ছাড়ধরা, ধরাট
Receipt—রসিদ, জমা
*Receipt and Disbursement—জমা ও খরচ
Receiver—রিসিভার, প্রতিগ্রাহক
*Reciprocal demand—পরস্পরানুবর্তী চাহিদা
Reciprocity—পারস্পর্য, পারস্পরিক সহযোগিতা
Reciprocal—বিপরীত, পারস্পরিক
Record—লেখ্য দলিল
Reclamation—উদ্ধার
* „ of Land—ভূমি উদ্ধার
Reconcilation—রাজীনামা
Reconstruction—পুনঃ সংস্কার, পুনর্গঠন

*Recurring expenditure—আবর্তক ব্যয়
Report—এত্তেলা, প্রতিবেদন
*Redemption—মোক্ষণ
Redeemable debenture—পরিশোধনযোগ্য ঋণপত্র
*Redemption of debt—কর্জ শোধ, ঋণ মোচন
*Redemption charges—মোক্ষণ দক্ষিণা
**Referendum—গণমত গ্রহণ
Refinery—শোধনাগার
Registration—রেজেষ্ট্রী, নিবন্ধন
Registered bond—রেজেষ্ট্রীকৃত বণ্ড
,, capital—নির্ধারিত মূলধন
Register—নিবন্ধক
Regressive taxation—ক্রমহ্রাসমান কর
**Rehabilitation—পুনর্বাসন
Rejection—বাতিল
*Relief work—ত্রাণকার্য, সাহায্য, দান
Relinquishment—ইস্তফা
Relative—আপেক্ষিক
Relative Value—আপেক্ষিক মূল্য
* ,, Surplus Value—আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য
Remission of Revenue—রাজস্ব ছাড় দেওয়া
,, of Rent—খাজনা রেহাই
Reminder—তাগিদ
Remission—নিষ্কৃতি, রেহাই
Remittance—প্রেরণ
*Remunerative Capital—লাভজনক মূলধন

Remuneration—পারিশ্রমিক
Rent—কর
Rent, Consumers'—ভোগ কর
* ,, , Dead—তামাদি কর
Requisition slip—অধিযাচন পত্র
Reserve Fund—সংরক্ষিত তহবিল
,, Capitel—সংরক্ষিত মূলধন
Re solution—প্রস্তাব, সংকল্প
**Resources—সম্পদ
Resources, Mobilisation of—সম্পদ সংযোজন, সম্পদ সঞ্চারণ
Returns—আগম
Revenue—রাজস্ব, আয়
**Revenue Account—রাজস্ব হিসাব আয়ের হিসাব
,, Expenditure—ব্যবসায় পরিচালন ব্যয়, খরচের হিসাব
* ,, Expenditure, Deferred—বিলম্বিত খরচ
,, free land—লাখেরাজ জমি
Road cess—পথকর
*Rotation of crops—শস্যাবর্তন
Rouble—(রাশিয়ার মুদ্রা) রুবল
**Royalty—স্বামিত্ব, নজরানা
**Rural Reconstruction—পল্লী পুনর্গঠন

Sabotage—অন্তর্ঘাত
*Sag—(আকস্মিক) মূল্যহ্রাস
Sanction—মঞ্জুর, অনুমোদন
Sale warrant—বিক্রয় পরোয়ানা
,, certificate—বয়নামা
,, Public—নীলাম
Salesmanship—বিক্রয়কলা

Saigs account—সঞ্চয় আমানত
Sca of Pay—বেতনক্রম
Scity—অপ্রাচুর্য
,, Cast—তপশীলভুক্ত জাতি
Sool Industrial—কারু-শিক্ষালয়
Sdtineer—সমীক্ষক
Sqtiny—সমীক্ষা
Sded—শীলমোহরাঙ্কিত
Sesonal occupation—মরসুমী পেশা
Sretariat—মহাকরণ
Scretary, Private—একান্ত সচিব
Sstor, Private—বেসরকারী ক্ষেত্র
,, , Public—সরকারী ক্ষেত্র
Scular State—ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, লোকায়ত রাষ্ট্র
Scurity—জামানত, জামিন
Security Deposit—জামানত জমা
*Security Collateral—সমপর্যায়ের জামিন
**,, , Gilt-edged—স্বর্ণসমান জামিন
,, , Government—সরকারী জামিন
,, , Liquid—চলতি জামিন
,, , Personal—ব্যক্তিগত জামিন
Seigniorage—বানি
**Self Sufficiency—স্বয়ংপূর্ণতা,
Separation of Powers—ক্ষমতা বিভেদন
Sericulture—গুটিপোকার চাষ
Service Book—কৃত্যক বহি
Service, Administative—প্রশাসন কৃত্যক
Service, Agricultural—কৃষি কৃত্যক
,, , Civil—শাসন-কৃত্যক

Settlement—ভূবাসন
Share certificate—শেয়ার পত্র
,, holder—অংশীদার
** ,, Preference—পক্ষপাতমূলক শেয়ার
Shipment—জাহাজে মাল চালান, জাহাজে চালান দেওয়া মাল
Shipping Agent—পোত নিযুক্তক
,, Bill—জাহাজী মালের চালান
*Short Hand—রেখাক্ষর, লঘুলিপি
Sight Bill—দর্শনী হুণ্ডি
Signature, Specimen—নমুনা, স্বাক্ষর
**Sinking Fund—কর্জ-শোধ তহবিল
*Slab System—পর্যায় পদ্ধতি
Skilled Labour—নিপুণ কারিগর
*Slump—অতি-মন্দা
Small industry—ক্ষুদ্র শিল্প
Smuggling—চোরাই কারবার
Social Control—সামাজিক চুক্তি অভিব্যক্তি
*Socialism, Democratic—গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র
Socialism, Guild—শ্রেণীগত সমাজতন্ত্র
Society, Better Farming—সু-কর্ষণ সমিতি
Sole Agent—একমাত্র বিক্রেতা
Solvency—সচ্ছলতা
Specialisation—বিশেষত্ব বিধান
**Speculation—ফাট্‌কা, ঝুঁকিদারী, অনুমানন
Speculative Business—ফাট্‌কা কারবার, ঝুঁকিদারী ব্যবসায়
Speculative Demand—ফাট্‌কা চাহিদা

Stale Cheque—বাতিল চেক
Stamp Duty—প্রমুদ্রা শুল্ক
Standard money—আদর্শ মুদ্রা,
Standard of Living—জীবনযাত্রার মান
Standard Value—প্রামাণিক মূল্য
*Standard, Gold—স্বর্ণমান
* „ , Gold Bullion—স্বর্ণ-পিণ্ড মান
* „ , Gold Exchange—স্বর্ণ বিনিময় মান
Standardisation—মান নির্ধারণ
State Finance Corporation—রাজ্য বিত্ত সংস্থা
„ Monopoly—রাষ্ট্রীয় একাধিকার
Statement of Accounts—হিসাবের বিবরণ, হিসাব বিবৃতি
**Status enquiries—অবস্থানুসন্ধান
* „ quo—বর্তমান অবস্থা
Statute—বিধিবদ্ধ আইন, লিখিত আইন
Statutory—সংবিধিবদ্ধ
Statutory Company—সংবিধিবদ্ধ কোম্পানী
Stenographer—লঘুলিপিক
*Sterilisation of Gold—স্বর্ণের অকর্মণ্যতা (বন্ধ্যাত্ব) সাধন
Sterling—স্টার্লিং
Stock Book—মালের বহি, গুদামবহি
*Stock Clearing House—স্টক ক্রয় বিক্রয়ের নিকাশ ঘর
**Stock Register—মজুত মালের খতিয়ান
* Stock in trade—ব্যাপারিক সম্ভার
*Stock-taking—মজুত মালের হিসাব গ্রহণ, সংভার গণন
**Stock valuation—মজুত মালের মূল্য নির্ধারণ

**Stock Closing—শেষ মজুত
„ , Dead—অচল মজুত
„ , Deferred—মুলতবী মজুত
„ , Opening—প্রারম্ভিক মজুত
Stockist—মজুতদার
*Storage Cold—হিম ঘর
Stores, Departmental—বিভাগী বিপণি
Strike—ধর্মঘট, হরতাল
Strike, Pen down—লেখনী বিরতি ধর্মঘট
„ , Stay in—অবস্থান ধর্মঘট
Sub-let—কোর্ফা বিলি
Subsidiary—আনুষঙ্গিক
**Subsidy—সরকারী অনুদান
*Sundry creditor—বিবিধ পাওনাদার
*Superannuation Allowance—বার্ধক্য ভাতা
*Superintendent—অধীক্ষক
*Super Profit—অতি মুনাফা
*Super Tax—অতিকর
*Supplementary—পরিপূরক
*Surcharge—অতিরিক্ত কর
**Surplus, Consumer's—ভোগোদ্বৃত্ত
*Sur Tax—অতি-কর, উপরি-কর
Symmetry—প্রতিসাম্য
Syndicate—সিণ্ডিকেট, সংঘ

Tabulation—সংখ্যা শ্রেণীকরণ
**Target—লক্ষ্য
Tariff wall—শুল্ক প্রাচীর
„ Board—শুল্ক নির্ধারক বোর্ড
** Reform—শুল্ক সংস্কার
*Tax, Betterment—উন্নয়ন কর

**Tax Corporation—নিগম কর
** „ Excess profit—অতি মুনাফা কর
„ , Entertainment—প্রমোদ কর
„ , Graduated—ক্রমবর্ধমান কর
„ , Impact of—কর সংঘাত
** „ , Indirect—পরোক্ষ কর
* „ , Inheritance—উত্তরাধিকার কর
** „ , Purchase—ক্রয় কর
„ , Progressive—আয়ানুপাতিক কর
„ , Proportionate—আনুপাতিক কর
„ , Regressive—ক্রমহ্রাসমান কর
„ , Wealth—সম্পদ কর
Taxation—করাধান
„ , Canons of—করারোপন সূত্রাবলী
, Commodity—পণ্য করাধান
Tenancy—প্রজাস্বত্ব
, Act—প্রজাস্বত্ব বিধি
'ender—মূল্যাবেদন পত্র, টেণ্ডার
, money—বায়না
, Legal—বৈধমুদ্রা
'enure—কার্যকাল
'erminal loan—মেয়াদী ধার
'erminology—পারিভাষিক শব্দ শাস্ত্র
'erminus—পথপ্রান্ত
'est Relief—কর্ম সাহায্য
Textile protection bill—বস্ত্রশিল্প সংরক্ষণ বিল
Trade, Balance of—বাণিজ্যিকগতি
** Colonial—ঔপনিবেশিক বাণিজ্য
Commissioner—বাণিজ্য প্রতিনিধি
" , Depression—মন্দা ব্যবসা
** " ' Discount—ব্যবসায়ের বাট্টা
" ' Distributive—খুচরা কারবার, বণ্টন বাণিজ্য
" ' Foreign—বৈদেশিক বাণিজ্য
" ' Mark—ব্যবসায় চিহ্ন
** " ' Union movement—শ্রমিক সংঘ আন্দোলন
Transaction—লেনদেন
Transferable—হস্তান্তর যোগ্য
** " of a country—দেশের পরিবহণ ব্যবস্থা
Treasury Bill—সরকারী হুণ্ডি
*Trial balance—রেওয়া মিল
Trustee—অছি
*Turn-over—উৎপাদন, মোট বিক্রয়-মূল্য, স্থানান্তর
*Type-writer—মুদ্রলিখ
Typist—মুদ্রলেখক

U

*Ultimatum—চরম পত্র
Ultimo—বিগত মাস
*Ultra vires—অধিকার বহির্ভূত
Unanimous—সর্বসম্মত
*Unclaimed dividend—বেওয়ারিশ লভ্যাংশ
Unconditional—বিনাশর্ত, নিঃশর্ত
Unconfirmed—অসমর্থিত
Unconsititutional—নিয়মতন্ত্র বিরুদ্ধ
Uncultivated—অনাবাদী
Under-charge—অল্পমূল্য

Under-developed Economy—অনুন্নত অর্থ ব্যবস্থা
Under-estimation—স্বল্পানুমান
*Under-invoice—অবচালান, কম মূল্যে চালান বিক্রয়
Under-rate—অনুচিত অল্পমূল্য
Under-sale—অববিক্রয়
Under-supply—কম-যোগান
Under-tenant—কোরফা প্রজা
Under-writer—অবলেখক, দায়-গ্রাহক
*Under-writing—অবলিখন, দায়গ্রহণ
Unearned income—অনুপার্জিত আয়
Unearned increment—অনুপার্জিত বৃদ্ধি
Unemployment—বৃত্তিহীনতা, বেকারত্ব
Unemployed—বেকার
*Unfavourable exchange—প্রতিকূল বিনিময়
Uniformity of price—মূল্যের সমতা
Usufrůctuary—স্বদফসলী
Uśurer—সুদখোর, কুসীদজীবী
Usury—কুসীদ বৃত্তি
Utilitarianism—হিতবাদ
Utility Curve—উপযোগ-রেখা
Utility, Derived—উদ্ভূত উপযোগ
" , Final—অন্তিম উপযোগ
" , Form—রূপাত্মক উপযোগ
" , Indirect—পরোক্ষ উপযোগ
" , Marginal—প্রান্তিক উপযোগ
Utopian—অবাস্তব

V

Vacancy—শূন্যপদ, খালি
Vagary—অদ্ভুত খেয়াল
Vagrancy—ভবঘুরেমি
Validity—বৈধতা, প্রামাণিকতা
Valuation—মূল্যবধারণ
Value in use—ব্যবহার মূল্য, উপযোগিতা
" , Declared—ঘোষিত মূল্য
** " , Face—অভিহিত মূল্য
" , Surrender—সমর্পণ মূল্য
*Valued Policy—মূল্যঘোষিত বীমাপত্র
Variation—তারতম্য, উঠানামা
*Velocity of Circulation—মুদ্রার প্রচলন গতি
*Vendibility—বিক্রয়যোগ্যতা
Vendor—বিক্রেতা
Venture—ব্যবসায়, প্রচেষ্টা
Verdict—রায়
Verification—প্রমাণীকরণ
Versus—বনাম
*Veto—প্রতিষেধ, ভেটো
Via—পথে
*Visa—প্রবাসানুমতি, ভিসা
Vocational Training—বৃত্তিমূলক শিক্ষণ
Void—নিষ্ফল, নিষ্প্রভাব
Volume—ঘনফল, পরিমাপ
Vote—মত, ভোট
Vote by Ballot—গুপ্তমতদান
Voter—নির্বাচক
Voucher—প্রমাণক
*Vox Populi—জনমত
Voyage—সমুদ্রযাত্রা
*Voyage policy—সমুদ্রযাত্রার বীমাপত্র

W

*Wages—মজুরী
**Wages, Piece—ঠিকা মজুরী
,, , Real—প্রকৃত মজুরী
,, , Fund—ভৃতি ভাণ্ডার
,, , Task—কার্যানুযায়ী মজুরী
* ,, , Time কালানুসার মজুরী
*Waiting list—প্রতীক্ষা তালিকা
*Warehouse—গুদাম, পণ্যাগার
*Way bill—লোক ও মালপত্রের তালিকা
*Wear and Tear—ব্যবহার জনিত ক্ষয়ক্ষতি
Weekly Return—সাপ্তাহিক বিবৃতি
Weigh Book—ওজন বহি
Weigh man—কয়াল
Welfare work—কল্যাণমূলক কার্য
**Whole Life Insurance Policy—আজীবন বীমাপত্র
Wholesale price—পাইকারী দাম
**Wind-bill—সুপারিশী হুণ্ডি
Winding up—গুটানো
*Window Dressing—প্রচার চাতুর্য
Withdrawal—প্রতিগ্রহণ, উত্তোলন
*Workmen's Compensation—কারিগরদের ক্ষতিপূরণ
,, Insurance—শ্রমিক বীমা
Write off—খরচ খাতায় লেখা

Yard stick—মাপকাঠি
Year Book—বর্ষপঞ্জী
*Year ending—সালতামামী
Yeoman—কৃষক (মধ্যবিত্ত)
Yeomanry—কৃষক সম্প্রদায়
Yield—উৎপাদন

*Zamindary Systems—জমিদারী প্রথা
Zone—অঞ্চল
Zone, Temperate—নাতিশীতোষ্ণ
,, , Tropical—উষ্ণ অঞ্চল.